| পত্রাঙ্ক | প্রদানের তারিখ | গ্রহণের তারিখ | পত্রাঙ্ক | প্রদা[illegible]র তারিখ | গ্রহণের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

যিনি আমার জীবনসর্ব্বস্ব,
যিনি আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,
অহৈতুক কৃপা যাঁহার স্বরূপ,
তাঁহার শ্রীচরণকমলে এই পুস্তিকা
অর্পণ করিলাম।

ইতি
শ্রী-মতী বিনোদিনী
মিত্র

# সূচী।


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| জন্ম ও শৈশব ... ... | ১ |
| কলিকাতায় আগমন ও বিবাহ ... . | ৩৩ |
| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ... ... | ৭২ |
| [illegible]য়া ... ... ... | ৯৭ |
| দেশে অবস্থান ... ... | ১৪৯ |
| শেষ ... ... ... | ৪২৯ |
| তৎপর ... ... ... | ৪৯৪ |
| পূজা ... ... ... | ৫৪১ |
| নাগমহাশয় কি জীব? ... .. | ৫৬৯ |
| উপদেশ ... ... ... | ৫৮২ |
| পরিশিষ্ট ... ... ... | ৬০৩ |

# ভূমিকা।
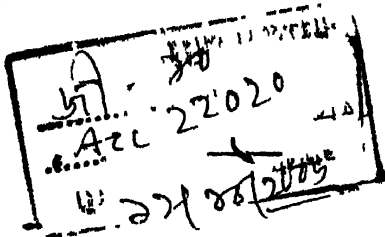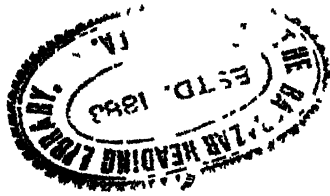
ঢাকা জিলার অধীনে নারায়ণগঞ্জ নামে এক বন্দর আছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে আধক্রোশ দূরে পশ্চিমদিকে দেওভোগ গ্রামে শ্রীদুর্গাচরণ নাগমহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺দীনদয়াল নাগ, মাতার নাম ৺ত্রিপুরাসুন্দরী। দীনদয়ালের পিতার নাম ৺প্রাণকৃষ্ণ নাগ। দীনদয়ালের দুই সহোদরা ছিলেন, ভগবতী ও ভাবতী। ভগবতী শিশুকালে বিধবা হইয়া চিরজীবন পিতৃভবনে কাটান। ভাবতী পিত্রালয়ে বড় আসিতেন না, স্বামী বাড়ীতেই থাকিতেন। নাগমহাশয়দের আদিনিবাস করাপুর। বরিশাল জেলার অন্তর্গত করাপুর গ্রামে তাঁহাদের আদিপুরুষগণ বাস করিতেন। যখন মুসলমানদিগের গরিমারবি অস্তমিতপ্রায়, ইঁহারা সে সময় প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। একশিশু সেই বিশাল জমিদারীর এক অংশ পাইত। তাহার জন্মিবার কিছুকাল পরে শিশুর পিতা ও মাতা পরলোক গমন করেন। এক পরিচারিকা তাহাকে প্রতিপালন করিত। অর্থলুব্ধ, নীচাশয় অংশিগণ তাহাকে বিনাশ করিয়া, তাহার অংশ আত্মসাৎ করার মানসে ঘাতক নিযুক্ত করে। পরিচারিকা তাহা জানিতে পারিয়া শিশুকে লইয়া রাত্রিযোগে বাড়ীর বাহির হয়, জানা নাই সে কোথায় যাইবে। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে রূপেই হউক শিশুর প্রাণ রক্ষা করা। গ্রামের পাশ দিয়া এক নদী প্রবাহিত ছিল। সে তাড়াতাড়ি নদীর পার আসিল এবং একটি নৌকা দেখিতে

পাইল। সে জানিত না নৌকা কোথায় যাইতেছে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ারও তাহার ইচ্ছা ছিল না। সে চাহিয়াছিল, যে কোন প্রকারে হউক এই যমপুরী হইতে শিশুকে লইয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে। সুতরাং সে নৌকার মাঝিকে সকাতরে ডাকিতে লাগিল। মাঝি গভীররজনীতে রমণীর স্বর শুনিয়া, কৌতূহলপরবশ হইয়া, পারে নৌকা লাগাইল এবং ডাকার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। রমণী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, শিশুকে কোলে করিয়া নৌকায় উঠিল এবং মাঝির সম্মুখে শিশুকে রাখিয়া তাহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা, আমাদিগকে রক্ষা কর।

মাঝির বাড়ী ঢাকা জিলায় ছিল। ধান্য ক্রয় করিবার জন্য বরিশালে গিয়াছিল। বরিশাল চিরকাল শস্যের জন্য বিখ্যাত। ঢাকার জিলা হইতে সেখানে লোক যাইয়া চিরকাল ধান্য ক্রয় করিয়া আনিত এবং এখনও আনে। ধান্য ক্রয় করিয়া আসার সময় পরিচারিকা ও শিশু তাহার নৌকায় উঠিয়াছিল। পরিচারিকার ক্রন্দনে এবং তাহার সহিত এক সুকুমার শিশুকে দেখিতে পাইয়া, মাঝি বিপদের আশঙ্কা করিয়া সত্বর নৌকা ছাড়িয়া দিল। পরিচারিকা তাহাকে সমস্ত বিবরণ বলিল। সে যত দূর সম্ভব আত্মসংযত করিয়া শিশুর বংশমর্য্যাদা ও ধন সম্পত্তির কথা বলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণনাশের কথাও ব্যক্ত করিল। মাঝির অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল। সে পরিচারিকাকে অনেক আশ্বাস দিল। নৌকা চলিয়া আসিল।

আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ঢাকা জিলার মধ্যে তিলার্দ্দি নামে একটী গণ্ডগ্রাম ছিল। তিলার্দ্দির নিকটে একটী

বড় হাট বসিত। তথায় ধান্য বিক্রয় করিতে নৌকা লাগান হইল। তিলার্দ্দি গ্রামে ভৌমিক উপাধিধারী কয়েক ঘর কায়স্থ বাস করিতেন। পরিচারিকা লোকমুখে তাহা শুনিতে পাইয়া, তাঁহাদের আশ্রয় নিবে বলিয়া মাঝির নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিল। মাঝিও সেই কথায় মত দিল। পরিচারিকা শিশুকে কোলে করিয়া ভৌমিক-দিগের বাড়ীতে গেল। যিনি তিলার্দ্দির মালিক ছিলেন, তিনি শিশুর পরিচয় পাইয়া, তাহাদিগকে আপনার ঘরে স্থান দিলেন। যথা সময়ে তিনি এই নাগমহাশয়ের নিকটে তাহার একটী কন্যার বিবাহ দিয়া, যৌতুক স্বরূপ এই তিলার্দ্দি গ্রাম তাঁহাকে দিলেন। কালক্রমে তিলার্দ্দি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইলে, কাশীরাম নাগ দেওভোগ চলিয়া যান। আত্মারাম নাগও সেখানে বাড়ী করিবার জন্য কতক ভূমি রাখেন, এখনও সেইস্থান "আত্মারাম নাগের বাড়ী" বলিয়া পরিচিত আছে। দেওভোগ বিক্রমপুর নহে, এই সামাজিক আপত্তি উত্থাপিত হইলে, আত্মারাম নাগ আর সেখানে যান নাই।

তিনি পঞ্চসার গ্রামে যাইয়া, তালুক গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এখনও সেই গ্রামে বাস করিতেছেন।

কাশীরাম নাগমহাশয়ের পুত্র রামমাণিক্য নাগ। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র দীনদয়াল। কাশীরামের অপর পুত্র রামমোহন নাগের বংশধরগণ বেতকা গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজগতে শ্রীদুর্গাচরণ নাগমহাশয় "নাগমহাশয়" বলিয়া পরিচিত, সুতরাং আমি তাহাকে নাগমহাশয় বলিয়াই লিখিব। যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং যাহা আমি তাঁহার আত্মীয়ের

মুখে শুনিয়াছি, তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিব। যদি কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। আশা তাঁহার পত চরিত্র আলোচনা করা, ভরসা তাঁহার রাতুল শ্রীচরণকমল।

১লা বৈশাখ, ১৩৩০। গ্রন্থকর্ত্রী।

---
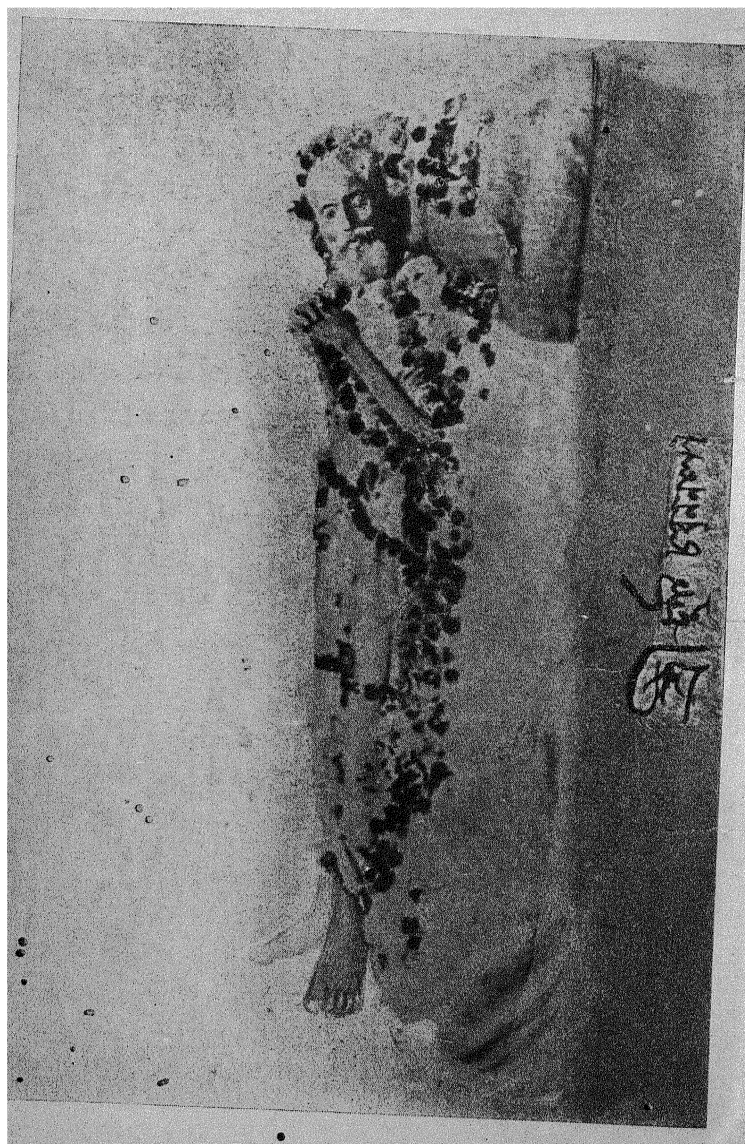
# শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়।

## জন্ম ও শৈশব।

১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র বেলা একপ্রহরের পূর্ব্বে নাগমহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। সেদিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি, চন্দ্র সিংহ ভবনে। দীনদয়াল নাগ মহাশয়েরবব অনেক বয়স পর্য্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহাব মাতা ও ভগ্নি বড় দুঃখিতা ছিলেন। তাঁহার ছেলে হওয়ায় সকলেই অতিশয় সুখী হইলেন। প্রতিবেশীদিগকে সঙ্গে করিয়া নবজাত শিশুকে দেখিতে গেলেন। শিশুকে দেখিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। অন্যান্য শিশুর মত তাহাকে লাগিল না। তাহাকে তাহাদের ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইল, কোন কারণ বশতঃ তাহাকে আপন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, শিশুকে একবার কোলে লেন, হৃদয়ে ধারণ করেন, এবং তাহার মুখকমল চুম্বন করেন। ভূতলে আসিয়াই শিশু লোকের মন আকর্ষণ করিল। সে অতিশয় শান্ত ছিল, কদাচিৎ কাঁদিত। শিশু আপন মনে শুইয়া থাকিত, তাহার খাওয়ায় তত প্রবৃত্তি ছিল না। জননী অনেকবার কোলে করিয়া স্তন মুখে ধরিলে, এক-আধবার স্তন্য পান করিত। অন্য সময়

মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত এবং মৃদু-মন্দ হাসিত। যে শিশু পরের মন হরণ করিতে পারে, সে যে মাতার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জননী তাহাকে কোলে নিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন, লোকে অনেক বার ডাকিলে তিনি শুনিতে পাইতেন। তিনি শিশুকে মাটিতে রাখিতে চাহিতেন না, অনেক সময় তাহাকে কোলেই রাখিতেন এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাহার মুখে যে কি সৌন্দর্য্য লাগিয়াছিল, তিনিই জানিতেন, তাহার মুখ হইতে যেন নয়ন তুলিয়া আনিতে পারিতেন না। জননী বসিয়া থাকিয়া তৃষিত চকোরের মত তাঁহার মুখ-চন্দ্রিমা পান করিতেন।

অন্যান্য শিশু যেমন ঘন ঘন মল-মূত্র ত্যাগ করে, এই শিশু তাহা করিত না। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইত, কাঁদিয়া একবার মাতাকে বিরক্ত করিত না। শিশুর কষ্ট হইবে বলিয়া জননী অনেকবার উঠিয়া, শিশুকে তুলিয়া দেখিতেন, সে কোন ভিজা স্থানে শুইয়া আছে কি না। যদিও তিনি জানিতেন শিশু সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, তবু ভালবাসার তাড়নায় তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেন, অতৃপ্ত বাসনা পুরণ করিতেন। দীনদয়াল তখন কলিকাতায় ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্ম-বিবরণ-লিখিত চিঠি পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন, দিন গণিতে লাগিলেন, কবে পুত্রের মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা তখনই চলিয়া আসিয়া কুল-নন্দনকে কোলে নেন, কি করিবেন, পরের চাকুরী করেন। ইচ্ছামত কাজ করাত আর চলে না। সুতরাং তিনি সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঁচ মাস চলিয়া গেল, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি ভোজেশ্বর পালবাবুদের কাজ

করিতেন। তাঁহাদিগকে বলিয়া ছুটি লইয়া বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাড়ী আসিয়া পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিলেন। শিশু তখন আধ-আধ কথা বলিতে পারে।

দীনদয়াল শিশুর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তাহার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা শুনিতে সর্ব্বদাই উৎকর্ণ থাকিতেন। শিশু চন্দ্রকলাব মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল; সে ছয় মাসে পড়িল। দীনদয়াল পুত্রের অন্নপ্রাসনের যোগাড় করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতাদির অর্চ্চনা করিয়া, নিয়মমত তাহার মুখে ভাত দিলেন এবং শ্রীদুর্গাচরণ নাম রাখিলেন। শিশু বসিতে শিখিল। হেলিয়া দুলিয়া পিতা-মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাঁহারা শিশু ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। সোহাগ করিয়া কোলে কাঁখে করিয়া, দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৭।৮ মাসে শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিল। দীনদয়ালের একটী কাজ বাড়িল। এখন তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইত। শিশু এক স্থান হইতে অন্যস্থানে হামাগুড়ি দিয়া যাইত, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া আবার হাসিতে হাসিতে হামাগুড়ি দিত। তাহা দেখিয়া দীনদয়াল একবারে ভুলিয়া গেলেন। শিশুকে ফেলিয়া কোথায়ও যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না, সর্ব্বদা তাহাকে নিয়া থাকিতে মনে নিত। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়া শিশু অতিশয় চঞ্চল হইল। সে কেবল এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে থাকিত। দীনদয়াল অস্থির হইয়া পড়িলেন, ডর, শিশু আঘাত পায়। কখন কখন তাঁহাকে তাড়াতাড়ি চলিতে হইত, তাহা দেখিয়া শিশু আরও বেগে চলিত ও হাসিত। এরূপে

মাস এইরূপে খেলা করিয়া কাটাইলেন। ছুটি ফুরাইয়া আসিল, কলিকাতা যাইতে হইবে। তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, শিশুকে ছাড়িয়া আসিতে হইবে ভাবিয়া মনে কষ্ট হইল। দিন চলিয়া গেল, দীনদয়াল দুঃখিত অন্তঃকরণ লইয়া রওনা হইলেন।

কলিকাতা আসিয়া দীনদয়াল পুত্রের বিবহ জ্বালায বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। শুইতে বসিতে কেবলই পুত্রের কথা তাঁহাব মনে হইতে লাগিল। পুত্রের মুখ-চন্দ্রিমা, হাসিমাখা কমল-নয়ন, ভাবভঙ্গি, জড়িত কথা ও হামাগুড়ি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মনিবের চাকুরী তাহা ভুলাইতে পারিল না। যাহা কিছু করিতেন, তাতেই পুত্রের কথা মনে পড়িত। তিনি ভাবিতেন, এখন কি করি? কয়েক দিন এই ভাবেই কাটাইলেন। বাড়ী হইতে যাইবার সময় পুত্রের একটি ঠিকুজি করিয়া নিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, সেইঠিকুজি দেখাইয়া কুষ্ঠি তৈয়ার করাইবেন। দীনদয়াল একজন জ্যোতিষীর অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। অনেক তল্লাসের পর একজন জ্যোতিষী পাইলেন। যাহারা তাহাকে জানিত, সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছিল। জ্যোতিষীকে ঠিকুজি না দেখাইয়া, পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কবিয়া দীনদয়াল বলিলেন, অমুকদিন অত ঘটিকার সময় আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার কুষ্ঠি করাইতে চাই। তাহা শুনিয়া জ্যোতিষী বলিলেন, আমি কোন ঠিকুজি না দেখিয়াই আপনার পুত্রের রূপ ও স্বভাব বলিব। ইহাতে সন্তোষলাভ করিলে, আপনি আমাকে তাহার কুষ্ঠি প্রস্তুত করিতে বলিতে পারেন। আপনার পুত্র বড় মনোরম, শ্যামকায়, পলাশ-লোচন। তাহার বামপদেব কনিষ্ঠ অঙ্গুলি জোড়াও বলা যায়;

কিম্বা তাহার পায়ে একটী অঙ্গুলি বেশী আছে। তাহার হাসি মনমুগ্ধকর, স্বভাব চঞ্চল অথচ সে অতিশয় শান্ত। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকে না, আধ-আধ কথা বলিয়া হাসিয়া হামাগুড়ি দিয়া অথবা হাত পা নাড়িয়া সকল দিন খেলা করে, কিন্তু কোন জিনিষ ধরে না, কাঁদিয়া কাহাকেও বিরক্ত করে না। যেরূপ চঞ্চল যদি সেরূপ অশান্ত হইত এবং জিনিষ-পত্র ফেলিত, এই অশান্ত শিশুকে লইয়া আপনাদিগকে খুব বেগ পাইতে হইত; তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে হইত এবং জিনিষপত্রও যেখানে সেখানে রাখিতে পারিতেন না। শিশু হাসিয়া হাসিয়া নিজের মনে নিজে খেলা করে, কোন অনিষ্টে যায় না। তজ্জন্য সে অশান্ত হইয়াও অতিশয় শান্ত। সে এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমস্তগুলি লক্ষণ ভাল। এ রকম শুভলগ্নে কদাচিৎ কাহার জন্ম হয়। এই লগ্নে জন্মিয়াছে বলিয়া তাহার বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি জোড়া। আপনার পুত্র সুশীল, সচ্চরিত্র, সুমিষ্টভাষী, সত্যবাদী হইবে। এ জগতে সে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে পবিগণিত হইবে। সকলে তাহাকে ভালবাসিবে এবং আপন বলিয়া মনে করিবে। আপনার পুত্র প্রাণান্তেও কোন দোষের কাজ করিবে না। যাহা সে অন্যায় ভাবিবে, সে কাজ আপনি বলিয়াও করাইতে পারিবেন না। তাহাকে কেহ পর বলিয়া ভয় করিবে না। দীনদয়াল জ্যোতিষীব কথা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলেন, তাঁহার প্রত্যেকটী কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন। যখন তিনি পুত্রের রূপ বর্ণনা করিয়া, তাঁহার বামপদের কনিষ্ঠের অঙ্গুলিটী জোড়া বলিলেন, তাঁহার কথায় দীনদয়ালের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি দুর্গাকে যেরূপ খেলা করিতে দেখিয়াছেন, জ্যোতিষী ঠিক্‌ই

বলিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী নির্ভুল মনে করিয়া ঠিকুজী দেখাইয়া পুত্রের কুষ্ঠি তৈয়ার করাইলেন। *

জ্যোতিষীর মুখে দুর্গার রূপ ও গুণ শুনিয়া দীনদয়াল মহানন্দে দুর্গার কুষ্ঠি তৈয়ার করাইয়া দিন গণিতে লাগিলেন, কবে দুর্গার মুখ দেখিতে পাইবেন। তিনি ভাবিতেন, দুর্গা হয়ত এখন হাঁটিয়া সকল বাড়ী বেড়াইয়া খেলা করিতেছে, আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি না। দীনদয়াল দূরে বসিয়া পুত্রের সকল কথা কল্পনা করিতেছেন। এক বৎসরের শিশু মায়ের সাথে ঘুরিতে লাগিল। পিসী-মা ও ঠাকুর-মা আদর করিয়া কোলে নিতেন, কিন্তু সে কাহারও কোলে বেশী সময় থাকিত না, সকল দিন হাঁটিয়া বেড়াইয়া, হাসিয়া নাচিয়া, কখন তরুলতার দিকে তাকাইয়া, কখন বা পশুপক্ষী দেখিয়া খেলা করিত। অনেক সময় জননীর নিকট থাকিত। জননী হাতে কাজ করিতেন সত্য, মনপ্রাণ শিশুতে পড়িয়া রহিত। তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন, শিশু যেন কোন মতে ব্যথা না পায়। তাহাকে হাঁটিতে দেখিয়া, তাহার হাসিমাখা আধ-আধ কথা শুনিয়া, সকলেই মুগ্ধ হইত।

শিশুর বয়স দুই বৎসর হইল। সারদামণি জন্মগ্রহণ করিলে ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

---

* একদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন। দীনদয়াল আহ্লাদিত হইয়া আমার পিতার নিকট জ্যোতিষীর কথা বলিতেছিলেন, আমি তাঁহাদের কাছে ছিলাম। দীনদয়াল পিতাকে ৩।৪ বার বুঝাইয়া বলিলেন, দুর্গার বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি জোড়া দেখ না, জ্যোতিষী দুর্গাকে না দেখিয়াই তাহা বলিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছে, রূপে গুণে দুর্গার মত কেহ হইবে না। এই সব কথা বলিতে বলিতে দীনদয়ালের চক্ষু স্থির হইয়াছিল, তাঁহার সে দৃশ্য এখনও আমার চক্ষে আসিতেছে। নাগমহাশয় বাড়ীতে আসিলে দীনদয়াল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আর ছেলের যত্ন করিতে পারিব না, আর তাহাকে বুকে নিয়া শুইতে পারিব না, কি করিব সকলই বিধাতার ইচ্ছা। যখন সারদামণি হয়, শিশু একবার মা কোথায় গেল বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসীমা বলিলেন, তোমার বোন্ হইয়াছে, মা তাহাকে নিয়া আছে, তুমি আমার কাছে থাক। শান্তস্বভাব শিশু আর কোন কথা বলিল না, কাহাকে আব বিরক্ত করিল না, পিসী মাতার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। এদিকে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তাঁহার বুকখালি বোধ হইল। শিশু ভোরে উঠিয়া, হাঁটিয়া গিয়া জননীর সামনে দাঁড়াইল। ত্রিপুরাসুন্দরী তাহাকে দেখিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। শিশু দূর হইতে মাতার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া মাতার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি মেয়েকে রীতিমত লালন-পালন করিতেন, লক্ষ্য থাকিত ছেলে যেন কোথায চলিয়া না যায়, কোথায় যেন ব্যথা না পায়। শিশু দূরে থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া জননীকে দেখিতে লাগিল। সে কোনরূপ বিরক্ত কিম্বা ভগ্নির সাথে হিংসা প্রকাশ করিত না। দেবতা চিরকালই দেবতা। যিনি বিষধর সাপকে আপন করিয়াছিলেন, তিনি কি কখন ভগ্নির প্রতি হিংসা করিতে পারেন?

ভগ্নি জন্মিলে শিশু দুর্গা পূর্ব্বের মত মাতার নিকট থাকিতে পারিত না। সে সকল দিন মাকে দেখিবা, হাঁটিয়া নাচিয়া আপন মনে খেলা করিয়া বেড়াইত। ভগ্নি হাঁটিতে শিখিলে, সে সময় সময় তাহাকে লইয়া খেলা করিত। তাহা দেখিয়া মাতা অতিশয় সুখী হইতেন। তিনি বলিতেন, দেখিও, তোমার ভগ্নি যেন কোথায় চলিয়া না যায়। শিশু ভগ্নির একটী রক্ষক হইল দেখিয়া, ঠাকুর

মা ও পিসী মা আপন মনে কাজ করিতেন। মা সকল দিন সংসারের কাজ করিয়া, সন্ধ্যা হইলে, ছেলে ও মেয়েকে নিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া, ছেলের মুখপানে চাহিয়া, আদর করিতেন। শিশু মাকে পাইলেই সুখী হইত, মায়ের আদর পাইয়া, সে আকাশ পানে তাকাইয়া তারা দেখাইয়া বলিত, মা, মা, ও কি? মাতা সরল স্বভাবা ছিলেন। তিনি বলিতেন, ঐ স্বর্গ। উহাতে যাহা দেখিতে পাও তাহা তারা। শিশু বলিত, তুমি আমাকে উহা দাও; আমি উহাদের সাথে খেলা করিব। মাতা বলিতেন, উহা কি ধরা যায়? উহা স্বর্গের সৌন্দর্য্য। শিশু মায়ের কথা শুনিয়া কি বুঝিল, সেই তাহা জানিত। আকাশ পানে এক মনে তাকাইয়া থাকিত। তাহাকে আকাশের দিকে চাহিতে দেখিয়া, মাতা জিজ্ঞাসা করিতেন, ওখানে কি দেখিতেছ? শিশু বলিত, স্বর্গে কেমন সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে। এখানে উহা নাই। তাহা শুনিয়া মা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। আকাশে চাঁদ উঠিলে শিশুর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে চাঁদের দিকে তাকাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিত, মা, ও কি? মাতা বলিতেন, ও চাঁদ তোর চাঁদ-মুখ দেখিতেছে। শিশু চাঁদের দিকে চাহিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। সে বলিত, মা, চল, আমরা ও দেশে চলিয়া যাই। এখানে আমার ভাল লাগে না। শিশুর কথা শুনিয়া, তাহার মুখপানে চাহিয়া, স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, মা মনে ভয় পাইতেন। তিনি জানিতেন, এই চাঁদ কি তাঁহার কুটীর ঘরে শোভা পায়? এ দরিদ্রের ঘরে, তাঁহার বুক জুড়িয়া, চির দিন থাকিবে কেন? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিত। তিনি ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে

মনে বলিতেন, ভগবন্, যে ধন আমাকে দিয়াছ, আমা হইতে তাহা কাড়িয়া লইও না। আমি অনেক দুঃখের পর ইহাকে পাইয়াছি, ইহাকে রাখিয়া যেন চলিয়া যাইতে পারি। বধূর তাদৃশ ভাবব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া শ্বশ্রূ ও ননদিনী মনে ব্যথা পাইতেন। সকলেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, শিশু যেন দীর্ঘজীবী হয়।

ত্রিপুরাসুন্দরী স্বর্গে গেলে, ঠাকুর-মা ও পিসী-মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন, এদেশ ভাল লাগে না বলিয়া, মাকে সুখময় স্বর্গে পাঠাইয়া দিলে। এখন তুমি বাঁচিয়া থাকিলেই বহুভাগ্য মনে করিব। আহা কি সুন্দর বধূ ছিল? গর্ভে কি রত্ন হইয়াছে! এমন বৌ আর পাইব না। বিধাতা তাহার চিহ্ন স্বরূপ এই রত্নটী বাঁচাইয়া রাখুন।

সারদামণির দুই বৎসর পর আর একটী কন্যা হইয়া মারা গেল। আবার দুই বৎসর পর একটী ছেলে হইয়াছিল। শেষোক্ত পুত্রের এক মাস বয়সের সময় ত্রিপুরাসুন্দরী সূতিকা রোগে আক্রান্ত হন এবং ননদিনীর কোলে হৃদয়ের ধন দুর্গাচরণ ও অন্য দুইটি সন্তান রাখিয়া বিধাতার লিপি অনুসারে নয়ন মুদিলেন। দীনদয়ালের মন হাহাকার করিয়া উঠিল, হৃদয় দমিয়া গেল। এমন অতুলনীয় মণিকে শিশু বয়সে মাতৃহীন করিয়া কোথায় প্রস্থান করিল? যে দুর্গাকে না দেখিলে মুহূর্তে মণিহারা ফণীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা হইত, সে নয়নের মণি দুর্গাকে ফেলিয়া এখন কি করিয়া থাকিবে? দুর্গার মুখের কথা মনে হইলে কি তাহার হৃদয়ে একবার ব্যথা লাগিবে না? বৎস দুর্গা শিশু বয়সে মাতৃহীন হইল। ভগবন্, তোমার কাজ তুমি করিলে, এখন আমি যেন আমার কাজ করিতে পারি। যে কাজে দুর্গার কষ্ট আসে, সে কাজ ভ্রমেও যেন না

করি। জ্ঞানী দীনদয়াল আগম ও নিগম ভগবানের নিয়ম মানিয়া, দুর্গাকে হৃদয়ে ধরিয়া, স্ত্রীবিয়োগজনিত দুঃখ দূর করিলেন। জননীকে চক্ষে রাখিয়া, সুখী হইয়া দুর্গা সকল দিন খেলা করিত, লেখাপড়া করিত। সে জননীকে এভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, সুখময় হইয়া, জীবের দুঃখ মোচন করিতে আসিয়া, নিজে দুঃখে পড়িলেন। শত লোক শত যত্ন করুক না কেন, মাতার যত্নের তুলনা হয় না। সংসারে দুর্গার কোন সুখ ছিল না, শুধু দুইটী খাওয়া ছিল, ৬ বৎসর বয়সে মাতা হারাইয়া সে খাওয়াও হারাইল। জননীর তুল্য যত্ন জগতে কে করে? তবে পিতা দেবতুল্য ছিলেন, সাধ্যমত কতক যত্ন করিয়াছেন। সারাদিন মাতাকে দেখিয়া, খাওয়ার সময় খাইত, খেলার সময় খেলিত, কখন কখন পড়িত, শিশু দুর্গা ৬ বৎসর সুখেই ছিল। আজ জননীকে মৃত্যুশয্যায় শুইতে দেখিয়া, কাল মুখ নিয়া তাঁহার মৃতদেহের পাশে বসিয়া কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইল। ঠাকুর মা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু তাহার কান্না থামাইতে পারিলেন না। এদৃশ্য দেখিয়া দীন দয়ালের হৃদয় ফাটিয়া গেল। পুত্রকে শান্ত করিতে হৃদয়ে ধরিলেন, হৃদয় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় চিতার বহ্নি ইহা হইতে শীতল।

ত্রিপুরাসুন্দরী ভাগ্যবতী, ৬ বৎসরের ছেলে রাখিয়া স্বর্গে গেলেন। দীনদয়াল ধর্ম্ম সঙ্গত মনে করিয়া বালক দুর্গা দ্বারা মাতার মুখাগ্নি করাইলেন। মায়ের সৎকার করিয়া বাড়ীতে আসিয়া, বালক মলিন মুখে যেখানে মাতা থাকিতেন, সে-সব স্থান দেখিতে লাগিল। দীনদয়াল তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়া,

তাহাকে জড়াইয়া বুকে রাখিলেন। ঠাকুরমা ও পিসীমা বিশেষ যত্ন করিলেন, যাহাতে সে সহজে মাকে ভুলিয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মভীরু দীনদয়াল তাহাকে আতপ অন্ন ও সৌন্ধব লবণ খাওয়াইয়া নিয়ম মত মাতার জলপিণ্ড দেওয়াইলেন। তিনি স্বীয় জননী ও ভগ্নিকে বলিলেন, আমাদের কর্ম্মদোষে আমরা কষ্টে পড়িলাম, কিন্তু সে ভাগ্যবতী পতি ও পুত্র রাখিয়া গমন করিয়াছে। ভাগ্যবতীর উপযুক্ত কাজ করিব। দীনদয়াল মনে অশেষ কষ্ট লইয়া, পুত্র দ্বারা স্ত্রীর প্রেতকার্য্য সব করাইলেন। বহু ব্রাহ্মণের ভোজন হইল, অন্যান্য অনেক লোক খাইল। যিনি এমন রত্ন প্রসব করিয়াছিলেন, যদি তিনি ভাগ্যবতী না হন, এজগতে আর কে ভাগ্যবতী হইবে? সতী ত্রিপুরাসুন্দরীর মত পূণ্যবতী ভাগ্যবতী কোথায়? পতি সামনে দাঁড়াইয়া সতী ত্রিপুরার প্রেত কাজ শিশু পুত্রের হাতে সমাপন করাইলেন। যে এই দৃশ্য দেখিয়াছিল, সে অমঙ্গল দৃশ্যেও ত্রিপুরাসুন্দরীকে ভাগ্যবতী বলিয়া মঙ্গল দৃশ্য মনে করিল। তাহারা বলিল, বধূ কি ভাগ্যবতী ছিল? স্বামী ও শিশু পুত্রকে দিয়া নিয়ম-মত সব কাজ করাইল। সকলকেই ত মরিতে হইবে, ভাগ্যবতী সুসময়ে মরিল। দীনদয়ালকে বহু ধন্যবাদ দিল। অসময়ে স্ত্রী সংসার ফেলিয়া চলিয়া গেলে, কেহ এমত নিখুত ভাবে শ্রদ্ধাদি করায় না। ধন্য দীন দয়াল! ধন্য ত্রিপুরাসুন্দরী!

মাতৃহীন বালক পিতার স্নেহে ও বাৎসল্যে দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পিতার মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। স্বভাব সুন্দর বালক স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। কেহ তাহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না। যে তাহাকে

দেখিত, সেই তাহার ভালবাসামাখা মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিত হইত এবং একবার তাহাকে কোলে নিত। বালকও সকলের কোলে যাইত। সে বাৎসল্য স্নেহ জাগাইয়া সকলের চিত্ত অধিকার করিত। অধিক সময় না হউক, অল্প সময়ের জন্য সকলে তাহাকে কোলে নিয়া হৃদয় শীতল করিত। বালক কোলে উঠিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইত। তাহার দৃষ্টি সকলের হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত করিত, যেন সে মাতৃহীন হইয়া জগতের মাতৃভাব জাগাইতেছে। প্রতিবেশী রমণীগণ বলিত, অন্য শিশুকে এরূপ করিতে কখন দেখা যায় না। এক মাসের শিশু নিজ জননীকে চিনিতে পারে। শিশু মায়ের মুখের দিকে যেভাবে তাকায়, অন্য কাহার মুখের দিকে সেভাবে তাকায় না। বধূ তাহাকে আমাদের কোলে দিলে দেখিয়াছি, শিশুর দৃষ্টি ভিন্ন মত ছিল। যতদিন সে মায়ের কোলে ছিল, ততদিন আমরা লক্ষ্য করি নাই। এখন তাহাকে কোলে নিয়া মনে করি, বালক মাতৃহীন, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বুঝাইয়া দেয়, সে এখনও মাতার কোলে উঠিয়াছে। বালক পরের মাকে মা বলিয়া দেখিতে পারে বলিয়াই বোধ হয় বিধাতা তাহাকে মাতৃহীন করিয়াছেন। যদি সে এখন নিজের জননীর কোলে থাকিত, আমরা তাহাকে এত কোলে নিতাম না, সে যে পরের মাতাকে নিজের মাতার মত দেখে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। জগতে উহার গুণ প্রচার করার জন্যই যেন বিধাতা উহাকে মাতৃহীন করিয়াছেন। তাহা না হইলে কোন দেবতা এমন স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিকে কষ্ট দিতে পারেন না।

বালকের স্বভাব ভিন্ন-মত ছিল। কেহ আদর করিয়া কোলে

নিলে সে তাঁহার কোলে যাইত, কিন্তু কোন জিনিষ খাইতে দিলে, সে ভুলেও তাহা মুখে দিত না। যখন সকলেই তাহার মধুর মুরতি দেখিয়া মোহিত হইত এবং আদর করিত, ঠাকুরমা ও পিসীমা যে তাহাকে বিশেষ আদর করিতেন, ইহা আর বেশী কি? ঠাকুরমা ও পিসীমা সর্ব্বদা মনে রাখিতেন, দুর্গাগত প্রাণ দীনদয়াল যেন কোনমতে মনে না করিতে পারে, ঘরে মাতা না থাকায় আমার দুর্গার অযত্ন হইতেছে। যত্ন ও অযত্ন উভয়ই বালকের পক্ষে সমান, কারণ যে যত্ন চায়, তাহাকে যত্ন না করিলে সে মনে কষ্ট পায়, নানামত উৎপাত করে। এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই সুখ ও দুঃখ বর্জ্জিত ছিল। যখন জীব জন্মগ্রহণ করে, তখনই সে খাওয়ার অভাব বোধ করে। বড় হইলে, খাওয়ার সময় আসিলে এবং খাইতে না পাইলে, সে কাঁদিতে থাকে, খাইতে পাইলে শান্ত হয়। যখন কথা বলিতে পারে, তখন সে কথামত খাওয়ার জিনিষ না পাইলে নানারকম উৎপাত করে। ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় ক্ষুধা পাইলে, যদি মাতা কোন কারণ বশতঃ সময় মত খাইতে না দেন, সে নিজহাতে খাদ্য দ্রব্য নিয়া খায় কিম্বা উপদ্রব জন্মায়। এই মাতৃহীন বালক কখনও বলে নাই, আমাকে খাইতে দাও, সময় হইয়াছে স্নান করাইয়া দাও। সে কখন নিজের সুখ চাহিত না। পিসীমা স্নান করাইয়া দিলে, সে স্নান করিত, খাওয়াইয়া দিলে খাইত। তাহার কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। সে ভুলেও নিজের সুখের জন্য কাহাকে সামান্য কষ্ট দিত না। বালক সাময়িক চাঞ্চল্য হেতু এখানে সেখানে যাইত, কিন্তু কাহাকেও যন্ত্রণা দিত না। ঠাকুরমা ও পিসীমা তাহাকে যে ভাবে রাখিতেন, সে বিনা আপত্তিতে সে ভাবে থাকিত। বালকের ভালবাসার মুর্ত্তি দেখিয়া

সকলে তাহাকে ভিন্ন মত স্নেহ করিত। তাহার আচার ব্যবহার লোকের মনোমত ছিল। সে সকলের মনোরঞ্জন হইল। মাতৃহীন বালকের জন্য কাহার একচুল অসুবিধা হয় নাই।

বালক দুর্গার মধুর মুর্ত্তি দেখিয়া পশু পাখি সকলেই তাহাকে আপন মনে করিত। বিড়ালের খাইতে ইচ্ছা হইলে তাহার কাছে আসিয়া মিউ মিউ করিয়া তাহার ক্ষুধা জানাইত। বালক পিসীমাকে বলিত, পিসীমা তাহাকে কিছু খাইতে দাও, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। সে এমন ভাবে বলিত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিসীমা তাহার মুখপানে চাহিয়া বিড়ালকে কিছু খাইতে না দিয়া পারিতেন না। তাহার মুখ দেখিলে মনে হইত জীবের ক্ষুধায় যেন সে নিজের ক্ষুধা বোধ করিতেছে। যদি পিসীমা কখন বালককে মুড়ি খাইতে দিতেন, এবং পশু পক্ষী মুড়ি খাইতে তাহার কাছে আসিত, সে সকলকেই খাইতে দিত, সে সকলকে সমান ভাবে সুখী করিত। সকলকে খাওয়াইয়া যাহা কিছু থাকিত সে তাহা খাইয়া সুখী হইত। কোন কোন দিন এমন হইত যে, তাহার খাইবার জন্য কিছুই নাই। সে পশু পক্ষীকে সুখী দেখিয়া, সন্তোষ লাভ করিয়া উহাদের সাথে খেলা করিতে থাকিত। পিসীমা কিছুই জানিতেন না। ৭।৮ বৎসরের বালক ১টা, কিম্বা ২টা পর্য্যন্ত না খাইয়া থাকিত। রান্না হইলে পিসীমা তাহাকে স্নান করাইয়া ভাত খাওয়াইয়া দিতেন। একদিন মুড়ি খাওয়ার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। বিড়াল, কুকুর, পক্ষী তাহার কাছে আসিয়া ডাকিতেছে। তাহাদিগকে ডাকিতে দেখিয়া পিসীমার মনে হইল তিনি দুর্গাকে খাইতে দেন নাই। সকল দিন চলিয়া গেলেও দুর্গা বলিবে না তাহার ক্ষুধা পেয়েছে। পিসীমা মনে কষ্ট পাইয়া বালককে মুড়ি খাইতে দিয়া চলিয়া

আসিলেন। সে সেই মুড়ি পশু পক্ষীকে খাইতে দিতে লাগিল। পিসীমা ফিরিবা তাকাইয়া দেখিলেন, সে সামান্ত বাখিয়া প্রায় সমস্ত মুড়ি উহাদিগকে দিয়া ফেলিল। তিনি বিরক্ত হইয়া বালককে গালি দিবেন ভাবিয়া তাহাব কাছে গেলেন। সে এমন ভাবে পিসীমার দিকে তাকাইল, তিনি তাহাতে ভুলিয়া গেলেন, তাহাকে আর কিছু বলিতে পাবিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুর্গা প্রত্যেক দিন এইরূপ না খাইয়া থাকে? কোথা হইতে উহাব অন্তরে এমন দয়া আসিল? পশু পক্ষী ডাকিলে, তাহাদের ক্ষুধা বোধ কবিয়া নিজেব ক্ষুধা ভুলিয়া, নিজের খাদ্যদ্রব্য তাহাদিগকে দেয় এবং তাহাদেব সুখে সুখী হইয়া, কিছু না খাইয়া বসিয়া থাকে। এমন শিশু কোথায় দেখি নাই বা শুনি নাই। পরন্ত দূবের কথা, কোন শিশু আপন ভাই ও ভগ্নিকে ক্ষুধাব সময় নিজের খাওয়ার জিনিষ দেয় না। পশুপক্ষী খাইবে বলিয়া সে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, কিম্বা অন্তকে তাহা তাড়াইতে বলে, আব এই শিশু পশুপক্ষীর ক্ষুধা বুঝিয়া ডাকিয়া সামনের দ্রব্য খাইতে দেয়। এ মানুষ না দেবতা? জগতে কাহারও অন্তরে এমন দয়া দেখা যায় না যে, ক্ষুধার সময় মুখের গ্রাস পরকে দিয়া সুখী হয়। জননী সন্তানকে ভালবাসেন, নিজে না খাইয়া সন্তানকে সুখাদ্য খাওয়াইয়া সুখী হন। তিনি সুখাদ্য জিনিষ খাওয়াইয়া সুখী হন সত্য, কিন্তু ক্ষুধার সময় খাইতে বসিলে, যদি সন্তান তাহার সম্মুখের খাদ্য খাইয়া ফেলে, মাতাও সব খাওয়াইয়া সন্তানের সুখ দেখিয়া নিজের ক্ষুধা ভুলিয়া যান না, কিম্বা সন্তানের সুখে সুখী হইতে পারেন না। জগতে মাতৃস্নেহের অত কাহারও স্নেহ হয় না। সে মাতাও যখন সন্তানকে সামনের

খাদ্য খাওয়াইয়া, ক্ষুধা ভুলিতে পারেন না, এমন শিশুর এভাব কোথা হইতে আসিল? শিশুর জীবনে এক সময় যায়, তখন সে ভাল মন্দ কিছু জানে না। সে সময়ও যদি সে দেখে যে তাহার সামনের খাদ্য দ্রব্য অন্যে খাইয়া যায়, নিজে তাড়াইতে না পারিলেও কাঁদিয়া অপরকে জানায়। অপর লোক আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলে শিশু শান্ত হয়। আর এই শিশু জানিয়া শুনিয়া সামনের জিনিষ পশুপক্ষীকে খাওয়াইয়া সুখী হয়। অন্য শিশু জিনিসের মূল্য না বুঝিয়া, পশুপক্ষীকে তাহা খাওয়াইয়া, নিজের খাওয়ার জন্য মাতার নিকট আবার সেই জিনিষ চায়, কিন্তু এই শিশু তাহা কখনও করে না। সে অপরকে সামনের জিনিষ খাওয়াইয়া, অপরের মুখ দেখিয়া, নিজের ক্ষুধা ভুলিয়া যায়। এ কোথা হইতে আসিল? উহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া পৃথিবী দেবীও হার মানেন। বালকের ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া পিসীমা অবসর মত নিজেই তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। তাহার অলৌকিক আচরণে সকলেই বিস্মিত হইল।

বালক দুর্গার সুমিষ্ট স্বরে ও বিনয় বচনে সকলে তাহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। দীনদয়ালের মন বাৎসল্য স্নেহ হেতু দুর্গাতে একেবারে ডুবিয়া গেল। দীনদয়াল বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর, তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দিবসে দুইবার অন্ন গ্রহণ করেন নাই। ১২ বৎসর বয়স হইতেই তিনি সদাচারী। পঞ্চম বৎসরে হাতে খড়ি দেওয়ার নিয়ম। সুতরাং দুর্গার বয়স ৫ বৎসর হইলে বিদ্যারম্ভ হইল। দীনদয়াল ৫ বৎসরেই তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গার খাওয়ার খেয়াল কোন দিনই ছিল না, কিন্তু পড়ায় বেশ

আগ্রহ হইল। পিতা একবার বলিয়া দিলে, সে সব মনে রাখিতে পারিত এবং নূতন পাঠ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিত। তাহার আগ্রহ দেখিয়া পিতা অতিশয় যত্নের সহিত তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। সে ৬ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইল। পিতার মনে বড় আঘাত লাগিল; তিনি কয়েক দিনের জন্য লেখা পড়া বন্ধ রাখিয়া দিলেন।

বালক দুর্গার পড়ায় এত আগ্রহ ছিল যে, সে স্নানাহারের মত লেখা পড়া একটা কাজ মনে করিয়া পিতার নিকট পুস্তক নিয়া বসিত। তিনি তাহার অগ্রহ দেখিয়া, অল্পদিন বাড়ীতে পড়াইয়া, নারায়ণগঞ্জে এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। তখন বালকের বয়স ৮ বৎসর। সে তথায় সকলের মনোরঞ্জন হইয়া উঠিল। সমবয়সী বালকগণ তাহাকে যেমন ভাল বাসিত, শিক্ষকও তেমন স্নেহ করিতেন। সে সকল দিন লেখাপড়া করিয়া রাত্রে শোয়ার সময় গল্প শুনিতে চাহিত।

শিশু সময়ে দুর্গা নিজের খাওয়ার জিনিষ অপরকে খাওয়াইয়া, তাহার সুখে সুখী হইয়া, তাহার সহিত খেলা করিয়াছে। কখনও ক্ষুধায় কাতর হয় নাই, যেন খাওয়া ও না খাওয়া উভয় তাহার সমান ছিল। বালককালে দেহের সুখ ও দুঃখ বোধ ছিল না, কিন্তু ন্যায় অন্যায় কাজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পড়ায় আগ্রহ দেখিয়া তাহার ঠাকুরমা ও পিসীমা বলিতেন, দুর্গার খাওয়ার খেয়াল নাই, কোথা হইতে পড়ায় এত মনোযোগ আসিল? পড়ার প্রতি ঔৎসোক্য দেখিয়া, তাঁহারা তাহার কাজের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। সে গল্প কথা শুনিতে অতিশয় ভাল বাসিত, পিসীমাও গল্পছলে রামায়ণের কথা বলিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। পিসী-

মা যে দিন যে গল্প বলিতেন, বালক সেই রাত্রে সেই চিত্র স্বপ্নে দেখিত। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত, জাগ্রত হইয়া সে কখন রামের সৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া হাসিত, কখন বা রামের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিত। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া পিসীমার নিকট স্বপ্নের সমস্ত বিবরণ বলিতে বলিতে রামের সুখে সুখী হইত, এবং রামের দুঃখের কথা বলিয়া মুখ মলিন করিত। রাম রাবণের যুদ্ধ দেখিয়া, সে ভয় পাইত। ইহা শুনিয়া, পিসীমা বলিতেন, বাবা, তুমি কখনও মানুষ নও। কোন্ পাপে মানবের ঘরে জন্মিয়াছ। এত বয়স হইয়া গেল, কত কাল যাবত রামায়ণ বলিতেছি, এক দিনও ত রামকে স্বপ্নে দেখিলাম না। কত বালক ও বালিকাকে রামায়ণ বলিয়াছি, কেহ ত বলে নাই, সে রামকে স্বপ্নে দেখিয়াছে। অধিক কি, সারদাও তোমার সঙ্গে রামায়ণের কথা শুনে, সে এক দিনও বলিল না, সে রামকে দেখিয়াছে। বালকের স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া, ঠাকুর-মা ও পিসী-মা অবাক হইলেন। পিসী-মা বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখিয়া, ভয় পাইয়া একাকী জাগিয়া কাঁদিয়াছ, আমাকে ডাক নাই কেন? সে বলিল, ঘুম ভাঙ্গিলে আপনার কষ্ট হইবে মনে করিয়া আপনাকে জাগাই নাই। ঠাকুর-মা বলিলেন, এমন বয়সে তোমার এত জ্ঞান কোথা হইতে হইল? দীনদয়ালের ঘরে তুমি কে আসিলে? সারদামণি সেই স্থানে ছিল, ঠাকুর-মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্গার কথা শুনিয়াছ? তুমি কি কখন রামকে স্বপ্নে দেখিয়াছ? সারদামণি বলিল, না, আমি কোন দিনও রামকে স্বপ্নে দেখি নাই। ঠাকুর ভাই কি রকমে দেখেন জানি না। ঠাকুর-মা বলিলেন, তোমার ভাই মানুষ নয়। কোন্ পাপের ফলে আমাদের কাছে আসিয়াছে।

বালক দুর্গা পিসী-মার নিকট অনেক কথা বলিত। ঠাকুর-মা অতিশয় বৃদ্ধা ছিলেন। পিসীমা ছোট সময় হইতে তাহার অলৌকিক ভাবগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন।

দুর্গা কখনও অন্যায় কাজ ও কলহ করিত না, মিথ্যা কথা মুখে আনিত না। এমন কি অন্যকেও তাহা করিতে বারণ করিত। তাহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া ঠাকুর-মা ও পিসী-মা বলিয়াছেন, দুর্গার খাওয়ার খেয়াল নাই, আপন পর জ্ঞান নাই, কিন্তু সে মিথ্যা কথায়, অন্যায় কাজে ও কলহে অতিশয় বিরক্ত হয়। দুর্গার গুণে সকলেই তাহাকে ভালবাসে। খেলার সাথীরা দুর্গাকে ডাকিয়া নেয়, তাহা দেখিলে মনে হয়, দুর্গা যেন তাহাদের আপন। সকলেই দুর্গার সঙ্গে খেলা করিয়া সুখী।

একদিন অন্য পাড়ায় ছেলেরা দুর্গা ও অন্যান্য ছেলেদের সাথে জুটিল। তাহাকে পাইয়া সকলেই মনের আনন্দে খেলা করিতে লাগিল। ছোট সময় হইতেই তাহার এমন শক্তি ছিল, যে তাহাকে একবার দেখিত, সেই তাহাকে আপন মনে করিত। অন্যান্য বালকেরা দুর্গাকে এত বিশ্বাস করিত, কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব লাগিলে, তাহা বালক দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিত, এবং তাহার কথা অনুসারে মীমাংসা হইত। যে কাজে তাহার সঙ্গীদিগের হার হয়, সঙ্গীদের হার হইলে নিজেরও হার হয়, এমন কাজেও অন্যপক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। দুর্গা সত্য কথা বলিত। একবার সঙ্গীরা খেলায় পরাজিত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে ধান ক্ষেতের উপর দিয়া টানিল, এবং তাহার কোমল অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিল। তাহারা আরও বলিল, যদি তোমার সত্য কথায় আবার আমাদের হার হয়, তোমাকে

ইহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দিব। বালক অম্লানবদনে সমস্ত সহ্য করিল। সে কেবল বলিল, ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড দিলেও আমি মিথ্যা কথা বলিব না। তাহার সত্যের আঁট দেখিয়া সঙ্গীরা কি ভাবিতে লাগিল। অন্যদিন খেলা শেষ হইলে সে বাড়ীতে আসিত। এইদিন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে ফিরিল না। সঙ্গীরা বাড়ীতে গিয়াছে। রাত্র হইয়াছে। পিসী-মা চিন্তিতা হইয়া সকল বাড়ীতে তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। চারিদণ্ড রাত্রির পর বালক বাড়ীতে গেল। পিসী-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রিতে কোথায় ছিলে? সে তাঁহাকে বিশেষ কিছু বলিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পিসী-মা মনে করিলেন, দেরি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভয়ে চুপ করিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া পিসী-মার মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, আর এত দেরি করিও না। পিসী-মা আদর করিয়া খাইতে দিলেন। বালক অন্য দিনের মত খাইল, কতক সময় পড়িয়া শুইয়া রহিল। বাড়ীর লোক কোন কথা জানিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে বালক দুর্গা উঠিয়া পড়িতে বসিল। যাহারা নির্দ্দয় কাজ করিয়াছিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, দুর্গা নিশ্চয়ই পিসী-মাকে এই বিষয়ে বলিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে পিসী-মা তাহাদিগকে কিছু বলেন কি না। অনেক বেলা হইল। এখনও যখন পিসী-মা কোন কথা বলিলেন না। তাহারা বুঝিতে পারিল, দুর্গা তাহাদের নামে কিছু বলে নাই। পিসী-মা গায় রক্ত দেখিবে বলিয়া বোধ হয় সে রাত্রে বাড়ীতে গিয়াছিল। তাহাদের প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারে না, কিন্তু নিজদের অন্যায় ব্যবহারের কথা মনে

করিয়া, তাহার নিকটেও যাইতে পারিতেছে না। অনেক চিন্তা করিয়া তাহাদের একজন আসিয়া দুর্গার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে অন্য দিনের মত তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিল, যেন তাহাদের মধ্যে বিশেষ কিছু হয় নাই। তাহা দেখিয়া অন্যান্য সঙ্গীরা তাহার নিকট আসিয়া নিজদের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিল। দুর্গা মধুর ভাবে সকলের সাথে মিশিতে লাগিল।

পিসী-মা আড়ালে থাকিয়া তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে এইসব কথা তাঁহাকে কেন বলে নাই। দুর্গা কোন জবাব দিল না। পিসী-মা তাহার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেখিলেন, তাহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, এই জন্যই বোধ হয় তুমি রাত্রিতে আসিয়াছিলে? সে আর কোন কথা গোপন করিতে পারিল না, সমস্ত কথা পিসী-মাকে বলিল। ঠাকুর-মা ও পিসী-মা সঙ্গীদিগকে বিস্তর গালাগালি দিলেন। দুর্গা বিনয় বচনে তাহাদিগকে শান্তনা করিয়া বলিল, কলহ করিলে আমি যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা না পাওয়া হইবে না। কলহ করা বড় দোষ, আমার কোন কষ্ট হয় নাই। আপনারা ঝগড়া করিবেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে কোন কথা বলি নাই। আমার কষ্ট হইয়াছে বলিয়াত আপনাদের কষ্ট হইয়াছে। আমার কষ্ট না হইলে ত আপনাদের কোন কষ্ট হইত না। আমার কষ্ট হয় নাই, আপনারা কষ্ট করিবেন না। বালকের নম্র স্বভাবে ও বিনয় বচনে তাঁহারা আর কোন কথা না বলিয়া নিবৃত্ত ছিলেন সত্য, বালকের দেহে আঁচড়ের চিহ্ন দেখিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে

অতিশয় ব্যথা লাগিল। তাহার গায়ের কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়া বলিলেন, যাদু আমার কি কষ্টই না পাইয়াছে! এত কষ্ট পাইয়াও অন্যের দোষ গোপন করিয়া, কাপড়ে রক্ত পুছিয়া সরাইয়া রাখিয়াছে, যেন আমরা তাহা দেখিতে না পাই। উহারা আমাদের বাড়ীতে না আসিলে কোন মতেই জানিতে পারিতাম না যে, তাহারা তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছে। অমন দুষ্ট ছেলেদের সাথে আর খেলা করিও না। ৮।১০ বৎসর এই ভাবেই চলিয়া গেল।

বালক দুর্গা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া পড়ায় আরও মনোযোগ-দিল। সে সর্ব্বদা সকলের উপরে থাকিত। সেই বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পড়া যাইত। সুতরাং সে আর বেশী দিন পড়িতে পারিল না। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার সেই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইল। বালক অন্য বিদ্যালয়ে পড়িবে মনস্থ করিল। কলিকাতায় পিতার নিকট চিঠি লিখিল। পিতার অল্প আয়। তিনি তাহাকে কলিকাতা রাখিয়া পড়ান অসম্ভব মনে কবিলেন। দুর্গা দেশেই স্কুল খুঁজিতে লাগিল। দেশে তখন বেশী স্কুল ছিল না। সে ঢাকায় যাইয়া পড়িবে স্থির করিল। সে কখন নিজের সুখের জন্য অন্যের অসুবিধা করিত না। দুইটা বাসি ভাত খাইয়া স্কুল দেখিতে ঢাকা গেল। সকল দিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া, নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িবে ঠিক করিয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ী গিয়া ভাত খাইল। ১৩ বৎসরের বালক সারা দিন একপ্রকার উপবাসী থাকিলেও, তাহার কষ্ট কেহ বুঝিতে পারিল না। আপনাদের সুখ ও দুঃখ জীবমাত্রেই অনুভব করে, কেহই পরের অসুবিধা হইবে বলিয়া নিজে কষ্টের বোঝা মাথায় করে না। বিশেষতঃ ১৩ বৎসরের

বালক স্বীয় সুখ ও দুঃখ বিনা অন্য কিছুই জানে না, কিন্তু এই বালকের শিশুকাল হইতেই দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। সে নিজের সুখের জন্য কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিত না, বরং সে অপরের সুখের জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া সুখী হইত।

বালক দুর্গা পিসী-মাকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিল, ঢাকা যাইয়া আসিতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। আপনাকে বলিয়া গেলে, আপনি আমাকে বাসিভাত খাইয়া যাইতে দিতেন না, তজ্জন্য আপনাকে বলিয়া যাই নাই। পিসী-মা বলিলেন, তুমি অত করিয়া ঢাকা যাইয়া আসিতে পারিলে, আর আমি বাড়ী বসিয়া রান্না করিয়া দিতে পারিতাম না। ঢাকায় পড়াই স্থির হইল। সমবয়সীরা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি করিয়া দেওভোগ হইতে রোজ যাইয়া ও আসিয়া ঢাকা পড়িবে? ইহাতে তোমার বড় কষ্ট হইবে। তাহাদের কথা শুনিয়া পিসী-মাও বলিতে লাগিলেন, কেবল হাঁটিয়া আসা-যাওয়া নয়, প্রাতঃকালে ৮টার সময় এবং সন্ধ্যার পর তাহাকে খাইতে হইবে। ১৩ বৎসরের বালক কি করিয়া যে এত কষ্ট সহ্য করিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। ৮টার সময় ছেলেদের খাওয়া জলখাওয়ার মত হয়। সমস্ত দিনের জন্য সে খাওয়া না খাওয়ার সমান। এ বয়সে দিনে ৩।৪ বার খায়। দুর্গা বুড়ো মানুষের মত দুইবার খাইবে। প্রতিবাসী বালকদের ভিতর এমন কেহ ছিল না, যে তাহাকে ভাল বাসিত না। সকলেই তাহাকে আপন মনে করিয়া ভাল বাসিত। তাহাকে ছাড়িতে সকলের মনে কষ্ট হইয়াছিল। তাহারা পিসী-মার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া বলিল, আপনি

ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ঢাকা কি কম দূর? যেদিন বৃষ্টি হইবে, সেই দিন নারায়ণগঞ্জ যাইতেই কত কষ্ট পাইবে। নারায়ণগঞ্জ গেলে ঢাকার পথ ধরিতে পারিবে। দেওভোগ হইতে ৮টার সময় খাইয়া নারায়ণগঞ্জ যাইতে না যাইতে তাহা হজম হইয়া যাইবে। বালক উভয় পক্ষের কথা শুনিযা, পিসী-মাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, আমি ঢাকা যাইয়া পড়িব, ইহাতে আমাব কোন কষ্ট হইবে না। অন্যে কষ্ট ভাবিলে আমার কি? তুমি ভোরে আলু সিদ্ধ ভাত রাঁধিয়া দিও, আমি তাহা খাইয়া চলিয়া যাইব। তুমি আমার খাওয়ার জন্য অধিক কষ্ট করিও না। আমি বৈকালে বাড়ী আসিয়া আবার খাইব। পথে ক্ষুধা বোধ করিলে ২।১পয়সার মুড়ি কিনিয়া লইব। পিসী-মা বলিলেন, কোন দিনই তোমার ক্ষুধার বোধ দেখিলাম না। শিশু সময়ে সামনের মুড়ি বিড়াল কুকুরকে খাওয়াইয়া নিজে ১টা ২টা পর্য্যন্ত না খাইয়া রহিয়াছ, এক দিনও বল নাই যে, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে। লোকে ছেলেকে তাড়না করিয়া পড়াইতে পারে না, আর আমরা তাড়না করিয়া তোমাকে না পড়াইয়া রাখিতে পারিতেছি না। রামজী তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রবল ইচ্ছা পূরণ করিবেন। দুর্গাচরণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিল মনে করিয়া অন্যান্য বালকগণ মলিন মুখে তাহার নিকট বিদায় লইল। সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, ভাই, সকালে ও বিকালে, যখন হয়, তোমাদের সাথে থাকিব এবং খেলা করিব। তোমরাও মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিও, ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিবে। আমাদিগকে সুখী দেখিলে আমাদের পিতামাতা, বন্ধু বান্ধব, সকলেই সুখী হইবেন। তাহারা পিতার ন্যায় স্নেহমাখা উপদেশ

শুনিয়া সন্তোষের সহিত চলিয়া গেল। সকলেই মনে মনে ভাবিল দুর্গার কি কর্ত্তব্যজ্ঞান। নিজের দেহের মমতা ত্যাগ করিয়া ভাল শিক্ষা পাইবে ভাবিয়া ঢাকায় পড়িতে গেল এবং আমাদিগকেও মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে বলিল। কাহার সহিত দুর্গার হিংসা নাই, কাহার সহিত তাহার দ্বেষ নাই। কাহার সহিত সে ঝগড়া করে নাই। দুর্গার মত ভাল ছেলে কোথায়ও দেখিতে পাই না। তাহার সহিত থাকিলে ভাল হওয়া যায়। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই দুর্গা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল। আর কি পূর্ব্বের মত তাহাকে দেখিতে পাইব? প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় অল্প সময়ের জন্য দেখা হইতে পারে, কিন্তু দুর্গা লেখাপড়া ভাল মত শেষ না করিয়া কি আর আমাদের কাছে আসিবে?

দুর্গাচরণ ঢাকায় পড়িতে লাগিল। সমপাঠিগণ তাহার গুণস্মরণ করিয়া তাহার অদর্শনে দুঃখিত হইল। শিক্ষকগণও তাহার সৌম্যমূর্ত্তি, নম্রস্বভাব, মিষ্টকথা, উত্তম ও উৎসাহ স্মরণ করিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার অদর্শনে দুঃখিত হইলেন। বালকের এমন মোহন মূর্ত্তি ছিল, এমন আকর্ষণ শক্তি ছিল, যে তাহাকে একবার দেখিত, একবার তাহার অমিয়মাখা কথা শুনিত, সেই তাহাকে আপন মনে করিত। সেই তাহার অসাক্ষাতে তাহাকে স্মরণ করিত। শিক্ষকগণ কতক সময় তাহাকে পড়াইয়া, তাহার গুণে মোহিত হইয়াছিলেন। তাহার গুণ স্মরণ করিয়া সকলেই তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। যাহারা তাহাকে কোলে কান্ধে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারা বালকের অদম্য উৎসাহ

দেখিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন, কিন্তু তাহার কষ্ট মনে করিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। বালকের স্বভাবে সকলেই যেন তাহাকে আপন মনে করিয়া ভালবাসিত। তাঁহারা নিজেদের ভিতর বলিতে লাগিলেন, দুর্গা ৮টার সময় খাইয়া সারা দিন কষ্ট পাইবে। ১৩ বৎসরের বালক দেওভোগ হইতে ঢাকা হাঁটিয়া গিয়া পড়িবে এবং রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া খাইবে। কোন বালক বিদ্যা উপার্জ্জন করার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে না। দুর্গা সময়ে না জানি কি হইবে? ১৩ বৎসরের ছেলেকে পিতা বকিয়া মারিয়া পড়াইতে পারে না, আর দুর্গা ভাল পড়ার জন্য দেহের দিকে চাহিল না। এমন ছেলে লোকের হয় না। বালকের গুণে সকলেই তাহার যশ গাহিতে লাগিল। সে বাড়ী আসিলে কেহ কেহ তাহাকে একবাব দেখিয়া যাইত। বালকও সুবিধা পাইলে তাহাদিগকে একবার দেখা দিয়া আসিত। দুর্গাচরণ জন্ম গ্রহণ করিয়াই ভালবাসায় জগতকে আপন করিল।

দুর্গাচরণ দেহের সুখ ও দুঃখ ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ ৮টার সময় খাইয়া দেওভোগ হইতে হাঁটিয়া, ঢাকা গিয়া পড়িতেছে। একদিন খুঁব ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে ঢাকা হইতে রওনা হইল। পথে একটা খাল পার হইতে হইত। বর্ষার সময় ব্যতীত সেই খালে জল থাকিত না। হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত। খালের দুই ধারে অগাধ জঙ্গল ছিল। তাহার মধ্য দিয়া একটা সরু পথে যাওয়া আসা করিতে হইত। এত ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছিল যে, সামান্য দূরে অবস্থিত কোন জিনিষ দেখা যাইত না। দুর্গাচরণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুধু পথ দেখিয়া চলিতেছে।

সে খালের পারে গিয়া দেখিতে পাইল, খালেব ধারে এক পদ এবং একটী অশ্বত্থগাছের উপর অন্যপদ রাখিয়া একটা ভীষণ কাল প্রাণী পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহা দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন কি করে। ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। দূরে কিছু দেখা যায় না। যে পথে যাইব, সেই পথেব দুই দিকে দুই পা দিয়া ভযঙ্কর ভূত দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব। পাশ্চাৎ দিকেই বা কোথায যাইবে? ঢাকা অনেক দূবে ফেলিযা আসিয়াছি। সে একটু সময দাঁড়াইয়া, ভূতের দুই পাযের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল। তাহাকে চোরের মত চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ভূত খল্ খল্ করিযা হাসিযা উঠিল। খাল পার হইয়া চলিয়া আসিয়াও পিছনে অট্ট হাসিব রোল শুনিতে লাগিল।

বৃষ্টিতে বালকের কাপড় ও জামা ভিজিযা গিয়াছিল। বই গুলি ভিজিয়া যাওয়ায় পাতা খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার মত হইল। খালেব নিকট এক মুসলমানের বাড়ী ছিল। সে বই বাঁধিয়া নেওয়াব জন্য এক খণ্ড নেকড়া চাহিতে সেই বাড়ী গেল। মুসলমানগণ জানিত খালের পারে একটি ভূত থাকিত। তাহারা বালকের শব্দ পাইয়া তাহাকে ভূত মনে করিল। এক জন অপরকে বলিল, এই ঝড় বৃষ্টিতে কি মানুষ আসিতে পারে? দরজা বন্ধ কর। এ নিশ্চয়ই ভূত। বালক পিতার নামের সহিত আপনার নাম বলিয়া পরিচয় দিল। তখন এক বৃদ্ধ মুসলমান বাহির হইয়া তাহাকে দেখিল এবং তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি দীনদয়াল নাগমহাশয়ের ছেলে? বাবা, তুমি এ ঝড় ও বৃষ্টিতে একাকী এ পথ দিয়া যে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছ, তাহা খোদার ইচ্ছা। তুমি কি কষ্ট না করিয়াছ! তুমি

ঢাকা হইতে ভিজিয়া ভিজিয়া একাকী আসিয়াছ, পথে কোন ভয় পাওনাই ত? বালক তাহাকে সকল কথা বলিল। বৃদ্ধ মুসলমান তাহা শুনিয়া বলিল, বাবা, তুমি প্রাণ লইয়া যে আসিয়াছ, তোমার পিতাব বহুভাগ্য। বালক তাহাব পুস্তকগুলি বাঁধার জন্য এক খণ্ড নেকড়া চাহিল। বৃদ্ধ তাহাকে এক খানা ভাল কাপড় দিল। সে কাপড় গ্রহণ না করিয়া বলিল, আমাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়াছি। আমার পরাব জন্য কাপড চাহি নাই। পুস্তকগুলি ভিজিয়া ছিড়িয়া যাইতেছে, তাই একটুকুবা নেকড়া চাহিয়া ছিলাম। আরও দেখুন, বৃষ্টিতে শুষ্ক কাপড় পবিলে, এখনই তাহা ভিজিয়া যাইবে। শেষে আমাকে দুইটা ভিজা কাপড লইয়া চলিতে কষ্ট হইবে। বৃদ্ধ মুসলমান তাহাব বুদ্ধি দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বাবা, এস, আমি তোমাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিব। বালক বৃদ্ধের কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাহাব সহিত যাইতে নিষেধ করিল। বৃদ্ধ বালকেবর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া, এবং সে একবাব ভয় পাইয়াছে চিন্তা করিয়া, কোন মতেই তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দিল না। সে তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া গেল।

দুর্গাচরণের সেদিনকার দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুর-মা ও পিসী-মার মনে বড় কষ্ট হইল। তাঁহারা তাহাকে শুষ্ক কাপড় দিলেন এবং অতিশয় যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। সে সুস্থ হইলে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এত কষ্ট করিয়া তোমার পড়া হইবে না। বরং তোমার লেখাপড়া কম হউক, তাহাও ভাল। তুমি একবংশের একটী ছেলে, তোমার দিন কি এক ভাবে যাইবে। এভাবে লেখা পড়া না করিলে যে তুমি খাইতে পাইবে না, তাহা হইতে পারে না।

ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া তোমাকে আর ঢাকা যাইতে দিব না। দুর্গাচরণ তাঁহাদিগকে দুঃখিতা দেখিয়া অনেক সান্ত্বনা করিল। সে বলিল, ঢাকায় যাইতে তাহার কোন কষ্ট হয় না এবং ঝড় বৃষ্টিও প্রত্যেক দিন হয় না। সে কোন মতেই পড়া ছাড়িতে পারিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব সে ঢাকা হইতে আসিবে, তাহার জন্য তাঁহাদের আর এত চিন্তা করিতে হইবে না। এই রূপ অনেক কথা বার্ত্তা হইল। সে ঢাকা যাইয়া পড়িতে লাগিল। সে আরও কয়েক দিন রাস্তায় ভূত দেখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাহার মনে আর ভয় হয় নাই। পথে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলে, যেমন অন্যলোক তাহার কথা ভাবে না, সেও সেইরূপ আপন মনে পথ চলিত।

আর একদিন অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছিল। ঢাকা হইতে আসিবার সময় দুর্গাচরণ পা হরকাইয়া এক পুকুরে পড়িয়া গেল। বৃষ্টির জল ঘাটপথ ভাসাইয়া দিয়াছে। পুকুরের পার ডুবিয়া গিয়াছে। সে পারে উঠিতে পারিতেছে না। মাটি ধরিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির গতিকে উঠিতে পারিতেছে না। অবশেষে পুকুরের পারের ঘাস ধরিয়া, গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেরি দেখিয়া, পিসী মা কতই না ভাবিতেছেন। সে যে জলে বসিয়া কাঁপিতেছে, তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই; পিসীমার মানসিক কষ্ট ভাবিয়া আকুল হইল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিয়া গেলে, অনেক কষ্টে পুকুরের পারে উঠিল। তখন তাহার দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল, সমস্ত শরীর বাতাহত কদলী পত্রের মত কাঁপিতে ছিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখিতে

পাইল, পিসী-মা পথের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, দুর্গাচরণ বলিল, আমি পুকুরে পড়িয়াই মনে করিয়াছিলাম, পিসী-মা আমার জন্য ভাবিতেছেন। নিজের যে এত কষ্ট হইযাছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও বলিল না। তাহাকে বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া পিসীর দেহে প্রাণ আসিল। তিনি তাহাকে যত্নের সহিত ঘরে গিয়া শুষ্ক কাপড় পরিতে দিলেন। তাহাকে খাইতে দিয়া রাস্তার দুর্গতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জলে পড়িয়াও যে নিজের কষ্ট না ভাবিয়া তাঁহার ক্লেশের কথা ভাবিয়াছিল, ইহাতে পিসীমা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, এমন ছেলে লোকের হয় না। তিনি দুর্গাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামজী তোমাকে সুখে রাখুন। ১৪ বৎসরের বালক কেন, যদি ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ এই রকম অবস্থায় পড়ে, দেহ লইয়া উঠিতে ভার হয়, তবে সে ভয়ে ত্রাহিত্রাহি করে। কি উপায়ে দেহ রক্ষা করিবে তাহার ভাবনাতে অস্থির হয়। সে নিজের প্রাণ রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কথা মনে করিতে পারে না। ১৪ বৎসরের বালকের প্রাণে কোন ভয় নাই, দেহে কোন কষ্ট নাই, পিসী-মা মনে কষ্ট পাইয়া চিন্তা করিবেন, তাহা মনে করিয়া অস্থির হইল। এই বালক কি কখন আমাদের মত মানুষ হইতে পারে?

একবৎসর এই ভাবে ঢাকায় যাইয়া এবং তথা হইতে পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়া দুর্গাচরণ পড়িতে লাগিল। বর্ষাকালে বাঁধান রাস্তা দিয়া ঢাকা যাইত এবং অন্য সময় বনের ভিতর দিয়া চলিত। এবার বর্ষাকালে অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রত্যহ ঢাকা যাইয়া আসিতে তাহাকে বেগ পাইতে হইল। সে স্থির

করিল, এবার বর্ষায় কয়েক মাস ঢাকায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে। বাড়ী হইতে ঘটী বাটী লইয়া রওনা হইল। কোন কারণ বশতঃ সেই দিন সে জিনিষপত্র এক দোকানে রাখিয়া, নারায়ণগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিল। পরদিন দোকানে যাইয়া দেখিল, তাহার সমস্ত জিনিষ চুরি গিয়াছে। সে আর ঢাকায় থাকিতে পারিল না। প্রতিদিন ঢাকায় যাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। ঢাকায় যাওয়া বন্ধ করিয়া বাড়ীতেই পড়িতে লাগিল। ৪।৫ মাস পরে দীনদয়াল দেশে গেলেন।

নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকগণ দুর্গাচরণকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাহার বিনয় বচন ও নম্রস্বভাব সকলের মন হরণ করিয়াছিল, সকলে তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, অদম্য সাহস ও অসীম সহিষ্ণুতা, তাহার হাসিমাখা মুখ, পাঠে একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া পারিতেন না। সে প্রত্যহ ৪ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিত ও যাইত, ঝড়-বৃষ্টিতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইত মনে করিয়া, এক শিক্ষক তাহকে বলিলেন, বাছা, তুমি প্রত্যেক দিন এতদুর পথ চলিয়া আস, তোমার কতই না কষ্ট হয়। তোমাকে আর এত কষ্ট করিতে হইবে না। তুমি আমার বাসায় থাকিয়া পড়। যেরূপে হউক আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলিয়া যাইবে। দুর্গাচরণ তাহার চির অভ্যস্থ নম্রস্বরে বলিল, আসিতে ও যাইতে তাহার কোন কষ্ট হয় না। সে কোন মতেই শিক্ষক মহাশয়কে তাহার জন্য বেগ পাইতে দিবে না। সে রোজ রোজ আসিয়া অধ্যয়ন করিবে। শিক্ষক তাহাকে অনেক বলিলেন, বালক তাঁহার কোন কথাতেই ঢাকায় থাকিতে স্বীকার করিল না। যে

মাতৃস্থানীয়া পিসীমাকে নিজের সুখের জন্য কষ্ট দিতে চায় নাই, সে কি শিক্ষকের কথায় তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে পারে? *

---

* দুর্গাচরণ ১৫ মাস নর্ম্মালস্কুলে পড়িয়াছিলেন। যদিও তিনি অল্প সময় তথায় পাঠ করেছিলেন, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও অপরিমিত মনোযোগ হেতু, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার বেশ বুৎপত্তি জন্মিযাছিল। তাহার রচনা কৌশল অতিশয় মুগ্ধকর ও ভাষা অত্যন্ত সরল ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি কলিকাতা আসিয়া "বালকদের প্রতি উপদেশ নামক" এক পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি উপদেশ ধর্ম্মভাবোদ্দীপক। আত্মগোপন তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মভাব তাঁহার সহজাত ছিল। সমস্ত কাজেই তিনি আপনাকে লুক্কাইত রাখিতে চাহিতেন। পরমহংস দেবের ভক্ত সুরেশবাবু তাহার বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সুরেশবাবুর সহিত তাহার বন্ধুতা হয়। চিরজীবন তিনি তাহার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় কিম্বা তাহা মুদ্রিত করিবার কালে, সুরেশবাবু ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারেন নাই। পুস্তক ছাপা হইলে, সুরেশবাবুকে একখণ্ড পুস্তক উপহার দিলে, তিনি জানিতে পারিলেন, নাগ মহাশয় তাহা লিখিয়াছেন।

# কলিকাতায়, আগমন ও বিবাহ।

দীনদয়াল দেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় নাগমহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা আনিলেন। নাগমহাশয় কয়েক মাস কোন স্কুলে ভর্ত্তি না হইয়া বাসায় বসিয়া যাহা মনে নিত তাহা পড়িতেন। তৎপর তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। তাঁহাদের বাসা কুমারটুলি বনমালি সরকারের লেনে ছিল। প্রত্যহ তথা হইতে আসিয়া ক্যাম্পবেলে পড়িতেন। ১৮ মাস এইভাবে পাঠ করিয়া সেই স্কুল ছাড়িয়া দেন। তিনি কেন যে এলোপ্যাথি ডাক্তারী পড়া ছাড়িলেন, কেহ জানে না। অনেকের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি, কেহ এই বিষয় বলিতে পারেন নাই।

শিশুকালে নাগমহাশয়ের মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিসী-ঠাকুরাণীর ইচ্ছা দুর্গাচরণকে বিবাহ করাইয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পত্তন করেন। এখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর। তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়েন। অনেকেই তাঁহাকে আগ্রহ করিয়া কন্যাদান করিবে। পিসী-মা আত্মীয়স্বজনকে তাঁহার জন্য একটী পাত্রী দেখিতে বলিতে লাগিলেন। পঞ্চসার নিবাসী, তাহাদের ভ্রাতা, ৺রঘুনাথ নাগ পাত্রী খুজিতে খুজিতে রাইজদানিবাসী ৺জগন্নাথ দাসের প্রথমা কন্যা প্রসন্নকুমারীর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। জগন্নাথ দাস অবস্থাপন্ন তালুকদার ছিলেন, মেয়েটীও সুরূপা। নাগমহাশয় ডাক্তারী পড়েন শুনিয়া,

জগন্নাথ এ সম্বন্ধ করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। নাগমহাশয়ের ভগিনী সারদামণির বিবাহও সেই দিন হইবে। সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। বিবাহের দিন আসিতেছে, সকলেই মনের আনন্দে আমোদ করিতে লাগিল। নাগমহাশয়ের বিবাহ হইবে, তাঁহার কত আনন্দ করা উচিত। অন্য ছেলে হইলে কত কি করিত, কিন্তু নাগমহাশয়ের কোন মানসিক বিকার প্রকাশ পায় নাই, যেন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিতেছে না। তিনি অন্য সময় যেরূপ ছিলেন, এখন সেই ভাবেই আছেন। স্নান করিতে হয় স্নান করেন, খাইতে হয় খান, অন্যান্য ছেলেদেব সহিত মিশিতে হয় মিশেন। কোন বিষয়ে তাহার আপত্তি নাই, কোন বিষয়ে বিবাগও নাই। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। মাঙ্গলিক ক্রীয়া আরম্ভ হইল। নাগমহাশয়েব গায়ে হরিদ্রা মাখিতে হইবে, নিজ শরীর ছাড়িয়া দিলেন; তাঁহাকে নূতন কাপড় পরিতে হইবে, পরিলেন। কাহাকে কোন কাজ করিতে মানা করিতেছেন না, কিন্তু তিনি কোন কাজে আনন্দও প্রকাশ করিতেছেন না। সকলে যাহা করিতে বলিতেছে, তিনি তাহা অবিচলিতচিত্তে করিতেছেন। আমার এক জ্ঞাতি পিসী এখনও জীবিত আছেন, তিনি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে ঠাকুর ভাইয়ের একবারেই স্ফুর্ত্তী ছিল না। কেবল কাষ্ঠপুত্তলিকার মত অন্যে যাহা করাইত, তিনি তাহা করিতেন। তিনি চিরকালই সাধারণ লোক হইতে পৃথক ছিলেন।

গোধূলি লগ্নে নাগমহাশয়ের বিবাহ হইল এবং শেষরাত্রে সারদামণির উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দুর্গাচরণ পুতিগন্ধময়

সংসার সাগরে অবগাহন করিতে চলিলেন। আবিল ফেন রাশি কি তাঁহার দেহ স্পর্শ করিবে? নরকের তীব্র গন্ধ কি তাঁহার দিগন্তব্যাপী সৌরভ নাশ করিবে? দিক্‌দেশবিঘোষিত সাগর কল্লোল কি তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ক্ষীণস্বর ডুবাইয়া ফেলিতে পারিবে?

বিবাহ হইয়া গেল। নাগমহাশয় কলিকাতা আসিলেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে কয়েক মাস পড়িয়া তাহা ছাড়িয়া দিলেন এবং ডাঃ বিহারীলাল ভাদুরীর নিকট দুইবেলা যাইয়া হোমিওপ্যাথী পড়িতে লাগিলেন। প্রাতে ও বৈকালে ডাঃ ভাদুরীর নিকট হইতে পাঠ লইতেন এবং মধ্যাহ্ন সময়ে বাসায় বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন। অল্পকাল মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাহার বেশ জ্ঞান জন্মিল, ঔষধ নির্ণয়ে তাঁহার অতিশয় বিচক্ষণতা দেখা যাইত। ডাঃ ভাদুরী বলিয়াছিলেন, তিনি দুর্গাচরণের নির্ব্বাচিত ঔষধে অনেক বহুকালের রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তাহা না হইবে কেন? যখন আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেন, কাঁচ লাগান আলমারির ভিতর জিনিষ রাখিলে যেমন বাহির হইতে দেখা যায়, সেই রূপ আমি লোকের ভিতর দেখিতে পাই।

দেড় বৎসর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আলোচনা করিয়া নাগমহাশয় দেশে আসিলেন। দীনদয়াল নূতন করিয়া ঘর তৈয়ার করিতে ইচ্ছা করিয়া একটু বড় দেখিয়া পুত্র বধূ আনিয়াছিলেন। তখন নাগমহাশয়ের বয়স ১৭ বৎসর এবং বধূর বয়স ১৫ বৎসর। বিবাহের অনেক দিন পর বধূ একদিন সারদামণিকে বলিয়াছিলেন, ঠাকুরঝি গো, আপনার ভাই কি রকম মানুষ? এই যে তিনি শুইয়া থাকেন, কোন জ্ঞান নাই। মনের মত কোন কথা

বলিতে গেলে কিছুই শোনেন না। এতদিন গেল, একদিনও তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। নাগমহাশয়ের এক জ্ঞাতি ভগ্নিও এই কথার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। সারদামণি বলিলেন, সময়ে সব হইবে। তিনি লজ্জা বোধ করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বধূও চুপ করিলেন। বধূ মনে বড় কষ্ট পাইলেন।

নাগমহাশয়ের ঠাকুরমার আমাশয়-রোগ হইল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। বাহিরে আসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারিতেন না, বিছানায়ই তাহা ত্যাগ করিতেন। নাগমহাশয় নিজ হাতে মল ও মূত্র ফেলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাহার জ্ঞাতি ভগ্নি দুঃখিতা হইয়া বলিলেন, দুর্গা, যদি আমাদের সামনে তুমি নিজে ঠাকুরমার মল ও মূত্র ফেলিবে, আমরা চলিয়া যাইব, এখানে থাকিয়া আমাদের দরকার কি? নাগমহাশয় বলিলেন, দিদি, পিতামাতার বিষ্টা চন্দন জ্ঞানে ফেলিতে হয়। আমি আমার মাতার সেবা করিতে পারি নাই। ঠাকুরমা জননীর মত আমাকে পালন করিয়াছেন, আমি মাতৃজ্ঞানে ঠাকুরমার সেবা করিব। আপনারা অন্য কাজ করুন। আমি কাহাকেও তাঁহার মল মূত্র ফেলিতে দিব না। তিনি এমন সরল ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন, কেহ আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না।

নাগমহাশয়কে হাসিমুখে ঠাকুরমার সেবা করিতে দেখিয়া বধূ সারদামণির নিকট বলিলেন, ঠাকুর ঝি, তিনি সংসারের সকল কাজই জানেন, তাঁহার সকল জ্ঞানই আছে। তিনি লজ্জায় আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। সারদামণি এই কথা পিসীমাকে বলিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, বধূর সাথে

নাগমহাশয়* কোন শারীবিক সম্বন্ধ নাই। পিসী-মা বলিলেন শিশু সময় হইতেই দুর্গার দেহে সুখ বোধ নাই। সময়ে সমস্তই হইতে পারে। বধূর ব্যবহারে সকলেই সেই কথা বুঝিতে পাবিল। ঠাকুর-মাব মৃত্যুর দিন আসিল। তিনি দেহত্যাগ কবিতে করিতে নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিলেন এবং ইষ্টনাম জপ করিলেন। নাগমহাশয় অনিমেষ লোচনে তাঁহাব প্রতি তাকাইয়া বহিলেন। তাঁহাকে সেইরূপ তাকাইতে দেখিয়া, বৃদ্ধা যেন অপর বাড়ী বেডাইতে যাইতেছেন, এই ভাবে বলিলেন, দুর্গা, এখন তোমবা সকলে আহার কব। আমার সময় হইলে, আমি বলিব। নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি আপনার ইষ্ট চিন্তা করুণ। এখন এই সব ভাবিবার কোন দরকার নাই। বৃদ্ধা বলিলেন, ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছি। আমি মারা গেলেত আব আজ তোমরা খাইতে পাবিবে না, কেন অনর্থক উপবাস করিবে? নাগমহাশয় দেখিলেন, না খাইলে বৃদ্ধা তাঁহাব খাওযার জন্য চিন্তা কবিবেন, তাই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। বৃদ্ধা একমনে জপ করিতে লাগিলেন। দেহত্যাগের অল্প আগে জপ ছাড়িয়া করজোরে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া, ডাকিয়া বলিলেন, দুর্গা, দুর্গা, এখন আমাকে বাহির কর। অমনি সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া, বৈতরণী পার করাইলেন। বাম রাম বলিয়া তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াগেল। বৃদ্ধা যতক্ষণ জীবিতা ছিলেন, নাগমহাশয় কেবল তাঁহাকে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি অসময়ে মাতৃহীন, ঠাকুরমাকে মাতৃস্থানিয়া মনে কবিতেন। তাঁহার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্না দেখিয়া সকলেই বলিলেন, দুর্গার দয়ার প্রাণ, সকলের জন্যই কাঁদে। এখনকার ছেলে মেয়ে পিতা

মাতার জন্য কাঁদে না, ঠাকুর-মা দূরের কথা। দীনদয়াল মাতা৷ সৎকার করিয়া সকলকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন। নাগমহাশয়ে৷ শ্বশুর ৺জগন্নাথ দাস চিঠি পাইয়া মনে করিলেন, এ শ্রাদ্ধের সম৷ ছেলেকে পাঠাইয়া আপন বাড়ীর কাজের মত সমস্ত সম্পন্ন করিবেন

নাগমহাশয়কে জামাতা পাইয়া শ্বশুর বাটীর লোক বড়ই সুখী ছিলেন। তাঁহার রূপ ও গুণ শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে মুগ্ধ করিয়াছিল। উঁহারা সময় খুঁজিতেছিলেন, কি করিয়া জামাতার আপন বলিয়া দেখাইতে পারিবেন, কি করিয়া তাঁহার সহিত মিশা মিশি করিবেন। তাঁহার শ্যালক মান অপমান সমান জ্ঞান করিয়া, আপন বাড়ীর কাজের মত শ্রাদ্ধের কাজ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই বলিল, যেন তিনি ও নাগমহাশয় দুই সহোদর ভাই। শ্বশুর জামাতার ও ছেলের ভাব দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে তিনি দীনদয়ালকে বলিয়া কন্যা ও জামাতাকে লইয়া বাটী গেলেন। দীনদয়াল বৈবাহিকের ব্যবহারে বড়ই অহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, দুর্গাকে বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করাইয়াছি, সে বেশ আদর পাইতেছে। এখন বধূর সহিত ভাব হয়, তাহা হইলেই আমার উদ্বেগ চলিয়া যায়। নাগমহাশয় ৬।৭ দিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, বধূর কথা মনে করিয়া সকলেই নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। কেহই তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন না। নাগমহাশয় যে বালক ছিলেন, সেই বালকই আছেন। দীনদয়াল সময়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

নাগমহাশয় কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। দীনদয়াল আরও কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ছেলেকে মন দিয়া ডাক্তারী পড়িতে দেখিয়া অতিশয় সুখী হইলেন। ৫।৬ মাস পরে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি মনে করিলেন, নাগমহাশয় ক্যাম্পবেল ছাড়িয়া, যখন নিজে আগ্রহ করিয়া হোমিওপ্যাথি পড়িতেছেন, এইবার সংসারে মন দিবেন। নাগমহাশয় বাড়ীতে আসিলেন দেখিয়া সকলেই হর্ষান্বিত হইলেন। শ্বশুর জানিতে পারিয়া ছেলের সাথে মেয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

নাগমহাশয় লোক দেখাইয়া কিছু করেন নাই। তিনি বধূর সাথে এক বিছানায় শুইতেছেন দেখিয়া পিসী-মা ও ভগ্নি সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল না। স্ত্রীর প্রতি আসক্তি জন্মিলে, লোক একমত ব্যবহার করে, আর লোক দেখান কাজ ভিন্নমত। মনের সন্দেহ নিরাশনের জন্য সারদামণি একদিন ভাতৃবধূকে তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বধূ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনার ভাই সংসার করিবেন না। তাঁহার কথা শুনিয়া সারদামণি পিসীমাকে তাহা বলিলেন। পিসীমা কহিলেন, ১৬ বৎসরের বধূ ও ১৮ বৎসর বয়সের ছেলে এক সঙ্গে শুইয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘুমায়, কে কোথায় দেখিয়াছে? ভগবান্ জানেন, কি হইবে। এই বলিয়া পিসী চুপ করিলেন। নাগমহাশয়কে কোন কথা বলিতে কেহ সাহস পাইলেন না। বধূ গোপনে ননদিনীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নাগমহাশয়ের জানার বাকি রহিল না। তিনি সেইদিন রাত্রিতে বলিলেন, আমি আজ পিসীমার কাছে শুইব। পিসীমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপযুক্ত বধূ ফেলিয়া তুমি আমার কাছে শুইবে কেন? নাগমহাশয় গাছে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। যোগমায়া হাসিতে হাসিতে চুপি চুপি বধূকে

বলিতে লাগিল তুমি দাদার নামে ননদিনীর কাছে কি বলিয়াছ, দাদা তোমাকে আর ঘরে নিবেন না। নাগমহাশয়কে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বধূর হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কি করিবেন, কোন উপায় নাই! সংসারে অপর লোক কষ্ট দিলে, স্বামীকে বলিয়া, স্বামীর কাছে থাকিয়া সব ভুলিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু স্বামী কষ্ট দিলে, তাহা রাখিবার স্থান থাকে না। সে কষ্ট কেহ দূর করিতে পারে না, কেহ শান্তিও দিতে পারে না। স্বামীই যখন মনে কষ্ট দিতেছেন, কে রক্ষা করে? যোগমায়া পরিহাস ছলে বধূকে সেই কথা বলিয়াছিল। যখন সে দেখিল, নাগমহাশয় সত্যসত্যই বধূর সঙ্গে শুইবেন না, লজ্জায় মরিয়া গেল এবং নাগমহাশয়ের অলৌকিকভাব দেখিতে লাগিল। *

পিসীমা নাগমহাশয়কে গাছ হইতে নামিয়া আসিতে অনেক বলিলেন, তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। অবশেষে পিসীমা নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি গাছ হইতে নামিয়া আস, আমার কাছে শুইতে দিব। নাগমহাশয় নামিয়া আসিলেন। বধূ সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াও নাগমহাশয়কে নিয়া এক

* যোগমায়া নামে দীনদয়ালের এক পরিচারিকা ছিল। যোগমায়া কায়েস্থের মেয়ে। অদৃষ্ট দোষে পরের বাড়ীতে চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। পশ্চিম বঙ্গে তাহার স্বামীর বাড়ী ছিল। সামন্ত ঋণ রাখিয়া স্বামী পরলোক গমন করিলে যোগমায়া বিপদ সাগরে পড়িল। ঋণ আদায়ের পীড়াপীড়িতে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত না থাকায়, অনন্যোপায় হইয়া পরের বাড়ীতে চাকুরী লইল। বেতন হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ ও ঋণ পরিশোধ করিত। কালের আবর্ত্তনে ঘুরিয়া ফিরিয়া যোগমায়া দীনদয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন তাহারই ছায়ায় কাটাইয়াছিল। দীনদয়াল কায়স্থ জানিয়াও তাহার হাতে খাইতেন না। সে তাঁহার রান্নার যোগাড় করিয়া দিত। দীনদয়াল দেশে গেলে যোগমায়াও দেশ-ভোগে যাইত।

বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেন, তাহাও আজ হইতে বন্ধ হইল। যাহাতে তাঁহার কোন লাভ হইল না এমন একটী কথায় সামান্ত সুখটুও রহিল না। নাগমহাশয় পিসীমার একপাশে শুইলেন, বধূ অন্তপাশে ভিন্ন বিছানা করিলেন। তখন বধূর বয়স ১৬ বৎসর ছিল। তিনি একাকী একঘরে শুইতে পারিলেন না। পিসীমা তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন। এইভাবে কয়েকদিন চলিতে লাগিল। হঠাৎ বধূর আমাশয় রোগ হইল। তিনি স্বামীর মতিগতি দেখিয়া, দেহের অবহেলা করিয়া, রোগ বাড়াইলেন, কাহাকে কিছুই বলিলেন না। যখন তিনি শয্যাশায়ী হইলেন, লোকে জানিতে পারিল, তিনি এত পীড়িতা। নাগমহাশয় ঔষধ দিয়া এ যাত্রায় তাঁহাকে ভাল করিলেন। বধূ আবার রান্না করিয়া স্বামীকে খাইতে দিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বিদ্বেষভাব দেখাইয়া একত্র শোয়া ছাড়িয়া দিলেন পর, বধূ তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় পাইতেন। অসুখের সময় নাগমহাশয় তাঁহাকে ঔষধ দিয়াছিলেন, সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় চলিয়া গেল। নাগমহাশয়ের যাহা দরকার, তাহা তিনি আদরের সহিত তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বিনা আপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিতেন দেখিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহারা আবার একত্র শুইতেন। অসুখের সময় স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া বধূ বড় আশা পাইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, লোকে যে বলে সময়ে সব হইবে, তাহা ঠিক। স্বামী সমস্ত সুখই দিবেন। একত্র শুইয়া তিনি একবারে নিরাশ হইলেন না। ভয়ে স্বামীকে কিছু বলিতেন না। স্বামীর মতানুসারেই আছেন। সারদামণি স্বামীর বাড়ী চলিয়া যাইবেন। বধূ অতিশয় গোপনে তাঁহাকে

বলিলেন, আপনার ভাই আগেও যে ভাবে ছিলেন, এখনও সেই ভাবেই আছেন। ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সারদামণি বলিলেন, তাহা আমারা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি কতকদিন সহ্য করিযা নেও। দেখেছত এমানুষ কাহার কথায কিছু কবিবে না। তোমার কপালে সুখ থাকিলে, .ভগবান ইঁহার মতি বুদ্ধি ঘুরাইয়া দিবেন। ননদিনী ও ভাতৃবধূ উভযই দুঃখিতা হইয়া সকল কথা চাপিয়া রাখিলেন। সারদামণি বধূকে প্রবোধ দিয়া স্বামী বাড়ী চলিয়া গেলেন।

বধূর আবার আমাশয় হইল। এবার তাঁহার মাথায় বড় যন্ত্রনা হইয়াছে। কতকদিন ভুগিযা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসীরা বধূকে ঘরের বাহির করিল। বধূ পিসী-শ্বশ্রূকে ডাকিয়া ববিলেন, আপনার ভাইয়ের ছেলেকে ডাকুন। তিনি তাড়াতাড়ি নাগমহাশয়কে ডাকিয়া বধূর অন্তিমশয্যার পাশে লইয়া গেলেন। নাগমহাশয় বধূর পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে নিকটে পাইয়া, বধূ নিজ কর চিরবাঞ্ছিত স্বামীর চরণে জনমের মত স্পর্শ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিতে লাগিলেন! যতক্ষণ বাহুতে সমর্থছিল, নাগমহাশয়েব পদযুগল ধরিয়া, ধূলি নিয়া কেবল কপালে দিলেন। নাগমহাশয় স্থাণুর মত দাড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে প্রসন্নকুমারী প্রসন্ন মনে চলিয়া গেলেন। পিসীমা বধূর ভাব দেখিয়া মহা অমঙ্গলের সময়ে মঙ্গল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বধূ, তুমি দুর্গার ভক্ত ছিলে। দুর্গাকে নমস্কার করিয়া, দুর্গাকে দেখিতে দেখিতে, সতীলক্ষ্মী মহা আনন্দে চলিয়া গেলে। দুর্গা তোমাকে সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া, এসময় লজ্জা ত্যাগ করিয়া, তোমার মনে হইবা

মাত্র তোমার সামনে দাঁড়াইল, দেহে যতক্ষণ প্রাণ ছিল, ততক্ষণ নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিলে, মনের মত স্বামীর পদধূলি লইয়া এই সংসার ত্যাগ করিলে। শেষ সময় দুর্গা তোমার বাসনা পূর্ণ করিল। তুমি সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইয়া ও আনন্দমনে স্বামীকে নিয়া ঘর করিতেছিলে, আজ আনন্দের বাজার পূর্ণ রখিয়া, স্বামীর মুখ দেখিয়া, তাহার পদধূলি লইয়া পরমানন্দে গমন করিলে। আমি দুর্গতি ভোগ করিতে তোমাদের সংসারে রহিলাম।" মৃত্যুর সময় নাগমহাশয়ের প্রতি বধূর ভাব দেখিয়া পিসীর হৃদয়ে ধারণা হইল, দুর্গা মানুষ নয়। দুর্গা বধূর ভক্তি জানিয়া, লজ্জাত্যাগ করিযা, সকলের সাক্ষাতে এভাবে দাড়াইয়া রহিল, বধূকে নমস্কার করিতে দিল। বধূর সাথে তাহার এমন কোন আসক্তি ছিল না যে, সেই আসক্তি হেতু মৃত্যু সময়ে সে সামনে দাঁড়াইবে। সারদামণি এই ঘটনা আমার কাছে বলিয়াছেন ও কাঁদিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার ভাই লোকের কাছে গোপনে থাকিবেন, ইহা তাঁহার চিরকালের ইচ্ছা। বধূ মনে কষ্ট পাইয়া আমাকে একটী কথা বলিয়া ছিলেন, তাই ভাই কয়েক দিন তাঁহার সাথে শুইলেন না। পিসীমা তাঁহার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, দুর্গা, তুমি কখনও সুখ চাও না। বিধাতা তোমার মন জানিয়া তোমাকে সকল সুখের বাহিরে রাখিয়াছেন। শিশুকালে মাতৃহীন হওয়ায় তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া দাদা আর বিবাহ করিলেন না। পুনর্ব্বার সংসার পাতার জন্য অল্প বয়সে তোমাকে বিবাহ করাইলেন। বধূ সংসার বুঝিয়া লইয়া তোমার ঘর করিতে লাগিল। তোমার মতি গতি দেখিয়া, বধূর কষ্ট বুঝিয়া, ভগবান্ তাহাকে সরাইয়া দিলেন। যে বয়সে তোমার গৃহশূন্য হইল,

অনেক লোক এ বয়সে বিবাহ করে না। কর্ম্মদোষ হেতু আমি তোমার সকল দুঃখ দেখিতেছি ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। তোমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। পিসী-মাতার কথা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, আপনিই ত কহিলেন, সমস্তই ভগবান্ করিতেছেন। জীবের আগম ও নিগম ভগবানের নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে, তবে কেন এত আক্ষেপ করিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছার উপর কাহার হাত নাই। পিসিমাতা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহাকে আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। নাগমহাশয় প্রতিবাসীদের কথা অনুসারে নিয়মমত বধূর সংকার করিলেন।

দীনদয়াল পুত্র-বধূর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া একবারে দমিয়া গেলেন। নিজের স্ত্রীবিয়োগে হইয়াছিল, দুর্গাচরণের কষ্ট হইবে ভাবিয়া আর বিবাহ করেন নাই। তিনি দুর্গাচরণের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছিলেন, বড় হইলে তাহাকে বিবাহ করাইয়া ভাঙ্গা ঘরে খুঁটী দিবেন। ১৫ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ করাইলেন। বধূ ভালমত সংসার করিতে লাগিল। এসময় বিধাতা বিমুখ হইলেন, গৃহশূন্য হইল। শূন্যগৃহ শূন্যই রহিল। দীনদয়াল ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? দুর্গাচরণকে আবার বিবাহ করান সঙ্গত নয়। ১৬ বৎসর বয়স্কা বধূর পাশে শুইয়া রহিয়াছে, কোন বিকার নাই। সে নির্ব্বিকার চিত্তে ঘুমাইয়াছে। বধূ কোন কথা বলিলে সংসারের অসারত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে। যুবকের এমন ভাব কে কোথায় দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? সংসারের কাজের জন্য অপরের একটী মেয়ে আনিয়া কষ্টে ফেলা যুক্তি যুক্ত নয়। ভীরু দীনদয়াল মনে মনে নানা মত

যুক্তি করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আসিয়া ভগ্নির মুখে বধূর মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া এবং পুত্রের মনেরভাব জানিয়া, তাহার আর বিবাহ না কবানই ভাল মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বিষম অনল জ্বলিয়া উঠিল। দুর্গা একবংশে একটী মাত্র পুত্র। দুর্গা আবার বিবাহ না করিলে এবং তাহার একটী পুত্র না হইলে, বংশ লোপ পাইবে, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড রহিত হইবে। কি করিবেন, কোন উপায় নাই। দুর্গাকে একবার বিবাহ করাইলে, বধূ বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত, কে জানে! মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিযা, আভাসে বন্ধু বান্ধবকে পুত্রের আচার ব্যবহার জানাইলেন। তাঁহারা দীনদয়ালের দুখে দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, তোমরা আর কতক কাল অপেক্ষা করিয়া দেথ কিসে কি দাঁড়ায়। বয়সের সঙ্গে লোকের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। দুইদিন পরে কি হইবে কে জানে? যাহা হউক এ বিষয়ে একবারে গোপনে রাখিও, ভুলেও যেন আলোচনা না হয়। দীনদয়াল তাহাদের কথা শুনিয়া, ছেলেকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার ভগ্নি বধূর কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, ভাই বংশ লোপ হইল। যদি দুর্গার ছোট ভাইটী বাঁচিয়া থাকিত, তোমার বংশ রক্ষা হইত। দুইটী ছেলে ছিল, দুর্গা যাহা ইচ্ছা তাহা করিত, তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। দীনদয়াল ভগ্নিকে শান্তনা দিয়া বলিলেন, তোমরা এই কথা একবারে মুখে আনিও না। ভবিষ্যতগর্ভে কি আছে আমরা জানি না।

নাগমহাশয় কলিকাতা আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মন দিলেন। পিতা তাঁহাকে ডাক্তারী করিতে দেখিয়া সুখী হইলেন সত্য, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, পুত্রের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন

হয় কি না। নাগমহাশয় পিতার জন্য সংসারে আছেন। কাজ করিতে হইবে, তাই তিনি ডাক্তারী করেন। অধিক সময় ধর্ম্ম আলোচনা করেন। শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ ভগবানেব জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তিনি দিন রাত ভাবিতে লাগিলেন, কি করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়? কে ভগবানের পথ বলিয়া দিতে পারিবেন? তিনি কখন শ্মশানে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেন, কখন বা গঙ্গার পাবে উন্মাদের মত নাচিতেন। সুতরাং ডাক্তারী করার সময় খুব কমিয়া গেল। তিনি রাত্রে শ্মশানে বসিয়া ধ্যান কবেন শুনিয়া দীনদয়াল মনে করিলেন, এতদিন পুত্র গৃহ শূন্য অনুভব করিয়াছে। এসময় তাহাকে বিবাহ করাইলে ভাল হইবে। সে উন্মাদের মত শ্মশানে রাত্র যাপন করে, এসময় বধূ জীবিত থাকিলে ঘরে রাখিতে পারিত। তিনি দেখিতেন, ছেলে দিনের বেলায বেশ মন দিয়া ডাক্তারী করে, রাত্র হইলে শ্মশানে যায, কারণ তাহাকে শান্তি দেওয়ার জন্য ঘরে কেহ নাই। ঘরে শুইয়া থাকা না থাকা উভয় সমান, তাই সে শ্মশানে রাত্রি কাটায়। দীনদয়াল মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক দিন পুত্রকে আবার বিবাহ করিতে বলিলেন। নাগমহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি পিতাকে অনেক বুঝাইলেন। এমন কি প্রথম বিবাহ করিয়া বধূর সাথে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও প্রকারান্তরে পিতাকে বলিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, একবার আমাকে বিবাহ করাইয়াছিলেন, সে স্ত্রী মারা গেল। আপনি আবাব কাহার মেয়ে আনিয়া মারিতে চান? দীনদয়াল তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, জন্ম ও মৃত্যু

বিধাতার লিপি। এবার ভালভাবে পুত্রকে বিবাহ করাইবেন। এই সুযোগ হারাইলে ইহা আর পাইবেন না। নাগ মহাশয় সহজে স্বীকার করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা তিনি এজগতে গোপনে থাকিবেন। বিবাহ করিলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রথম স্ত্রী অল্প কয়েক দিন স্বামীর সঙ্গে ছিলেন, তাহাতে পিতা, পিসী, ভগ্নি ও আত্মীয় সকলেই বুঝিতে পারিলেন, উঁনি মানুষেব কাজ করিতেছেন না। এই স্ত্রী অল্পদিনেই পরলেক গমন করিলেন। এখন ইচ্ছামত আত্মগোপন কবিয়া থাকিবেন। আবার বিবাহ করিলে তাহা চালিবে না। যত দিন থাকিবেন, লোকে তাঁহার চরিত্র অলৌকিক দেখিবে। তিনি ভাবিলেন, বিবাহ করিলে আবার সংসারেব বন্ধন হইবে, ডাক্তারী করিয়া রীতিমত টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে। কামিনী ও কাঞ্চন দুইজনই ঈশ্বরের পথের কাঁটা। সারাজীবন ছাই মেয়ে মানুষ, ছাই টাকা নিয়া থাকিতে হইবে। ইচ্ছামত শ্মশানে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে পারিব না। হায় হায় ইহার নাম সংসার! পিতা কি বুঝিলেন জানি না। যাহাতে আমি ভগবান্‌কে ভুলিয়া সংসারে বন্দী হইয়া থাকি, সেই কাজ করিতে পিতার প্রাণপণে চেষ্টা। তিনি একবার ভাবিতেছেন না, সংসার কত দিনের জন্য। আজ বা কাল ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যাঁহাকে ধরিলে, যিনি জীবনে ও মরণে সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহাকে ভুলাইয়া বন্ধন দেখিয়া পিতা সুখী হইবেন, কি পরিতাপের বিষয়? ভগবান্ বিনা কেহ কাহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝে না। যে যাহা বোঝে, সে তাহা করিবেই। সংসারে আর আত্মগোগন করিয়া থাকিতে পারিব না।

নাগমহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, তিনি আত্মগোপন করিয়া সংসারে

থাকিবেন। বিবাহ করিলে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন কবিতে পারিবেন না। নাগমহাশয় যে নিষ্কাম ছিলেন তাহা তাঁহার উপলব্ধি ছিল। এক স্ত্রী কেন, শতস্ত্রী থাকিলেও তিনি যে নিষ্কাম ছিলেন, সেই নিষ্কাম থাকিতেন। বিবাহ তাঁহার কোন প্রকার বন্ধন বা ধর্ম্মের ক্ষতিকারক হইতে পাবিত না, ইহা নাগমহাশয়ের বিশেষরূপে জানা ছিল। যখন লোকে দেখিবে যুবকের বুকে যুবতী স্ত্রী শুইয়া আছে, অথচ যুবক শিশুর মত সুখে নিদ্রা যাইতেছে, তাহার কোন ভাবনা নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন সুখ নাই কোন দুঃখ নাই অভাব নাই, সে নিশ্চয় ভাবিবে, এই কি! দুর্গাচরণ কি আমাদের মত মানুষ? কলিকালে কাম মহাঅসুর, কামই জীবের প্রধান রিপু। জীব কামাসুরের বশবর্ত্তী হইয়া কি অন্যায় কাজ না করে? জীব সমস্ত ভুলিয়া যায়, ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার কবে। যিনি যুবতী কামিনীর কাছে শুইয়া তাহা জয় করিতে পারেন, তিনি কি আর মানুষ! কলিকালে কেন, কোন কালেই যুবতী স্ত্রীর কাছে শুইয়া কেহ নির্ব্বিকার চিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। অন্যপরের কথা কি, দেবতাগণও তাহা পারেন নাই। এই নাগমহাশয় কি ছিলেন?

পিতার মুখে পুনর্ব্বার বিবাহ করার কথা শুনিয়া নাগমহাশয় মনে করিলেন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তিনি পিতাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, বাবা, বিবাহ হইতে জীবের নানা মত যন্ত্রণা আসে। এ বিবাহ হইতে জীবের কতই না ভোগ হয়? আপনি ইহা জানিয়া আমাকে সেই বিবাহ করিতে বলিতেছেন, যন্ত্রনার হাতে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছেন? আপনি আমাকে এ পাপ

হইতে অব্যাহতি দিন। আমি আপনাকে কোন কষ্ট দিব না। ঘরে বধূ আসিয়া যাহা করিবে, আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সেইরূপ সেবা করিব। আপনি আমাকে মায়াবন্ধনে ফেলিবেন না। পুত্রের মর্ম্মস্পর্শী বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া, পিতার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখনই আবার মনে হইল, দুর্গা আমার একমাত্র পুত্র। দুর্গা বিবাহ না করিলে, বংশলোপ, জলপিণ্ড লোপ হইবে। পিতার মন দুঃখে অভিভূত হইল। পুত্র ঘরের বাহির হইয়া গেলে, পিতা ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পিতা কাঁদিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, আমার সুখের জন্য পিতা সংসারের সব সুখ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই পিতা আমার জন্য চক্ষের জল ফেলিবেন? থাক আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, পিতা যাহাতে সুখী হন, আমি তাহা করিব। তিনি পিতাকে বলিলেন, আমি বিবাহ করিব। আপনি সম্বন্ধ স্থির করুন্। তাহা শুনিয়া পিতার কি রকম বোধ হইল। পুত্র আবার বলিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন। এবার পিতা পুত্রের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। পুত্র বিবাহ করিবে, পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। এদিকে পুত্রের মনে দুঃখের শেষ নাই।

পিতা ও পুত্রের এমন ভাব ছিল, পিতা সামান্য কষ্ট করিলে, পুত্রের প্রাণে তাহা লাগিত। পুত্র সামান্য অসুবিধা ভোগ করিলে, পিতা তাহা অসহ্য বোধ করিতেন। তিনি যেদিন পুত্রকে রান্না করিতে দেখিতেন, সেদিন তাঁহার কষ্ট রাখিবার স্থান থাকিত না। তাঁহার মনে হইত, দুর্গা নিজে কষ্ট করিয়া রান্না করিবে, আর আমি সুখে খাইব। এমন সুখে খাওয়ার

চেয়ে না খাওয়া ভাল। পিতা রান্না করিলে, পুত্র মনে করিতেন, আমার সাক্ষাতে পিতা কষ্ট করিয়া রান্না করিবেন, আর আমি সুখে খাইব, তাহা হইবে না। দুইজনাই খেয়াল রাখিতেন, তিনি কি করিয়া রান্না করিবেন। সময় সময় ইহা লইয়া ঝগড়া হইত। কোন কোন দিন রান্না হইয়া যাইত, কাহারও খাওয়া হইত না। পিতা জানিতেন, দুর্গা কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিবে। দুর্গা হইতে তাহার শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইবে না; কিন্তু সে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে, তজ্জন্য যে ভাবেই হউক, তাহাকে বিবাহ করাইতেই হইবে। কেহ কাহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন না। নাগমহাশয় ভাবিলেন, আর আত্মগোপন করিতে পারিব না। সংসারে ছাই টাকা, ছাই মেয়ে মানুষ লইয়া থাকিতে হইবে। সংসারে মুক্তির উপায় একটীও নাই, বন্ধনের উপায় শত সহস্র। যখন নাগমহাশয়কে দ্বিতীয়বার বিবাহ করান হয়, তখন তিনি ভগবান্ লাভের জন্য উন্মাদ। শ্মশানে বসিয়া ধ্যান করেন, কখন কখন সমাধি হওয়ায় পড়িয়া থাকিতেন। যদি নাগমহাশয় আত্মগোপন না করিতেন, তাহা হইলে জগতে এক নূতন ছবি দৃষ্ট হইত।

নাগমহাশয়ের মনের ব্যথা কেহ জানিলেন না। পিতা মনে করিলেন, উন্মাদ ছেলেকে বিবাহ করাইলে, বধূ তাহাকে বশে আনিয়া ভাল করিতে পারিবে। একটী বয়স্থা বধূ আনিব, শীঘ্রই তাহার উন্মত্ততা কাটিয়া যাইবে। পিতার আজ্ঞায় কলের পুতুলের মত বিবাহ করিতে দেশে আসিলেন। বাটীতে আসিয়াই নাগমহাশয় বলিলেন, তিনি কলিকাতায় যাইবেন। দীনদয়াল অনেক কহিয়া তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া

অনেকে বলিলেন, দুর্গা কি লোকের মত সংসার করিবে? সে একবার বিবাহ করিয়াছিল, তখন তাহাকে এইরূপ দেখা যাইত না, সাধারণ মানুষের মত আহার হাবভাব ছিল। সে সময় ও বধূর সহিত তাহার শারীরিক কোন সম্বন্ধ ছিল না। এখন দুর্গাকে অন্যরূপ দেখা যায়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন সংসারে কোন বিষয়ে তাহার মন নাই। পিতা যাহা করিতে বলেন, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত তাহাই করিতেছে। এমন ছেলেকে দীনদয়াল কেন জোর করিয়া বিবাহ করাইতেছে বুঝিতে পারি না। যদি বিবাহ করিয়া ছেলে সংসার না করে, আর একটী মেয়েকে হাতে ধরিয়া আনিয়া বধ করা হইবে।

যাঁহারা নাগমহাশয়কে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে ২।১ জন লোক এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা বলেন, বিবাহ করা নাগমহাশয়ের একেবারেই মত ছিল না। এমন কি বিবাহের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া পিতার আদেশ অনুসারে করিয়াছিলেন। বিবাহের দিবস তাঁহাকে স্নান করাইবে, তিনি যাইতে চাহেন না। পিতা তাঁহার সামনে আসিয়া বলিলেন, স্নান করিতে চল, তিনি কলের পুতুলের মত চলিলেন। স্নান করিতে গিয়া গায় হলুদ দিবেন না। একজন আসিয়া পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, দুর্গা গায় হলুদ দিবে না। পিতা তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, গায় হলুদ দেও। তিনি একটু হলুদ কপালে ছোঁয়াইতে দিলেন। সমস্ত কাজই এইরূপ পিতার আজ্ঞায় করিতেছেন। স্নান করাইয়া চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিবে, তিনি চন্দন দিতে দিবেন না। পিতা গিয়া কহিলেন, দুর্গা, শুভকাজে এমন করিতে হয় না। চন্দন পরিতে হয়, পিতার আদেশে কপালে একটু চন্দন

লাগাইতে দিলেন। পট্টবস্ত্র পরাইতে হইবে, পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহা পরিধান করিলেন। পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুত্রের সব ভাব দেখিতেছেন এবং বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে করিতেছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুর্গাকে বিবাহ করাইতেছি, কিম্বা কষ্ট দিবার পণ করিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছি। দীনদয়ালের যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইল। বিবাহের সময় হইল, পিতা বলিলেন, দুর্গা, নিয়ম মত বিবাহ করিতে হয়, পিতাব আজ্ঞায় নাগমহাশয় বিবাহ করিলেন। যিনি বিধিমত কন্যাদান করিলেন, তিনি জামাতার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শবৎকামিনীকে নিয়া উহার মাতা কাঁদিয়া খাইবে। নাগমহাশয় পিতার কথায় যন্ত্রার্পিত জড়পদার্থের মত সমস্ত কাজ সমাধা করিলেন। তাঁহার নিজ গ্রামবাসী ৺রামদয়াল ভৌমিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীযুতা শরৎকামিনীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের অধিবাস হইতে পারে নাই। নাগমহাশয়ের শ্বশ্রু তাঁহার উন্মাদ অবস্থা জানিয়াও তাঁহার করে নিজকন্যাকে অর্পণ করিলেন। নাগমহাশয়ের শ্বশুর অনেক দিন পূর্ব্বে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

নাগমহাশয় লোক দেখাইয়া কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন না। যখন পিতা বন্ধন করিলেন, তিনি বন্দীভাবেই থাকিতে লাগিলেন। অন্যবার ভগবান্ দুইদিনের জন্য বন্ধন দিয়াছিলেন, অল্পদিনেই তাহা ফুরাইয়া গেল। এবার পিতার বন্ধনে চিরজীবন বাঁধা থাকিতে হইবে। নাগমহাশয় বধূর সাথে একঘরে একবিছানায় শুইয়া থাকিতেন। বধূর সঙ্গে কোন ভাষই, কোন আলাপ

নাই। তাঁহার সেভাব দেখিয়া আত্মীয়েরা মনে করিলেন, ১৮ বৎসর বয়সে ১৬ বৎসর বয়সের স্ত্রীর কাছে শুইয়া যে অনাবিল চিত্তে সুখে নিদ্রা গিয়েছে, সে কি আর ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত থাকিয়া বালিকা স্ত্রীর সহিত সংসার করিবে? কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহাদের ভয়, কিছু বলিলে যদি নাগমহাশয় কলিকাতা চলিয়া যান। নাগমহাশয়ের যে সংসারে একবারে মন নাই, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

নাগমহাশয় আষাঢ় মাসে বিবাহ করিলেন, ভাদ্র মাসে তাঁহার পিসীমা পিঠা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে বাজার হইতে জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। বাজারে আসিয়া নাগমহাশয়ের কি মনে হইল, এক দোকানে যাইয়া, তৈলের পাত্র রাখিয়া, দোকানদারকে বলিলেন, আমার বিশেষ দরকার হইয়াছে, আমাকে ৩৲ টাকা ধার দিন। আপনি পিতা-মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইবেন। দোকানদার নাগমহাশয়ের সরল স্বভাবে, বিনয় বচনে বাধ্য হইয়া টাকা ধার না দিয়া পারিল না। হাতে টাকা পাইয়া তিনি বলিলেন, এখন আমি কলিকাতা চলিলাম, আপনি আমাদের বাড়ীতে খবর দিবেন। দোকানদার বলিল—তুমি বাজার করিতে আসিয়া, টাকা ধার করিয়া, কলিকাতা চলিলে, দীনদয়াল নাগমহাশয় আমাকে কি বলিবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, ইহাতে আপনার কি দোষ? আমি টাকা ধার চাহিয়াছি, আপনি দিয়াছেন। আমি কলিকাতা যাইব বলিয়া আপনার নিকট টাকা ধার চাহিয়াছিলাম না।

দোকানদার অনেক বাদানুবাদ করিল। নাগমহাশয় মিষ্ট

কথায় তাহাকে বুঝাইয়া চলিয়া আসিলেন। এদিকে বাজারের সময় অতীত হইল। পিসীমা চিন্তান্বিতা হইয়া, ঘরে সব ফেলিয়া রাখিয়া, প্রতিবাসীর ভিতর যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দুর্গা সকালবেলা নারায়ণগঞ্জ বাজারে গেল, এখনও আসিতেছে না কেন? সকলেই বলিল, আজত দুর্গাকে বাজারে দেখি নাই। তাহা শুনিয়া পিসীমা আকুলা হইয়া পথে ও বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বিকালবেলা তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে একজন লোককে বাজারের দোকানে খবর লইতে পাঠাইয়া দিলেন। সে বাজারে গিয়া সমস্ত দোকানে খোঁজ করিল। নাগমহাশয় যে দোকানে তৈলের পাত্র রাখিয়া; টাকা ধার করিয়া, কলিকাতা গিয়াছেন, সেই দোকানদার হইতে তাঁহার সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিয়া বাড়ীতে বলিলেন। পিসীমা নিশ্চিন্তা হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এমন উন্মাদ নিয়া কি আর সংসার করা চলিবে? পয়সা দিয়া তাহাকে বাজারে পাঠাইলে, পথে ছোট ছেলে পাইলে, তাহাদিগকে সমস্ত পয়সা দিয়া ফেলে। গরীব লোক দেখিলে তাহাকে জিনিষ কিনিয়া দেয়। যদি সকলকে দিতে পয়সা না কুলায়, যাহাদিগকে পয়সা দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বলে, আপনারা কাল এস্থানে আবার আসিবেন, আজ আর পয়সা নেই। পরকে পয়সা দিয়া, জিনিষ কিনিয়া দিয়া, শূন্য হাতে ঘরে ফিরিয়া আসে। তথাপি ভয়ে তাহাকে একটী কথা বলি না, যদি সে একদিকে চলিয়া যায়। কেহ কাহার মন বাঁধিতে পারে না। তাহার মোটেই মন নাই যে, সে বধূ নিয়া সংসার করে কিম্বা সংসারে থাকে। এমন মানুষ কোথায়ও দেখা যায় না। বধূ প্রথম স্বজনদের

হইলে দীনদয়াল পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিলেন। নাগ-মহাশয়কে একাকী পাঠাইতে তাঁহার সাহস হইল না। যদি নাগমহাশয় কোনদিকে চলিয়া যান! বাড়ীতে আসিয়া পিতার কথা মত সব কাজ করিলেন। বধূর সঙ্গে একত্র শুইতেন সত্য, ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি যে দেবতা ছিলেন, এখনও সেই দেবতাই রহিলেন। বধূর হৃদয়ে দারুণ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল।

বধূ যুবতী হইয়াছে দেখিয়া দীনদয়ালের ভরসা হইল, এবার ছেলে সংসারী হইবে, বধূ ছেলেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিতে পারিবে। তিনি বধূকে অনেক উপদেশ দিতেন। বধূ মনে মনে বলিতেন, এ গৃহী সন্ন্যাসীকে যে বাঁধিতে পারে, এমত মানুষ জন্মে নাই। স্ত্রী স্বামীর কাছে শুইয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রীর উপর তাহার একে-বারেই মন নাই। নাগমহাশয় স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, দৈহিক সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য স্থায়ী নয়। আমাকে ভুলিয়া ভগবানে মন দেও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য, তাহার পর দেহ পড়িয়া রহিবে, সম্পর্ক ফুরাইয়া যাইবে। ভগবান্‌কে ধর, তাঁহার আর নাশ নাই। তিনি জীবনে মরণে সঙ্গে থাকিবেন। নাগমহাশয়ের উপদেশে বধূর মনে আঘাত লাগিত। তিনি সমবয়সীর নিকট নাগমহাশয়ের ব্যবহার বলিয়া কাঁদিতেন। তাহারাও তাঁহার কষ্ট দেখিয়া মনে নিদারুণ ব্যথা পাইত এবং বলিত, নাগ মহাশয়ের বিবাহ করা ঠিক হয় নাই। তিনি এত জ্ঞান রাখেন, বিবাহ করিয়া একটী বধের ভাগী হইলেন কেন? যখন সুখ ও দুঃখ নাই, তাঁহার বিবাহ করার কি দরকার ছিল?

যাহাকে বিবাহ করিলেন, তাহার ত সুখ দুঃখ বোধ আছে। সে তাহার জীবন কি ভাবে কাটাইবে, তাহা তাঁহার একবার ভাবা উচিত ছিল। যে যেমন বুঝিত, নাগমহাশয়ের অসাক্ষাতে সে তেমন বলিত। বধূর বিষম অবস্থা, তাঁহার কান্না দেখিয়া সকলেই মনে কষ্ট পাইত এবং বলিত, সে এ বিষম অবস্থা কি করিয়া কাটাইবে। স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া যায়, ভিন্ন কথা। এক সঙ্গে এক বালিশে শুইবেন, সকল রাত ভগবানের কথা বলিবেন কিম্বা ভাগবত পাঠ করিবেন, স্ত্রীর কি কখন স্বামীর এ ভাব ভাল লাগে?

পিসীমার আমাশয় রোগ হইল। নাগমহাশয় সেই সময় দেশে ছিলেন। তিনি কায়মনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পিসীমা অনেক সময় বলিতেন, দুর্গা, তুমি মেয়েদের মত এ ভাবে দুই হাতে আমার মলমূত্র ধরিও না। তোমার মুখের দিকে তাকাইতে আমার বড় কষ্ট হয়। ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, আহার নিদ্রা ছাড়িয়া, তুমি কেবল আমার সেবা করিতেছ, যাহাতে আমি ভাল হইতে পারি। তুমি ছেলে মানুষ, ছেলের মত আমার সাক্ষাতে বসিয়া থাক। আমি তোমাকে দেখি। সারদা মেয়ে, ও আমার মলমূত্র পরিষ্কার করিবে। মেয়েদের ছেলে ও মেয়ের মল ঘাটিয়া ঘৃণা থাকে না। ইহা মেয়েদের কাজ। ছেলে মানুষ দূর হইতে মল দেখিলে ঘৃণা পায়; আর তুমি দুই হাতে তাহা ফেলিতেছ। নাগমহাশয় বলিলেন, পিসীমা আপনি আমাকে মায়ের মত লালন পালন করিয়াছেন। আমি মায়ের কোন সেবা করিতে পারি নাই। আপনাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া আপনার সেবা করিতেছি। মা শিশুসন্তানের মল ও মূত্রে ঘৃণা করেন না, সেই-

রূপ মা শক্তিহীনা হইলে, সন্তানেরও তাঁহার মলমূত্রে ঘৃণা করা উচিত নয়। আপনি আমার কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট করিবেন না। আপনার ইষ্ট চিন্তা করুন। আর কত দিনই বা বাকি আছে? তাহা শুনিয়া পিসীমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যতদিন তাঁহার অসুখ ছিল, নাগ মহাশয়ই তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন।

পিসীমা ছোট সময় হইতেই নাগমহাশয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। রুগ্নশয্যায় শুইয়া তাঁহার কিএক ভাব হইল, নাগ মহাশয় চক্ষের আড়াল হইলেই তিনি ছট্ ফট্ করিতেন। সমস্ত দিন শুশ্রূষা করিয়া নাগমহাশয় অন্যত্র শুইতে গেলে, কতটুকু সময় পর তাঁহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি বলিতেন, দুর্গা, তুমি কোথায়? আমার বড় ভয় হইতেছে। আমায় অতিশয় যাতনা হইয়াছে। আমার কাছে আস। নাগমহাশয় অনতিবিলম্বে পিসীর পাশে আসিতেন। পিসীমা তাঁহাকে দেখিলেই শান্ত হইতেন, আর যন্ত্রনার কথা বলিতেন না। পিসীমার এই ভাব দেখিয়া সারদামণি ও মা ঠাকুরাণী বিরক্ত হইতেন। তাঁহারা কহিতেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রে একটু শুইয়াছেন, অমনি ডাকাডাকি আরম্ভ হইল। রাত্রি দিন এই ভাবে কে বসিয়া থাকিতে পারে? একরাত্রি না ঘুমাইলে লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে, আর তিনি এত রাত্রি জাগিতেছেন, শীঘ্রই তাঁহার অসুখ হইবে। নাগমহাশয় তাহাদিগকে বলিতেন, তোমরা তাঁহার অসুখের সময় এই সমস্ত কথা বলিও না। এখন পুত্র কন্যার শুশ্রূষা করা উচিত। তাঁহাদের কথা শুনিয়া পিসীমা জিজ্ঞাসা করিতেন, দুর্গা, আমার কাছে থাকিতে তোমার কষ্ট হয়? নাগমহাশয়

বলিতেন, না। আমি আপনার সাক্ষাতে আছি। আপনি ইষ্ট চিন্তা করুন। কাহার কথায় মন দিবেন না। প্রায় একমাস এই ভাবে রোগে ভুগিয়া, মৃত্যু সময়ে নাগমহাশয়ের মুখপানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া, রাম রাম বলিয়া পিসিমা দেহ ত্যাগ করিলেন।

পিসীকে মরিতে দেখিয়া, দেহত্মাভাববর্জ্জিত নাগমহাশয় উন্মত্তের মত ভগ্নী সারদামণিকে বলিলেন, সকলকেই এইভাবে যাইতে হইবে। ভগবান্ ব্যতীত সংসারে কেহ কাহার আপন নয়। তবে কেন তাঁহাকে ভুলিয়া এই সংসারে থাকিব? ইহা দেখিয়া ভগবান্‌কে ধর, মঙ্গল হইবে। যখন পিসীমা জীবিতা ছিলেন, আমাদিগকে কত ভালবাসিতেন। চলিয়া যাওয়ার সময় তিনি ফিরিয়াও তাকাইলেন না। তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, আমরাও দেখিতে পাইলাম না। যখন মরিলেই সব সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়, দুই দিনের জন্য কেন পরকে আপন ভাবিয়া আপনকে ভুলিয়া থাকিব? যদি জীব ভগবান্‌কে আপন বলিয়া এইভাবে ধরে, তিনি তাহার জীবনে মরণে সঙ্গে থাকেন। হায়, হায়, জীবের কি লইয়া সংসার? এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াও জীব পরকে আপন মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

সারদামণি মনে করিলেন, পিসীমা মায়ের মত আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। ঠাকুর ভাই তাঁহার শোকে এই রূপ কথা বলিতেছেন। সুতরাং তিনি কিছু বলিলেন না, সকল কথা শুনিলেন। পিসীর সৎকারাদি হইয়া গেল। নাগমহাশয় শ্মশানে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। কেহ তাঁহার সামনে যাইতে সাহস পাইল না। এইভাবে রাত্রিও কাটিয়া গেল। পরদিন সারদাপিসী কাঁদিতে কাঁদিতে নাগমহাশয়কে বলিলেন, ঠাকুর ভাই, যদি আপনি

এরূপ করেন, আমরা কিকরিয়া ধৈর্য্য ধরিব? অনেক ক্ষণ পর নাগমহাশয় বলিলেন, কাহার জন্য কাঁদিতেছিস্? সংসারে কেহ কাহার নয়। সময়ে সকলকেই এই ভাবে যাইতে হইবে। কেহ কাহার সঙ্গে যাইবে না। কেহ কাহার জন্য বসিয়াও থকিবে না। সারদি, আর মায়া বাড়াস্ না। যিনি জীবনে ও মরণে সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহাকে ধর্। ভাইয়ের কথা শুনিয়া, সারদাপিসী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বধূকে বলিলেন, আমরা মনে করিয়াছিলাম, ঠাকুর ভাই পিসীমার শোকে এইরূপ করিতেছেন, তাহা নয়। তিনি বোধহয় আর সংসারে থাকিবেন না। জানি না, তিনি কখন বাহির হইয়া চলিয়া যাইবেন। হায়, হায়, কি উপায় হইবে? তিনি কেবল বলেন, ভগবান্‌কে ধর! ভগবান্ আপন, আপনকে পর ভাবিয়া, পরকে আপন বলিয়া আপনকে ভুলিয়া, কেন পর লইয়া সংসারে থাকিব? এই মানুষকে কে বুঝাইয়া আনিবে? মা ঠাকুরাণী ও সারদাপিসী ভয় পাইলেন। সারদাপিসী আবার বলিলেন, ঠাকুর ভাই আর সংসারে ফিরিবেন না। হায়, হায়, কি হইবে? সমস্ত সুখে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহাকে সংসারে দেখিয়া, বধূ সংসার করিতেছেন। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, এবার তাঁহার সব আশা শেষ হইল। সারদাপিসী ঠাকুরদাদার নিকট চিঠি লিখিলেন।

এদিকে নাগ মহাশয় ৭ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় পিসীর চিতায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন রহিলেন। দিনের বেলায় সারদাপিসী তাহার সাক্ষাতে যাইয়া বসেন ও কাঁদেন। রাত্রিতে কেহ তাঁহার নিকট যাইত না। প্রতিবেশীরা বলিত, এ মানুষ আর সংসারে থাকিবে না। আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া, এভাবে কাহাকেও

থাকিতে দেখি না। ছেলে মরিলে মা কাঁদিয়া আকুল হয় সত্য, ২।৪ দিনের পর শোক অনেক কমিয়া যায়। দুর্গা ভাবিয়াছে, সংসার অসার, কেহ কাহার নয়।

ঠাকুরদাদা পত্র পাইয়া শশব্যস্তে বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন। মনিবের সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, বাড়ীতে যাইয়া, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শ্মশানে দাঁড়াইয়া, তিনি বলিলেন, দুর্গা, দুর্গা! এ বুড়ো পিতাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবি? পিতার সম্বোধন শুনিয়া, শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। পিতা তাঁহাকে ধরিয়া বাড়ীতে আনিলেন, অনেক বুঝাইলেন। (পিতাকে বলিলেন, জীব কেবল দুই দিনের জন্য ভগবান্‌কে ভুলিয়া, আসা যাওয়ার যন্ত্রণা পায় কেন?) যখন মরিলেই সমস্ত শেষ হয়, দুই দিনের জন্য কেন পরকে আপন করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া থাকে? পিতা বলিলেন, চারিযুগই এইভাবে চলিতেছে। ভগবান্‌কে আপন বলিয়া কত জন ধরিতে পারে? নাগমহাশয় বলিলেন, অন্যের কথায় আমার দরকার কি? আমি আর তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব না।

যখন পিতা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও নিজ বশে আনিতে পারিলেন না, নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, বৃদ্ধবয়সে কি উপায় হইবে? পিতা অনেকবার বলার পর নাগমহাশয় অতিশয় অনিচ্ছার সহিত খাইলেন, ঠাকুরদাদা বাড়ীতে গিয়াছিলেন পর আর অনাহারে থাকিতে পারিতেন না। সমস্ত দিনে এক বার খাইলেও খাইতেন। সর্ব্বদা পিতার আজ্ঞা পালন করিতেন, কিন্তু সুবিধা পাইলেই শ্মশানে বসিয়া থাকিতেন ঠাকুরদাদা

নাগমহাশয়ের ভাব দেখিয়া, কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। এই নাগমহাশয় কি ছিলেন? লোকত সর্ব্বদা মরিতেছে। সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছে। অন্য লোক মরিতে দেখিলে, কেহত ভগবান্‌কে আপন বলিয়া ধরার জন্য এ ভাবে পাগল হয় না। শুনিয়াছি, বুদ্ধদেব রোগ, জরা ও মৃত্যু দেখিয়া, সকল ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আর নাগমহাশয় সব ছাড়িয়া কেবল ভগবান্‌কে ধরিতে বসিলেন, আহার, নিদ্রাভয় ত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে হৃদয়ে নিয়া রহিলেন।

আমার পিতা বলেন, আমি সময় সময় ঠাকুর ভাইয়ের নিকট গিযাছি। ঢাকা যাওয়ার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছি। তিনি অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়াছেন। কোনদিন তিনি আমার সঙ্গে ঢাকাও গিয়াছেন, আবার চলিয়া আসিয়াছেন। সময় সময় অকারণ তাঁহাকে এভাবে যাওয়া ও আসার কষ্ট দিয়াছি; এক দিনের তরেও মনে করি নাই কেন তাহাকে অযথা কষ্ট দেই। কিন্তু কখনও তাঁহার মলিন মুখ দেখি নাই। যখনই ঢাকা যাইতে দেখিয়াছেন, হাসিমুখে আমার সঙ্গে আসিতেন। সাধারণ লোকের মত তাঁহার সুখ দুঃখ বোধ ছিল না। তাঁহার একটী নিয়ম ছিল, তিনি সকলের সঙ্গে আপনার লোকের মত মিশিতেন, কিন্তু কখনও কাহার বাড়ীতে খাইতেন না। একবার পঞ্চসার আসিয়া ভারত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মীপূজার লাড়ু খাইতে দিবে ভাবিয়া সমস্ত ঠিক করিল। তাঁহাকে ডাকিতে যাইয়া দেখিতে পাইল, ঠাকুর ভাই তথায় নাই। কোন সময়ে

যে তিনি চলিয়া আসিলেন, কেহ জানিতে পারিল না। ভারত আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন কেন? আমি বলিলাম, ছোট সময় হইতেই তিনি কাহার বাড়ীতে খান না। ভারত বলিল, এত আত্মীয়তা দেখাইয়া, তিনি এই রূপ কাজ করিলেন? কি করিব উপায় নাই। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কে তাঁহাকে খাওয়াইবে। তৎপর তাঁহার সহিত ভারতের দেখা হইলে, তিনি এমন ভাবে কথা বলিলেন, ভারত তাঁহাকে আর পর ভাবিতে পারিল না। সে ভাবিল, তিনি কোন বিশেষ কারণে তাহাদের বাড়ীতে খান নাই।

আমার পিতা অনেক সময় দেওভোগ থাকিতেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে নাগমহাশয়কে অনেক বুঝাইয়াছেন। নাগ-মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, রাজকুমার, তুমি কিছু বোঝ না। আমার পিতা বলিতেন, বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। যদি আপনি সংসারে নির্লিপ্ত ভাবেই থাকিবেন, তবে একটী মেয়েকে হাতে ধরিয়া আনিয়া অনন্ত জ্বালায় কেন ফেলিলেন? একবারত বিবাহ করিয়াছিলেন, স্ত্রী কি চায়, তাহা বেশ টের পাইয়াছিলেন। সব জানিয়া শুনিয়া, আবার কেন, আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিতে এখন বসিলেন? স্পষ্টই দেখিতে পাই জ্যেঠা মহাশয়ের অদৃষ্টে সুখ নাই। স্ত্রীর সহিত নাগমহাশয়ের কি ভাব, তাহা কাহারও জানার বাকি রহিল না। তিনি আর সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। সংসারের জীব স্ত্রীর সাথে তাহার ভাব দেখিয়া অবাক হইল। দীনদয়াল পুত্রের ভাব জানিতে পারিয়া মনস্তাপ করিতে করিতে বলিলেন, কেন পরের মেয়ে আনিয়ে কষ্টে ফেলিলাম। দুর্গা ত বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল না। আমি মেয়েটীর কষ্টের কারণ

হইলাম। বিধাতা আমার পাপের ফল দিলেন। যদি কেহ সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা এক ভাবে সহ্য করা যায়। সংসারে থাকিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে শুইয়া, কে কোথায় এরূপ করিয়াছে? কোন দিন কাহার মুখে শুনিনাই, যুবক যুবতীর আলিঙ্গনে বিচলিত হয় নাই। আমি দুর্গীকে বিবাহ করাইয়া পাপের ভাগী হইলাম।

বৃদ্ধ দীনদয়াল এইরূপ মনস্তাপ করিয়া যাহাতে বধূ খাইতে পরিতে কোন কষ্ট না পায়, সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিতেন। সকল সময় সুমিষ্ট কথা বলিতেন। এমন কি যদি পিতা শুনিতে পাইতেন, নাগমহাশয় বধূর সহিত রাগ করিতেছেন, পুত্রকে ডাকিয়া বলিতেন, ও সংসারে আসিয়া কি সুখ না করিল! একদিনের তরেও স্বামীর সুখ ভোগ করিল না। উহার দিকে তাকাইতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। তুমি বিবাহ করিয়া স্বামীর কাজ সবই করিলে। আমি উহাকে হাতে ধরিয়া আনিয়াছি, যদি আমি উহাকে ছাই করিয়া যাইতে পারি, তবে শান্তিতে মরিতে পারিব। তুমি যে স্বামী, আমি তাহা বেশ জানি। আমি মরিলে, তুমি নিজেও ভাত খাইবে না, উহাকেও ভাত খাইতে দিবে না। নাগমহাশয় বলিতেন, যাহার যেমন কর্ম্ম, ভগবান্ তাহাকে তেমন ফল দিয়া থাকেন। আপনি আমাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন কেন? আমি ত বিবাহ করতে চাহি নাই। পুত্রের উত্তর শুনিয়া, পিতা মনের দুঃখে একবারে চুপ করিয়া যাইতেন।

নাগমহাশয় কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। বধূ নাগমহাশয়ের সাক্ষাতে প্রথমে বিশেষ কিছু বলিতেন না। কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতেন। অনেক সময় মনের দুঃখে তাঁহার কাছে কাঁদিয়াছেন। নাগমহাশয় কেবল ভগবানের কথা বলিয়াছেন।

কলিকাতা আসিয়া বধূর মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছেন, চিঠি পাঠ করিয়া বধূ অনবরত কাঁদিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, স্বামীকে মায়াজালে বাঁধা যাইবে না। যিনি প্রতিঘটে ভগবানের সত্তা অনুভব করেন, তিনি কখনও তাহাকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিবেন না। বধূ মধ্যে মধ্যে আমার পিতাকে চিঠি দেখাইতেন ও এক দিন আমার পিতা একখানা চিঠি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহা কেবল ভগবানের কথা, ভগবানের ভাব পূর্ণ। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে কিম্বা অন্য কোন কথা একবারেই লিখা ছিল না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কতটুক সময় চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, মানুষ কি করিয়া এমন দেবতা হয়? ঠাকুর ভাই সংসারে আছেন, সব কাজই ঠিকমত করিতেছেন, অথচ হৃদয়ে মায়ার একটু দাগ পর্য্যন্তও লাগিল না। আমার পিতা বধূকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, আপনি কিরূপ মেয়ে, একটী মানুষকে বাঁধিতে পারিলেন না। বধূ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার ভয়, যদি আমি তাঁহাকে একবারেই হারাই। পিতা দুঃখিত হইয়া চলিয়া আসিবেন, এমন সময় বধূ বলিলেন, আপনি তাঁহার কাছে একখানা চিঠি লিখুন। পিতা বলিলেন, স্বামী স্ত্রীর ভাব গোপনীয়, আমি তাঁহাকে কি লিখিব? যদি আপনি একান্তই লিখিতে বলেন, আমি লিখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না। তাঁহার সমস্ত চিঠিতেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের কথা, ভগবানের ভাব, এ অবস্থায় আমাদের কথায় কোন কাজ হইবে না। যদি মন ফিরে, আপনার চেষ্টাতেই হইবে।

কয়েক দিন পর আমার পিতা পরীক্ষা দিতে কলিকাতা

আসিলেন। বধূঠাকুরাণীর কষ্টের কথা মনে করিয়া, নাগ মহাশয়কে অনেক বুঝাইলেন। কিছুতেই তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, বিবাহ করিয়া এ ভাবে ছাড়িয়া থাকিলে, লোকে মন্দ বলিবে, আপনার নিন্দা করিবে। নাগমহাশয় কেবল হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আমার পিতা বুঝিতে পারিলেন, এ গৃহী সন্ন্যাসীকে কেহ বাঁধিতে পারিবে না।

প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না। রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া, মন্মথের শরাঘাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া সকলের সম্ভবে না। সময়ানুসারে মনের ভাব বিকাশ পায়। সময় হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিজ নিজ অভিলাষ পুরণ করিতে উদ্যোগ করে। ভৌতিক দেহ উত্তেজিত মনের তাড়নায় নানাবিধ কাজ করে। মা ঠাকুরাণীর বয়স এখন ১৬ বৎসর। নাগমহাশয়ের সহিত একত্র থাকিয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিতে বলবতী ইচ্ছা হইল। দূরে থাকিলে এক কথা ছিল, তাঁহারা সাধারণ লোকের মত এক বিছানায় শুইয়া থাকিতেন। নাগমহাশয় চিরজীবন শিশুর মত কাটাইলেন। কোন সময়ই তাঁহার কোন রূপ ভাবের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। মাঠাকুরাণী অনেক রকম চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে বশে আনিতে পারিলেন না। মা ঠাকুরাণী তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া রহিলেন, নাগমহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, সকলই বৃথা হইল। নাগমহাশয় বলিলেন, আমি দেখি যেন, তুমি আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা, মা আমাকে কোলে নিয়া থাকেন। আর কত কথা বলিলেন। মাঠাকুরাণী কোন মতেই হৃদয়ের ভাব দূর করিতে পারিলেন না। নাগমহাশয়

তাঁহাকে কত উপদেশ দিলেন, তিনি কোন মতেই প্রবোধ মানিতে পারিলেন না। নাগমহাশয় মাথা খুড়িয়া রক্তপাত করিলেন, তাহাতেও তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে রান্নাঘরের পিছনে যে আমগাছ আছে, তাহাতে মাঠাকুরাণী ফাঁস দিলেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে ছাড়াইয়া আনিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। হৃদয় হইতে কামভাব একবারে চলিয়া গেল। আত্মোৎসর্গ করিলে ভগবানের দয়া পাওয়া যায়। রাবণ যখন স্বীয় দশমুণ্ড আহুতি দিয়াছিলেন, ভগবানের দর্শন পাইলেন। নাগমহাশয়ের আশীর্ব্বাদে জীব অনতিবিলম্বে মুক্ত হয়। এবার তিনি বিধি অনুসারে কাজ করিলেন। যে পর্য্যন্ত মাঠাকুরাণী আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন না, সে পর্য্যন্ত তাঁহার আশীর্ব্বাদ পান নাই। আত্মোৎসর্গ করিয়া নাগমহাশয়ের আশীর্ব্বচন পাইলেন, কামজ্বালা দূরে পালাইয়া গেল।

মোহিনী দর্শনে মহেশের মোহপ্রাপ্তি হইয়াছিল। আর নাগমহাশয় কামার্ত্তা মোহিনীর আলিঙ্গনে সচ্চিদানন্দময়ীর সত্ত্বা অনুভব করিলেন, মহাভাবে মগ্ন হইলেন। রমণীর সঙ্গে একত্র থাকিয়া, রমণীর সঙ্গ না করা জীবের দূরের কথা শিবেরও অসাধ্য। আমি জোর করিয়া এক যেয়ে কথা লিখিতেছি না, যাহা সত্য ঘটনা, তাহা দেখাইতেছি। মোহিনী দর্শন করিয়া মহাদেব অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, নিজ কন্যা দেখিয়া ব্রহ্মার মন বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু নাগমহাশয় কামাতুরা রমণীর আলিঙ্গনে সচ্চিদানন্দময়ী মাকে অনুভব করিলেন, শিশুর মত অবিচলিত রহিলেন। যদি নাগমহাশয় সমাধির অতলজলে ডুবিয়া থাকিতেন, যদি তাঁহার মন বাহ্যিক জগতে না থাকিত, তবে মনে করা যাইতে

পারিত, মরার উপর খাড়া ধরিলে কোন ভাব অভিব্যক্ত হয় না। আরও এক কথা বলা যাইতে পারে, কোন সময় কোন লোকে ঈদৃশ ভাব প্রকাশ পায়, তাহা সাময়িক, বহু কাল স্থায়ী নয়। এক সময় নয়, বহু সময়—চিরকালই নাগমহাশয় শিশুর মত ছিলেন। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, স্ত্রী কামার্ত্তা হইয়া স্বামীকে নির্জ্জনে পাইলে কিরূপ ব্যবহার করে। নাগমহাশয় কখনও ভিন্ন বিছানায় শুইতেন না, দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া তিনি কামার্ত্তা স্ত্রীর সহিত এক বালিশে শয়ন করিতেন। কোন সময়ে তাঁহার কোন ভাব হয় নাই, কোন বিকার লক্ষিত হইত না। মাঠাকুরাণী শত চেষ্টায় তাঁহাকে টলাইতে পারেন নাই।

স্বামী শুনিয়াছেন, একবার নাগমহাশয়ের একভক্তের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, সুন্দরী যুবতী রমণী বুকে লইয়া শুইয়া নাগমহাশয় কি করিয়া বিকারশূন্য হইয়া থাকেন। তবে কি তাঁহার কোন অঙ্গ নাই? একদিন নাগমহাশয় তামাক খাইতে বসিয়াছেন। বস্ত্র একধারে সড়িয়া গিয়াছিল। ভক্ত তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার ভ্রম দূর হইল। তিনি নাগমহাশয়ের সমস্ত অঙ্গ সজীব দেখিতে পাইলেন। নাগমহাশয় কখনও মর্কট বৈরাগ্য দেখান নাই। তাঁহার প্রত্যেক কাজে ঐশীশক্তি প্রতিফলিত হইত।

একবার পিতার আদেশে নাগমহাশয় স্ত্রীকে কলিকাতা আনিলেন। ধর্ম্মোন্মাদ নাগমহাশয় স্ত্রীকে কলিকাতা লইয়া আসিলেন শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, দুর্গা হঠাৎ বধুকে লইয়া কলিকাতা গেল কেন? এমত উদাসীন দুর্গা কি সংসার করিবে?

অনেকের নিকট তাহা নিশার স্বপনের মত প্রতিপন্ন হইল। আমার পিতা বলিলেন, ঠাকুরভাই যে সংসার করিবেন, আমার বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় জ্যেঠা মহাশয়ের উৎপীড়নে তিনি বধূঠাকুরাণীকে নিয়া গেলেন। তাহা না হইলে, অমন মানুষ এত সহজে ভুলে না। অনেক সময় মা ঠাকুরাণী কাঁদিয়া আমার পিতার নিকট নাগমহাশয়ের বিষয়ে বহু কথা বলিয়াছেন। তিনি আবার সেই অনুসারে নাগমহাশয়কে অনেক কথা বলিতেন। যখন নাগমহাশয় বাড়ীতে ছিলেন, তিনি মাঠাকুরাণীর সাথে একত্র শুইতেন। পিতা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু নাগমহাশয়ের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। তাই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নাগমহাশয় পিতার কথায় বধূ লইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন।

একদিন মা ঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে-ছেন। আমার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ত আপনাকে কলিকাতা লইয়া গিয়াছিলেন। তখন তিনি আপনার সহিত কি রকম ব্যবহার করিতেন? মা ঠাকুরাণী বলিলেন, সব সময়ে সুখে রাখিয়াছেন। আমাদের খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হইত না। তিনি যত্নের কোন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু রাত্রি হইলে, পিতাকে দেখাইয়া আমার কাছে শুইতেন। পিতা ঘুমাইয়া পড়িলে, তিনি বাসার বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেন। ভোর ৪।৫টার সময় উন্মাদের মত আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইত। আমি মনে করিতাম, তিনি কোন দিন আমাদিগকে একবারে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহার শরীর ও মাথায় মাটি মাখা থাকিত। তাহা দেখিলে

মনে হইত, তিনি কোথায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছেন। কোন কথা বলিতে সাহস করিতাম না। তিনি রাত্রে এইরূপ কাজ করিয়াছেন, ভোর হইলে মানুষের সাক্ষাতে এমন ভাব দেখাইয়াছেন, যেন রাত্রে ঘরেই ছিলেন; সকালবেলা পিতা উঠিলে, ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে যাইতেন। সংসারের যে কাজ থাকিত, তাহা করিতেন। রোগী আসিলে, তাহাদিগকে ঔষধ দিতেন। পিতা মনে করিতেন, পুত্র সকল রাত্র ঘরেই ছিল। ভগবানের ইচ্ছায়, এখন বধূ তাহাকে দৃঢভাবে বাঁধিতে পারিবে। কিন্তু ঠাকুরদাদা ভুলিয়া যাইতেন, যশোমতি কৃষ্ণকে বাঁধিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কোনমতেই বাঁধিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া, নাগমহাশয় কতক দিন একবারেই বাড়ীতে যাইতেন না; যদি কখন বাড়ীতে যাইতেন, অধিক দিন থাকিতেন না। বধূর উপর আশক্তি হওয়ার কোন সুযোগ হয় নাই। পিসী মারা গেলে, সংসার অসার বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন। ভগবান্ লাভের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলেন। বধূকে কলিকাতায় আনিবার পূর্ব্বে তিনি সকল দিন ঘরে থাকিতেন না। এখন তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি ঘরে থাকিতে দেখিয়া, আশায় হৃদয় বাঁধিয়া, শ্বশুর বধূকে নানা মত উপদেশ দিতেন। ঠাকুরদাদা নাগমহাশয়কে ঘরে থাকিতে দেখিয়া সুখী হইতেন সত্য, তাঁহার ভাব দেখিয়া মরমে মরমে বুঝিতে পারিতেন, বধূর প্রতি তাঁহার একচুল আশক্তি হয় নাই। প্রথম বিবাহ করিয়া যেমন তিনি বধূর সহিত একত্রে শুইয়া রহিয়াছেন, এই স্ত্রীর সাথেও সেই ভাবে দেখিলেন। বধূ শ্বশুরকে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহাকে কোন কথা বলিতে

লজ্জা পাইতেন। আর বলিবেন বা কি, স্বামী কিরকম গৃহী, বধূ বিশেষরূপে তাহা জানিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন যে কাজে স্বামীর অনিচ্ছা, অন্যে প্রাণ দিলেও স্বামী তাহা করিবেন না।

ঠাকুরদাদা ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে বড় কষ্ট পাইলেন। সময় সময় আত্মীয়দিগকে বলিতেন, আমি উঁহাকে (বধূকে) ভাত রাঁধার জন্য কলিকাতা আনিয়াছি। সে ভাতই রাঁধিবে। হা ভগবন্! আমার কর্ম্মে এই ছিল। ঠাকুর দাদার ভাব দেখিয়া, একদিন নাগমহাশয় গোপনে তাঁহাকে বলিলেন, যদি আপনি আমাকে রান্না করিতে দিতেন, কখনও উঁহাকে এখানে আনিতাম না। আমি দেখিতে পাই সে আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা। আপনি কি আমাকে মাতৃগমন করিতে বলেন। আমি পশুপক্ষী-যোনীকে মাতৃ-যোনীর মত দেখি, নারী মাত্রেই ব্রহ্মময়ী মা বলিয়া জানি। যখন সে আমাকে খাইতে দেয়, আমি মনে করি মা অন্নপূর্ণা আসিয়া আমাকে খাইতে দিতেছেন। সে আমার কাছে শুইলে, আমি দেখিতে পাই, আমার জননী আমাকে বুকে করিয়া শুইয়া আছেন। এমত অবস্থায় আপনি আমাকে কি করিতে বলেন? পুত্রের কথা শুনিয়া ঠাকুর-দাদা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই দুর্গা কি মানুষ? তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, হা দুর্গা, জগতকে মা দেখ বলিয়া বিবাহ করিতে চাও নাই। আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেন তোমাকে বিবাহ করাইলাম? আমার বুদ্ধির ত্রুটীতে পরের মেয়েকে কষ্টে ফেলিলাম। সেই দিন হইতে ঠাকুর-

দাদা একবারে নিরাশ হইলেন। কি এক ভাব হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুর্গা কি মানুষ? পিতা ও পুত্র আর কোন কথা বলিলেন না। দিন্ একভাবে কাটিয়া গেল।

একদিন মাঠাকুরাণী রজস্বলা হইয়া বসিয়া আছেন। আমার মা রান্না করিতেছেন। তিনি মাকে বলিলেন, আমার জীবনে কি সুখ হইল? শিয়াল কুকুরও নিজেদের সন্তান লইয়া একত্র থাকে, একে অন্যকে দেখিয়া সুখী হয়। ইহা বলিয়া মাঠাকুরাণী খুব কাঁদিলেন। আমাদের বাড়ীর লোকের বিশ্বাস ছিল, তিনি পিতাঁর কথামত সমস্ত কাজ করেন। আমার এক পিসী প্রকারান্তরে বধূর কার্য্যের কথা ঠাকুরদাদাকে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া, এই সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, বধূ কি দুর্গার নিকট কোন সুখের আশা করিতে পারে? যে কয়েক দিন সংসারে থাকিবে, কেবল চক্ষে দেখিতে পাইবে। আমি মরিলে, বধূর উপায় কি হইবে, তাহা ভগবান্ জানেন। বধূর কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়। তাহা শুনিয়া পিসী অবাক হইলেন। আমি ছোট ছিলাম, বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ী আসিয়া পিসীকে বলিলাম, ঠাকুরদাদা কি বলিলেন? জ্যেঠা মহাশয় কলিকাতায় কি করিয়াছিলেন? পিসী আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তোমার জ্যেঠামহাশয় স্ত্রীকে মা বলেন, ভগবতী মার মত তাঁহাকে দেখেন। সে সকল স্ত্রীলোককেই ভগবতী বলিয়া দেখে। তোমার জ্যেঠামহাশয় কি মানুষ? সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঠাকুর কাকা না বুঝিয়া তাহাকে বিবাহ করাইয়াছিলেন।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদর্শন।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের নিকট নাগমহাশয় যাইয়া কি করিয়াছেন, আমাদের দেশের লোক তাহা জানে না। নাগমহাশয়ের মুখে দুই একটী কথা শুনিয়াছি সত্য, কিন্তু শরৎ বাবুর লিখিত নাগমহাশয়ের জীবনীতে অনেক ঘটনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন সম্বন্ধে শরৎ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহার অবিকল নকল করিলাম। শরৎ বাবু দয়া করিয়া দোষ ক্ষমা করিবেন।

সুরেশ বাবু নাগমহাশয়ের নিকট নিত্য আসেন, আর দুই জনে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিয়া ধর্ম্ম কথার আলোচনা করেন। কিন্তু কেবল আলোচনায় আর নাগমহাশয়ের তৃপ্তি হইতেছে না। বলিতে লাগিলেন, কেবল কথার কথায় জীবনতো চলিয়া যাইতেছে, কিছু প্রত্যক্ষ না দেখিলে, জীবন ধারণ করা নিষ্ফল। ঠিক সেই সময় সুরেশ একদিন কেশব বাবুর সমাজে গিয়া শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন—তিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, ভগবৎ প্রসঙ্গে সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকেন এবং মুহুর্মুহুঃ ভাব সমাধি হয়। সুরেশের ইচ্ছা হইল, নাগমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন সাধুকে দেখিতে যাইবেন। কিন্তু নানা কারণে সে কথা নাগমহাশয়কে বলা হইল না। এইরূপে দুইমাস কাটিয়া গেল। তারপর সুরেশ এক দিন নাগমহাশয়কে বলিলেন, ওহে দক্ষিণেশ্বরে একজন খুব ভাল সাধু আছেন, দেখতে

যাবে? নাঁগমহাশয়ের আর বিলম্ব সহিল না, বলিলেন আজই চল। সেই দিনই দুই জনে আহারাদি করিয়া বাহির হইলেন। শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তরে, সেই মুখেই চলিলেন। তখন চৈত্র মাস। মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ হইতেছে। আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী সব অগ্নিময়। গ্রাহ্য নাই, দুইজনে যেন মাতোয়ারা হইয়া চলিতেছেন, কি এক অদৃশ্য শক্তি তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কতদূর জানা নাই, উভয়ে একাগ্রমনে উত্তর মুখে চলিতে লাগিলেন। বহু দূর যাইয়া একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক বলিল, আপনারা দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সে পথ বলিয়া দিল। দুজনে প্রায় দুইটার সময় দক্ষিনেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

কি মনোরম স্থান। যেন দেবগণের নিভৃত লীলাভূমি। সংসারের কোলাহল নাই। বিশির পুষ্প সৌরভে সমস্ত উদ্যান খানি যেন বিভোর হইয়া রহিয়াছে। কি স্নিগ্ধ বাতাস! কি সুন্দর সরোবর! কোথাও উচ্চশির দেব মন্দির, কোথাও নবপল্লবীত বৃক্ষরাজি যেন শাখা আন্দোলন করিয়া ধীর স্বরে ডাকিতেছে, এস, এস, সংসার সন্তপ্ত পথিক, এই তোমার জুড়াইবার স্থান।

দেখিতে দেখিতে দুই জনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন, তাহার পূর্ব্বদিকের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার পার্শ্বে এক জন শ্মশ্রুধারী পুরুষ বসিয়া ছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, এখানে যে একজন ব্রহ্মচারী থাকেন, তিনি কোথায়? ভদ্রলোকটী বলিলেন, হাঁ একজন

আছেন। তিনি আজ চন্দন নগরে গিয়াছেন। তোমরা আব একদিন আসিও।

এত কষ্ট করিযা আসিযাছেন, উত্তর শুনিয়া দু'জনের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল। হতাশে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কি আর উপায়! ভদ্রতাব খাতিরে ভদ্রলোকটিকে একটী কথা বলিয়া বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেছেন, নাগমহাশয় দেখিলেন, দ্বারের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া কে যেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।" নাগমহাশয়কে কে যেন বলিয়া দিল ইনিই সেই সাধু। শ্মশ্রুধারীব বাক্য উপেক্ষা করিয়া দুইজনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্মশ্রুধারী ভদ্র লোকটীব নাম, প্রতাপচন্দ্র হাজরা। নাগমহাশয় বলিতেন হায়, হায়, ভগবানের কি আশ্চর্য্য মায়া। বারো বৎসর কাল নিকটে অবস্থান করিযাও হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে চিনিতে পাবেন নাই। ফুট তাঁর হাতে, তিনি কৃপা করিয়া জানাইয়া দিলে, জীব তাঁহাকে জানিতে পারে। শত বৎসর জপ ধ্যান করিলেও, তাঁর কৃপা না হলে, কেহই তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণেব নিজ জীবনের ঘটনা হইতে স্বামী সুবোধানন্দ একটী উদাহরণ দেন:—ভাগিনেয হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত রামকৃষ্ণ একদিন কালীঘাটে গমন করেন। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার উত্তর পাবে তখন বিস্তর কচুগাছের বন ছিল। রামকৃষ্ণ দেখিলেন, সেইখানে শ্রীশ্রীজগন্মাতা একখানি লাল পেড়ে কাপড় পরিয়া কুমাবী বেশে কতকগুলি কুমারীর সহিত ফড়িং ধরিয়া খেলা করিতেছেন। দেখিয়াই

ঠাকুর মা, মা বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধি ভঙ্গের পর শ্রীমন্দিরে গিয়া দেখিলেন, যে কাপড় পরিয়া মা কুমারীবেশে খেলা করিতেছিলেন, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে সেই শাটী শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হৃদয় বলিলেন, মামা, তখনই ত বলিতে হয়, মাকে গিয়া দৌড়ে ধরে ফেলতুম্। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, তাকি হযরে! মা না ধরা দিলে কার সাধ্য যে তাঁরে ধর্‌তে পারে! তাঁর কৃপা না হলে কেউ তাঁর দর্শন পায় না।

প্রথম দিন হইতেই হাজরামহাশয়ের উপর নাগমহাশয়ের কেমন বিরূপভাব হইয়াছিল। বলিতেন, ঠাকুরের কাছে থাকিয়াও তাঁর সত্যের আঁট ছিল না। মিথ্যাকথা বলিয়া প্রথম দিনই তিনি আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দয়াময় রামকৃষ্ণ নিজগুণে পাদপদ্মে আশ্রয় দিলেন।

নাগমহাশয় ও সুরেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভগবান্ রামকৃষ্ণ উত্তরাস্য হইয়া একখানি ছোট তক্তপোষের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, মুখে হাস্য। সুরেশ করজোড়ে প্রণাম করিয়া মেজেতে পাতা মাদুরের উপর বসিলেন। নাগমহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু পদধূলি লইবার চেষ্টা করিলে, রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না, পা গুটাইয়া লইলেন। নাগমহাশয় বুঝিলেন, তিনি এখনও এ পবিত্র সাধুর চরণ স্পর্শ করিবার যোগ্য হন নাই। উঠিয়া ঘরের একপাশে বসিলেন।

ঠাকুর উভয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম, কোথা বাড়ী, কি করা হয়, সংসারে আর কেকে আছে, বিবাহ করিয়াছে কিনা, ইত্যাদি। তার পর কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, সংসারে থাক্‌বে ঠিক পাঁকাল মাছের মত। গৃহে

থাকা আর দোষ কি? পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায় লাগেনা। তেমনি গৃহে থাক্‌বে, কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগ্‌বে না। নাগমহাশয় একদৃষ্টে ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, অমন করে কি দেখ্‌ছ?

নাগমহাশয়—আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি, তাই দেখ্‌ছি।

কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ঐ দিকে পঞ্চ বটীতে গিয়ে একটু ধ্যান করে এস।

প্রায় অর্ধঘণ্টা ধ্যান করিয়া সুরেশ ও নাগ মহাশয় আবার ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে লইয়া দেব মন্দির সকল দেখাইতে গেলেন।

ঠাকুর অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, সুরেশ ও নাগমহাশয় পশ্চাতে। ঠাকুরের ঘরের সংলগ্ন প্রথমেই দ্বাদশ শিব মন্দির। রামকৃষ্ণ প্রত্যেক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেমন ভাবে শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাগমহাশয়ও তেমন করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। সুরেশ ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুর দেবতা মানে না, নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর বিষ্ণুমন্দির। এখানেও পূর্ব্ববৎ প্রণাম প্রদক্ষিনাদি করিয়া, রামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় ও সুরেশ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আশান্ত বালক যেমন জননীর অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, শ্রীশ্রীভবতারিণীকে রামকৃষ্ণ তেমনি করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তারপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের

পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুর নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

বেলা প্রায় ৫টার সময় সুরেশ ও নাগমহাশয় রামকৃষ্ণ সকাশে বিদায় চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আবার এস, এলে গেলে তো তবে পরিচয় হবে।

পথে আসিতে আসিতে নাগমহাশয়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কে ইনি? সাধু, সিদ্ধ মহাপুরুষ না আরও কিছু?

সুরেশ বলেন, সেদিনকার সে ভাব ভক্তির ছবি তাঁহার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। অনল আহুতি পাইলে যেমন জ্বলিয়া উঠে, নাগমহাশয়ের হৃদয়ে তেমনি তীব্র পিপাসা জাগিয়া উঠিল; ঈশ্বর লাভ লালসায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ, লোকের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। কেবল সুরেশের সঙ্গে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ করিতেন।

প্রায় সপ্তাহ পরে আবার দুইজনে ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। উন্মাদপ্রায় নাগমহাশয়কে দেখিবা মাত্র রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, এসেছিস্, তা বেশ করেছিস্, আমি যে তোদের জন্য এতদিন হেথায় বসে রয়েছি। তারপর নাগমহাশয়কে কাছে বসাইয়া বলিলেন, ভয় কি? তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা। সেদিনও রামকৃষ্ণ নাগমহাশয় ও সুরেশকে পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিতে গেলে, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সেখানে আসিয়া নাগমহাশয়কে তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশয় তামাক সাজিতে যাইলে, রামকৃষ্ণ সুরেশকে বলিলেন, দেখ্‌ছিস্, এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন। বলিতে বলিতে নাগমহাশয় তামাক সাজিয়া আনিলেন।

তামাক সাজিবার পর, ঠাকুর তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে আদেশ করিতে লাগিলেন, গামছা ও বেটুয়াটী আনো; এবার গিয়ে জলের গাকটী নিয়ে এস, জল ভর্ত্তি করে নিয়ে এস, ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করিতে পাইয়া নাগমহাশয়ের আনন্দের অবধি রহিল না। কেবল মনে এক ক্ষোভ ঠাকুর পদধূলি দেন নাই।

ইহার পর নাগমহাশয় যেদিন দক্ষিণেশ্বর গেলেন, সেদিন একা। সুরেশ কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, যাইতে পারেন নাই। সেদিনও নাগমহাশয়কে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল। বসিয়াছিলেন, বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাড়াইলেন। ঠাকুরকে তদবস্থায় দেখিয়া নাগমহাশয়ের বিষম ভয় হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, ওগো, তুমি না ডাক্তারী কর, দেখদেকি আমার পায় কি হইয়াছে। ঠাকুরের স্বাভাবিক কথা শুনিয়া নাগমহাশয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; পাযে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কই কোথাও তো কিছু দেখ্‌ছি না। রামকৃষ্ণ বলিলেন, ভাল করে দেখ না কি হয়েছে? নাগমহাশয়ের হৃদয়ের ক্ষোভ আজ দুর হইল, চরণ স্পর্শের অধিকার পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়া অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে বারম্বার সেই বাঞ্ছিত চরণ হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার (ঠাকুরের) নিকট কিছুই চাহিবার প্রয়োজন ছিল না; তিনি মনের ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অভিষ্ট পূর্ণ করিয়া দিতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু, যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিয়াছে।

এখন হইতে নাগমহাশয়ের ধ্রুব ধারণা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ

সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি বলিতেন, ঠাকুরের নিকট কয়েক দিন যাতায়াতের পরই জানিতে পারিলাম, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, গোপনে দক্ষিণশ্বরে বসিয়া লীলা করিতেছেন। কেমন করিয়া জানিলেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তিনিই (ঠাকুরই) যে নিজ গুণে কৃপা করে জানিয়ে দিলেন তিনি কে। তাঁর কৃপা না হইলে কি কেহ তাঁকে জান্‌তে পারে, না বুঝ্‌তে পারে। সহস্র বর্ষ কঠোব তপশ্চর্য্যা কবিলেও যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে কেহই তাঁহাকে বুঝিতে সক্ষম হয় না। . .

ইহার পব বামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে নিজ দেহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমাব এটা কি বোধ হয়? নাগমহাশয় কর-জোড়ে বলিলেন, ঠাকুর, আর আমায় বলিতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেবেছি, আপনি সেই। ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া নাগমহাশয়ের বক্ষে দক্ষিণ চরণ অর্পণ করিলেন। সহসা নাগমহাশয়ের যেন কি একরূপ ভাবান্তর হইল, তিনি দেখিলেন, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরে কি এক দিব্য জ্যোতি জ্বলিতেছে।

তিনি বলিতেন, ঠাকুরের আগমন অবধি জগতে বন্যা এসেছে, সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, এমন সর্ব্ব ভাবের সমন্বয় আজ পর্য্যন্ত কোন অবতারে হয় নাই।

কিছুকাল এই ভাবে যাতায়াত করার পর, একদিন নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বর গিয়া দেখেন, রামকৃষ্ণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, আর সেই দিন ভারি গ্রীষ্ম। নাগমহাশয়ের হাতে পাখাখানা দিয়া ঠাকুর ঘুমাইলেন, কিছুক্ষণ বাতাস করিতে করিতে নাগমহাশয়ের হাত অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু

ঠাকুরের আদেশ ব্যতীত তিনি বাতাস বন্ধ করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত এতই ভারি হইয়া উঠিল যে আর চলে না। রামকৃষ্ণ অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সাধারণের ন্যায় নিদ্রাবস্থা নহে। তিনি সদাসর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতেন। এক ভগবান্ ভিন্ন, সাধক বা সিদ্ধ পুরুষে এ অবস্থা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না।

একদিন নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়াছিলেন, চিদানন্দরূপো শিবোহহং শিবোহম্ বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্র) প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর নাগমহাশয়কে দেখাইয়া। নরেন্দ্রকে বলিলেন, এরই ঠিক্ ঠিক্ দীনতা একটুও ভাণ নাই। নরেন্দ্র বলিলেন, তা আপনি যখন বল্‌ছেন, তা হবে। দুই জনে আলাপ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় নাগমহাশয় বলিলেন, সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

নরেন্দ্র—আমি তিনি-মিনি বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ পরমাত্মা। আমার ভিতর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উঠ্‌ছে, ভাস্‌ছে, ডুব্‌ছে।

নাগমহাশয়—আপনার কি সাধ্য যে একটি চুল সোজা কল্লেন, তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ত দূরের কথা। তাঁর ইচ্ছা না হলে, গাছের পাতাও নড়ে না।

নরেন্দ্র—আমি ইচ্ছা না করিলে চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হয়। আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষে বসিয়া উভয়ের কথা শুনিতে

ছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে নাগমহাশয়কে বলিলেন, কি জানিস্ ও খাপ খোলা তরোয়াল, ওর ওকথা শোভা পায়, তা নরেন ওকথা বল্‌তে পারে। নাগমহাশয়ের অমনি ধারণা হইল, নরেন্দ্রনাথ মানুষ নয়, রামকৃষ্ণ-লীলায় মহাদেব নরশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া নিরুত্তর হইলেন। জীবনে আর তাহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন মুক্ত পুরুষ দর্শন করিয়াছেন কি? নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ মুক্তি-দাতা রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়াছি। আর তাঁহার সর্ব্ব প্রধান পার্ষদ শিবাবতার স্বামিজীকেও দর্শন করিয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা কিছু বলিতেন, নাগমহাশয় তাহা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, ঠাকুর পরিহাসচ্ছলেও যদি কোন কথা কহিতেন, তাহার এক গূঢ় রহস্য থাকিত। আমি ছাপালোক তাঁহাকে বুঝিলাম কই?

কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করার পর নাগমহাশয় এক দিন শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন, দেখ, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল, এদের ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম্মলাভ হওয়া বড় কঠিন। তারপর ডাক্তারদিগের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিলেন। একটুকু ঔষধে মন পড়ে থাক্‌বে, তাহলে কি আর বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হইতে পারিবে? ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নাগমহাশয় দেখিতেন, তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদিগের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে বৃত্তি ঈশ্বর লাভের প্রবল অন্তরায় বলিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ করিলেন, সে বৃত্তি দ্বারা অন্ন বস্ত্র লাভে আমার

প্রয়োজন নাই। সেই দিন বাসায় আসিয়া ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তকাদি লইয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কুতের কার্য্যই এখন তাঁহার একমাত্র জীবিকা হইল।

দীনদয়াল পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন, নাগমহাশয় ডাক্তারী ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পিতার প্রতিনিধি স্বরূপ নাগমহাশয় এত দিন কুতের কার্য্য চালাইতেছেন। পালবাবুদের অনুরোধ করিয়া আপনার স্থলে পুত্রকে বহাল করাইয়া দীনদয়াল দেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় এই তাঁহার শেষ আসা।

কুতের কার্য্যে নাগমহাশয়কে বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না; কেবল কখন কখন বাগবাজার বা খিদিরপুরের খালে যাইতে হইত। ডাক্তারি ছাড়িয়া এখন জপতপের যেমন সুবিধা হইল, দক্ষিণেশ্বর যাইবারও তেমন অবসর পাইলেন। বাসায় গঙ্গাজল রাখিবার একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান ছিল, সেই স্থানে জালার পাশে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। যে দিন কুতের কার্য্যের জন্য বাগবাজার যাইতেন, সে দিন খাল পার হইয়া বন বাগানি অঞ্চলে, একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া লইতেন এবং সেই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। এক দিন এই রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার কি অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়াছিল, বাসায় আসিয়া সুরেশকে বলিলেন, ধ্যানে আর কখন তাঁহার তেমন আনন্দ হয় নাই।

ক্রমে রামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাইতে যাইতে নাগমহাশয়ের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল, সংসার ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া অনুমতি লইতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। কিন্তু ঘরে

প্রবেশ করিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন, তা, সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকিলেই হলো। গৃহস্থাশ্রম কিরূপ জানো? যেমন কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করা। কি বিড়ম্বনা। যিনি স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিয়া এই দাবানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে। আর উপায় কি নাগমহাশয় বলিতেন, ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে যাহা একবার বাহির হইত, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। যাহার যে পন্থা, দু'কথায় তিনি তাহা বলিয়া দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নাগমহাশয় বাসায় ফিরিলেন, কিন্তু মন বড় আকুল হইল। মুখে দিন রাত কেবল হা ভগবান, হা ভগবান, কখন ধূলায় আছড়াইয়া পড়েন, কখন কণ্টকে পড়িয়া শরীর ক্ষত বিক্ষত করেন। আহারে লক্ষ্য নাই, যে দিন সুরেশ যত্ন করিয়া কিছু খাওয়ান, সেই দিন খাওয়া হয়, নহিলে নয়। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, কখন কোথায় থাকেন, কিছুরই স্থিরতা নাই। বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর, কোন দিন দুইটা বাজে। সামান্য কুতের কার্য্য করাও নাগমহাশয়ের পক্ষে এখন দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিছু পূর্ব্বে রণজিৎ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। রণজিৎ দরিদ্র সন্তান, কিন্তু ধর্ম্মভীরু; নাগমহাশয় যে দিন অক্ষম হইতেন, সেই তাঁহার হইয়া কুতের কার্য্য চালাইয়া দিত।

ইতিমধ্যে নাগমহাশয়কে দেশে যাইতে হইল। মাতাঠাকুরাণী

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিতা হইলে... বুঝিলেন, গৃহস্থাশ্রমে স্বামীর আর তিলমাত্র আস্থা নাই। নাগমহাশয়ও তাঁহাকে বুঝাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পিত দেহ দ্বারা তাঁহার আর সংসারের কোন কার্য্য হইবে না।

দেশ হইতে আসিয়া নাগমহাশয় এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, তাঁর উপর নির্ভর হলো কই? এখনও তো নিজের চেষ্টা রহিয়াছে। ঠাকুর নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, এখানকার টান থাক্‌লে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে। নাগমহাশয় বলিতেন, (রামকৃষ্ণ) যাকে দিয়া যা ইচ্ছা করাইয়া নেন, জীবের কোন কিছু সাধ্য নাই, মানুষের মনকে ঠাকুর যেমন ইচ্ছা গড়্‌তে ভাঙ্‌তে পার্‌তেন; একি মানুষের ধর্ম্ম?

নাগমহাশয়ের তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার একদিন তাঁহাকে বলিলেন, গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলে যাবে।

নাগমহাশয়—গৃহে কিরূপে থাকা যায়; পরের দুঃখ কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?

রামকৃষ্ণ—ওগো, আমি বল্‌ছি, মাইরি বল্‌ছি, ঘরে থাক্‌লে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে।

নাগমহাশয়—কি করে গৃহাস্থাশ্রমে দিন কাটুবে?

রামকৃষ্ণ—তোমার আর কিছু করতে হবে না, কেবল সাধু-সঙ্গ কর্‌বে।

নাগমহাশয়—সাধু চিন্‌বো কি করে, আমি যে হাঁদা লোক।

রামকৃষ্ণ—ওগো, তোমার সাধু খুঁজে নিতে হবে না। তুমি

ঘরে বসে থাকবে, যে সকল যথার্থ সাধু আছেন, তাঁরা এসে নিজেরাই তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

দিন যাইতে লাগিল, নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, যতদিন সংসার ধান্দায় ঘুরতে হইবে, ততদিন শান্তির আশা দুরাশা। স্থির করিলেন, রণজিৎকে কুতের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিবেন। সুযোগমত একদিন পালবাবুদের কাছে কথাটা পাড়িলেন। বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার তাহলে কি করে চলবে? নাগমহাশয় বলিলেন তিনি (রণজিৎ) দয়া করে যাহা দিবেন, তাহাতে একপ্রকার চলিয়া যাইবে।

পালবাবুরা দেখিলেন, নাগমহাশয়ের দ্বারা সংসারের কাজকর্ম্ম চলা অসম্ভব। তবে যাহাতে এই প্রতিপালিত পরিবারের অন্ন কষ্ট না হয়, তাহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাহারা রণজিৎকে ডাকাইলেন, এবং লাভের অর্দ্ধাংশ নাগমহাশয়কে দিতে স্বীকার করাইয়া কুতের কর্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রণজিৎ নাগমহাশয়ের স্বভাব জানিত, পাছে খরচ করিয়া ফেলেন, এজন্য সমস্ত টাকা তাঁহাকে একবারে দিত না, নাগমহাশয়ের বাসা খরচ চালাইয়া বাকি টাকা ডাগযোগে দীনদয়ালকে পাঠাইয়া দিত।

বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন, তা বেশ হয়েছে, তা বেশ হয়েছে।

নিশ্চেষ্ট হইয়া নাগমহাশয় উগ্রতর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন এবং সর্ব্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে রবিবারে, ছুটীর দিনে তিনি কখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না; বলিতেন বুকত বিদ্বান, ধিমান, গণ্যমান্য

লোক ববিবারে ঠাকুরের কাছে যান, আমি মুর্খ লোক, তাদের কথা কি বুঝ্‌ব ? এ জন্য অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তগণের সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন সর্ব্বদা যাতায়াতের কারণ, কারুব কারুব সঙ্গে পরিচয় হইতে লাগিল।

এক রাত্রে গিরিশ দুইটী বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘবের কোণে, কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিদীন হীন ভাবে একটী লোক বসিয়া আছেন। লোকটীর আকার অতি শুষ্ক, কিন্তু চক্ষু দুইটী তারার মত জ্বলিতেছে। ঠাকুর তাহার সহিত গিরিশের আলাপ করাইয়া দিলেন। কি শুভক্ষণে দেখা, সেই প্রথম পরিচয়েই গিবিশেব সহিত নাগমহায়ের সৌহৃদ্য জন্মিল।

নাগমহাশয় প্রায় অপরাহ্নে নদীতীবে বেড়াইতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, একটী তরুণ রয়স্ক সৌম্যমূর্ত্তি পদচারণ করিতেছে। নাগমহাশয়ের মনে হইল, বোধ হয় ইনি একজন রামকৃষ্ণ ভক্ত। যুবার সহিত পবিচয় করিয়া জানিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য। ইনি স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন হরিরাজ। তুরীয়ানন্দের কঠোর ব্রহ্মচার্য্যেব কথা বলিতে বলিতে নাগমহাশয় বলিতেন, এমন না হলে কি আর ঠাকুরের কৃপাপাত্র হইয়াছেন।

নাগমহাশয় এখন হইতে জামা জুতার ব্যবহার একবারে ছাড়িয়া দিলেন। বাবমাস এক খানি ভাগলপুরী খেস গায়ে দিয়া থাকিতেন। আহার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় যখন যেমন আহার পাবে, তাই খাবে; তোমার এতে কিছু বিধি-নিষেধ নাই; তাতে কোন দোষ হবেক নি।

এজন্য আহার সম্বন্ধে নাগমহাশয় কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম রাখিতেন না। যখন যেমন পাইতেন, তেমনি খাইতেন। সাধারণতঃ তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল, দিনান্তে গ্রাস দুই অন্ন খাইতেন; বলিতেন, যত দিন দেহ আছে, কিছু কিছু টেক্স দিতেই হবে। রসনার ভাল-মন্দ আস্বাদের লালসাকে জয় করিবার জন্য তিনি খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ বা মিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।

নাগমহাশয়ের অর্দ্ধেক বাসা ভাড়া দেওয়া ছিল। কীর্ত্তিবাস নামে একটী মেদিনীপুরের লোক সপরিবারের তাহাতে থাকিত এবং চালের ব্যবসা করিত। বাসায় সেজন্য সময়ে সময়ে অনেক কুঁড়ো জমা হইত। নাগমহাশয়ের একদিন মনে হইল, সেই কুঁড়ো খাইয়া জীবন ধারণ করিলেই হইল, ভালমন্দ আস্বাদনের অত প্রয়োজন কি? লবণ বা মিষ্ট না দিয়া কেবল গঙ্গাজলে মাখিয়া সেই কুঁড়ো খাইলেন। তিনি দুইদিন এই রূপ আহার করিবার পর কীর্ত্তিবাস জানিতে পারায়, সমস্ত কুঁড়ো বেচিয়া ফেলে। সেই অবধি সে আর বাসায় কুঁড়ো জমিতে দিত না। নাগমহাশয় বলিতেন, কুঁড়ো খাইয়া তাঁহারা কোন কষ্ট হয় নাই; বরং শরীর বেশ হালকা বোধ হতো। দিন রাত আহারের বিচার করিতে গেলে, কখনই বা ভগবান্‌কে ডাকিব কখনই বা তাঁর স্মরণ মনন কর্ব্বো। নিয়ত ভালমন্দ খাদ্যের বাচ-বিচার করূতে গেলে, সূচীবায়ু হয়। সাধু সজ্জন জ্ঞানে কীর্ত্তিবাস নাগমহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। বাসায় ভিখারী আসিলে, নাগমহাশয় যদি ভিক্ষাদানে অসমর্থ হইতেন, কীর্ত্তিবাস তাঁহার সহায়তা করিত। সুরেশ বলেন, মামার বাসা বড় রাস্তার উপর ছিল

বলিয়া নিত্য অনেক ভিখারী আসিত, কিন্তু কেহ শূন্য হস্তে ফিরিত না। এক দিন একবৃদ্ধ বৈষ্ণব নাগমহাশয়ের বাসায় ভিক্ষা করিতে আসে। আহারোপযোগী চারটী আলো চাল ব্যতীত নাগ মহাশয়ের সে দিন আর কিছুই ছিল না। কীর্ত্তিবাসও তখন বাসায় উপস্থিত নাই। নাগমহাশয় ভিখারীর নিকটে আসিয়া অতিবিনীতভাবে বলিলেন, আজ আর আমার অন্য কিছু নাই, কেবল চারটী আলো চাল আছে, নিবেন কি? বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার শ্রদ্ধা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া আলোচাল লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশ বলেন, আমার সহিত নাগমহাশয়ের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের আলাপ, কিন্তু আমি কখন তাঁহকে জল খাবার খাইতে দেখি নাই। দেবতার প্রসাদী এবং ঠাকুরের মহোৎসবের প্রসাদী সন্দেশ ব্যতীত তিনি অন্য সন্দেশ খাইতেন না, বলিতেন, জিহ্বার সুখেচ্ছা হইবে। তিনি নিজে ভাল জিনিস কখনও খাইতেন না, কিন্তু অপরকে খাওয়াইতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

বিষয় প্রসঙ্গে নাগমহাশয় একেবারেই করিতেন না, অপরে করিলে, কৌশলে বন্ধ করাইয়া দিতেন। জয় রামকৃষ্ণ, আজ কি কথা তুলিয়াছেন। ঠাকুরের নাম করুন। কোন কারণে কাহার উপর ক্রোধ বা অশ্রদ্ধার উদয় হইলে, তিনি নিকটে যাহা পাইতেন, তাহারই দ্বারা আপনার শরীরে অতি নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিতেন। তিনি কখন কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না, বা কাহারও বিপক্ষে কোন কথা বলিতেন না। একবার ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তাঁহার মুখ দিয়া একটী বিরুদ্ধ কথা বাহির হইয়া পড়ে। নিকটে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল, তিনি তদ্দ্বারা আপনার মস্তকে বারবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাথা ফাটিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে

লাগিল। প্রায় মাসাবধি সে ঘা শুকায় নাই। বলিতেন, বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি, তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া দরকার।

সময় সময় তিনি দীর্ঘ লঙ্ঘন দিতেন। এমন কি পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস থাকিতেন। একবার এইরূপ দীর্ঘ-লঙ্ঘনের পর নাগমহাশয় রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় সুরেশচন্দ্র তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। বোধ হয় সুরেশকে দেখিয়া নাগমহাশয়ের মনে কোনরূপ বিসদৃশ ভাবের উদয় হইয়া থাকিবে, আমার অপরাধ দূর হইল না বলিয়া তিনি রন্ধনের হাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আক্ষেপ করিতে করিতে সুরেশকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেদিন আর তাঁহার অন্নাহার হইল না। আধপয়সার মুড়ি ও আধপয়সার বাতাসা খাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

শীর-পীড়া বশত নাগমহাশকে স্নান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন হইতে জীবনের শেস বিংশতি বর্ষ তিনি আর স্নান করেন নাই। সেজন্য তাহার শরীর অতিশয় রুক্ষ দেখাইত। তার উপর কঠোর সাধনায় তাঁহার অন্তরের দীনতা অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গিরিশ বলেন, অহংশালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগমহাশয় তাহার মাথা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন, তার আর মাথা তোলবার যো ছিল না। পথ চলিবার সময় তিনি কখনও কাহারও অগ্রে যাইতে পারিতেন না। কেহ তামাক সাজিয়া দিলে তাঁহার খাওয়া হইত না, কিন্তু তিনি সকলকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। মনের মত লোক পাইলে, ছিলিমের পর ছিলিম সাজিয়া খাওয়াইতেন এবং আপনিও খাইতেন। এমন কি যখন সে লোক বিদায় চাহিত, নাগমহাশয় ছাড়িতেন না, আর এক ছিলিম খাইয়া যান বলিয়া তাঁহাকে

বসাইতেন, তারপব কত এক ছিলিম চলিত। তিনি বলিতেন, আমি অধম কীটাধম, ভূতোলোক, আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবার নহে ; তবে যদি আপনাদের, তামাক সাজিয়া কৃপালাভ করিতে পারি, তবেই এই জন্ম সফল হইবে।

নাগমহাশয় রাগমার্গের সাধক হইলেও বৈধ ভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনি যে রূপ উগ্র সাধন করিতেন, অপরকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এই লইয়া সুরেশের সঙ্গে একদিন তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। নাগমহাশয়ের সঙ্গে আট নয়-দিন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পব সুবেশকে কার্য্যোপলক্ষে কোয়াটে যাইতে হয়। যাইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণের নিকট হইতে দীক্ষা ও সাধনা উপদেশ লইবার জন্য নাগমহাশয় সুরেশকে নিতান্ত পীড়া-পীড়ি করিয়া বলেন। মন্ত্রে তখন সুরেশের বিশ্বাস ছিল না বলিযা তিনি নাগমহাশয়ের সহিত বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, রামকৃষ্ণ যেমন উপদেশ দিবেন, সেইরূপ কার্য্য হইবে। পরদিন দুইজনে দক্ষিণেশ্বর গেলেন এবং উপস্থিত হইয়াই নাগমহাশয় সুরেশের দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন, ওগো, এতো ঠিক কথা বল্‌ছে। দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন কর্‌তে হয়, তুমি এর কথা মান্‌ছ না কেন? সুরেশ বলিলেন, মন্ত্রে আমার বিশ্বাস নাই। রামকৃষ্ণ নাগমহাশয়কে বলিলেন, তা এখন ওর দরকার নাই, হবে হবে পরে হবে।

কিছুদিন কোয়াটা বাস করিবার পর সুরেশের মন দীক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইবেন। কিন্তু যখন তিনি কলিকাতায় আসিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা অবসান প্রায়।

দিন থাকিতে নাগমহাশয়ের কথা শুনেন নাই ভাবিয়া সুরেশের মনে বড় ধিক্কার হইল। রামকৃষ্ণ যখন স্বস্বরূপ সম্বরণ করিলেন, সুরেশের তখন বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। রাত্রে নিত্য গিযা গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতেন আব মনের দুঃখে পতিতপাবনী জাহ্নবীকে বলিতেন। একদিন ধবণা দিয়া গঙ্গাকুলে পড়িয়া আছেন। রাত্রিশেষে দেখিলেন ভগবান রামকৃষ্ণ গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিযা আসিতেছেন! সুরেশের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঠাকুর কাছে আসিয়া তাঁর কানে বীজ মন্ত্র দিলেন। সুরেশ যেমন তাঁহার পদধূলি লইতে যাইবেন, অমনি শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে প্রায় চারিবৎসব কাটিযা গেল। ক্রমে ভগবান্ রামকৃষ্ণের লীলাবাসনের সময় সন্নিকট হইয়া আসিতেছে! দক্ষিণেশ্বরের সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাটীতে রামকৃষ্ণ রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আছেন। নাগমহাশয় বুঝিলেন, রামকৃষ্ণের স্বস্বরূপ সম্বরণের আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন আর সর্ব্বদা ঠাকুরেব কাছে যাইতে পারিতেন না, বলিতেন, ঠাকুরের রোগে যন্ত্রণা দেখা দূরের কথা স্মরণ করিতেও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যখন ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে রোগ রাখিতে দিলেন, তখন কোন রূপেই তার যন্ত্রনার লাঘব করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহার সমীপে না যাওয়াই স্থির করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম। কেবল কদাচ কখন যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতাম। রামকৃষ্ণের দেহে যখন অহরহ অন্তর্দাহ হইতেছে, সেই সময় এক দিন নাগমহাশয়কে দেখিয়া তিনি

বলিয়াছিলেন, ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বসো। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করিয়া আমার শরীর শীতল হবে বলিয়া রামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ নাগমহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুরেশ কোয়েটা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে গেলে, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিযা ছিলেন, সেই ডাক্তার কোথায়? সে নাকি খুব ডাক্তারি জানে? তাকে একবার আসতে বোলো ত। সুরেশ আসিয়া নাগমহাশয়কে জানাইলেন। নাগমহাশয় কাশীপুরে উপস্থিত হইলে রামকৃষ্ণ বলিলেন, ওগো, এসেছ, তা বেশ হয়েছে। এই দেখনা ডাক্তার কবিরাজেরা তো সব হার মেনে গেছে। তুমি কিছু ঝাড়ফুক জানো? জানত দেখদেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারো। নাগমহাশয় নতমুখে একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, রামকৃষ্ণের সাংঘাতিক ব্যাধি, মানসিক শক্তিবলে নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। সহসা তাঁহার শরীরে এক অপুর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিল, বলিলেনে, হাঁ, হাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব জানি, এখনি রোগ সেরে দিব। বলিয়া ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তা তুমি পারো, রোগ সারাতে পারো।

ঠাকুর অপ্রকট হইবার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে নাগমহাশয় আর একদিন তাঁহকে দেখিতে যান। ঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, এসময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়েছে, আমলকী চিবুলে বোধহয় পরিষ্কার

হতো। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একজন বলিলেন মহাশয়, এখন তো আমলকীর সময় নয়, কোথায় পাওয়া যাবে? নাগ-মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে যখন আমলকীর কথা বাহির হইয়াছে, তখন নিশ্চয় কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। তিনি জানিতেন, ঠাকুরের যখন যাহা অভিলাষ হইত, যে কোন প্রকারে হোক তাহা আসিত। একদিন রামকৃষ্ণের কমলালেবু খাইবার প্রয়াস হয়। ঠাকুর লেবুর কথা স্বামী অদ্ভুতানন্দ (তখন লাটুকে) বলিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নাগমহাশয় কমলালেবু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর অতি আগ্রহে সেই লেবু খাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটী ভাবিতে ভাবিতে নাগমহাশয় কাহাকে কিছু না বলিয়া আমলকী অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমে দুই দিন আড়াই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল নাগ-মহাশয়ের দেখা নাই। এই সময় তিনি কেবল বাগানে বাগানে আমলকী অন্বেষণে বেড়াইয়াছেন। তিন দিনের দিন আমলকী লইয়া রামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। আমলকী পাইয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন, আহা, এমন সুন্দর আমলকী তুমি এই অসময়ে কোথা থেকে জোগাড় করলে? তার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণানন্দকে (তখন শশী বাবুকে) নাগমহাশয়ের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। নাগমহাশয় ঠাকুরের নিকট বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে রামকৃষ্ণানন্দ সংবাদ দিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় উঠিলেন না। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আহার করিবার জন্য নীচে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশয় নীচে আসিয়া আসনে বসিলেন, কিন্তু ভক্ষ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। আহার করিবার

জন্য সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেদিন একাদশীর উপবাস; নাগমহাশয়ের মনোভাব, ঠাকুর যদি দয়া করিয়া প্রসাদ দেন, তবেই ব্রতভঙ্গ করিবেন, নচেৎ নয়। কিন্তু সে কথা কাহাকে বলেন নাই। নাগমহাশয় যখন কিছুতেই আহার করিলেন না, তখন রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরকে গিয়া সেকথা জানাইলেন। রামকৃষ্ণ বলিলেন, ওর খাবারপাতাটা এখানে নিয়ে আয়। তাহাই হইল। রামকৃষ্ণানন্দ পাতাশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলে, তিনি সকল সামগ্রীর অগ্রভাগ জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দিয়া বলিলেন, এইবার দেগে, খাবে এখন। রামকৃষ্ণানন্দ সেই পাতা পুনরায় নাগমহাশয়কে আনিয়া দিলে, নাগমহাশয় প্রসাদ, প্রসাদ, মহা-প্রসাদ বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন ও পরে খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাইতে খাইতে পাতাখানি পর্য্যন্ত তার উদরস্থ হইয়া গেল। প্রসাদ বলিয়া দিলে, নাগমহাশয় কিছুই পরিত্যাগ করিতেন না। রামকৃষ্ণানন্দ বলেন, আহা সেই দিন নাগমহাশয়ের কি ভাবই দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনার পর রামকৃষ্ণ ভক্তগণ নাগমহাশয়কে আর পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না। যদি কখন পাতায় প্রসাদ দেওয়া হইত, সকলে সতর্ক থাকিতেন, নাগমহাশয়ের খাওয়া শেষ হইলেই, পাতাখানি কাড়িয়া লইতেন। যে ফলে বিচি আছে, তাহার বিচি অন্তরিত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইত। ১২৯৩ সালে, ৩১শে শ্রাবণ রবিবার সংক্রান্তি দিনে, ভগবান্ রামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নাগমহাশয় শ্মশানে গমন করেন। পরে গৃহে আসিয়া নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের অপ্রকটের পর স্বামী বিবেকানন্দ সকল ভক্তের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদেব তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বামীজী শুনিলেন, নাগমহাশয় একখানি লেপমুড়ি দিয়ে অনাহারে পড়িয়া আছেন। এমন কি স্নান শৌচাদির জন্যও উঠেন না। স্বামী অখণ্ডানন্দ (তখন গঙ্গাধব) ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ নাগমহাশয়ের বাসায় গেলেন। অনেক ডাকাডাকির পর নাগমহাশয় উঠিয়া বসিলেন, নবেন্দ্রনাথ বলিলেন ওগো আজ আমরা আপনার এখানে ভিক্ষার জন্য এসেছি। নাগমহাশয় তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি কিনিযা আনিলেন। ইতিমধ্যে অতিথিত্রয় স্নান করিযা আসিয়াছেন এবং নাগমহাশয় ভাঙ্গা তক্তা-পোষের উপর বসিয়া রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেছেন। তিনখানি পাতা করিয়া আহায্য দেওয়া হইল। স্বামিজী আর একখানি পাতা করাইয়া তাহাতে খাবাব দেওয়াইলেন। পরে সেই পাতায় বসিবার জন্য নাগমহাশয়কে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই বসিলেন না। স্বামিজী বলিলেন, আচ্ছা থাক, উনি পরেই খাবেন। আহারান্তে বিশ্রাম করিতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ নাগমহাশয়কে আবাব অনুরোধ করিলেন। নাগমহাশয় বলেলেন হায়, হায়, আজিও এ দেহে ভগবানের কৃপা হইল না, ওকে আবার, আহার দিব, আমা হতে তা আর হবে না। স্বামিজী বলিলেন, আপনাকে খেতেই হবে, নইলে আমরা যাচ্ছি না। অনেক বুঝাইবার পর নাগমহাশয় সেদিন আহার করেন।

রামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর বাগবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বসু পুরীধামে বাস করিবার জন্য নাগমহাশয়কে বিশেষ জেদ করেন। নবদ্বীপ বাস করিবার জন্য পালবাবুরা

তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাব সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিতে উভয়ই স্বীকৃত হন। নাগমহাশয় বলিলেন, ঠাকুব গৃহে থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন. তাঁহার বাক্য একচুল লঙ্ঘন করিতে আমার তিলমাত্র সাধ্য নাই। সকলের অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া, রামকৃষ্ণের আদেশ মাথায় ধবিয়া নাগমহাশয় দেশে গিয়া বাস করিলেন।

---

## দয়া।

এক বর্ষার সময় আমি প্রথম নাগমহাশয়কে দেখিতে যাই। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। ঘাটে নৌকা লাগিয়াছে, আমরা সকলে নাগমহাশয়কে দেখিতে উঠিলাম। নাগমহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া এগিয়ে আসিয়া পথে দাঁড়াইলেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে লাগিলাম। নাগ মহাশয় আমার দিকে এমন স্নেহের সহিত তাকাইলেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি তাঁহাকে আর কোথায়ও দেখি-য়াছি। আমি বড় ঘরে গেলাম, নাগমহাশয় আমার পিছনে পিছনে যাইয়া ঘরের সিঁরির পাশে দাড়াইলেন। ঠাকুরদাদা (দীনদয়াল নাগমহাশয়) বলিলেন, দুর্গা, তুমি ইহাকে চেন? এ রাজকুমারের মেজ মেয়ে। নাগমহাশয় শিশুর মত গদগদ স্বরে বলিলেন, আমিত কখন ইহাকে দেখি নাই, মেয়েটী বেশ লক্ষ্মী। এই কথা বলিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমিও তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিলাম। তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে একটা কেমন ভাব হইল, মনে হইল যেন তিনি কত দিনের চেনা, কত আপন। তিনি যে আমার পিতার বড় ভাই, তাহা ভুলিয়া গেলাম। কেবল আমার মনে হইতে লাগিল, ইঁনি কে? ইঁহাকে কোথায় দেখিয়াছি? ইঁনি যে আমার মহা আপন।

ছোট বেলায় আমার বড় ভয় ছিল। দিনে একাকী ঘরে যাইতে ভয় হইত। মা বলিয়াছিলেন, রাম নাম নিলে ভয় থাকে

না। রাত্রিতে শুইয়াছি, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকার দেখিয়া আমার ভয় হইত, তখন রাম রাম বলিতাম এবং এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। নাগমহাশয়কে দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, এইত সেই মূর্ত্তি, সেই শ্বেত জবার আভা নিয়া বুকের রং, পরণে ধুতি, গায় চাঁদর। তাঁহা হইতেও যেন সাদা জ্যোতি বাহির হইতেছে। একেই কি তবে দেখিয়াছি? ছোট সময়ে ভয়ের কথা মনে করিয়া এবং নাগমহাশয়ের জ্যোতি-র্ম্ময় মূর্ত্তি মনে পরাণ, প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনি যেখানে যাইতেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে সেই স্থানে যাইতে লাগিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জামাতা মুন্সীগঞ্জ পড়ে, বাড়ীতে তাহার কে আছে, আমি উত্তর দিতে লজ্জা পাইলাম। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে আমাব এক পিসী ছিলেন, তিনি আমার শ্বশুর বাড়ীর সকল কথা বলিলেন। নাগমহাশয় তাহা শুনিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন। সাধু দেখিলে সংসারের লোক হাত দেখায়, অদৃষ্ট গণনা করায়। আমার মন জানিত তিনি সকল জানেন, তবু আমার বাসনা হইল যদি তিনি আমার হাত দেখিতেন, বড় ভাল হয়। নিজে বলিতে লজ্জা হইল, সেই পিসীকে তাহা বলিতে বলিলাম। পিসী বলিলেন দুর্গা, খুকী তোমাকে হাত দেখিতে বলে। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তিনি হাত দেখ্‌তে জানেন না। আমি আরও লজ্জা পাইলাম, মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। প্রথম দেখাতেই, আমার উপর ভিন্নমত স্নেহ দেখিতে পাইলাম।

আমাদের সঙ্গে অনেক লোক নাগমহাশয়কে দেখিতে

গিয়াছিলেন। রাত্রিতে ৫।৬টা বিছানা হইল। ৫।৬টা মশারি টাঙ্গান হইল। এক এক বিছানায় ৫।৬ জন লোক শুইল। মশারির ভিতর মশা গিয়াছিল। সকলেরই ঘুম ভাল হয় নাই, ভোরে উঠিয়া নাগমহাশয়ের কাছে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, মা, তুমিকাল রাত্রিতে ভাল ঘুমাইতে পার নাই। আমি বলিলাম, আমার কোন কষ্ট হয় নাই, আমাদের মশারি ছিল। নাগমহাশয় বলিলেন, মশারি ছিল সত্য, তোমাকে যে মশায় কষ্ট দিয়াছে, আমি এখানে থাকিয়াই জানিয়াছিলাম। তুমি সমস্ত রাত্র হাত পা নাড়িয়াছ। আমি বলিলাম, আপনিও ত ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া ছিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন আমি জানিতাম, রাত্রে পিড়া পড়িবে না। বর্ষার সময় নাগমহাশয়ের বাড়ীতে জল উঠিত, জলে অনেক ঘরের পিড়া পড়িয়া যাইত। মণ্ডপ ঘরের বারান্দার পিড়া এমত ফাটিয়াছিল, দেখিলে মনে হইত, তাহা এখনই পড়িয়া যাইবে। নাগমহাশয় সেই বারান্দায় শোয়ার জন্য বিছানা করিলেন। সকলে তাঁহাকে তথায় শুইতে মানা করিলেন। ঠাকুর দাদা বলিলেন, দুর্গা, তুমি ভাঙ্গা পিড়ার সঙ্গে জলে পড়িয়া যাইবে, ঘরে শুইয়া থাক। নাগমহাশয় বলিলেন আমি এখানেই শুইব। এই পিড়া ভাঙ্গিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমান। তাঁহার কথার উপর কাহার কথা চলিল না। সকলেই ভাবিল, পতনোন্মুখ পিড়া মানুষের ভরে এক বারেই পড়িয়া যাইবে। নাগমহাশয়ের শরীরস্পর্শে অচেতন মাটিও যেন শান্তিবোধ করিয়া স্থির হইয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে সেই পিড়া পড়ে নাই দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, তাঁহার ইচ্ছায় এসব ফাটা মাটি মানুষের ভার বহন করিল। তিনি একাকী শুইয়া

ছিলেন। ভোর হইতে না হইতেই নাগমহাশয় মণ্ডপ ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে লোক আসিতে লাগিল। বাজারের সময় হইল। নাগমহাশয় বাজার করিতে গেলেন। আমাদের মনে হইতে লাগিল, কতক্ষণ তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। আমি কখন বাড়ীতে জল উঠিতে দেখিযা ছিলাম না। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে জল দেখিয়া মনের আনন্দে বড় ঘরের সিঁরির উপর বসিয়া, ঘটি দিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলাম। স্নান করিবার সময় আমি ভাবিতে ছিলাম, নাগমহাশয সকল কথা জানেন, আমি জল দেখিয়া স্নান করিতে বসিলাম, তিনি দেখিলে লজ্জা পাইব। অমনি তাকাইয়া দেখি, তিনি হাসিতে হাসিতে আমার পানে তাকাইয়া বলিতেছেন, বাড়ীতে ত কখন জল দেখে নাই, তাই মনেব আনন্দে ঘরের সিঁরিতে বসিয়া স্নান করিতেছে। আমি অতিশয় লজ্জা পাইয়া পুকুরে গিয়া স্নান করিলাম এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলাম। জীব কি করিয়া ভগবান্‌লাভ করিতে পারে এবং ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে কি হয়, তিনি তাহা উপদেশের ছলে বলিতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় বলিলেন, একটী মেয়ে শিশুকালে একটী শিলা পাইয়াছিল, সে তাহা পূজা করিত এবং তাহাকে শিলা পিলা বলিত। সে শিলাকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিত, এবং অন্তস্থানে থাকিয়া মনে করিলে শিলা পিলা তাহাকে দেখা দিত। মেয়েটির বিবাহের বয়স হইল। পিতা তাহার বিবাহ দিলেন। শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় পিতা মনে করিলেন, শিলা নিয়া কি করা যায়। মেয়েটী শিলা পিলা সঙ্গে নিয়ে গেল। পথে নৌকায় শিলা পিলা দেখিতে পাইয়া শ্বশুর তাহা জলে ফেলিয়া

দিলেন। মেয়েটী নৌকায় বসিয়া মনে মনে শিলাপিলাকে ডাকিতে লাগিল। শিলাপিলা আসিয়া দেখা দিলেন। বাড়ী যাইয়া সে এক নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। স্বামী তাহা জানিতে পারিয়া শিলাপিলাকে জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। মেয়েটী আবার ডাকিলে শিলপিলা আসিয়া দেখা দিলেন। সে আবার নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। কয়েকদিন এই ভাবে গেলে পর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নির্জ্জনে জঙ্গলে বসিয়া কি কর? মেয়েটী উত্তর দিল, আমি শিলাপিলার পূজা করি। স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিলাপিলা কোথায়? মেয়ে বলিল, যখন আমি তাঁহাকে ডাকি, তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দেন। স্বামী বলিল দেখাও দেখি তোমার শিলাপিলা কেমন? মেয়েটী স্বামীকে তাহা দেখাইল। স্বামীর মনে বিশ্বাস হইল, মেয়েটী দেবতা, শিলাপিলা নারায়ণ। যখন সে ডাকে, তখনই শিলাপিলা পায়। স্বামী বলিল, আমি তোমাকে পূজার ঘর করিয়া দিব। তুমি সে ঘরে বসিয়া শিলাপিলার পূজা করিবে। পূজার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া পিতাকে সমস্ত কথা বলিল। আর কোন গোলমাল হইল না। মেয়েটী শিলাপিলার পূজা করিয়া মুক্ত হইয়া গেল।

নাগমহাশয় বলিতেন, ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলে, তিনি সকল সময় সকল স্থানে দেখা দেন। মনে প্রাণে না ডাকিলে তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না। মন বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ না হইলে তাঁহার ছবি হৃদয় প্রতিফলিত হয় না। একটী সাধ্বী মেয়ে ছিল। তাহার স্বামী অতিশয় ধনী। সে কেবল ভোগবাসনায় রত ছিল। নানামত

সুখ ভোগ করিতে লাগিল। এই ভাবে দিন চলিতেছে, মেয়েটীর মনে বড় কষ্ট হইল। সে ভাবিল, স্বামী বিষয়ে একবারে আসক্ত হইয়া বিষয়ভোগেই দিন কাটাইতেছে, কত শত অত্যাচার, কত শত পাপ করিতেছে; কিছুতেই তাহার বিষয়ের নিশা কাটে না, একবারও ভগবানের কথা স্মরণ করে না। অবশেষে স্বামীকে বলিল, তুমি কি কখন ভাব, তোমার কি দুর্গতি হইবে? তুমি একবারও ভগবান্‌কে মনে কর না, বিষয়ভোগবাসনাতেই মত্ত আছ। এ জীবন কত দিনের? অনন্ত কালের তুলনায় ইহা চক্ষের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা কম। ইহা জানিয়াও কি তোমার সময় বৃথা নাশ করিতে ইচ্ছা হয়? যে সংসারে তুমি মত্ত আছ, যে বিষয় ভোগ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করিতেছ, তাহা তুমি কতদিন নিজবশে রাখিতে পারিবে? যখন তোমার শরীর অবশ হইয়া আসিবে, যখন তোমার ইন্দ্রিয় সকল আর বিষয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? তখন তোমাকে কে এই আপাতঃমধুর হলাহলপূর্ণ মায়াময়সংসার হইতে যাইবার সময় তোমার সঙ্গী হইবে? ভোগবাসনা পূর্ণ মন ত? এখন এসব ছাড়িয়া দেও। যথেষ্ট সংসার ভোগ করিয়াছ। এখন ভগবানের রাতুলচরণে মন দাও। যে মন তোমাকে পঞ্চভূতের ফাঁদে ফেলিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তর লইয়া যাইতেছে, তাহাকে তুমি তাঁহারই চরণে উৎসর্গ কর। কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট নিজকর্ম্মক্ষয়ের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া তোমার একুল ও ওকুল রক্ষা করিবেন। "তিনি বড় দয়াল, দুর্ব্বল মানব আকুল প্রাণে তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিলেন. তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন; পথ ভ্রান্ত

জীব তাঁহার মনোরম, সদাসুখপূর্ণ, অনন্তকাল স্থায়ী-পথ ভুলিয়া, আপাতমধুর, সদাবিপদসঙ্কুল, পিচ্ছল, শোকতাপপূর্ণ, পুতিগন্ধময়, অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে, যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিহ্বল হইয়া, দুই হাত তুলিয়া বলে, প্রভো, দীনদয়াল, পতিত বন্ধো, আমায় ধর, তিনি সমস্ত ভুলিয়া যান, সযতনে, আদর করিয়া বলেন, সন্তান, এস, আমি তোমারই জন্য বসিয়া আছি। বল দেখি এমন দয়াল, এমন আপন কি আর আছে? এই আপন ভুলিয়া, যাহা তোমার কেহ নয়, যাহা তোমাকে চিরকাল স্থায়ী আনন্দের বাজার হইতে দূরে নিয়া যায়, চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া, যাহা তাহা দেখিতে দেয় না, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছ?

স্বামী তাহার কথা শুনিয়া কোন কথা বলিল না। মেয়েটীও সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিল না। সে যখনই স্বামীকে দেখিত, তখনই বলিত, তুমি কি করিতেছ? ঘরে আসিয়া স্বামী একই কথা শুনিতে লাগিল। অনেক দিন এই সব কথা শুনিয়া স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল। তাহার এতকালের নেশা একদিন ছুটিল। সে ভাবিল, সত্যইত স্ত্রী যাহা বলিতেছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি এই সংসারে মত্ত আছি, একদিনও ভাবি না, ইহার পর কি হইবে, এ জীবন শেষ হইলে, এই বিষয় সম্পত্তি কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় থাকিব। যাঁহাকে পাইলে আর ছাড়াছাড়ি নাই, তাঁহাতে নিশ্চয়ই মত্ত থাকা ভাল। তৎপর স্বামী স্থির করিল, সে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে মন দিবে, এবং স্ত্রীকে বলিল, সে সংসার ছাড়িয়া ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য বনে চলিল। স্বামী বনে চলিয়া গেল। কতকদিন পরে স্বামী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ভাল হইয়াছে কি না।

মেয়েটি বলিল, এখন হয় নাই। স্বামী ভাবিল, সে সমস্ত ছাড়িল, তবুও ভাল হইতে পারিল না। সঙ্গে বিছানা ছিল, তাহাও ত্যাগ করিয়া আবার বনে গেল। কতকাল পর আবার বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, আমি ভাল হইয়াছি কি? স্ত্রী একই উত্তর দিল। স্বামী এবার অন্যান্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, একখানা ধুতি পরিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রাখিয়া বনে চলিয়া গেল। অনেক সময় পর, আবার আসিয়া, স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, বলদেখি, এবার ভাল হইয়াছি কি? মেয়েটী বলিল, না। স্বামী বলিল, দেখ, প্রথমে সকল কাজ ছাড়িযা বনে গেলাম, পরে সঙ্গে যে বিছানা ছিল, তাহাও ছাড়িলাম, অবশেষে বসন ব্যতীত সকল বস্ত্র ত্যাগ করিলাম, তাহাতেও তুমি বল, আমার কিছুই হয় নাই। এখন আমার সঙ্গে একটী রুদ্রাক্ষের মালা ও একখানা কাপড় আছে। আমি ইহাও ছাড়িলাম। সাধ্বী বলিল, তুমি ভগবানের জন্য কিছুই ছাড় নাই। তুমি বিষয় ছাড়িয়া বনে গেলে, তোমার মনে যে ভোগবাসনা ছিল, তাহা এখনও আছে। শরীরের উপরের কাপড় ত্যাগ করিলে কি হইবে? রুদ্রাক্ষের মালায় ও কাপড়ে মন ধরিয়া রাখে নাই। যেমন বিষয় ও বস্ত্রাদি ছাড়িয়াছ, সেই রকম মনের বাসনা সকল ত্যাগ কর, তবে ভগবানে মন যাইবে। মনে বাসনা থাকিতে বনে গেলে কিছু হয় না। মনের বাসনা ত্যাগ হইলে, বাড়ীতে বসিয়াই ভগবান্ লাভ হয়। তুমি বাসনা ছাড়, সমস্ত ছাড়া হইবে। সাধ্বীর কথায় স্বামী প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিল।” যখন আমি নাগমহাশয়কে প্রথম বার দেখি, তিনি আমাকে এই দুইটী উপদেশ দিয়াছিলেন।

নাগমহাশয় ভগবান্ কিনা আমি জানিতাম না। বিপদে পড়িলেই তাঁহার স্নেহ মনে পড়িত। সেই সুধামাখা হাসিমুখ মনে করিয়া যখন যে বিপদে পড়িতাম, সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। বিপদ আর কি? যখন যে বিষয়ে মনে কষ্ট পাইতাম, সে কষ্ট দূর হইয়া যাইত। আমি ছোট সময়ে মাকে বড় ভাল বাসিতাম। মা বিনা এক রাত্রও অন্য কাহার কাছে থাকিতে পারিতাম না। ৯ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। ১০ বৎসর বয়সে শ্বশ্রু মারা যান। শ্বশুরের এক পা অবশ ছিল, স্নানের জল পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে হইত। অনেক সময় শ্বশুরের সেবার জন্য স্বামীবাড়ী থাকিতে হইত। মার জন্য প্রাণ ছটফট করিত। মনে হইত কত দিনে মার কাছে যাইব। যখন আমার বয়স ১১ বৎসর, তখন আমি নাগমহাশয়কে প্রথম দেখি। নাগমহাশয়কে দেখার পর, স্বামীবাড়ী গেলে, মার জন্য প্রাণ কাঁদিত সত্য, কিন্তু নাগমহাশয়কে মনে করিলে মাতার জন্য আর সেরূপ লাগিত না। কোন বিষয়ে মনে কষ্ট হইলে, নাগমহাশয়কে মনে মনে ডাকিতাম। আমার মনে হইত যেন নাগমহাশয় আমাকে দেখিতেছেন। আমি ইহাতে অতিশয় শান্তি পাইতাম।

একটা ঘটনা মনে পড়িলে এখনও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি স্বামীবাড়ীতে আছি। একদিন অনর্থক অনেক গালাগালি শুনিলাম। ছোট ছিলাম, অনেক রকম কষ্ট হইত। সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। ঘরে একটা অত্যন্ত ধারাল দা ছিল। রান্না ঘরে যাইয়া সেই দা গলায় বসাইয়া দিব মনে করিয়া হাতে নিয়াছি, অমনি যেন কেহ বলিয়া উঠিলেন, এ কাজ করিও না। তোমাকে ভগবান্ দেখা দিবেন। বেলা দুপ্রহর, সকলে

ঘুমাইতেছে, আমি রান্না ঘর হইতে অন্য ঘরে গিয়া নাগমহাশযকে স্মরণ করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি। এখন আর কি করিব? তাঁহাকেই মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। তৎপর মনে হইল যেন নাগমহাশয বলিতে-ছেন, এ কষ্ট বেশি দিন থাকিবে না। কোন কথা কানে শুনি-লাম না, কিম্বা কাহাকেও দেখিলাম না ; হৃদয়ে এই কথা বুঝিলাম। ছায়ার মত নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম।

পূজার সময় পঞ্চসার আসিলাম। নাগমহাশয়ের দেব চরিত্র স্বামীকে বলিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইযা, নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলেন। স্বামী দেখিয়াই ভাবিলেন, ইঁনি আমাদের মত মানুষ নন। তাঁহাকে দেখিতে শিশুর মত চঞ্চল, অথচ ভিতরে যেন এক মহান্ ভাব। স্বামী প্রথমবাব নাগমহাশয়কে দেখিয়া ভগবান্ বলিয়া মনে করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসব। সংসারের কোন কথা তাঁহাকে বলি নাই। আমরা দুইজনই ছোট, তবে আমাদেব মধ্যে নাগমহাশয়ের কথা হইত। ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে আমার শ্বশুর দেহত্যাগ কবিলেন। এক বৎসয়ের মধ্যেই আমি ভয় পাইয়া নাগমহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীচবণে স্থান দিলেন। আমি সংসার ভুলিয়া গেলাম।

নাগমহাশয় আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার যে সব লীলা দেখাইয়াছেন, সেই কথা মনে পড়িলে এখনও আমার রোমাঞ্চিত হয়। মনে হয় কেমন, ভগবান্ লইয়া আমি কি খেলাই না করিয়াছি! আমি যখন ছোট ছিলাম, ভগবান্ কি জানি নাই, জীব কি

তাহাও বুঝি নাই, তখন তিনি দয়া করিযা আমাকে তাঁহাব লীলা দেখাইতে লাগিলেন। আমার বয়স ১২ বৎসর। তাঁহার লীলা দেখিয়া তাঁহার ক্ষমতা হৃদয়ে অনুভব হইল না; তাঁহার অলৌকিক গুণ বুঝিতে পারিলাম না। লীলা দেখিয়া কেবল মনে করিতাম, তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন, অতিশয় স্নেহ করেন। তাই তিনি দিনরাত সব সময় হাসিয়া হাসিয়া আমাকে দেখা দিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী, তাঁহাব স্নেহে তাঁহাতেই ভুলিয়া রহিয়াছি। এমন আশ্চর্য্যেব বিষয় একবার মনে কবি নাই, তিনি কি ভাবে দেওভোগ হইতে দিন রাত্র পঞ্চসার আসিয়া দেখা দিতেছেন। আমি এত নির্ব্বোধ ছিলাম। যখন ভয় পাইয়া ফিট্ হইতে লাগিল, যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহাকে দেখিলাম, যন্ত্রণা কমিয়া গেল, দেহ সুস্থ হইল। তিনি লুকাইয়া গেলেন। আমি নিবাময় হইয়া ভাবিতেছি, কি দেখিলাম? জ্যেঠামহাশয় আসিয়াছিলেন, না স্বপ্ন দেখিলাম? এমন সময় দেখি তিনি যেন আমার কষ্ট দেখিয়া, আমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। আমার কাছে দাঁড়াইয়া হাতখানা নাড়িয়া যেন বলিতেন, কোন ভয় নাই। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, জ্যেঠামহাশয়, আপনি বাটী কি কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছেন? তিনি মুখে শব্দ করিয়া কোন কথা বলিলেন না। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছি, তিনি কি ভাবে—জানি জানাইলেন, তিনি বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। কথার কোন শব্দ পাইলাম না। তখন আমার বিশ্বাস হইল, তিনি আমার কাছে আসিয়াছেন, ইহা স্বপ্ন নয়। শুইয়া থাকিয়া চক্ষু বুজিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার দেহ একবারে

অবশ হইয়া পড়িয়াছে। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত অনবরত ফিট্ হইয়াছিল। দিন ও রাত্রিতে একভাবেই ফিট্ লাগিয়া ছিল। আমি সজ্ঞাবস্থায় দুর্ব্বলা ছিলাম, তাহার উপর জ্ঞান হইলেই ভীষণ অন্ধকারের মত কালমূর্ত্তি দেখিতাম। সে সময় নাগমহাশয় দেখা না দিলে ভয়ে প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। দয়াময় দয়া করিয়া মাথার কাছে বসিয়া আছেন। আমার ইচ্ছা হইল উঠিয়া তাঁহাকে দেখি। উঠিব মনে করিয়া এক পাশ হইলাম। উঠিব যে এমন শক্তি ছিল না। আমি বলিশ হইতে মাথা উঠাইয়া আনিয়া পাটিতে রাখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অসুস্থদেহে, আবার চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। কতটুক সময় পরে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একটী যজ্ঞ কর। আমি বলিলাম, আপনার বাড়ীতে কি পূজা হইতেছে? আমি কি দিয়া যজ্ঞ করিব? তিনি যেন বলিলেন, ১১০টী বেল পাতা দ্বারা যজ্ঞ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তিনি কথা বলিলেন, কিন্তু তাঁহার কথার শব্দ শুনিতে পাইলাম না, কি ভাবে জানি তিনি কথা বুঝাইয়া দিয়া, আমার সামনে বসিয়া যজ্ঞ দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটী একটী করিয়া বেলপাতা যজ্ঞে দিলাম। ১.০টী পাতা দেওয়া হইয়া গেল। তিনি আমাকে ঐ যজ্ঞের ফোটা কপালে দিতে বলিলেন। আমি কপালে যজ্ঞের ফোটা দিলাম। হঠাৎ তিনি লুকাইয়া গেলেন। আমি যেন পুনর্জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিলাম।

গভীর রাত্রিতে তিনি দেখা দিয়াছিলেন। ভোর পর্য্যন্ত এই সব দেখিলাম। আমি চক্ষু মেলিয়া তাকাইলাম। বাবা ও আমার এক পিসী মলিন মুখে আমাকে নিয়া বসিয়া আছেন।

কখন কি হয় তাঁহারা জানেন না। আমাকে তাকাইতে দেখিয়া, বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন মাগো, তুমি কি তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে দেখিয়াছিলে? একবার যেন বলিল, জ্যেঠা মহাশয়, আপনি বাড়ী কি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন? কতক্ষণ পর তুমি যজ্ঞ কুণ্ডলি আঁকিয়া, হাত তুলিয়া যে ভাবে বেল পাত দেয, সে রূপ অনেকবাব হাত তুলিয়া যেন কিছু ছাড়িয়া দিয়া আবার আনিয়াছ। বাবাব কথা শুনিয়া আমার মনে হইল জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া, আমাকে দেখা দিয়া, ১১০টা বেল পাত্র দিয়া যজ্ঞ করাইযা গেলেন। তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পান নাই। আমার কি এক ভাব হইল, বাক্‌শক্তি একবারে রহিত হইল, কোন কথা বলিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু বুজিলাম. কতকক্ষণ পর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা, যজ্ঞকুণ্ডলি কোথায়?

পিতা বলিলেন, তোমার শিযরে রহিয়াছে। আমি বলিলাম—হাঁ, আমার মনে হয যেন তিনি ১১০টী বেল পাতা দ্বারা আমাকে যজ্ঞ করাইলেন।

ইহা বলিযা আমি আবার অজ্ঞান হইলাম। কতক্ষণ পর দেখিলাম, মা কাঁদিতেছেন। বাবা বলিতেছেন, তুমি কাঁদ কেন? এতদিন ঠাকুর ভাইকে সাধু বলিয়া জানিতাম, মনে করিতাম, ঠাকুব ভাইয়ের মত মহান্ লোক হয় নাই, এই সংসারে এমন সাধু নাই। আজ ও অজ্ঞান বস্থায় ঠাকুরভাইকে বলিল, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি নারায়ণ। অজ্ঞানাবস্থায় এসমস্ত কথা বলিয়াছে। ঠাকুর ভাই যখন আসিয়া উহাকে দেখা দিয়াছেন, ঠাকুর ভাই মানুষ নন্। সাক্ষাৎ নারায়ণ। মেয়েটীর কর্ম্ম ভাল ছিল, শেষ সময় নারায়ণ রূপে দেখা

দিয়া উহাকে নিয়া যাইবেন, এতো সুখের কথা। এই মেয়ের জন্ত কাঁদা শোভা পায় না। যাঁহার মেয়ে তিনি নিয়া যাইবেন। এখন হইতে জানিও ঠাকুর ভাই নারায়ণ। আমাদের উপর কি ঠাকুর ভাইয়ের দয়া হইবে! সন্তান হইয়া তাঁহাকে চিনিল, আর আমরা পড়িয়া রহিলাম। আমার এক পিসী বলিলেন, ভাই, ছোট বড় বলিয়া কিছু আসে যায় না। শিশুর উপর ঠাকুরের অধিক দয়া। লোকে বলেন, পঞ্চম বৎসরের শিশু পদ্মপলাশলোচনকে পাইল। অজ্ঞান, নির্ব্বোধ প্রাণীর উপর দুর্গার দয়া হইল। যদিও তোমাব মেয়ে হইয়া থাকে, দুর্গা ভাল করিয়া লাথি মারিয়া ফেলিয়া যাইবে। তোমাব এমেয়ে ত নারায়ণের আশ্রয় পাইল। কি করিবে? অজামিল মৃত্যুশয্যায় শুইয়া একবার নারায়ণ বলিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। সকলকেই মরিতে হইবে। দুর্গা দেখা দিয়া, উহাকে এই কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিয়া লইয়া যায়, ও মহাসুখে গেল। ৫।৬ দিন যাবত উহার কম যন্ত্রণা হইতেছে না। ও দোষ ছাড়িতে পারে না। উহাব কষ্ট দেখিতে শত্রুর বুক ফাটিয়া যায়। যে যাহার আগে যায়, সে তার মা। মনে করিও ও তোমার মা। বয়সে পিসী পিতাব অনেক বড় ছিলেন। বাবাকে বুঝাইতেছেন, আমি সমস্ত শুনিতেছি। আমার বিশেষ কিছু বোধ হইল না। আমি কেবল মনে করিতেছি, দেওভোগ গিয়া নাগমহাশয়কে দেখিব।

আমি চক্ষু মেলিলাম এবং পিতাকে বলিলাম, বাবা, এখন আমাব শরীর খুব ভাল বোধ হইতেছে, আমি দেওভোগ যাইব। জ্যেঠামহাশয়কে দেখিলে আমি সম্পূর্ণ ভাল হইব। পিতা বলিলেন তুমি হাটিয়া যাইতে পারিবে কি? আমি বলিলাম

হাঁ পারিব। আমার আর ফিট্ হইবে না। এখন দেওভোগ গেলেই বাঁচিব। আমাকে এখনই দেওভোগ লইয়া চলুন। পিতা বলিলেন, যখন তুমি অজ্ঞানাবস্থায় বলিলে, জ্যেঠা মহাশয়, আপনি কোথা হইতে আসিলেন ? যাহারা সাক্ষাতে ছিল, তাহারা মনে করিল, তুমি ঠাকুর ভাইকে দেখিয়াছ। আমার মনে হইল, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, কিম্বা রোগে প্রলাপ বকিতেছ। যখন তুমি যজ্ঞ কুণ্ডলি আঁকিয়া, লোকে সেরূপ যজ্ঞে আহুতি দেয়, সেরূপ করিলা, তখন ঐ কুণ্ডলিতে একটী পিপীলিকা গেল। তুমি তাহা না মাড়িয়া, মাটিতে হাত পাতিয়া রাখিলা। পিপীলিকাটী তোমার হাতে উঠিল। তুমি হাতখানা কুণ্ডলির বাহিরে আনিয়া পিপীলিকা ছাড়িয়া দিলা, তখন আমার প্রকৃত বিশ্বাস হইল, তুমি সত্যসত্যই ঠাকুর ভাইকে দেখিতেছ, তিনি তোমা দ্বারা যজ্ঞকুণ্ডলি করাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন, পিপীলিকা না মাড়িয়া সড়াইয়া দিলেন। ঠাকুরভাই শিশুকাল হইতেই কোন প্রাণী হত্যা করেন না, গাছে কষ্ট পাইবে বলিয়া একটী গাছের পাতাও ছিড়েন না। স্বপ্নে কথা বলা যায়, জাগ্রত অবস্থায়ও পিপীলিকা না মারিয়া সড়াইয়া দেওয়া তোমার কাজ নয়। তোমাব এত বুদ্ধি হয় নাই। এই কাজটী আমার নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে দেখাইয়া বলিলাম, ও ঠাকুর ভাইকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছে, রোগের বিকারে কিম্বা স্বপ্নে হইলে, এমন ভাবে পিপীলিকা সড়াইয়া দিতে পারিত না। তুমি ঠাকুর ভাইকে দেখিবার পর আর কিছু হয় নাই। তুমি একটু সুস্থ হও, পরে দেওভোগ যাইবে। তুমি যাঁহাকে দেখিতে দেওভোগ যাইবে, তিনিত এখানে আসিয়া তোমাকে দেখা দিতেছেন এবং ভাল করিলেন। খুব ভাল দেখাই পাইয়াছ।

আমি বলিলাম, না, এখনই যাইব। আমি ভাল হইয়াছি। এখন আমার সেই ভয় নাই। পূর্ব্বে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, এখন সে ভাব নাই। এখন আমি উঠিয়া একাকী বাহিরে যাইতে পারিব। হাঁটিলে আর অসুখ বাড়িবে না। পিতা বলিলেন, হাঁ, আজই তোমাকে নিয়া দেওভোগ যাইব এবং তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে দেখাইব। যাহারা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা আমার দিকে চাহিয়া পিতাকে বলিলেন, তাহার জ্যেঠামহাশয়কে দেখিয়াই ভাল হইয়া গিয়াছে। চক্ষু মুখ কেমন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিনের কষ্টে, উহার মুখ একেবারে কাল হইয়া গিয়াছিল, চক্ষু কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। এখন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্গার কাছে নিয়া যাও, কোন ভয় নাই। পিতা বলিলেন, যখন সে বড় ঘর হইতে বলিল মণ্ডপ ঘরে যাইবে, তখন চিন্তা করিয়াছিলাম, কি করিয়া তাহাকে তথায় লইয়া যাইব, কোলে করিয়া নিয়া আসিলেও যদি ঘরে যাওয়ার পূর্ব্বে কিছু হয়, তখন কি করিব? এখন সে চিন্তা নাই, তবে ঠাকুর ভাইয়ের বাড়ী হইতে অনেক দূরে নৌকা লাগিবে, যদিও এতদূর হাটিয়া যাইতে না পারে? পিসী বলিলেন, আমরা উহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব। ছোট মেয়ে, ও আর কত ভার হইবে? পিতা বলিলেন, কোলে করিয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। পিসী বলিলেন, ধীরে ধীরে উহাকে লইয়া যাইব। বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না। পিতা বলিলেন, তাহাই হইবে। সেরূপ নেওয়া অসম্ভব হইলে, পালকি ভাড়া করিব।

পিতা নৌকা ভাড়া করিয়া আসিলেন। তাহা শুনিয়া আমার যেন হাতীর বল হইল। মণ্ডপ ঘর নমস্কার করিয়া বলিলাম, মা

ভগবতী, জ্যেঠা মহাশয়ের যেন দেখা পাই। হাঁটিয়া নৌকায় উঠিলাম। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম জ্যেঠামহাশয়, আপনি যেন বাড়ীতে থাকেন, কোথায়ও যেন লুকাইয়া যান না। আমি যেন বাড়ীতে গিয়া আপনাকে দেখিতে পাই। নৌকা নারায়ণ-গঞ্জের নিকট লাগিল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি হাটিয়া দেওভোগ যাইতে পারিব কিনা। আমি নৌকা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাটিয়া যাইতে লাগিলাম, আশা নাগমহাশয়কে শীঘ্র দেখিতে পাইব। গিয়া দেখিলাম তিনি দক্ষিণের ঘরে অনেক লোকের সাথে বসিয়া আছেন। আমার মনে হইল, আপনি ঐ স্থান হইতে আমার কাছে আসুন, আমি আপনাকে ধরিব, পায় পড়িয়া নমস্কার করিব। মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি মনে প্রাণে তাঁহাকে দেখিতে লাগি-লাম। তিনি সামনে আসিলেন, আমি মনের আবেগে পড়িয়া গেলাম। দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে ধরিলেন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া, পিঠে হাত বুলাইলেন। তিনি আমার কষ্ট দেখিয়া বলিলেন, এমন শিশুর এমন ব্যারাম দেখি নাই। আমি সুখময়ের শ্রুতিসুখকর স্বর শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাই-লাম। তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, মাগো ভয় কি? কোন ভয় নাই। আমি বলিলাম, আপনি কাল রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে যাইয়া, দেখা দিয়া, আমার কষ্ট দূর করিয়াছেন। নাগমহাশয় বলিলেন, ক্ষেপা মা, একথা বলে না। আমি চুপ করিলাম। তিনি চুপ করিয়া, স্নেহের সহিত তাকাইয়া, আমাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আমার সকল যন্ত্রনা দূর করিয়া, সকল

ভুলাইয়া, এক তাঁহাতে ডুবাইয়া রাখিলেন। আনন্দে দুই চক্ষুর বাহির দিক হইতে আনন্দনীর গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। দয়াময় পাখা দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন। আমার পিসী তাহা দেখিয়া মাথায় হাওয়া দিতে গেলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, ও এখন খুব সুস্থ আছে, মহা আনন্দ ভোগ করিতেছে, এখন হাওয়া দেবেন না।

পিসী বলিলেন, দুর্গা, শিশু তোমাকে চিনিল, আর আমরা কি করিলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, আমি কি? আমি কি? উহাকে দেখুন। কে উহাকে এই সমস্ত শিখাইল? এখন ও সুস্থভাবে থাকুক। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই চুপ করিলেন। তিনি আমাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। সুখময়কে স্পর্শ করিয়া আমি মহা সুখে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তিনি উঠিয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া যাওয়া মাত্র আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাকাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় আমার কাছে নাই। অমনি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। তিনি কোথায়? কোন ঘরে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, দক্ষিণদিকের পথে যাইতেছি, তাঁহাকে আমার পিতার সহিত দাড়ান দেখিলাম। পিতা কি বলিতেছেন, তিনি তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া শুনিতেছেন। আমি নাগমহাশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপদ্ম দেখিতে লাগিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি গোপনে ছিলেন, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দুইটী চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে ছিল। তিনি পিতার কথার কোন উত্তর দিতেছেন না। পিতা তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া সুখী হইলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসিলেন,

এবং বলিলেন, মা, সন্ধ্যার সময় এখানে কেন? আমি বলিলাম, আপনাকে অনেক কথা বলিব, আপনাকে দেখিব। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, তুমি ঘরে যাও। আমি আসি। অনেক লোক কীর্ত্তন করিতেছিল। তিনি বোধ হয় তাহাদিগকে তামাক দিতে গেলেন। নাগমহাশয় আমাকে নিয়া যে বিছানায় বসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা শুইতেন। তিনি ঘরে আসিয়া সারদাপিসীকে বলিলেন, খুকীর জন্য একটী বিছানা করিয়া দেও। আমি ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলাম। সুখময়ের বাতাসে সুখে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিছুকাল পর নাগমহাশয় আসিয়া পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খুকী কোথায়? তিনি আমাকে বড় হইলে পরও খুকী বলিতেন।

পিসী বলিলেন, সে ঘুমাইয়া আছে। তিনি চলিয়া গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ঘর হইতে চলিয়া যাওয়া মাত্র, আমার মনে হইল, আমার হৃদয় হইতে যেন কিছু চলিয়া গেল। দেহ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি অমনি ঘরের বাহির হইলাম। যেখানে কীর্ত্তন হইতেছিল, সেই স্থানে অন্ধকারে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। নাগমহাশয় স্নেহ করিয়া, আমার হাতে ধরিয়া নিয়া আসিয়া, পিসীকে বলিলেন, রইন দিদি, আপনি কোথায়? মা অন্ধকারে কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে ধরিল। পিসী বলিলেন, কখন উঠিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাই নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে ঘরে রাখিয়া গেলেন। আমি দয়াময়ের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল,

তিনি কতক্ষণে আবার আমার কাছে আসিবেন। আমি কখন তাহাকে আমার সব কথা বলিব। এমন সময় আমাকে খাইতে ডাকা হইল।

আমি বাহির হইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, খাইতে যাইব কি? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখন খাইয়া গিয়া শুইয়া থাক, কাল সকালে কথা শুনিব। আমাব মনে হইল, তিনি কি করিয়া আমার মনের কথা জানিলেন। তাড়াতাড়ি খাইয়া আবার তাঁহার কাছে গেলাম। পলকহীন নয়নে মনের মত রূপ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু মনের তৃপ্তি হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মাগো আনন্দময়ী! এখন তুমি শুইয়া থাক, কাল সকালে উঠিবে। এমন স্নেহে, এমন মধুর ভাবে কথা বলিলেন, আমার মনে হইল তিনি যেন আমার কত আপন, সেই ভাব ব্যক্ত করা যায় না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, যাহা কিছু আছে, তিনি যেন সকলের চেয়ে আমার বেশি আপন। তিনি আমার এত আপন যে তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাতেই ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ঐ রূপ ছাড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার অমিয়মাথা হাসিতে, স্নেহমাথা কথায়, তিনি সমস্ত ভুলাইয়া আমার আপন হইলেন। আমি শুইয়া থাকিয়া কেবল তাঁহার পীযূষ কান্তি ও মধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তাঁহার কথার এমন মাহাত্ম্য যেই ভোর হইল, আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চক্ষুমেলিয়া দেখি, সামান্য অন্ধকার আছে। ভাবিতে লাগিলাম, তিনি কখন উঠিবেন। এমন সময় আমার কিভাব হইল, মনে হইতে লাগিল, সকল ঘরটী যেন তাঁহার ভাবে

পরিপূর্ণ, তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই। অন্ধকারের মধ্যে যেন সকল দিকেই তাঁহার রূপ এবং সেইরূপ হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইতেছে। যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাই। তখন তাঁহার অভাব আর আমার মনে রহিল না। মনের আনন্দে কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। কতক সময় পর হঠাৎ তিনি লুকাইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, আমি কোথায় আছি? কি দেখিলাম? কি হইল?

এখন খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। নাগমহাশয় সকালে উঠিয়া তাঁহার কাছে যাইতে বলিয়াছেন। এই স্নেহ মাখা কথা মনে করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। তিনি হাত-মুখ ধুইয়া হুঁকা ভড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আদর করিয়া বলিলেন, তুমি শীতের সময় এত ভোরে উঠিয়াছ? আমি মনে মনে বলিলাম, আপনার কাছে আসিয়াছি। তিনি হাসিতে হাসিতে মণ্ডপ ঘরে যাইয়া বসিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে যাইয়া তাঁহার সামনে বসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, কি বলিবে? এমন ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আমি কথা বলিতে একটু লজ্জা পাইলাম। তিনি সরল ভাবে হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া তাঁহাকে আমার মহা আপন বলিয়া মনে হইল। লজ্জা ভাঙ্গিল। প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়াছি, কি রকম যজ্ঞ করিয়াছি, সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া মহাভাবে মগ্ন হইয়া, আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন, মাগো, কে যজ্ঞ করাইল? আমি বলিলাম, আপনাকেইত যজ্ঞ করাইতে দেখিলাম। তাহা শুনিয়া, আদর

করিয়া আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এমন সময় অন্য লোক আসিল। তিনি তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে তামাক খাইতে লাগিলেন। আমি মনের মত রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি আমার সহিত হাসিতে হাসিতে কথা বলিতেছেন, পিতা যাইয়া বলিলেন, ঠাকুব ভাই, আজ আমার কাচারি খুলিবে, এখন বওনা হইতে চাই। এই কথা শুনিয়া, আমি অতিশয় দুঃখিতা হইলাম এবং নাগমহাশযেব দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, কয়েক দিন দেওভোগে থাকিয়া তাঁহার শান্তিপ্রদ রূপ দেখি, অমিয় মাখা কথা শুনি। এমন সুখময়কে, শান্তিময়কে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? দয়াময় মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে লইয়া দক্ষিণের ঘরে গেলেন। মুখখানা ঈষৎ মলিন করিয়া আমাকে বলিলেন, মঙ্গল বার জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে। তাঁহার কথার ভাবে আমি বুঝিলাম, দয়াময় দয়া করিয়া এই কয়েক দিন আমাকে সেখানে রাখিবেন। আমি সুখী হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

নাগমহাশয় আমাব সহিত কি বলিতেছেন, আমাকে আসিতে দিবেন কিনা, এই প্রকাব ভাবিতে ভাবিতে পিতা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি পিতাকে দেখিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, আগামী মঙ্গলবার জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে। তাহা শুনিয়া পিতা বুঝিতে পারিলেন, তিনি এই কয়েক দিনের জন্য আমাকে তথায় রাখিতে চান। পিতা নম্রভাবে বলিলেন, ঠাকুরভাই, আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহা করুন। উহাকে এখানে রাখিয়া গেলে, বাড়ীতে বড় চিন্তা করিবে। এখন নিয়া যাই, পূজার দিন আবার আসিবে। পিতার কথা শুনিয়া, আমার মনের ভাব দেখিয়া,

নাগমহাশয় ঈষৎ বিষণ্ণমুখে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, জগদ্ধাত্রী পূজার মোটে ৫ দিন বাকি আছে। যখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহাকে সত্য সত্যই ছাড়িয়া আসিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিলে কি ভাবে থাকিব, তিনি কি আবার দয়া করিয়া দেখা দিবেন, আমি কি কবিয়া তাঁহাকে মনে রাখিব, এই সব ভাবিয়া তাঁহার মুখেরপানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে ধরিলেন, গায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, মা, ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া কি এক ভাব হইল, তাঁহাকে ভগবান্ মনে করিয়া দেওভোগ হইতে চলিয়া আসিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। আসার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে কতক দূর আসিলেন এবং পিতাকে বলিলেন, ধন্য মেয়ে, এমন শিশুর এমন ভাব কোথা হইতে আসিল। পিতা বলিলেন, আপনার দয়া। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহাকে আর দেখা গেল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বাড়ী গিয়া কি করিব? দেওভোগ হইতে যতই দূরে যাইতে লাগিলাম, ততই এই কথা মনে পড়িতে লাগিল। বিবর্ণ মুখ দেখিয়া পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর অসুস্থ লাগে কি? আমি কিছু বলিলাম না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া আসায় আমার কষ্ট হইয়াছে। তিনি সান্ত্বনা দিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার জ্যেঠা মহাশয় সাধু মানুষ, কোন কাজ করেন না, কোন লোক হইতে কিছু লেন না। সময় সময় লোকজন হয়। টাকার অভাবে তাঁহার কষ্ট হয়। কোথা হইতে এত খরচ চালাইবেন? ইহা শুনিয়া মন কতক শান্ত হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, টাকার জন্য সময় সময়

তাঁহার কষ্ট হয়। আমি চিন্তা করিলাম, বাড়ীতে গিয়া তাঁহার নাম করিব। সর্ব্বদা মনে মনে তাঁহাকে ডাকিব। ৫ দিন পর আবার দেওভোগ যাইব। সকল পথ এই মত ভাবিয়া বাড়ীতে আসিলাম। সমস্ত যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। যেদিক তাকাইলাম, সেদিক যেন খালি বোধ হইতে লাগিল। তখন মনে হইল, জ্যেঠামহাশয় কোথায়?

মণ্ডপঘরে বসিয়া নাগমহাশয়কে প্রথম দেখিয়াছিলাম। মণ্ডপ ঘরটী যেন তাঁহার ভাবে পূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। মণ্ডপ ঘরের পাশে একটী তুলসী গাছ ছিল। সেই তুলসী গাছের পাতা লইয়া, অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া, কি ভাবিয়া তাঁহার পায় দিয়াছিলাম, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া ঐ তুলসী গাছ যেন তাঁহার চিহ্ন মনে হইল। কতটুক সময় মণ্ডপে দাঁড়াইয়া মার নিকট যাইয়া বলিলাম, মা, আমাকে খাইতে বলিও না। যখন ইচ্ছা হইবে, আমি খাইব। তৎপর আমি স্নান করিয়া তুলসীতলায় বসিলাম। চক্ষু বুজিয়া নাগমহাশয়ের জ্যোতির্ম্ময়রূপ দেখিতে লাগিলাম। তখন তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ দূর হইল।

প্রতিদিন এইরূপ অনেক সময় তুলসীতলা বসিয়া নাগমহাশয়কে দেখিতাম। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত সেস্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তুলসীতলায় একটী ছোট ঘর উঠান হইল। যখন ইচ্ছা তুলসী-তলায় ও মণ্ডপ ঘরে থাকিতাম। এই দুইটী স্থান যেন তাঁহার বাড়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৫ দিন এই ভাবে গেল। জগদ্ধাত্রীপূজার দিন দেওভোগ গেলাম। তথায় যাইয়া দেখি, নাগমহাশয় পথের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি যাইয়া ধরিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,

ক্ষেপা মাঁ, ভাল আছ ত? আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। শরীর অবসন্ন হইল। তিনি আমাকে কোলে করিয়া নিয়া বারান্দায় গেলেন এবং শোয়াইয়া রাখিলেন। কতটুক সময় আমার কাছে থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। পূজার বাড়ী, একা সমস্ত কাজ করিতেছেন। আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম, তিনি আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন। উঠিয়া বসিলাম। তাঁহাকে দেখিব মনে করিয়া উঠানের দিকে তাকাইয়াছি তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার সামনে দাড়াইলেন। আমি বলিলাম— আপনি এখন কোথায় যাইবেন? তিনি বলিলেন, তুমি শুইয়া থাক, আমি বাজাব হইতে আসি। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজার হইতে ফিরিয়া আসিতে আপনার কত সময় লাগিবে? তিনি বলিলেন, মা, এখনই আসিব।

নাগমহাশয় বাজার গেলেন। আমি শুইয়া রহিলাম। কতক সময় পর তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া যেখানে তিনি ছিলেন, তথায় গিয়া দাড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি স্নেহের সহিত হাসিতে লাগিলেন। হাসিব সাথে যেন জ্যোতি বাহির হইতেছে। কি জ্যোনির্ম্ময় রূপ! কতটুক সময় দেখিলে পর মনে হইল, যেন তাহার রূপ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইতেছি না। অল্প সময় এ ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া পরে দেখিলাম, তিনি হুঁকা হাতে নিয়া তামাক খাইতেছেন। একটু দাড়াইয়া অন্যলোকের হাতে হুঁকা দিতে গেলেন। তখন আমার মনে হইল, সেদিন তিনি অনেক সময় আমার কাছে ছিলেন, আজ কেবল এখানে সেখানে যাইতেছেন। কি করি? এক মনে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখিতে

লাগিলাম। পূজা হইতেছে। ঢাক বাজিতেছে। ঢাকের তালে মন বিহ্বল হইল। কি এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ যেন হৃদয় পূর্ণ করিয়া জগৎ পরিপূর্ণ করিতেছে। অবশেষে কি ভাব হইল জানি না। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখিতে পাইলাম, নাগমহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার পা ধরিব বলিয়া, তিনি তাঁহার পাদুখানি অন্য দিকে রাখিয়া হাঁটু ভর দিয়া বসিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, যদি আপনি আমাকে আপনার পা ধরিতে না দেন, রামকৃষ্ণের দোহাই। মহাভাবে তাহার চক্ষু নিমিলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, ক্ষেপা মা, ঠাকুরের দোহাই দিতে হয় না। রামকৃষ্ণ বলিয়া, ভূমিষ্ট হইয়া, তিনি নমস্কার করিলেন। আমি তাঁহার হাত হইতে একখানা হাত ছাড়াইয়া আনিয়া তাঁহার বামপদ খানা ধরিলাম। পা ধরিয়া যে কি আনন্দ পাইলাম, বলিতে পারি না। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পাদপদ্ম দেখিতে লাগিলাম। মহাভাবহেতু আনন্দনীর পড়িতে লাগিল। তাঁহার নয়ন কমলের জ্যোতিতে কি এক ভাব হইল। আর তাকাইতে পারিলাম না। জ্যোতির্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চক্ষু বুজিলাম। তিনি কোলে করিয়া নিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন।

সময় কি ভাবে গেল জানি না। সংজ্ঞা হইলে নাগমহাশয়ের চরণ খানা যেন হাতে অনুভব হইতে লাগিল। তাঁহাকে না দেখিয়া মনে হইল, তিনি কোথায় গেলেন। মনে হওয়া মাত্র তিনি আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী! আমার কেবল তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ মনে পড়িতে

লাগিল। তখনও জানি না, তিনি কে? তাহা জানিবার চেষ্টা করিবার ক্ষমতাও ছিল না। বিচাব করিতে পারিতাম না, বয়স মোটে ১২ বৎসর। কাহাকে অবতার বলে, তাহাও জানিতাম না। তবে কাহাকেও তাঁহার মত ভাল লাগিত না। ছোট সময় পিতা মাতা রাম ও দুর্গাকে ভগবান্ ও ভগবতী বলিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাদিগকে মনে মনে ডাকিতাম, নমস্কার কবিতাম। নাগমহাযের দয়ায় সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কি এক ভাব হইল, মনে লইতে লাগিল, তিনি সর্ব্বব্যাপিয়া আছেন, নাগমহাশয় বিনা অপর কিছু নাই। তাঁহাকে যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ছাড়া অন্য কোন দেবতা রহিলেন না, কোন আপনও রহিল না। পিতা, মাতা, স্বামী, কাহার কথা মনে হইত না। কেবল তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা হইত, তাঁহার কাছে থাকিতে বাসনা হইত। তিনি বিনা যেন আমার আর কিছু ছিল না। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দিকে তাকাইলাম। তাহাও যেন তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় রূপ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার দয়ায় সকল বস্তুতে তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, মা, সুস্থ হও। তখন আমি তাঁহার দিকে চাহিযা দেখিলাম, যেন সেই জ্যোতি আর নাই। অন্য সময়ে যেরূপ দেখিতাম, সেই রূপ হইয়াছেন। তিনি আমার হৃদয়ে কি এক ভাব দিলেন, তিনি বিনা আমার মনে আর কিছু রহিল না।

সারদাপিসী আসিয়া নাগমহাশয়কে বলিলেন, ঠাকুর ভাই, উহার মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ও কি এখন খাইতে যাইবে? তিনি আমাকে বলিলেন, মা, খাইয়া এস। আমি খাইতে গেলাম

সত্য, মনে যেন কি এক ভাব রহিয়া গেল। খাইতে বসিয়া মনে হইতে লাগিল, আজ নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাঁহাকে না দেখিয়া কি করিয়া থাকিব। মাকে বলিলাম, মা, আর খাইতে পারিব না, আমি উঠি। আঁ চাইয়া নাগমহাশয়ের কাছে আসিলাম। তিনি তাঁহার শান্তিময় রূপ দেখাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইল। আবার দেবীর কাছে ঢাক বাজিতে লাগিল। আমি আবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে ধরিয়া বসিলেন। আমার বাসনা, তাঁহার পা দুখানি ধরি। তিনি পাদুখানা অন্যদিকে রাখিয়া, আমার দুইখানি হাত ধরিয়া, স্নেহের সহিত বলিতেছেন, মা, তুমি আমার দিকে তাকাও। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, মা, তুমি কি চাও? আমি বলিলাম, আপনার চরণ দুখানি। একজন লোক তাহা শুনিতে পাইয়া বলিল, দুর্গা, ও তোমাকে নমস্কার করার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছে, একবারে নমস্কার করিতে দেও না। তিনি বলিলেন, আমি উহাকে কি নমস্কার করিতে দিব? এ আমাদের এই জগতের মেয়ে নয়, শাপে আসিয়া এজগতে পড়িয়াছে। সকলে মাকে নমস্কার করিতেছে, মায়ের সামনে ও আমাকে নমস্কার করিবে। মায়ের সাক্ষাতে আমি কি করিয়া উহাকে নমস্কার করিতে দিব? নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া কি এক ভাব হইল, আর কিছু জানি না। তিনি কোলে করিয়া লইয়া আমাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলেন। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সামনে পা ধরিতে দিলেন না। অন্যবার তিনি প্রতিমার সামনে ছিলেন না। তিনি ও আমি মণ্ডপ ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া

প্রতিমা দেখিতেছিলাম। ঢাকের বাদ্য শুনিয়া, জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। তখন তিনি দয়া করিয়া ধরিলেন, পা ধরিতে দিলেন না। আমিও কেবল পা ধরার জন্য রামকৃষ্ণ দেবের দোহাই দিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া মাথা লোটাইয়া পা খুঁজিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, ক্ষেপা মা, একি? আমি বলিলাম, আপনি আমাকে ক্ষেপাইতেছেন। যখন আমার মনপ্রাণ ও চরণ পাওয়াব জন্য পাগল হইল, ও চরণ বিনা আর কিছুতেই শান্ত হইবে না। তখন তিনি 'জয় বামকৃষ্ণ' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার কবিলেন। আমি দেবতা বঞ্চিত চরণ-কমল ধরিতে পারিলাম।

এখন ইহা মনে পড়িলে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ভগবান্ দয়া কবিয়া যখন জীবের মনপ্রাণ তাঁহাতে একবার ডুবাইয়া দেন, জীব তাঁহাব চরণ ধরার অধিকারী হয়। মন একচুল এদিক সেদিক থাকিলে জীব তাঁহার চরণ পায় না। তখন আমি এত নির্ব্বোধ ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল তাঁহাকে ভাল লাগিয়াছে, সকল হইতে আপন মনে হইয়াছে। তাঁহাকে চিনিতে পার নাই। তবে হৃদয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কিছু রহিল না। সর্ব্বদা ঐ রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইত। সংসারে সকলের সাথে থাকি, কথা বলি, স্নান করি, খাই, সকলই করি, কিন্তু সকল সময় সেই পবিত্র শান্তিপ্রদ রূপ মনে পড়িত। বাড়ীতে আসিব, আমার ইচ্ছা তাঁহার কাছে থাকি। তিনিও দয়া করিয়া আমাকে রাখিতে চান। পিতা ও মাতা তথায় থাকিতে দেন না। আসার সময় দয়াময় স্নেহ করিয়া, আমাকে ধরিয়া বলিলেন, কি ভয়? আগে মা ও বাপ, পরে তাহারা যেখানে

দিয়াছে, সেই সর্ব্বস্ব ধন। তাহা শুনিয়া আমার মনে হইল, প্রথমে বাবা ও মার ঘরে হইয়াছি, তাহাদের কাছেই রহিয়াছি। পরে মা ও বাবা যাহার হাতে দিয়াছেন, সংসারে সেই সর্ব্বস্ব। নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া আসিতে হইবে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, মা, সংসারে দশজনের মত থাকিবা। তাহা শুনিয়া, মন আরও আকুল হইল! আমি পঞ্চসার তুলসীতলা বসিয়া, না খাইয়া, তাঁহার নাম করি, তাঁহার রূপ দেখি, তিনি কি করিয়া জানিলেন আমি না খাইয়া থাকি? নির্ব্বোধ আমি বুঝিলাম না, যিনি পঞ্চসারে গিয়া আমাকে দেখা দিতে পারেন, আমি কখন খাই, তাহা কি তিনি দেখিতে পান না। দয়াময় দয়া করিয়া লীলা দেখাইতেছেন। আসার সময় নাগমহাশয় আমার প্রাণ আকুল দেখিয়া, স্নেহ করিয়া, আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, মাগো মা, সকলই ঠাকুরের দয়া। মা, ভগবান্ সকল স্থানে আছেন। ভাবের ঘোরে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। নৌকায় উঠিয়া তাঁহার রূপ ও গুণ মনে পড়িতে লাগিল। পিতা ও মাতাকে বলিলাম, আমি যে অসময়ে খাই, তিনি দেওভোগে বসিয়া, তাহা দেখিয়া, আমাকে সময়মত খাইতে বলিলেন। তিনি সব জানেন, সমস্ত বুঝিতে পারেন। বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার অদর্শনে যেন কেমন বোধ হইতে লাগিল, বিরক্তির সহিত মাকে বলিলাম, তোমার জন্য আমি দেওভোগে থাকিতে পারিলাম না। জ্যেঠামহাশয় আমাকে কত ভালবাসেন, কত যত্নে রাখেন। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তিনি ভালবাসেন, কিন্তু অন্য লোক বিরক্ত ভাবে। ছোট ছিলাম, মার কথা শুনিয়া মনে করিলাম,

নাগমহাশয়ের যে খরচ চালাইতে কষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া ঠাকুরদাদা বোধ হয় বিরক্ত হন; কারণ ঠাকুরদাদা পুত্রকে বড় ভালবাসেন।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, দেওভোগে বেশি দিন থাকিয়া নাগমহাশয়কে কষ্ট দিব না। মণ্ডপে ও তুলসীতলায়, যখন যেখানে ইচ্ছা হইবে, সেই স্থানে বসিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিব, সুবিধা পাইলে দেওভোগে গিয়া তাঁহাকে একবার দেখিব। তাঁহার এত দয়া—যখন আমি তুলসীতলায় চক্ষু বুজিয়া বসিয়া তাঁহাকে মনে করিয়াছি, তখনই তাঁহার দেখা পাইয়াছি। আমার মনে হইত, যেন তিনি সকলদিকে আছেন। তাঁহাকে ধরিতে পারি নাই—তিনি ধরা দিতেন না। কেন ধরিতে পারি নাই, তাহা চিন্তাও করি নাই। তাঁহাকে দেখিয়াই সুখে ছিলাম, কোন কষ্টবোধ করি নাই। কত সময় এইভাবে বসিয়া থাকিতাম। খাওয়ার সময় হইলে মনে হইত, তিনি আমাকে সময় মত খাইতে বলিয়াছেন। সময়মত না খাইয়া পূর্ব্বের মত বসিয়া থাকিলে, যদি তিনি দেখা না দেন। এই কথা ভাবিয়া, আবার নিজেই মনে করিতাম, ১০০বার তাঁহার নাম জপ করিব। ইহার বেশীও নাম করিব। তখন ১০০ পর্য্যন্ত গণিতে পারিতাম। ১০০ বার তাঁহার নাম না নিয়া খাইব না, এইরূপ ভাবিয়া তাহার নাম করিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম। তিনি আমার সামনে আসিয়া হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া মনে এমন আনন্দ হইল,—মনে মনে বলিলাম, দেওভোগে গিয়া বলিব, আপনার ১০০ বার নাম জপ না করিয়া আমি খাই না। তিনি তাহা শুনিয়া সুখী হইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া, কত আদর করিবেন। তুলসী তলায়

বসিয়া থাকিতাম, যেই খাওয়ার সময় হইত ১০০ বার নাম জপ করিয়া খাইতে যাইতাম। মনে একটা আনন্দ থাকিত। না খাইয়া, সকল দিন বসিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে যেমন দেখিতাম, তাঁহার কথানুসারে খইনাও সেই ভাবে সকল দিন এখানে সেখানে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দূরে থাকিয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনি ধরা দেন নাই। আমি এত নির্ব্বোধ ছিলাম, কখন অন্য লোক আমার কাছে থাকিলে, যেখানে তাঁহাকে দেখিতাম, সেই দিকে হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিতাম, ঐ দেখ জ্যেঠামহাশয় আসিয়াছেন। এক দিন আমার এক পিসী সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তিনি আমার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা ফেলিয়া, দৌড়াইয়া আসিলেন। সে স্থানে আমি আর নাগমহাশকে দেখিতে পাইলাম না, পিসীও দেখিতে পাইলেন না। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ঠাকুর যাহাকে দয়া করিয়া দেখা দেন, সেই দেখিতে পায়। এমন নির্ব্বোধের উপর নারায়ণের দয়া হইল। আমাদের মত পাপিনী কি দুর্গাচরণের দেখা পাইতে পারে।

একদিন দুই প্রহর বেলা কেবল মনে হইতে লাগিল, এখন যদি তিনি এখানে আসেন, কেমন সুখ হয়। যদি কেহ আসিয়া বলে, জ্যেঠা মহাশয় আসিয়াছেন, আমি দৌড়াইয়া পথে গিয়া, তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়া ইচ্ছামত দেখিব। কতক সময় বাহিরে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিয়া, যে পথ দিয়া দেওভোগ হইতে আসি, সেই পথে যাইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহাকে আসিতে দেখা যায় কি না। কি এক আনন্দ হইল, মনে হইল যেন তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। আমি দ্রুতগতিতে বাড়ী ফিরিতেছি, মনে হইতে লাগিল, তিনি আমার পিছনে আসিতেছেন।

এমন আনন্দ হইয়াছে, কিন্তু পিছনে তাকাইতে ভয় হয়, যদি তিনি চলিয়া যান। আমি ভাবিলাম, আমি একজন লোককে বলিব, জ্যেঠামহাশয় আসিয়াছেন। যদি সে তাঁহাকে আমাব পিছনে দেখিতে পায়, তবে বুঝিব তিনি সত্যই আসিয়াছেন। তিনি আর যাইতে পাবিবেন না। একটী লোক নিকটে ছিল, তাহাকে বলিলাম, জ্যেঠা মহাশয় আসিয়াছেন। সে তাঁহাকে না দেখিয়া আমাকে বলিল, জ্যেঠা মহাশয় আমাব জন্য আসিয়া বসিয়াছেন। ঠাকুর দেখিয়া এভাবে মিথ্যাকথা বলে না। তাহার কথা শুনিয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের ভাব—যদি অন্য কোন লোক বলে, দুর্গাচরণ আসিয়াছে। সমস্ত দিন সেই ভাবে দাঁডাইয়া রহিলাম, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম না। বিকাল বেলা অনেক লোক সেই পথে যাতায়াত করিতে লাগিল। কেহই বলিল না, তিনি আসিয়াছেন। আমি সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। আমার মনেব ভাব কেহ বুঝিল না। তখন আমাব বিশ্বাস হইল, কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। সন্ধ্যা হইল, তুলসীতলায় বসিলাম। সে রাত্রে প্রভু যে ভাবে দয়া কবিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে রোমাঞ্চিত হয়। এখন তাহা নিশাব স্বপন বলিয়া বোধ হয়। এই ঘটনার পর আর আমি দিনেব বেলায় চক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে যেখানে সেখানে দেখি নাই। তুলসীতলা বসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি। রাত্রে শুইলে তাঁহার দেখা পাইয়াছি।

একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় বসিয়া চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পাইলাম, যে পথে আমি নাগমহাশয়ের জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পথে তিনি এক কালীমূর্ত্তি কাঁধে করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ও কালীর রূপে পথ আলোকিত হইয়াছে। সেই আলোতে তাঁহার কাঁধে কালী দেখিয়া মনে একটু ভয় হইল। ভয় হওয়া-মাত্র তিনি তাঁহার রূপ ও আলো সংবরণ করিলেন। আমি ঘরে গিয়া পিতাকে বলিলাম, জ্যেঠামহাশয়কে দেখিলাম এক কালী কাঁধে নিয়া আসিয়াছেন। যে পথে আসিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন, আমার যে বীজমন্ত্রের ঘর, তাহা ঠাকুরভাই তোমাকে দেখাইলেন। মাগো, তোমার জ্যেঠামহাশয়কে বলিয়া উঁহা আমাকে দেখাইতে পার? আমি বলিলাম, আচ্ছা, দেখিব। পিতা আমার মনের মত উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার জ্যেঠামহাশয়কে দেখিতে পাও? আমি বলিলাম, হাঁ। এইসব কথা বলায়, মনটা যেন কিরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই সমস্ত কথা শুনিয়া, যদি জ্যেঠা-মহাশয় দেখা না দেন। কতটুক সময় পর দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন হাসিতে হাসিতে আমার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপে আমার কোন ভয় হইত না, মনে অতিশয় আনন্দ হইত—কেবল ঐ রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহার রূপ দেখিতে দেখিতে মনে হইত, এমন সুখ আর নাই, তাঁহার মত আপনার আমার আর কেহ নাই। আমি তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাই তিনি শীতের সময় রাত্রিতে আসিয়া আমাকে দেখা দেন। এইভাবে কতক দিন গেল। দেওভোগ যাইয়া তাহাকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। তাহা পিতাকে বলিলাম। পিতা বলিলেন, কেন, মা, তুমিত এখানেই তোমার জ্যেঠামহাশয়কে দেখিতে পাও। আমি সুবিধামত তোমাকে নিয়া দেওভোগ

যাইব। আমারত কাজকর্ম্ম আছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি চুপ করিলাম। স্থির করিলাম, বাড়ীর যে কোন লোক দেওভোগ যাইবে, আমি তাহার সাথে দেওভোগ যাইব।

নাগমহাশয়ের এমনই দয়া, সেইদিন দেওভোগ হইতে আমার পিসতুতো ভগ্নিকে নিতে লোক আসিয়াছিল। দেওভোগ গ্রামে তাহার বিবাহ হইযাছে। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের নিকট তাহার স্বামীর বাড়ী। আমার এক পিসাও সেই নৌকায় দেও-ভোগ যাইবেন। তাহা শুনিয়া আমি পিসীকে বলিলাম, আপনি দেওভোগ যাইবেন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব। পিসী বলিলেন, ঠাকুরভাইয়ের বাড়ী আমার জামাইবাড়ী হইতে অনেক দূর। আমি ভালরূপ পথ চিনি না। পরের জন্য কেহ সঙ্গে যাইবে না। আমি কাহাকে জোর করিয়াও বলিতে পারিব না। আমার সঙ্গে গেলে, জামাতার বাড়ীর লোক বলিবে, আজ তাহাদের বাড়ী থাকিলে সময় মত নাগমহাশয়ের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে। তখন কি করিব? যে আমার ভগ্নিকে আনিতে গিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, শীতের সময়, আজ রাত্রিতে কে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে যাইবে? নারায়ণগঞ্জ যাইতেই রাত্রি হইবে। যদি তুমি যাও, আজ আমাদের বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। জগবন্ধু বাবু ভোরের সময় নাগমহাশয়ের বাড়ী যান, তাহার সঙ্গে যাইতে পারিবে। আমি নিরাশ হইলাম। যে পিসী ছোট সময় নাগমহাশয়কে চিনিয়া ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি নারায়ণগঞ্জ হইতে জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীর পথ চিনেন? তিনি বলিলেন, আমি ও পথে দুর্গাচরণের বাড়ী কখন যাই নাই। যদি ছোট সময় কখন গিয়া থাকি, এখন

পথ মনে নাই। আমাদের কথা শুনিয়া আমার এক পিসতুতো ভাই বলিল, সে নাগমহাশয়ের বাড়ীর পথ চেনে এবং আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইতে পারে। বয়সে সে আমার অল্প বড়। পিসী উহার কথায় বিশ্বাস কবিলেন না। তিনি ভাবিলেন, নারায়ণগঞ্জ পৌছিতেই রাত্রি হইবে। ও কোন্ পথে কোথায় নিয়া শীতের মধ্যে ঘুড়াইবে। আমি তাঁহাকে এমন ভাবে ধরিলাম, তিনি আমার কথা ফেলিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দুর্গাচন্দ্রের নাম নিয়া চল। এমন ছেলে মানুষ সঙ্গী লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইতে কেবল দুর্গাব নামে সাহস হইল। পিসী দেওভোগ যাইতে স্বীকার করিলেন। আমি মাকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং তাঁহার অনুমতি পাইলাম।

মনের আনন্দে দেওভোগ যাইতে লগিলাম। আমাদের বাড়ীর মণ্ডপঘর নমস্কার করিয়া বলিলাম, দেওভোগ যাইয়া যেন নাগমহাশয়কে দেখিতে পাই। নৌকার উঠিয়া মনে হইতে লাগিল, কতক্ষণে দেওভোগ যাইব, কতক্ষণে জ্যেঠামহাশয়কে দেখিব। সন্ধ্যার সময় নাবায়ণগঞ্জ আসিলাম। পিসী বলিলেন, কোন পপে যাইবে চল। অন্ধকার রাত্রি, অচেনা পথ। আমার মনে একবারেই কোন ভয় হইল না, কেবল আনন্দ হইতে লাগিল। ভাবিলাম নাগমহাশয় এখনই আমাদিগকে নিয়া যাইবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউব মন্দির পর্য্যন্ত চেনা লোক সঙ্গে ছিল। তৎপর আমার পিসতুতোভাই এমন এক পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল, তাহা আর শেষ হয় না। অবশেষে অনেক ঘুরিয়া আমরা তাঁহার বাড়ীর কাছে গেলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম কতক্ষণে তাঁহাকে দেখিব! হঠাৎ তাঁহার বাড়ীয় সামনে এক ঝোপের

ভিতর দিয়া পথ পাইলাম। নাগমহাশয়দের বাড়ী দেখিতে পাইলাম। হিমের জন্য মণ্ডপ ঘরের বেড়া দিয়া নাগমহাশয় ও হরপ্রসন্নবাবু বসিয়া আছেন। আমি মনের আবেগে সেই ঘরে গেলাম। দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে একবারে তাঁহার কাছে নিয়া গেলেন। আমি একখানা বেড়া ধরিয়াছি, অমনি তাহা খুলিয়া গেল। আমি নাগমহাশয়ের সামনে যাইয়া বসিলাম। মনের আনন্দে মনের মত রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি কতটুক সময় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলাম। হরপ্রসন্নবাবু উঠিয়া বাহিরে গেলেন। আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, তুলসীতলা যাইয়া, চক্ষু বুজিয়ে বসিলে, আপনাকে দেখি। তাহা শুনিয়া তাঁহার দুইটি চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, মাগো, আমাকে কি দেখ? তুমি এসংসারে? আমার মনে এমন আনন্দ হইল, কোন কথা আর বলিতে পারিলাম না, কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনিও একভাবে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কতক সময় পর মনের আনন্দে তাঁহাকে বলিলাম, ভয় পাইয়া আপনাকে দেখিলাম, সেই অবধি কেবল আপনাকে মনে পড়ে এবং আপনাকে দেখি। তিনি বলিলেন, মা, তোমার ভয়ে ভূত কাঁপিবে। তুমি কাহার ভয় কর? তাঁহার মধুমাখা কথা শুনিয়া তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তিনি, বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনি আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। যাহারা আমার সাথে গিয়াছিলেন, তাহারা এখন নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলেন।

নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ও আসিয়াই আমার কাছে বসিয়াছে। পিসীমা বলিলেন, ও কি করিয়া জানিল, তুমি এই ঘরে আছ? আমি উহাকে না দেখিয়া মনে করিলাম, রাত্রে একাকী কোথায় গেল। আমরা তিন জন একত্র বাড়ীতে আসিযাছি, আমরা বড় ঘরে ঠাকুর কাকার কাছে গেলাম, ও তোমার কাছে আসিল। নাগমহাশয় বলিলেন, উহাকে কে শিখায়? পিসী বলিলেন, তোমার কাছে আসার জন্য পাগল। আমি পথ চিনি না। ঐই ছেলেকে নিয়া, তোমার বাড়ী বলিয়া রওনা হইতে সাহস পাইলাম। তিনি এই সব কথা শুনিয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু খাইয়া আসিলেন। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, মা, দুইটী খাইয়া এস। আমি খাইয়া ঘাটে আঁচাইতে যাইব, দেখিলাম, তিনি অন্ধকার রাত্রিতে শীতে ঘাটের পথে দাড়াইয়া আছেন। আমাকে স্নেহ করিয়া বলিলেন, মা, এত ঠাণ্ডা রাত্রিতে ঘাটে আসিলে কেন? ঘরেইত জল আছে। আমি বলিলাম, মা জল আনিয়াছে, সেই জলে কি করিয়া আঁচাইব, পা ধুইব? তিনি বলিলেন, জলে দোষ কি? আমি বলিলাম, না, তাঁহার আনীত জলে আমি আঁচাইতে পারিব না। যখন তিনি দেখিলেন, আমি কোন মতেই মাঠাকুরাণীর আনীত জল দ্বারা আঁচাইলাম না, দয়াময় আমার সাথে ঘাটে গিয়া দাড়াইলেন। আমি আঁচাইয়া আসিলাম। তিনি আমাকে বড় ঘরে নিয়া গেলেন। সারদা পিসী বলিলেন, খুকী কোথায় শুইবে? তিনি ঘরের মধ্যে এক বিছানা দেখাইয়া বলিলেন, মা, শীতের সময় লেপ গায় দিয়া এই বিছানায় শুইয়া থাক। আমি শুইলাম। তিনি চলিয়া আসিলেন। তখন আমার কি এক ভাব

হইল, আঁমি উঠিয়া নাগমহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি আসনের উপর বসিয়া একটা কমলা লেবু ছাড়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, এসেছ? মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, উহাকে একটা কমলা দেও। তাহা শুনিয়া আমার লজ্জা বোধ হইল। অমনি নাগমহাশয় বলিলেন, ছেলে মানুষ কত খায়। এই নেও, কমলাটী খাও। আমি তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া কমলালেবু খাইলাম দেখিয়া তিনি কত সুখী হইলেন। তিনি মাঠাকুরাণীকে আলো ধরিতে বলিলেন, আমি বড় ঘরে যাইব। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার সামনে বসিয়া রহিলাম। মাঠাকুরাণী বিরক্তির সহিত বলিলেন, তোমাকে যাইতে বলিতেছেন। আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম আমি শুইতে যাই। আলোর কোন দরকার নাই। আপনার বাড়ীতে আমার ভয় হয় না।

আমি চলিয়া আসিলাম। মনে হইতে লাগিল, তিনি আমাকে কমলালেবুটী খাওয়াইবার জন্য উঠাইয়া নিয়াছিলেন। তিনি দেখা দেওয়ার মত কি ভাবে লইয়া গেলেন? ইহা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিলে পর মনে হইতে লাগিল, নাগমহাশয় চারিদিক হইতে আসিতেছেন আবার চলিয়া যাইতেছেন। কতক সময় তাঁহাকে এই ভাবে অনুভব করিয়া, তাকাইয়া দেখি, অন্ধকার আর নাই চারিদিকেই পরিষ্কার হইয়াছে। মনে হইল, এখন তিনি নিশ্চয়ই উঠিয়াছেন। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, তিনি মণ্ডপ ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, মা উঠিয়াছ? শীতের সময় আর একটুক শুইয়া থাকিলে না কেন? আমি বলিলাম আপনাকে দেখিতে আসিলাম। তিনি

হাসিতে লাগিলেন। মণ্ডপ ঘরে যাইয়া বসিলেন। আমি পিছে পিছে গিয়া তাঁহাব কাছে বসিলাম। কতক সময় পর সকলেই তথায় গেলেন এবং তাঁহার নিকটে বসিলেন। তিনি সকলের আপন হইয়া সকলের মনের মত অমিয়মাখা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসায় এক ভগবানের ভাবই থাকিত। আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর দাদাকে (দীন-দয়ালকে) বলিলেন, এই দেখুন বাপ্ মহাশয়, উহাকে এসব কে শিখায়? চণ্ডী-মণ্ডপের নিকট একটী তুলসী গাছ লাগাইয়া ও সেখানে বসিয়া থাকে, মনে মনে আনন্দ অনুভব কবে। তাঁহার কথা শুনিয়া ঠাকুরদাদা আমাকে অনেক আদর করিয়া বলিলেন, এখানে কয়েক দিন থাকিবি? এখানে থাক্ না? দুর্গা তোকে কত ভালবাসে। ইহা শুনিযা আমার মনে হইল, আমি যে মনে করি আমি দেওভোগ থাকিলে ঠাকুরদাদা বিরক্ত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ঠাকুরদাদার কথায, আমার সেই ভুল বিশ্বাস চলিযা গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমরা বাড়ীতে যাহা বলি কিম্বা মনে করি, নাগমহাশয় সমস্ত জানিতে পারেন। এত দেখিয়াও আমি এত নির্ব্বোধ ছিলাম, তাঁহাকে চিনেতে পারিলাম না। সারদাপিসী নিকটে ছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরভাই, আমি পঞ্চসার লোকের মুখে শুনিতে পাই, এমন ছোট মানুষ কাহারও ছায়া মারায় না। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এমন শিশু সকল ঘটে ভগবান্ অনুভব করিতেছে। আমার মনে হইল, ছায়া মারাইতে গেলে, নাগ-মহাশয়ের কথা মনে হয়, তাঁহার রূপ মনে পড়ে, তাই ছায়া মারাইনা। ভগবান্ কি তাহা জানি না। তিনি আমার দিকে

তাকাইয়া হাসিলেন, আমি তাঁহার স্নেহে তাঁহাতে একবারেই ডুবিয়া গেলাম। তাঁহার রূপব্যতীত অন্য কিছু মনে রহিল না। আমার উপর তাঁহার অপরিমিত স্নেহ দেখিয়া ঠাকুরদাদা হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ছোট সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কাহার উপর দুর্গার এত মনের টান দেখি নাই। শিশু কাল হইতেই দুর্গার আপন পর ভাব নাই, কেহ তাহার আপন নাই, কেহ তার পর নাই। সকলের সাথে একই ভাব। ভগিনী, ভাগিনেয় অথবা অন্য লোকের সহিত ব্যবহারে কোন তফাৎ দেখা যায় নাই। উহার প্রতি দুর্গার ভিন্ন ব্যবহার। সারদা পিসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমাদের বংশে ছেলে ঠাকুর ভাই। ঠাকুর ভাই বংশ পবিত্র করিয়াছেন। ঠাকুরভাইয়ের দয়ায় আমাদের বংশে শ্রেষ্ঠ মেয়ে এই। নাগমহাশয় মুখ খানা ঈষৎ গম্ভীর করিয়া সকল কথা শুনিলেন। সরদাপিসীর কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, চারা গাছে বেড়া। সংসারের কোন ভাব ঢুকিবার পূর্ব্বে ভগবানের ভাব হৃদয়ে পড়িল। এমন কাহার হয়? আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। কি মধুর রূপ! কি অমৃতোপম হাসি! তাহা সমস্ত ভুলাইয়া ঐ রূপমাধুরিতে হৃদয় পূর্ণ করিল। সকলেই বাক্‌শক্তি রহিত হওয়ায় এক মনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

বাজারের সময় হইল। তিনি এক খানা নেকড়া হাতে নিয়ে বলিলেন, বাজার করিয়া আসি। আমি তাঁহার পিছনে কতটুক যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এই আমি আসি। তিনি বাজারে চলিয়া গেলেন। বাজার হইতে আসার পথে এক বাড়ী ছিল। সে বাড়ীর সমবয়সী একটী

মেয়ের সাথে খেলা করিতে চলিলাম। মনে খেয়াল রহিল, তিনি কতক্ষণে আসিবেন, খেলা শেষ না হইতেই নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইয়া খেলা ফেলিয়া উঠিলাম। মেয়েটি বলিল খেলা আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া যাও কেন? কে কাহার কথা শোনে। আমি নাগমহাশয়ের কাছে চলিয়া আসিলাম। তিনি বাজারের জিনিষ রান্নাঘরে রাখিয়া, স্নেহ করিয়া আমাকে নিয়া মণ্ডপ ঘরে বসিলেন। তখন অন্য লোক তথায় ছিল না। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অন্য বাড়ীতে বেড়াইতে যাও? আমি বলিলাম, সময় সময় যাই। আপনি কি অন্য বাড়ী যাইতে মানা করেন? তিনি বলিলেন, দরকার কি? আবার হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে যে দেখ, এই কথা পিতা মাতাকে বলিয়াছ কি? আমার মনে ভয় হইল। আমার মনে হইল, পিতা মাতার কাছে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহা শুনিলে, যদি তিনি আর দেখা না দেন। আমি বলিলাম, না। তিনি জোরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিতে আমার জ্ঞান হইল। যিনি এখানে বসিয়া পঞ্চসারে যাইয়া দেখা দিতে পারেন, তিনি কি আর মনের কথা জানিতে পারেন না? তিনি সব জানিতে পারেন। আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, লজ্জায় ও ভয়ে অধোবদন হইয়া রহিলাম। আমার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আর বলিও না। তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া মনে করিলাম, তিনি কাহার উপর রাগ করেন না। মিথ্যাকথা বলা সত্বেও তিনি আমার উপর রাগ করেন নাই। বোধ হয় তিনি আর দেখা দিবেন না। তিনি বলিলেন, মা, ভয় কি? ভগবান্ দয়াবান্।

ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। তিনি গুণ দেখিয়া গ্রহণ করেন না, আবার দোষ দেখিয়া ফেলিয়া দেন না। তাঁহার অভয় বাণী শুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি ভগবান্। তিনি দয়াবান্। তিনি সকল স্থানেই আছেন। যেখানে তাঁহাকে দেখিতে চহিব, সেই স্থানে তিনি দেখা দিবেন। তখনও আমি জানি না, অবতার কাহাকে বলে। তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, তিনি ভগবান্।

এমন দয়া কে কোথায় দেখিয়াছে অথবা শুনিয়াছে? মুনি ঋষি কত যুগযুগান্তর কত কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবানের দর্শন পায় না, আর আমি ভগবানের জন্য তপস্যা দূরে থাকুক, তাঁহাকে জানি না, তাঁহার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিলাম, তিনি নিজগুণে আমাকে তাঁহার লীলা দেখাইতে লাগিলেন। ইহাকে বলে নিজগুণে দয়া এবং ইহাই প্রকৃত জীব উদ্ধার। নরদেহ ধারণ করিয়া এমন দয়া, এমন অধমতারণ বাসনা কোথায়ও দেখা যায় না। শুনিয়াছি, ভগবানের দয়া হইলে, বোবা কথা বলে, অন্ধে চক্ষে দেখে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আমার উপর তাঁহার দয়া দেখিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করি, এই সব সত্যসত্যই হইয়া থাকে। তাঁহার দায়ায় লোকের মুখে শ্রুত ঘটনা সত্য বলিয়া প্রতীত হইল। এমন দয়া আর কাহারও হয় না। তিনি নির্ব্বোধ জীবকে লীলা দেখাইয়াছেন, গণ্ডমূর্খকে তাঁহার সত্তা অনুভব করাইতেছেন, অথচ সে তাঁহার লীলা দেখিয়াও, তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া, তাঁহার কাছে মিথ্যা কথা বলিল, তিনি হাসি মুখে সমস্ত অবহেলা সহ্য করিলেন। তিনি অবোধকে তাঁহার ভাব বুঝাইয়া শ্রীচরণে স্থান দিলেন, এবং তাঁহার লীলা দেখাইতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সমভাবে লীলা দেখাইয়াছেন। মিথ্যা কথা বলবার পর, তিনি হৃদয়ে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ভগবান্। তিনি সমস্ত অবস্থায় সমভাবে সকল দেখিতেছেন, সমুদয় জানিতেছেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা দেখিয়া, আমার মনে কি এক ভাব হইল। মিথ্যা কথা শুনিয়া তিনি যে অট্টহাস্য করিলেন, তাহা বার বার আমার মনে হইতে লাগিল। প্রাণে একটু ভয় হইল, তাঁহার সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বলিলাম। মনের ভাব জানিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কি যেন একটা কথা বলিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার ধারণা হইল, তিনি দোষ গ্রহণ করেন নাই, আমার কোন পাপ হয় নাই। তখন সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল। তাঁহার স্নেহমাখা রূপ মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। স্নানের সময় হইল। তিনি বলিলেন, মা, স্নান করিয়া এস। আমি স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি পাদুখানা ঝুলাইয়া মণ্ডপ ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। নমস্কার করিব মনে করিয়া পাদুইখানার নিকটে উঠানে বসিলাম। আমাকে মাটিতে বসিতে দেখিয়া, আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় আমার এক পিসতুতো ভাই হাত জোর করিয়া আমাকে বলিল, নমস্কার কর। অমনি তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমার মনে কষ্ট হইল। উহার জন্য আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতে পারিলাম না। আমার মনে কষ্ট হওয়া মাত্র তিনি এমন ভাবে আদর করিলেন, আমি একবারে গলিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, দুর্গা প্রতিমার ডান ধারে দাঁড় করাইলে লক্ষ্মীর মত দেখা যায়। তাঁহার কথা শুনিয়া, যাহারা সেস্থানে ছিলেন, তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

তিনি আমার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। নমস্কার করা আর হইল না। নাগমহাশয়কে হাসিতে দেখিয়া, আমি লজ্জায় অধোমুখী হইলাম। তৎপর তিনি আমাকে খাইতে যাইতে বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কখন খাইবেন? তিনি রান্নাঘরে যাইয়া খাইতে বসিলেন। আমি বড় ঘরে খাইতে গেলাম।

কোন সময় ঠাকুর দাদা বলিয়াছিলেন, দুর্গার সুখ ও দুঃখ বোধ নাই। দুর্গা কেরাসিন তৈল খাইয়া থাকিতে পারে। সে কথা আমার মনে হইল। তাড়াতাড়ি খাইয়া গিয়া তাঁহার খাওয়া দেখিতে বসিলাম। তিনি কি ভাবে খান, কি খান, অথবা না খাইয়া উঠিয়া আসেন, এই সমস্ত ভাবিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। খাওয়ার সকল জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সামান্য খাইয়াছেন। মিষ্টান্নের বাটিতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন আছে, তিনি সামান্য মিষ্টান্ন ভাতের থালাতে লইয়া, এক মুঠ ভাত মিশাইয়া খাইতেছেন দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল। মনে হইল, যদি মাঠাকুরাণী সাক্ষাতে বসিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিতেন, তবে বোধ হয় সুধু মিষ্টান্ন খাইতেন। আমার মনে এই কথা হওয়া মাত্র তিনি বলিলেন, না, আমি এই খাই। এমন সময় মাঠাকুরাণী স্নান করিয়া আসিলেন। নাগমহাশয় আঁচাইতে গেলেন। মাঠাকুরাণী তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, এই রকমই তিনি খাইয়া থাকেন। ঠাকুর দাদা যথার্থ বলিয়াছেন দুর্গার সুখ ও দুঃখ নাই। সে কেরাসিন তৈল খাইয়া থাকিতে পারে। তিনি আঁচাইয়া আসিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে বসিলাম। তাঁহার কি এক রূপ দেখিলাম।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপে হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় শরীর অবশ হইয়া পড়িয়া গেল। দেহ পড়িয়া যাওবার সময় তিনি তাহা ধরিয়া রাখিলেন। তৎপর কে শোয়াইয়া রাখিল জানি না। সংজ্ঞা হইলে দেখিলাম বড ঘবের সমস্ত দরজা বন্ধ। আমি একাকী শুইয়া আছি। চক্ষু মেলিয়া, নাগমহাশয়কে না দেখিয়া, মনে করিলাম, তিনি মণ্ডপ ঘবে বসিয়া আছেন। এই কথা মনে হওয়া মাত্র দরজা নড়িয়া উঠিল। তিনি আমার কাছে আসিযাছেন। আমর দিকে চাহিয়া, মাগো বলিযা সামনে বসিয়া, তিনি আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইলেন, এবং কতটুক সময় বসিয়া রহিলেন। তৎপর অতিথিদিগকে তামাক দিতে গেলেন।

আমাব মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া আমাকে কি এক আনন্দ সাগবে রাখিয়া গেলেন। কেবল তাঁহার মুক্তি প্রদাতা-রূপ দেখিতে লাগিলাম। তিনি যে অনন্ত সুখপ্রদ হাত দ্বারা জীবকে ধরিয়া রাখেন, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ হাত আমাব অনুভব হইতে লাগিল। কি দয়া। কি স্নেহ! এমন অপাত্রে এমন দয়া কে কোথায় দেখিয়াছে? যাহাকে জানি না, যাঁহাকে ভক্তি করি না, যাঁহাতে বিশ্বাস হয় নাই, এবং সহজ মানুষ মনে করিয়া যাঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলিলাম, তিনি মিথ্যা কথা জনিত দোষ কিম্বা পাপ না ধরিয়া, দয়া করিয়া নিজ পরিচয় দিলেন। আমি এত নির্ব্বোধ ছিলাম, তাহার এত দয়া সত্ত্বেও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম না। আসার সময় তাঁহাকে নমস্কার করতে গেলাম। তিনি স্নেহের সহিত বলিলেন, আমরা তোমাকে নমস্কার দেওয়ার যোগ্য নই। ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মিয়া ছিলেন, হিমালয় ভগবতীকে নমস্কার করিয়া ছিলেন।

তাঁহার ঈদৃশ আদরে আমার মনে হইল, আপনি ভগবান্। আমি আপনাকে নমস্কার করিব। আমি ভগবতী মেয়ে না। তিনি বলিলেন, শিশুকালে এমন ভাব কাহার হয়? একি মানুষ? এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, আমি দেবী। দেবী ও মানুষে কত তফাৎ, তাহা আমি জানিতাম না। আমার মনে অহঙ্কার হইল, আমি নাগমহাশয়ের পানে তাকাইলাম। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও আদর করিলেন। কোন অবতার কি এমন জানিয়া শুনিয়া জীবের অহঙ্কার সহ্য করিয়াছেন? তিনি চিরকাল অহঙ্কার হওয়া মাত্র জীবকে সাজা দিয়াছেন। সাজা দেওয়া দূরের কথা, নাগমহাশয় কত আদর করিয়া কত লীলা দেখাইলেন।

একদিন আমার মনে হইয়াছিল, কি করিয়া তাঁহার প্রসাদ পাওয়া যায়। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। তিনি মনের ভাব জানিয়া একটী হরিতকি মুখে দিলেন, তাহা অল্প খাইয়া আমার সম্মুখে ফেলিলেন। আমি মনের আনন্দে হরিতকি প্রসাদ বলিয়া চুষিতে লাগিলাম, এবং তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আবার একটী হরিতকি খাইয়া ফেলিলেন, আমি আবার মনের আনন্দে প্রসাদ খাইলাম। সেদিন আমার উপরে তাঁহার এত দয়া হইল, তিনি চারিটী হরিতকি খাইয়া আমার সামনে ফেলিলেন। যখন আমি হরিতকি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম, তিনি দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে ছিলেন। একে মহাপ্রসাদ খাইতেছি, তাহার উপর তিনি সস্নেহে আমাকে দেখিতেছেন, আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সংজ্ঞা হারাইলাম। জ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে

পাইলাম, দয়াময় আমার সাক্ষাতে বসিয়া আছেন। আমি শুইয়া আছি।

বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলিলাম মা, জ্যেঠামহাশয়কে কেহ দেখিতে পায় না, অথচ তিনি সকল স্থানে আছেন। আমরা যাহা করি, তাহা তিনি দেখিতে পান, আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শুনিতে পান। মা কি বুঝিলেন, আমি জানি না। মা আমাকে বলিলেন, তিনি তোমাকে ধরিয়াছেন, তিনি তোমার সব জানেন। পিতা মধ্যে মধ্যেই হাসিতে হাসিতে কহিতেন, তোমার জ্যেঠামহাশয়ের কথা এখন আর বলিও না। আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। জ্যেঠামহাশয়ের কাছে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তাহা পিতার নিকট বলি নাই। নাগমহাশয় তাঁহার কথা অন্যের নিকট বলিতে মানা করিয়াছেন, তাহাও বলি নাই। তখন আমার বয়স ১২ বৎসর। মোটেই বুদ্ধি ছিল না। আমার কেবল নাগমহাশয়ের কথা শুনিতে, তাঁহার কথা বলিতে, তাঁহাকে দেখিতে ভাল লাগিত। অন্য কথা বলিতে কিম্বা শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইত না। যখন লোকের সাথে কথা বলিতাম, তাহাদিগকে বলিতাম, তিনি ভগবান্। তিনি সকল স্থানে আছেন। তাহা শুনিয়া, কোন কোন লোক বলিত, মানুষ কি ভগবান্‌কে দেখিতে পায়? আমি বলিতাম, মানুষ কি মনের কথা জানিতে পারে? সে কি এস্থানে বসিয়া থাকিয়া অন্যস্থানে যাইয়া দেখা দিতে পারে? তিনি যে আমাকে দেখা দেন, মূর্খ লোকে তাহা বিশ্বাস করিত। তিনি যে সমস্ত জানিতে পারেন, তিনি যে সকল করিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিত না তিনি যে এমন ভগবান্ তাহা তাহাদের প্রত্যয় হইত না। আমাকে যে তিনি দেখা দিতেন,

ইহা বিশ্বাস গেল কেন? কারণ আমার ভয়ে ফিট্ হইত, এক সময় দম বন্ধ হইয়া আমি মরিতে বসিয়াছিলাম। দেওভোগে না গিয়া, মণ্ডপ ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া, সকলের কাছে বলিলাম, জ্যেঠামহাশয় আসিয়াছেন। ভয় ও রোগ উভয় চলিয়া গেল। লোক ভাবিল, এমন ভয়, এমন অসুখ বিনা ঔষধে একরাত্রিতে কি করিয়া সারিল। কত ওঝা, কত জলপড়া, কত মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়া, কিছুতেই কিছু হইল না। দিনের দিন ভয় ও রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাগমহাশয়কে দেখিয়া একরাত্রিতে একবারে ভাল হইয়া গেলাম। তিনি দেখা দিয়া এমন করিয়া গেলেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। তখন আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র সকলেই বিশ্বাস গেল, তিনি দেখা দিয়া আমাকে ভাল করিলেন, নচেৎ ঔষধ বিনা একরাত্রিতে এভাবে ভাল হইতে পারিতাম না। কিন্তু কাহার মনে বিচার আসিল না, যিনি দেখা দিয়া একরাত্রির মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত লোকের দেহ সুস্থ ও শান্তিময় মন করিলেন, তিনি কে? অন্য পরের কথায় কি, আমিও বুঝিলাম না, তিনি কি? তবে আমি তখন ছোট ছিলাম। আমার শুদ্ধ বুদ্ধি ছিল না।

সময়ে কোন কোন বৃদ্ধ লোক বলিত, নাগমহাশয় নারায়ণ। কেহ বলিত, তিনি দেবতা। কেহ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিত। আবার কেহ বলিত, এমন সাধু, এমন মহাত্মা হয় না। যে নাগমহাশয়কে নারায়ণ বলিত, তাহাকে আমার নিকট ভাল লাগিত। তবে তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া মনে যে ভাব হইত, কাহার সাথে সে ভাবে কথা বলিয়া সুখ পাই নাই। কয়েক দিন অনেক কথা বলিয়াছি। তৎপর কাহার সাথে বেশী কথা বলিতে

ইচ্ছা হইত না। কাহার সহিত কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতাম না। আমার পিতা কখন কখন হাসিতে হাসিতে নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ বলিতেন। তাহা শুনিয়া আমি মনে করিতাম, ভগবান্‌কে বোধ হয় মহাপুরুষ বলে। এ কথায় ভাল বোধ হইত না। একদিন রাত্রিতে কথায় কথায় স্বামীকে বলিলাম, পিতা নাগমহাশযকে মহাপুরুষ বলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের কথা আমি বুঝিতে পাবি না। নাগমহাশয় ভগবান্। তাঁহাকে ভগবান্ বল। ভগবান্ ব্যতিত কেহ জীবকে দেখা দিতে পা.বন না। যখন নাগমহাশয় তোমাকে দেখা দেন, তোমার পিতা সেইস্থানে ছিলেন। তিনি সমস্ত দেখিলেন, সকল কথা শুনিলেন, তোমাকে এমন অসুখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুস্থ হইতে দেখিলেন, তথাপি যদি তিনি নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ বলেন, অদৃষ্ট সকলেব চেয়ে বলবান্ বলিয়া মনে কবিব। আমি এক দিন নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি, আমার মনে হইল, তিনি এখন এখানে বসিয়া আমার সাথে কথা কহিতেছেন, পঞ্চসার যাইয়া তাহাকে দেখা দিতেছেন। তখন তিনি হাসিয়া হাসিয়া আমার সাথে কত কথা বলিলেন। বলদেখি, ভগবান্ বিনা কেহ কি এমন করিতে পারেন? সাধু কিম্বা মহাপুরুষ কোন মতেই তাহা করিতে পাবে না। স্বামীর কথা শুনিয়া আমার মনে অতিশয় সুখ হইল। নাগমহাশয় দয়া করিয়া তাঁহাকে যেমন বুঝাইয়া ছিলেন, স্বামী সেইরূপ তাঁহার বিষয় বলিলেন। স্বামী ব্যতীত অন্য কাহার মুখে নাগমহাশয়ের বিষয়ে এমন সুন্দর কথা শুনি নাই। সে সময় আমি ছোট ছিলাম, লজ্জা হওয়ায় আর বেশি কিছু বলিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। আমি চিন্তা করিতে

লাগিলাম, নাগমহাশয়ের বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি জোড়া কেন! স্বামীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি। অনেক সময় চুপ করিয়াছিলাম। তিনি ঘুমাইযাছেন কিনা জানি না। তাহার সহিত কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে, অথচ মনে এমত আনন্দ হইয়াছে। স্বামী প্রথমবার নাগমহাশয়কে দেখিয়াই বলিয়া ছিলেন, ইঁনি আমাদের মত লোক নন। যখন স্বামী তাঁহাকে ভগবান বলিয়া আমাকে বুঝাইলেন, কনিষ্ঠ আঙ্গুলীর কথা অবশ্যই বলিতে পারিবেন। মনের আবেগে পাশ্ ফিরিলাম। স্বামী ঘুমান নাই জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নাগমহাশয়ের পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী জোড়া কেন? স্বামী বলিলেন, তাঁহার দয়া। তিনি ভগবান্, তাই যখন তিনি চলিয়া যাইবেন, যদি আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, সেই জন্য তিনি একটী অঙ্গুলি বেশি নিযা আসিযাছেন। সমস্ত ভুলিযা গেলেও অঙ্গুলিটী মনে থাকিবে। স্বামীর ভক্তি-পূর্ণকথা শুনিযা মনে এমন সুখ হইল যে, লজ্জা ত্যাগ করিযা নাগমহাশয়ের বিষয় অনেক কথা বলিলাম, অনেক কথা শুনিলাম। আমি স্বামীকে বলিলাম, আমরা অনেকেই এই বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা করিয়াছি, কেহই তাঁহার পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির এমত ব্যাখ্যা করিতে পারি নাই। তাঁহার ভক্ত, তাই ঠিক বুঝিয়াছ। আমার মনে কষ্ট হইল, তিনি চলিয়া গেলেও আমরা এই সংসারে থাকিব। স্বামী চুপ করিলেন। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, স্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী জোড়া হওয়ায় সকলেই একবার তাঁহার কথা মনে করে, তাঁহার বিষয় আলোচনা করে। আমাদের মত হইলে, কেহ আর

তাঁহার পায়ের অঙ্গুলির কথা এত বলিত না। যাহা হউক তিনি চলিয়া গেলে আমি এজগতে থাকিব না। আমি যে ভাবেই হউক প্রাণ দিব। আর, তিনি কি আমাদিগকে ছাড়িবেন ?

এই সমস্ত কথা অতিশয় গোপনীয়। আমি অতিশয় ছোট ছিলাম, আমার কোন গুণ ছিল না যে নাগমহাশয়কে লাভ করিতে পারি, কিম্বা তাঁহার দয়া পাইতে পারি। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার অহেতুক দয়া। সেই দয়া বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা লিখিলাম। জগৎ দেখুন, তাঁহার কত ক্ষমতা ছিল। সাধু কি মহাপুরুষে ঈদৃশ শক্তির বিকাশ পায় না, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

---

# দেশে অবস্থান।

ছোট সময় যখন আমি আত্মহত্যা করিতে ছিলাম, নাগ মহাশয় রক্ষা করিযাছিলেন। তিনি নিজগুণে আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি ভগবান্, তিনি সকল স্থানে আছেন। মনে কবিতাম আমি তাঁহাকে কখন হারাইব না। হা কর্ম্মভোগ! যে মন তাঁহাতে এমন বাঁধাছিল, আজ সে মন তাঁহা হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে পড়িল। আমার উপর তাঁহার অসীম দয়া ছিল, তাই তিনি পিছনে থাকিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভুলিলাম সত্য, তিনি আমাকে ছাড়িলেন না। সংসারে জড়িত হইবার পূর্ব্বে দয়াময় দয়া করিয়া অনেক সময় বলিয়াছেন,' দেহ থাকিলে ভোগ আছে। আমি তাঁহার স্নেহে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার পতনের কারণ মনে হইলে কষ্টে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চায়। কি করি? উপায় নাই, ভুগিতেই হইবে। বিনা দোষে আমার দণ্ড হইল। মনে করিয়া ছিলাম একথা প্রকাশ করিব না, মনের দুঃখ আর চাপিতে পারিলাম না! মনে হয়, হায়, হায় কাহাকে লইয়া কি খেলা করিলাম। এই নির্ব্বোধকে এত দয়া করিয়া, এমত লীলা দেখাইয়া, এত স্নেহ করিয়া এ ভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিলেন। যিনি আমাকে সমস্ত অবস্থায় দেখা দিতেন, যিনি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে থাকিতেন, তিনি লুকাইয়া রহিলেন, এ হৃদয়ে সয়তানে বাসা করিল। কেন এমন হইল?

আমি এমত নির্ব্বোধ ছিলাম, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। যখন আমি ছোট ছিলাম—ছোট কি বড় চিন্তার বিষয় নয়—নাগমহাশয় কি ছিলেন, আমি তাহা জানিতাম না। নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছি। দেওভোগ যাইয়া মা ঠাকুরাণীর বিব দৃষ্টিতে পড়িলাম। কারণ কিছু বুঝিতে পারি নাই। মা ঠাকুরাণী সময় সময় নাগমহাশয়কে রাগিয়া বলিয়াছেন, যে আমার আত্মীয় ভালবাসে না, তাঁহার আত্মীয়ও আমি ভাল বাসিব না। তাহা শুনিয়া সুখময় হইয়াও মুখখানা ঈষৎ মলিন করিয়া বলিয়াছেন, ও তোমার কোন ক্ষতি করে নাই। তাহাতে মা ঠাকুরাণী আরও বাগিযা বলিয়াছেন, যতদিন আপনি আছেন ততদিন একভাবে যাইবে, পরে সকল ভূত একত্র হইয়া আমাকে মারিবে। তিনি বলিয়াছেন, যদি তোমার মনে হয়, তোমাকে ভূতে মাবিবে, কে ধরিতে পারে? বনেব ভূতে মারে না, মনের ভূতে মারে।

সুখময় হইয়াও এইরূপ কথা শুনিয়া নাগমহাশয় বিষণ্ণ মুখে চোরের মত বসিয়া রহিয়াছেন। আমি নাগমহাশয়ের কাছে থাকিয়া এই সমস্ত কথা শুনিয়া, মলিন মুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মা-ঠাকুরাণী আবাব বলিয়াছেন, ইহারা কেবল দেখিয়াই সুখী। যাহাকে দেখিতে আসে তাহার সুখের দিকে চায় না। চক্ষে দেখে উনি সময় মত খান না, সময় মত শোন না, লোকের জন্য কত খাটিতে হয়। একটী মানুষ কি বহুরূপী হয় যে তাহাকে বার বার দেখিতে হইবে। স্বাধীন হইয়াও তখন তিনি পরাধীনের মত বলিয়াছেন, তাহা তুমি কি বুঝিবা;

যাহার চক্ষু আছে, সে আমাকে বহুরূপীই দেখে। সুখময় হইয়াও আমার জন্য মুখপদ্ম মলিন করিয়া মা ঠাকুরাণীর সাথে এ ভাবে কত কথাই না বলিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। মা ঠাকুরাণীর কোন কথা আমার মনে লাগে নাই। নাগমহাশয়ের জন্য কষ্টও হয় নাই। যতটুকু সময় তাঁহার মুখমলিন দেখিয়াছি, ততক্ষণ মুখ কাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। সুখময় বেশী সময় মুখ মলিন কবিয়া থাকিতেন না। তাঁহার হাসি দেখিলেই আমি সমস্ত ভুলিযা গিয়াছি। আমি কয়েকদিন দেওভোগ গেলে পর মা ঠাকুরাণী এ ভাবে নাগমহাশয়কে কর্কশ কথা বলিয়া আমাকে শুনাইয়াছেন। ইচ্ছা আমি আর তথায় না যাই।

আমি দেওভোগ গেলে, নাগমহাশয় সময় মত খান না, সময় মত শোন না, আমার জন্য তাঁহাকে খাটিতে হয়। যখন তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার কষ্ট দেখিয়া আর যাইব না। কয়েক দিন এই ভাবে ঝগড়া করিয়া যখন মাঠাকুরাণী দেখিলেন, আমি যাওয়া বন্ধ করিলাম না, একদিন মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের অসাক্ষাতে আমাকে বলিলেন, তিনি তোমাকে সামনে এত আদর করেন, ভালবাসেন, অসাক্ষাতে তোমাকে কত মন্দ বলেন। তাহা শুনিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আমি ভাবিলাম, যখন তিনি অসাক্ষাতে আমার নিন্দা করেন, তিনি বোধ হয় আর আমাকে দেখা দিবেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি করিলে আমি ভাল হইতে পারি। নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ীতে আসিলে, তাঁহাকে দেখা মাত্র তাঁহার স্নেহে সব ভুলিয়া

গেলাম। এমন আশ্চর্য্যের বিষয়, মনে একথার একটু দাগ পর্য্যন্ত রহিল না।

পঞ্চসার আসিয়া সময় সময় এই কথা মনে পড়িত। দেওভোগ গেলে নাগমহাশয় বাজারে গেলেই মাঠাকুরাণী আমাকে এই কথা বলিতেন। আমিও নাগমহাশয়কে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতাম। তাঁহার স্নেহে তাঁহাকে দেখিলেই সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। নাগমহাশয়ের অসাক্ষাতে মাঠাকুরাণীর কথায় মনে কষ্ট পাইয়াছি, বাজার হইতে আসিয়া তিনি আমাকে অতিশয় যত্ন করিতেন, স্নেহ করিয়া ভগবানের কথা বলিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেন, মানুষকে বিশ্বাস করিও না। আমি নির্ব্বোধ ছিলাম, তখন কিছুই বুঝিতাম না। তাঁহার আদরে তাঁহাকে দেখিয়াই সুখী হইতাম। মাঠাকুরাণী এই কথা বলিয়াও যখন দেখিলেন, আমি দেওভোগ যাওয়া বন্ধ করিলাম না, তিনি অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। কি করিয়া দেওভোগ না যাইয়া পারি? এমন মনের মত আরাধ্য দেবতা পাইয়া, কেহ কি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার স্নেহে বশীভূতা হইয়া অনেক দিন তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারি নাই। একমাস হইলেই মন অস্থির হইয়া উঠিত। এবং তাঁহাকে না দেখিবই বা কেন? তখন আমার বয়স কম ছিল। কখন কখন আমার মনে হইত, যদি ধলেশ্বরী নদী শুকাইয়া যাইত, হাটিয়া দেওভোগে যাইতে পারিতাম, রোজ তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারিতাম। নৌকায় যাইতে হয় বলিয়া একমাসে একবার যাই। এখন কি করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আছি? অবশেষে মাঠাকুরাণী আমাকে

শাপ দিতে লাগিলেন। তুই একবার অভিসম্পাদ দিয়া আমার বড় কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি আমার সাথে কথা বলা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি নাগমহাশয়ের সাক্ষাতে থাকিতাম। দূর হইতে আমার নজর পড়িলেই দেখিতাম, মাঠাকুরাণী দাঁত কড়মড় করিয়া কি জানি বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া ফেলিতেন। তখন আমাব মনে হইয়াছে, তিনি যে এভাবে দাঁত কড়মড় করিয়া, অকাবণ আমাকে গালি দিতেছেন, নাগমহাশয় তাহা দেখিলে তাঁহাকে বকিবেন। মাঠাকুবাণী দাঁত কড়মড় করিয়াছেন, আব আমি নাগমহাশযের দিকে তাকাইয়া অনন্তসুখ পাইয়াছি। তাঁহাব গালি আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারে নাই। যখন তাঁহাকে ভুলিযা সংসারে মজিলাম, তাঁহাব শাপ হাড়ে হাড়ে অনুভব হইতে লাগিল। তাঁহার কাছে থাকিয়া, নাগমহাশয়ের আদরে মনে কষ্ট হয় নাই। তাঁহার অসাক্ষাতে হৃদয় সংসারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে মনে করিতাম, আমার কি হইল?

সময় সময় নাগমহাশয় বলিতেন, এ জগতে এক সুখী দেখিয়াছি রামকৃষ্ণ দেবকে; তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার জ্বালা নাই। তখন আমাব মনে হইয়াছে, মাঠাকুরাণীর জ্বালা নাই। মুখ খানা ঈষৎ মলিন করিয়া নাগমহাশয় বলিতেন, সংসারের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। একটী লোক আমার কাছে বলিয়া যাইতে পারিবে না যে, তাহার জ্বালা নাই। তিনি কখন কখন আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, মা সংসার ক্ষেত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্র, এখানে আসিলেই ভোগ। তাঁহার নিকট হইতে আসিলে, তাঁহার অব্যর্থ বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কখন কখন মনস্তাপ হইত, যে মন তাঁহাকে ছাড়া অন্য কিছু জানিত না, আজ সেই মন তাঁহার সাক্ষাতেও কত

ছাইভস্ম চিন্তাকরে। একদিন মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, মন এভাবে কি করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিল। উদ্দেশে মনের কষ্ট নাগমহাশয়কে জানাইয়া কাঁদিলাম, তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, মা ঠাকুরাণীর শাপে আ'মার এই অবস্থা হইয়াছে। তখন কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিলাম, বাবা, এমন ভগবান্কে কি কেহ না দেখিয়া পারে? আমি মাঠাকুরাণীর নিকট কোন দোষ করি নাই, সুধু দেওভোগ যাইয়া তোমাকে দেখিয়াছি। কত লোক দেওভোগে গিয়াছে, সকলের জন্যই রান্না করিতে হইয়াছে। আমি কি করিয়া তাঁহাকে বেশী কষ্ট দিয়াছি? নাগমহাশয়ের নিকট আশা পাইলাম। প্রাক্তন ভোগ আছে, ভুগিতেছি। আবার পূর্ব্বের মত তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারিব। সেই দিন হইতে মা ঠাকুরাণীর ব্যবহার, দাঁত কড়মড়ি, সমস্তই মনে হইতে লাগিল। যখন মনে অতিশয় কষ্ট হয়, মনে করি, বাবা, অকারণ আমার হৃদয় তোমাধনে বঞ্চিত হইতেছে; তুমিই দেখিও, আমি কিছু বলিব না।

আমি ছোট সময় অনেক বার নাগমহাশয়কে বলিয়াছি, আপনি আমাদের বাড়ীতে যাইবেন? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, যদি ঠাকুর নেন, তবে যাইব। একদিন বহুবার বলায়, তিনি বলিলেন, যদি রামকৃষ্ণদেব নিয়া যান, একদিন যাইব। কয়েক মাস পর আমার কি এক রকম ভাব হইল। আমি পিতাকে বলিলাম, আপনি দেওভোগ যাইয়া, জ্যেঠামহাশয়কে নিয়া আসুন। পিতা আমার কথা মত দেওভোগ যাইতে রাজি হইতেছেন না। অবশেষে আমার ভাবের ঘোর দেখিয়া, তিনি ও আমার খুড়ো বিমলবাবু বিজয়াদশমীর পর দিন তাঁহাকে

আনিতে গেলেন। নাগমহাশয় ঠাকুরদাদাকে বলিলেন, বাপ্ মহাশয়, পঞ্চসার হইতে আমাকে নিতে আসিয়াছে। খুকী আমাকে যাইতে বলিয়াছে। নাগমহাশয় সর্ব্বদা আমাকে খুকী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর দাদা তাহা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি যাইবে? যদি তুমি যাও, এক খানা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া যাইও। তিনি পঞ্চসার আসিবেন শুনিয়া অনেক লোক অনেক বাধা জন্মাইতে লাগিল। কেহ বলিল, আজ মাস দগ্ধ, কেহ বলিল, আজ ত্র্যস্পর্শ, কেহবা বলিল, আমি কাল চলিয়া যইব, আপনি কি করিয়া আজ এখান হইতে যাইবেন। তিনি কোন বাধা মানিলেন না, নৌকায় উঠিলেন। পিতা মহা আনন্দে তাঁহাকে লইয়া নৌকা ছাড়িলেন। সন্ধ্যার পর তিনি আমাদের বাড়তে আসিলেন। স্বামী তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীতে দৌড়াইয়া আসিয়া, নাগমহাশয়ের পৌছ সংবাদ দিলেন। আমি দৌড়াইয়া ছুটিলাম। কতক দূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি বাটীর কাছে আসিয়াছেন। তিনি পথে আমার হাত ধরিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেন তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছি। আমি হাসিতে হাসিতে দয়াময়ের হাত ধরিয়া বলিলাম, আপনাকে দেখার জন্য। নাগ-মহাশয় আমাদের বাড়ীতে গিয়াছেন শুনিয়া, অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। অনেক লোক কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তিনি মণ্ডপ ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

হায়, আমি কি পাষাণী। নাগমহাশয় দয়া করিয়া আমাকে দেখিতে গেলেন, কিন্তু আমি তাঁহার কোন যত্ন করিলাম না। সে দিন তাঁহার বড় কষ্ট হইয়াছিল। তিনি একাদশী তিথিতে পঞ্চসার

গিয়াছিলেন। পিতা একাদশীব উপবাস কবিতেন। মা বান্না কবিতে যাইতেছেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আমাব জন্য বাঁধিবেন না, বাজকুমাব যাহা খাইবে, আমিও তাহাই খাইব। সকলে বলিল, বান্না কবিতে কাহাব কষ্ট হইবে না। কিন্তু তাঁহাব কথাব উপব কাহাবও কথা চলিল না। তিনি পিতাব সহিত খাইতে বসিলেন। সামান্য চিনি, নাবিকেল খণ্ড, ভিজামুগ ও একখানা সন্দেশ খাইতে দেওয়া হইল। তিনি তাহাও খাইতে চান না। আমিও আমাব পিতা অনেক বলিলাম, তিনি কিছুতেই তাহা খাইতে বাজি হইলেন না। তিনি আমাকে বলিলেন, মা, সংসাবে সকলে সন্দেশ ভালবাসে, তুমি আমাকে সন্দেশ খানা দাও এবং অন্য জিনিষ সডাইযা বাখ। আমাব মনে হইল এই সকল জিনিষ তাঁহাব সম্মুখে আনিয়াছি, কি কবিয়া তাহা ফিবাইয়া লইয়া যাইব। আমি সমস্ত জিনিষ হইতে অল্প কবিয়া দিতে লাগিলাম। তিনি তাহাতেও হাসিয়া হাসিয়া আপত্তি কবিতে লাগিলেন। সন্দেশেরও একটুকুরা দিলাম। আমার মনে হইল, যখন সকল জিনিষ হইতে কিছু কিছু দিয়াছি, যদি সম্পূর্ণ সন্দেশ দিলে, তিনি না খান। আমাব এমন দুর্ভাগ্য একখানা সন্দেশ তাঁহাব হাতে দিতে পারিলাম না। নাগমহাশয় এই সমান্য আহাব করিয়া সেই রাত্র যাপন কবিলেন।

অনেক বাত্র পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইয়াছিল। নাগমহাশয় আমাকে শুইয়া থাকিতে বলিলেন। আমি সুখে বিছানায় শুইতে গেলাম, একবার ভাবিলাম না, তিনি কোথায় শুইবেন। পরদিন তিনি আমাব উঠিবার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ কবিয়া ছিলেন। পায়খানা হইতে ঘটি হাতে কবিয়া পুকুবেব ঘাটে নামিতেছেন দেখিয়া আমি

সেই ঘাটে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কখন উঠিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় শুইয়াছিলেন? বাহির বাড়ী শুইয়া ছিলেন শুনিয়া আমি বিছানা দেখিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, যে স্থানে ঢাকী শুইয়াছিল, সেই বারান্দায় তিনি একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়া ছিলেন। পিতার নিকট শুনিলাম, তাঁহাব বিছানা তক্তপোষেব উপর কবা হইয়াছিল। পিতা ও বাহির বাড়ীতে শুইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় তাহাকে বাড়ীব ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। পিতা শুইতে আসিলে পর তিনি একখানা মাদুর লইয়া বারান্দায় শুইলেন। তাঁহার কত অযত্ন করা হইল। তাঁহার খাওয়ার ও শোয়ার মোটেই যত্ন হইল না এবং আমিই এই কষ্টের কাবণ হইলাম।

এজগতে আমার মত অধম নাই, তাই নাগমহাশয় আমার প্রতি অহেতুক দয়া করিয়া ছিলেন! তিনি নিজগুণে আমাকে ভালবাসিতেন। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া একছিলুম তামাক খাইলেন। কতলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। তিনি সকলের সাথে হাসিমুখে কথা কহিতেছেন। তিনি বালকের মত হাসিতে হাসিতে মণ্ডপ ঘরের পিছনে যে কলাবাগান ছিল, তাহা দেখিতে চাহিলেন। আমি মনের আনন্দে তাঁহার আগে চলিলাম। তিনি আমার পিছনে ছিলেন। যাওয়ার সময় আমরা ঠিক পথ ধরিয়া গিয়াছিলাম। আসার সময় আমি পথ ভুলিয়া গেলাম। আমি জানিতাম না যে বাগানের ভিতর দিয়া একটী পথ ছিল। তিনি আমাকে ভাল পথ দেখাইয়া ছিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অন্য দিকে চলিয়া গেলাম।

কতকদুর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, সেই দিক দিয়া কোন পথ নাই, বেড়া দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বাগানের বাহির আসিলাম। তিনি দয়া করিয়া পথ দেখাইযা দিলেন, আর আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, পথের তাপাসে চলিলাম। আমার ঈদৃশ মন দেখিয়াও নাগমহাশয় দয়াপরবশ হইযা আমাকে তাঁহার লীলা দেখাইলেন এবং ধবিযা পথে পথে রাখিতে ছিলেন।

বাড়ীতে আসিযা নাগমহাশয় দক্ষিণেব ঘরেব বারান্দায় বসিলেন। মেয়ে ও পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। আমবা দেখিয়াছি, তিনি সকলকে তামাক সাজিয়া দিতেন এবং সকলের সাথে তামাক খাইতেন। সুতবাং একবাব মনে কবিলাম তাঁহাকে একছিলুম তামাক দিব, আবাব ভাবিলাম, যদি তিনি তাহা না খান। অনেক সময ভাবিয়া কম্পিতহৃদযে একছিলুম তামাক তাঁহাব নিকট লইয়া যাইয়া নাগমহাশযকে বলিলাম, দেওভোগে আপনি সর্ব্বদা তামাক খান, আমি আপনার জন্য তামাক আনিয়াছি, আপনি নিন্। তিনি দয়া করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা গ্রহণ করিলেন। কতক্ষণ পরে আর এক ছিলুম তামাক তাঁহাকে দিতে গেলাম, তিনি বলিলেন, মা, আবার কেন তামাক আনিয়াছ? আমি বলিলাম, বাড়ীতে আপনাকে অনেকবার তামাম খাইতে দেখিয়াছি, তাই ইহা আনিয়াছি। আবার তামাক নিলে কি বলিবেন ভাবিয়া আর তাঁহাকে তামাক খাইতে দেই নাই। নাগমহাশয়কে পাইয়া, বাড়ীর সকল লোকই অতিশয় আনন্দিত। নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিযা সকলেই আমাকে নানা কথা বলিতে লাগিল। আমিও

প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তাঁহার কাছেই রহিলাম। তিনি যে কি খাইবেন, একবারও তাহা ভাবিলাম না। মা রান্না করিতে গেলেন। আমার ছোট পিসী বিনয়ের সহিত মাকে বলিলেন, বধূ ঠাকুরাণী, 'তুমি দেওভোগ যাইয়া ঠাকুর ভাইকে রান্না করিয়া দেও, আজ আমি রান্না করিতে ইচ্ছা করি। আজ যদি রান্না করিতে না পারি, ঠাকুরভাইকে রান্না করিয়া খাওয়ান আমার কপালে ঘটিবে না। মা তাঁহাকে রান্না করিতে দিলেন। ছোট পিসী রান্না করিলেন। আমি নাগমহাশয়কে খাইতে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন, রাজকুমারকে ও আমাকে এক-জায়গায় খাইতে দাও। আমি বলিলাম, আপনি একাকী এক ঘরে খান। বাবা অন্যস্থানে এখনই বসিবেন। নাগমহাশয় আবার আমার পিতার সহিত খাইবেন বলায়, একস্থানে তাঁহাদের আসন দেওয়া হইল। তিনি ও পিতা খাইতে বসিলেন। পিতাকে এক থালায় এবং তাঁহাকে অপর থালায় ভাত দিলাম। তাঁহাকে যে ভাত দিয়াছিলাম, তাহার সিকিভাগ ভাত অন্য থালায় তুলিয়া লইলেন। মাছ তরকারি অল্প করিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি সামান্য খাইলেন, কিন্তু পিতাকে বলিলেন, তুমি কি খাও? বড় বড় গ্রাস মুখে দাও। পিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি কি আপনার চেয়েও কম খাইলাম? আমি তাঁহার থালা ধুইতে পুকুরের ঘাটে যাইতেছি দেখিয়া, তিনি আমার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন আমি তাঁহাকে তামাক দিলাম না। কে তাঁহাকে তামাক দিল, আমি জানি না। কি কাজ করিলাম? তিনি অন্যকোন জিনিষ বড় খাইতেন না। তামাক বারে বারে খাইতেন, তাহাও দিলাম না। আমার মত

পাষাণী কি তাহার যত্ন করিতে পারে? এমন কি নিয়মমত তামাক পর্য্যন্ত তাঁহাকে দিলাম না।

আমরা খাইয়া উঠিলাম। নাগমহাশয় আমাকে কিছু বলিলেন না। তিনি আমার পিতাকে বলিলেন, সেইদিন তিনি বাড়ী যাইবেন। পিতা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি জানেন আর মেয়ে জানে, আমি ও বিষয় কিছু জানি না। পিতা আমাকে বলিলেন, মাগো, আজই তোমার জ্যেঠামহাশয় বাড়ী যাইবেন। আমি পিতাকে বলিলাম, তাঁহার বাবার সাধ্য কি আজ যান। তিনি আজ কোথায় যাইবেন? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার পিতা হইলে আজ থাকিতেন, কারণ আমার পিতা আমার চেয়ে সোজা। ইহা বলিয়া নাগমহাশয় চুপ করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আজই যাইবেন? কতটুক সময় চুপ করিয়া থাকিয়া, বালকের মত বলিলেন, হাঁ, বাবাকে বলিয়া আসিয়াছি, আজই বাড়ীতে ফিরিয়া যাইব। ইহা বলিয়া, তিনি মণ্ডপ ঘর নমস্কার করিয়া, সকলের নিকট বিদায় লইলেন। যাঁহারা তাঁহার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। আমাকে বলিলেন, মা, আসি গিয়া? তুমি শান্ত থাকিও। অল্পবেলা থাকিতে তিনি রওনা হইলেন। আমরা মনে করিয়া ছিলাম, আমরা তাঁহার সহিত নৌকার ঘাট পর্য্যন্ত যাইব। তিনি কাহাকেও সঙ্গে যাইতে দিলেন না। আমরা কতদূর যাইয়া দাঁড়াইলাম। যত দূর পর্য্যন্ত নাগমহাশয়কে দেখা গেল, আমরা দেখিলাম। তিনি কতকদূর যাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, আমরা তখনও জলে দাঁড়াইয়া আছি কি না। আমাদিগকে জলে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বার বার আমাদিগকে ফিরিয়া বাড়ী আসিতে বলিলেন, এবং সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে বলা সত্ত্বেও যখন আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, তিনি পিতাকে আমাকে নিয়ে বাড়ী যাইতে বলিলেন। পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি এখানে থাকিলে, তিনি দাড়াইয়া থাকিবেন। তাহাতে তাঁহার কষ্ট হইবে। আমরা চলিয়া আসিলাম। নাগমহাশয়কে দেওভোগ পৌছাইতে একটী নৌকা ভাড়া করিয়া পাঠান হইল। সে নৌকার মাঝি আমাদের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আমি খুকীকে কাদায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছি। সেকি বাড়ীতে গিয়াছে? মাঝি বলিল, তাহারা সকলেই বাড়ীতে গিয়াছে এবং আপনাকে দেওভোগ পৌছাইয়া দিতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নাগমহাশয় তাহার নৌকায় যাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি অন্য নৌকায় আসিলেন। তিনি যে নৌকায় আসিয়া ছিলেন, সেই নৌকায় মাঝি তাঁহাকে পথে নামাইয়া দিয়াছিল। কয়েক দিন পর আমরা দেওভোগ যাইয়া শুনিলাম, নাগমহাশয় কাপড় ভিজাইয়া বড়ী গিয়াছিলেন।

নাগমহাশয় চলিয়া আসিলে, আমার মনে দারুণ কষ্ট হইল। আমাকে দেখিতে আসিয়া তিনি কত কষ্টই না করিলেন। ভাল মত খাওয়া হইল না, মাটিতে শুধু মাতুর পাতিয়া সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইলেন এবং যাওয়ার সময় নৌকা পাঠান সত্ত্বেও অনেক জল ও কাদায় হাঁটিয়া অন্য নৌকা লইয়া গেলেন। আমরা কোন যত্ন করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে যে সন্দেশখানা দিতে পারিলাম না, তাহা কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না।

আমার মনে হইতে লাগিল, যদি আমি সাহস করিয়া সন্দেশখানি তাঁহাকে দিতাম, তিনি নিশ্চয়ই খাইতেন। অনেক সময় এইরূপ ভাবিয়া মাকে বলিলাম, মা, তিনি আমাকে সন্দেশ দিতে বলিয়া-ছিলেন, আমি তাঁহার জন্য আনীত খাদ্য জিনিষ হইতে অল্প পরিমাণ দিলাম। তিনি সন্দেশের এক অংশ খাইলেন। সমস্ত সন্দেশখানা তাঁহার হাতে দিলাম না। যদি দিতাম, তিনি বোধ হয় তাহা নিতেন। মা বলিলেন, যখন আমরা দেওভোগ যাইব, সন্দেশ নিব। জীব ভাল কাজ করিতে অনেক সময় নেয়। নাগমহাশয় কার্ত্তিক মাসে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, মাঘ মাসে আমরা সন্দেশ লইয়া দেওভোগ গেলাম। নানা কারণে তিন মাস দেওভোগ যাওয়া হইল না। সন্দেশ, দুগ্ধ ও কমলা লেবু লইয়া আমরা দেওভোগে গেলাম।

আমার মার উপর নাগমহাশয়ের অতিশয় দয়া ছিল। মা দেওভোগে গেলে অনেক দিন মাঠাকুরাণী অস্পৃশ্যা হইতেন। এই সুযোগে মা রান্না করিতে পারিতেন। যেদিন আমরা গেলাম, সেইদিন মাঠাকুরাণী রান্না করিতে পারিলেন না। মা নাগমহাশয়ের জন্য রাঁধিলেন, দুগ্ধ ক্ষীরে পরিণত করিলেন। তাঁহার বাসনা, তিনি নাগমহাশয়কে ক্ষির ও সন্দেশ খাওয়াইবেন। মনে অত্যন্ত আনন্দ, কাজ করিতে কোন ওজর নাই। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। কীর্ত্তন শেষ না হইলেত আর নাগমহাশয় খাইবেন না। কীর্ত্তনের সময় তিনি ঘরের এককোণে একখানা চট পাতিয়া বসিতেন। যাঁহারা কীর্ত্তন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে তামাক দিতেন। লোক চলিয়া গেলে, যাঁহারা নাগমহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহারা

খাইতেন। সকলেব খাওয়া হইয়া গেলে, নাগমহাশয় খাইতে বসিতেন।

মার বান্না হইয়া গিয়াছে। যে ঘবে কীর্ত্তন হইতেছিল, সেই ঘরেব এককোণে নাগমহাশয় বসিয়া আছেন। আমি বড় ঘরে শুইয়াছি। মা ভাবিলেন, তিনি লোকের মধ্যে বসিয়া আছেন, অন্ধকাবে পুকুবে যাইযা, হাত মুখ ধুইয়া আসিলে, নাগমহাশয বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু মা যাহা ভাবিলেন, তাহা হইল না। মা ঘাটে যাইতে না যাইতে, নাগমহাশয় বড ঘবে যাইয়া বলিলেন, খুকী কোথায়? তিনি কোন দিন এইভাবে আমাকে খোঁজেন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া উঠিলাম এবং তাঁহার ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শিশুর মত গদ্‌গদ্ করিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি শুইয়াছ, আর তোমাব মা অন্ধকারে ঘাটে গিয়াছেন। তোমার মার কষ্ট দেখিয়া আমার কান্না আসে। আমি অমনি বাতি লইয়া মার কাছে পুকুরে গেলাম এবং মাকে বলিলাম, তুমি ত জান তিনি কোন লোকের কষ্ট দেখিতে পারেন না, কোন লোককে কাজ করিতে দেন না। তুমি কেন এইভাবে অন্ধকারে একাকী আসিলে? তিনি বড় ঘরে গিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার মার কষ্ট দেখিয়া আমার কান্না আসে। মা থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি এত লোকের মধ্যে বসিয়া আছেন, আমি যে পুকুরে যাইতেছি, তাহা খেয়াল করিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম, কি ভ্রান্ত জীব! যিনি অন্ধকারে পিপিলিকার পা দেখিতে পান, তিনি একটী মানুষকে চলিয়া যাইতে দেখিবেন না। যাহা হউক, তিনি যাহা ভা-বাসেন না, তাহা করিতে হয়

না। মা চোরের মত বাড়ীতে আসিয়া রান্না ঘরে বসিয়া রহিলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইল। সকলে খাইল। নাগমহাশয়ের খাওয়ার জন্য আসন পাতা হইল। জলের গ্লাস দিয়া যেখানে দাঁড়াইলে তাঁহাকে দেখা যায়, মা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাঁহাকে খাওয়ার জন্য বলিলেন। তিনি খাইতে যাইতেছেন না দেখিয়া, মা তাঁহাকে খাইতে যাইতে বলাইলেন। আমি নাগমহাশয়কে খাইতে যাইতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, যখন তোমার মা আসেন, আমার জন্য কষ্ট করেন। আমি মনে মনে বলিলাম, কাহার সাধ্য আপনার জন্য কষ্ট করে? নাগমহাশয়ের যাওয়ার দেড়ি দেখিয়া, মা ঠাকুরদাদাকে বলিলেন, দেখুন, তিনি খাইতে যান না। ঠাকুরদাদা তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, তুমি খাইতে যাও। নাগমহাশয় বলিলেন, উনি যখন আসেন, তখনই কাজ করেন, ইহাতে আমার বড় কষ্ট হয়। ঠাকুরদাদা বলিলেন, বৌ তোমার জন্য কষ্ট করিয়া রান্না করিয়া বসিয়া আছে, আর তুমি না খাইলে বৌর মনে অতিশয় সুখ হইবে—এই কি তুমি ভাবিয়াছ? বৌ তোমার জন্য রান্না করিয়াছে, তুমি খাইলেই সুখী হইবে। তুমি খাইতে যাও। নাগমহাশয় আর কোন কথা না বলিয়া খাইতে বসিলেন। মা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। মনের মত করিয়া ক্ষীর ও সন্দেশ তাঁহাকে দিলেন। তিনি সহজাবস্থায় কম খাইতেন। তিনি অল্প খাইলেন। তাঁহার খাওয়া হইলে, মা ঠাকুরাণীকে খাইতে ডাকিলেন। মা ঠাকুরাণী কিছুতেই খাইবেন না। তিনি বলিলেন, আপনারা আপনার ভাস্থরের জন্য আসেন, ভাস্থর খাইলেই

হইল। * মা বলিলেন, তা কেন হইবে? আমরা আপনাদের জন্যই আসি। অবশেষে মা ঠাকুরাণী খাইতে বসিলেন। ক্ষীর খাওয়ার সময় বলিলেন, আপনার ভাসুর ক্ষীরের চাঁছি ভাল-বাসেন। তাহা শুনিয়া, মা ক্ষীর ও সন্দেশ শিকায় তুলিয়া রাখিলেন।

আমার মা জানিতেন, পরদিবস মা ঠাকুরাণী রান্না করিতে পারিবেন না। তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নে নাগমহাশয়কে খাওয়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবেন। নাগমহাশয় বাজার হইতে রোহিত মৎস্য ও দুগ্ধ আনিলেন। মা রাঁধিলেন। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে খাইতে গেলেন। সেই দিন একাদশী তিথি ছিল। আমি তাঁহাকে সন্দেশ ও ক্ষীর দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমি এত খাইতে পারিব না। তুমি কতক নেও। আমি বলিলাম, আমি আপনাকে দিয়াছি, আমি আর নিব না। তিনি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি ইহা খাও এবং ছেলেদিগকে দাও। আমি হাতে লইয়া বসিয়া আছি। তিনি আমাকে তাহা মুখে দিতে বলিলেন। নাগ-মহাশয় এত স্নেহের সহিত বলিলেন, আমি তাহা মুখে না দিয়া পারিলাম না। আমার মনে হইয়াছিল, তিনি ক্ষীর ও সন্দেশ খাইলে আমি খাইব। ক্ষীর ও সন্দেশ মুখে দেওয়ামাত্র মুখে এত জল উঠিল যে তাহা মুখে রাখিতে কষ্ট হইতেছে। আমার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তিনি খাইতে আরম্ভ করিলেন। রসনা আস্বাদন পাইয়াছিল বলিয়া আমিও কষ্টের হাত এড়াইলাম। তাঁহাকে খাইতে দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ধরে না। মা তাঁহাকে ভাত দিলেন। যাহা খাইতে পারেন, এমত সামান্য

ভাত খাইলেন। তিনি কাহাকে তাহার উচ্ছিষ্ট দিতেন না। তিনি সকল জীবে ভগবৎ উপলব্ধি করিতেন। আচাইতে যাইয়া প্রথমে কুলকুচ করিয়া খাইতেন। তৎপর মুখ ধুইতেন, যেন মুখের ভিতর যে খাদ্য থাকিত তাহা অন্য জীবে না খায়। শরৎ বাবু বলিয়াছেন, কত বই পড়িয়াছি, কত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু নাগমহাশয় যেমন জীবে জীবে শিবজ্ঞান করিয়াছেন, প্রত্যেক নারীকে গৌরী ভাবিয়াছেন, এমত আর কোথায়ও দেখি নাই।

নাগমহাশয় আচাইয়া, হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার মাকে বলিলেন, উহাকে আমার উচ্ছিষ্ট দিবেন না। এমন স্নেহমাখা হাসি, যেন আমি এই কথা শুনিয়া মনে কষ্ট না পাই। তাঁহার সাক্ষাতে ভিন্ন থালায় খাইতে বসিলাম। তিনি সকলই জানিতেন। আমি তাঁহার প্রসাদ হাতে করিয়া নিয়া, তাঁহাব মুখ পানে চাহিয়া মুখে দিলাম। তিনি সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি ভাত খাইয়া, তাঁহার কাছে যাইয়া বসিলাম। মা-ঠাকুরাণীর সহিত আমার মা খাইতে বসিলেন। আমি ভাবিতেছিলাম, আর কতটুক সময় এখানে আছি, মা খাইয়া উঠিলেই আমরা চলিয়া যাইব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা একটী টাকা নেবে? আমি নিব না বলিলে, তিনি বলিলেন, দশটাকা আছে, তুমি একটী টাকা নেও। আমি বলিলাম, আমি টাকা লইয়া কি করিব? মনে মনে বলিলাম, আমাতে আপনার দয়া থাকিলেই যথেষ্ট, আমি আপনার নিকট টাকা চাহি না। সময় সময় টাকার অভাবে আপনার কষ্ট হয়। বিশেষতঃ, আমার

টাকার কোন দরকার নাই। আমি কিছুতেই টাকা নিব না। আমার ছোট ভাই শিশিরকুমার সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাকে সেই টাকা নিতে বলিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, জ্যেঠামহাশয়ের টাকা নিতে হয় না। সে সরিয়া গেল। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, তুমি কেন উহাকে বারণ করিলে? আমি বলিলাম, সে টাকা লইয়া কি করিবে? তিনি বলিলেন, খেলা করিবে। আমি মনে মনে বলিলাম, মানুষ আবার টাকা দিয়া খেলা করিবে? আমি শিশিরকুমারকে বলিলাম, তুমি মাকে ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া থাক, তাহা হইলে তিনি আর টাকা দিতে পারিবেন না। সে মাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি শিশুর মত চঞ্চল হইয়া তাহার পকেটে টাকা ফেলিয়া দিলেন। ঠাকুর-দাদা বলিলেন, দুর্গা টাকা দিয়াছে, লইয়া যাও। যদি টাকা না নেও, আমার মনে কষ্ট হইবে।

শীতকাল। দুইটা বাজিয়াছে। মা বলিলেন, আমি শ্বশুর ঠাকুরকে ভাত খাইতে দিয়া যাইব। যদি বাড়ী যাইতে সামান্য রাত্রও হয়, তাহাও ভাল। সকলে খাইয়া বিশ্রাম করিয়া উঠিলেন। তখন ঠাকুরদাদার মন্ত্র পড়া শেষ হয় নাই। মা রান্না-ঘরে বসিয়া আছেন। নাগমহাশয় রান্নাঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন এবং হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছেন। আমি বড়ঘর হইতে তাহা দেখিয়া, তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং মা উননে আগুন জ্বালিয়া নাগ-মহাশয়ের বরাবর হইয়া, একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মা আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, তিনি ঠাকুরের জন্য কিছু রাঁধিতে বলিতে আসিয়াছিলেন, উননের আগুন নিবান দেখিয়া

আর বলিলেন না, তজ্জন্য আমি আগুন জ্বালিযাছি। তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি রাঁধিতে হইবে। আমি নাগমহাযকে বলিলাম, বলুন না, কি বাঁধিতে হইবে?, মা বাড়ীতে কত কষ্ট কবেন। এখানে আপনাব কাজ কবিতে পাবিলে, মা কত সুখী হইবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আগুন নিবান হইয়াছে, আবাব কষ্ট কবিতে হইবে। বাপমহাশয় পাট পাতা ভাজা খান। মা তাঁহার কথা শুনিয়া মহা আনন্দে পাটপাতা ভাজিলেন এবং ঠাকুব দাদাকে খাইতে দিলেন। ঠাকুর দাদা মাব হাতে খাইয়া বড়ই সুখী হইতেন। তিনি মাকে ভালবাসিতেন।

নাগমহাশয আমাদেব সহিত যেমন ব্যবহাব করিতেন, সেইরূপ তাঁহার কৃপাদৃষ্টিও ছিল। মা শিবচতুর্দ্দশীব উপবাস করিতেন। একবাব মার মনে হইল, তিনি উপবাসেব দিন নাগমহাশয়কে দেখিবেন। পিতাকে বলা হইল। তিনি সংযমেব দিন মাকে বলিলেন, আজ তাডাতাড়ি বান্না কবিযা খাইয়া দেওভোগ চল। তাহা হইলে, আমবা গেলে ঠাকুর ভাইয়ের কোন কষ্ট কবিতে হইবে না। আমবা তাহা শুনিয়া খুব সুখী হইয়া দেওভোগ অভিমুখে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার সময় আমবা পৌছিলাম। যাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় পথে দাঁডাইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমাব মনে হইল, আমরা যে তাঁহাব বাডীতে যাইতেছি তিনি তাহা বাড়ীতে বসিযাই দেখিতে পাইয়াছেন। তাই তিনি এগিয়ে এসে পথে দাঁডাইযা-ছেন, যেন বাড়ীতে পৌছিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমাকে দেখিয়া, সস্নেহে তাকাইয়া, তিনি আমাব সঙ্গে বাড়ীতে আসিলেন। অন্যান্য যাঁহাবা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কে

কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই নাগমহাশয়কে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। আমার পিতা মনে করিয়াছিলেন, দেওভোগ গেলে যত কম গোল হইবে, নাগমহাশয়কে তত বেশী সময় দেখিতে পাইবেন। আমরা বাড়ী হইতে খাইয়া গিয়াছিলাম, যেন নাগমহাশয়কে বাজার করিতে না হয় এবং মাঠাকুরাণীকে রান্না করিতে না হয়। কিন্তু নাগমহাশয় না খাইয়া থাকিতে দেন নাই। জীবের কৌশল তাঁহার নিকট টিকিল না। সন্ধ্যার সময় তিনি দুধের জন্য গোয়ালাবাড়ী গেলেন। দুগ্ধ বাড়ীতে রাখিয়া বাজারে গেলেন, খই, ছাতু, গুড়, মৎস্য ইত্যাদি লইয়া রাত্রিতে বাড়ী আসিলেন। যখন তিনি বাজারে রওনা হইলেন, আমরা সকলেই বলিলাম, আপনি কোথায় যান। আমরা বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়াছি। তিনি শুধু বলিলেন, আমি এখনই আসিতেছি। অনেক সময় পর তাঁহাকে বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসিতে দেখা গেল। সকলেই মনে করিলেন, এ সময় আসিয়া ভাল কাজ হয় নাই। তাঁহাকে অযথা অনেক কষ্ট দেওয়া হইল। আমাদের বুদ্ধির ত্রুটীতে তিনি অন্ধকার রাত্রিতে, এতবড় বোঝা লইয়া বাজার হইতে আসিলেন। নাগমহাশয় বোঝা নামাইয়া এমন ভাবে দাঁড়াইলেন, যেন তাহার কোন কষ্ট হয় নাই। কতটুকু সময় এইভাবে থাকিয়া, মণ্ডপ ঘরে যাইয়া বসিলেন। কীর্ত্তন হইতেছিল। কীর্ত্তনের সময় দেখিয়াছি, তিনি কাহাকে বাতাস দিয়াছেন, কাহার নিকট তামাক সাজিয়া নিয়াছেন, যাহার যাহা দরকার, তাহাকে তাহা দিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। ইহার মধ্যে যদি কেহ নাগমহাশয়ের সহিত কথা কহিতে চাহিত, তিনি তাহার

সঙ্গে কথাও বলিতেন। সকল সময় তাঁহার মুখ অমিয়হাসিমাখা ছিল। এমন আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সময়ের মধ্যে যদি কেহ বাড়ী যাইত, তিনি তাহার পিছনে পিছনে আলো লইয়া যাইতেন। এত লোকের এত কাজ করিতেন, অথচ কেহ মনে করিতে পারিত না, নাগমহাশয় উহাকে আদর করিলেন না। সকলেই ভাবিত নাগমহাশয় আমাকে অতিশয় যত্ন করিলেন। কোন লোক ভাবিত তাঁহার বাটী হইতে আসার সময় নাগমহাশয় আমার সঙ্গে আসিয়া আলো ধরিলেন। যে তাঁহাকে দেখিতে যাইত, সে মনে করিত, তিনি আমার কাছে বসিয়া আছেন। তিনি একাকী এত কাজ করিতেন।

শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস করিয়া নাগমহাশয়কে দেখিবেন ভাবিয়া, মা দেওভোগ গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার সকল বাসনা পূর্ণ করিলেন। পরদিন মা ঠাকুরাণী অস্পৃশ্যা হইলেন। মার মনে মহা আনন্দ। তিনি উপবাসী থাকিয়া নাগমহাশয়ের সেবা করিবেন। মা রান্না করিতে গেলেন। নাগমহাশয় বাজার হইতে দুগ্ধ, মৎস্য ও নানমত দ্রব্য আনিলেন। মা রান্না করিলেন। হরপ্রসন্নবাবু সেইদিন দেওভোগ গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বড়ঘরের ভিতর খাইতে দেওয়া হইল। নাগমহাশয়ের আসন বারান্দায় করা হইল। আমি ভাত দিতে গেলাম। মা রান্নাঘর হইতে খাওয়ার জিনিস দিতে লাগিলেন, আমি তথা হইতে আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলাম। মা দুইজনকেই একখানা করিয়া মাছভাঁজা দিয়াছিলেন। মা ঠাকুরাণী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখানা করিয়া মাছ দেওয়া হইয়াছে? নাগমহাশয়কে একখানা ভাঁজা মাছ দেওয়া হইয়াছে বলায়, মা ঠাকুরাণী বলিলেন, তিনি একখানা মাছ দিলে

খান না। তাঁহাকে যাহা খাইতে দেওয়া হয়, তিনি তাহার অর্দ্ধেক পাতে রাখিয়া দেন। আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম না। মা আমার হাতে আর একখানা ভাঁজা মাছ দিলেন। আমি সেই মাছ হরপ্রসন্নবাবুর থালায় দিয়া ফেলিলাম। যখন আমি বারান্দার মধ্য দিয়া, ভাঁজা মাছ লইয়া যাই, নাগমহাশয় শিশুর মত বলিয়া উঠিলেন, আবার কেন? আবার কেন? আমি বলিলাম, আপনাকে দিব না, হরপ্রসন্নবাবুকে মাছ ভাঁজা দিব। তিনি সরল ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।' আমি অন্য তরকারি আনিতে গেলে, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে ভাঁজা মাছ দিয়াছ? আমি বলিলাম হরপ্রসন্নবাবুকে দিয়াছি। মা অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, যখন তুমি বুঝিতে পারিলে না, তাহা কাহাকে দিতে হইবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গেলে না কেন? আর ভাঁজা মাছ নাই, এখন আমি কি করিয়া আর একখানা ভাঁজা মাছ নাগমহাশয়কে দিব? যাহা তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হয়, তিনি তাহার অর্দ্ধেক না রাখিয়া কখন খান না। তিনি সমস্ত জানিতে পারিতেন। আমাকে ভাঁজা মাছ নিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন আবার কেন? আমি ঘোর অবিশ্বাসিনী, তাঁহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহাকে খাইতে দিলাম না। আমার বিশ্বাসে কিম্বা অবিশ্বাসে তাঁহার কিছু আসে যায় না, তবে আমার কর্ম্ম-দোষে তাঁহার খাওয়া হইল না। হায়, আমি এমত পাষাণী! এখন আর কি করিব। তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম।

নাগমহাশয়কে ভাঁজা মাছ না দেওয়ায় মনে যে সামান্য কষ্ট পাইতেছিলাম, তাহা দূর করার জন্য, তিনি আমার দিকে তাকাইয়া শিশুর মত দুইটী মুখে দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন,

বেশ হইয়াছে। সব জিনিষ বেশ রান্না হইয়াছে। আমি সব খাইয়াছি। ইহা বলিয়া তিনি উঠিলেন। আমি তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, মা, তুমি এখন খাইতে বস। আমি খাইতে গেলাম। নাগমহাশয় মার বাসনা পূরণ করিলেন। আমার কর্ম্ম অতিশয় মন্দ। তিনি আমার সুখের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন, সর্ব্বদা আমার খাওয়ার যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমি এমত দুরদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছি, আমি একদিনের তরেও তাঁহাকে সুখে খাওয়াইতে পারিলাম না। তবে তিনি নিজগুণে সুখী, কখন অসুখী ছিলেন না। আমি পাষাণী, তাই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলাম না। তাঁহার কথা লইয়া বাদানুবাদ করিলাম। তাহাকে মাছভাঁজা-খানা খাইতে দিলাম না। আমি এমন কাজ আরও করিয়াছি। তিনি আমার নিকট সন্দেশ চাহিলেন, আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম।

স্বামী অতিশয় ভাল ছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে আমাকে কিছু বলিতেন না। তিনিও মনে মনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দুই বেলা তাহার ধ্যান করিতেন। মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। কতক দিন পরে, এক দিন নাগমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন মাছ না খাইলে কি হয়? আমিও কতক দিন মাছ খাইতাম না। নক্তব্রত করিতাম; সমস্ত দিন পরে কাঁচাকলা সিদ্ধ ও আতপ চাউলের ভাত খাইতাম। তখন বাজারে গেলে মাছের আইসের গন্ধ পাইতাম। কৈ, আমার কি হইল? ভগবান্ দয়া করিলে, মাছ খাইলেও দয়া করিতে পারেন। এবং ভ গবানের দয়া না হইলে, হবিষ্য করিলেও দয়া আসে না।

স্বামী মনেমনে বলিলেন, আপনি বলিলেই আমি মাছ খাইব। তৎপর খাওয়ার সময় নাগমহাশয় তাঁহাব সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া মাছ খাইতে বলিলেন। স্বামী মাছ খাইলেন। বয়স হইল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই হইল। আমি ভয় করিতাম, নাগমহাশয় সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা চর্ম্মসুখ ভোগ করিলে, তিনি আমাদিগকে ভাগবাসিবেন না। এক দিন দেওভোগ গিয়াছি, তিনি বলিলেন, আমাদিগকে সুখী দেখিলেই তিনি সুখী।

আমার মনে হইত, পিতার বাড়ীতে থাকিলে, ইচ্ছামত নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব, ইচ্ছামত তাহার নাম করিতে পারিব। সুতরাং স্বামী বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিতাম না। রওনা হইলে, আমি মনেব আবেগে কেমন হইয়া যাইতাম। স্বামীও জোর করিয়া নিতে চাহিতেন না। কুচিয়ামোরা না গেলে তিনি মনে কষ্ট পাইতেন। এক দিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নাগমহাশয়কে বলিলাম, আপনি সকল জানেন। স্বামী কোথায় গিয়াছেন, তাঁহাকে আনিয়া দিন। আমি তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। এই যে স্বামীর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, আর সুস্থ থাকিতে পারিলাম না। আমার ঘুম ভাঙ্গিলে পরও সে স্বপ্ন সত্য বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। মন ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, যেন বহুদিনের তৈয়ারী ঘর এক ঝড় আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। আমার মনে ছিল, যে স্থানে বসিয়া নাগমহাশয়কে দেখিয়াছি, সেখানে থাকিয়া চিরদিন নাম করিব, আমি তাঁহাকে দেখিব। স্বামী মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইবেন। এই স্বপ্নে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। তখন মনে হইল, স্বামী

সেখানে নিবেন, আমি সেই স্থানেই থাকিব, ঘরে বসিয়া তাহার নাম করিব, কারণ নাগমহাশয় বলিয়াছেন, ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। সে সময় স্বামী পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে ছিলেন। আমি তথায় না যাওয়ায় তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছিল। বাবার ইচ্ছা আমাকে স্বামী বাড়ী পাঠাইয়া দেন। মার একবারেই ইচ্ছা নয়, আমি কুচিয়ামোড়া যাই। মা বলিলেন, মেয়ে কখন কি ভাবে থাকে, তাহার ঠিক নাই। কখন মণ্ডপ ঘরে, কখন তুলসীতলায় পড়িয়া থাকে। সময় মত খায় না, সময় মত কোন কাজ করে না, পাগলের মত এখানে রহিয়াছে। পরের নিকট কি করিয়া এ ভাবে থাকিবে? বাবা কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, দেওভোগ চলিয়া গেলেন এবং নাগমহাশয়কে সমস্ত বলিলেন। পিতা নিজেই আমাকে লইয়া স্বামী বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, বিমলার সহিত খুকীকে পাঠাইয়া দেও। কোন ভয় কারও না, যেমন হাড়ি তেমন সরা। তাঁহার আদেশ পাইয়া, পিতা অতিশয় সুখী হইয়া, দেওভোগ হইতে বাড়ী আসিয়া মাকে সব কথা বলিলেন। বিমলা বাবু আমার খুল্লতাত হন।

আমার মনে হইতে লাগিল, আমি আবার পরের অধীন হইয়া থাকিতে চলিলাম। স্বাধীন মত নাগমহাশয়ের নাম করিতে পারিব না। তিনি যখন যাইতে বলিয়াছেন, যাইব, কিন্তু বেশী দিন তথায় থাকিব না, কারণ স্বামী বাড়ী থাকিলে যখন ইচ্ছা হইবে, তখন দেওভোগ যাইতে পারিব না, নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব না। যখন নাগমহাশয়কে প্রথম দেখিয়ছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, আগে মা বাপ, পরে যাহার হাতে দেওয়া হইয়াছে, সেই যথা-

সর্ব্বস্ব ধনী স্বামী। কাহাকে কিছু বলিলাম না। পিতা খুড়োর সঙ্গে স্বামী বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। নৌকায় উঠিয়া মনে মনে নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলাম, তুমি কিন্তু দেওভোগ থাকিও। আমাকে দূরে পাঠাইয়া কোথায় চলিয়া যাইও না। যখন আমি আসিব, তখন যেন তোমাকে দেখিতে পাই। নৌকা চলিতে লাগিল। সে সময় তুলসীতলা বসিয়া, নাগমহাশয়ের চিন্তা করিতাম, সে সময়ে তাঁহার কথা মনে পরায় মন যেন কি রকম হইয়া উঠিল। কয়েক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িল। খুড়ো বলিলেন, কাঁদ কেন মা ? তুমি নাগমহাশয়ের কথা মত চলিয়াছ। স্বামীর কাছে যাইবে। তিনি তোমাদিগকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন। তাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা নয়। লক্ষীনারায়ণের মত থাকিয়া, তাঁহার নাম করিবে, ইহাতে কাঁদার কি আছে ? আমি বলিলাম, আমি কেন কাঁদি আপনি তাহা বুঝিবেন না। তিনি চুপ করিলেন।

নৌকা কুচিয়ামোড়া যাইয়া লাগিল। বাড়ীতে উঠিলাম। অনেক লোক দেখিতে আসিল। আমি নাগমহাশয়ের দর্শন পাইয়াছি পর বেশি লোকের সাথে মিশিতে পারি নাই। নাগমহাশয় একদিন আমাকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন, আমি কাহারো বাড়ীতে বেড়াইতে যাই কি না। আমি বলিলাম, কখন কখন প্রতিবেসির বাড়ী যাই। আপনি মানা করিলে আর যাইব না। তিনি বলিলেন, অনেক লোকের সাথে মিশিবার দরকার কি ? তাঁহার এই কথার পর লোকের সাথে মিশা একবারেই বন্ধ হইল। ইহার পূর্ব্বেও আমি লোকের সহিত বড় মিশিতাম না। কাহারও বাড়ী বড় যাইতাম না, মধ্যে মধ্যে

সমবয়সীর সাথে খেলা করিতাম। নাগমহাশয়ের দয়া্য সব বন্ধ হইয়া গেল। কুচিয়ামোড়ার লোক দেখিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল, আবার বৌ হইয়া বন্দী হইলাম। সেই তুলসীতলাই বা কোথায়, আর নাগমহাশয়ই বা কোথায়? আমি কোথায় বসিয়া নাগমহাশয়কে দেখিব? তাঁহার নাম করিতে বসিলে, যখন ইচ্ছা উঠিয়াছি, এখানে আর তাহা হইবে না। সকলের সঙ্গে সকল কাজ করিতে হইবে। মনে ভয় হইতে লাগিল, যদি নাগমহাশয় তাঁহার শ্রীচরণ হইতে ফেলিয়া দেন। এই সকল কথা ভাবনা করায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। কাহারো সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া আমি শুইয়া রহিলাম। মনে করিলাম, এখানে থাকিব না। পঞ্চসারে যাইয়া স্বাধীন মত তাঁহার নাম করিব। সন্ধ্যার পর স্বামী ঘরে গেলেন। তিনি খুড়োর সাথে কি বলিলেন। আমি খুড়োকে বলিলাম, আপনি বলুন, আমি পঞ্চসার যাইব। তিনি স্বামীকে তাহা বলিলেন। স্বামী বলিলেন, আপনি নিয়া যাইবেন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। স্বামী চিরকালই ধীর ছিলেন। নাগমহাশয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। নাগমহাশয়কে ভক্তি করায়, আমাকেও অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। তখন তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। কে কি বলে ভাবিয়া কয়েকটী কথা বলিয়া ঘরের বাহির হইলেন। আমার মনে হইতেছিল, আমি এই সব লোকের মধ্যে থাকিব না, এখনই চলিয়া যাইব। যখন স্বামী বলিলেন, কোন বিষয়ে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, আমি খুড়োকে বলিলাম, আপনি আমাকে লইয়া চলুন। আমি আজই দেওভোগ যাইব। খুড়ো বলিলেন, আমি কি করিয়া

তোমাকেঁ নিয়া যাইব? তুমি এখানে বৌ, আমি তোমাকে এভাবে নিয়া যাইতে পারিব না। বিশেষতঃ আমি পথ চিনি না। ঠাকুর তোমাদিগকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন। এখানে কয়েকদিন থাক, ঠাকুরদাদা আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া, বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম, আমি একাকীই নাগমহাশয়ের কাছে যাইব এবং তাহাকে স্মরণ করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। আমি মনে করিলাম, নাগমহাশয় আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। আমিত পথ চিনি না। আমাকে ঘরের বাহির হইতে দেখিয়া খুড়ো আমার পিছনে রওনা হইলেন। তাহার মনে বিশ্বাস ছিল, নাগমহাশয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমি নাগমহাশয়কে আমার সঙ্গে দেখিতেছিলাম। কোন্ দিকে যে যাইতে ছিলাম, তাহা আমি জানিতাম না। কুচিয়ামোড়া ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর পারে আসিয়া, একখানা নৌকা যাইতেছে দেখিয়া খুড়ো নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকা কোথায় যাইবে? নাবিক বলিল, সে মুন্সীগঞ্জ যাইতেছে। পঞ্চসার মুন্সীগঞ্জের কাছে। আমরা নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল আমার মনে হইল যেন নাগমহাশয় নৌকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহের অধিবাস দিবস কুচিয়া-মোড়া গিয়াছিলাম। বাড়ীতে অনেক লোক একত্রিত হইয়াছিল। আমি এভাবে চলিয়া আসিলাম, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। নাগমহাশয়কে মনে করিয়া নৌকায় শুইয়া রহিলাম। অল্প রাত্রি থাকিতে নৌকা পঞ্চসার আসিল। বাড়ীতে যাইয়া আমি তুলসীতলায় কতক সময় পড়িয়া রহিলাম। তৎপরে ঘরে গেলাম। মা বলিলেন, একি? এতরাত্রে কোথা হইতে কি করিয়া আসিলে?

খুড়ো সমস্ত কথা বলিলেন। মা বলিলেন, জামাতা কি বলিবে? আমি বলিলাম, মনে কষ্ট পাইবে, কিন্তু কি করি, ওখানে স্বামী ছাড়া আমার আর কিছু ভাল লাগিল না। পর দিন পিতা সব জানিলেন। পিতা খুড়োকে বলিলেন, ওই ছোট ছিল, তোর কি কোন বিবেচনা ছিল না। পার্ব্বতী ছেলে মানুষ, পিতামাতা নাই, এখন সে কি করিবে? ঠাকুর ভাই তোর সাথেই খুকীকে পাঠাইতে বলিয়াছিলেন; তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে। খুড়ো দেওভোগ গিয়া নাগমহাশয়কে সকল কথা বলিলেন। জগবন্ধুবাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন, মেয়ে কি এমন ছোট, কেন একাকী বাহির হইল? নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, আমি সাক্ষী দিতেছি, ইহার মন পাঁচ বৎসরের শিশুর মত। উহার কোন জ্ঞান নাই, ও কোন দোষ করে নাই। জগবন্ধুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। জগবন্ধুবাবু নাগমহাশয়ের একজন ভক্ত।

স্বামী অতিশয় কষ্ট পাইয়া সন্ন্যাসী হইবেন স্থির করিলেন। কয়েকদিন পর তিনি নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিলেন। নাগ-মহাশয় আপন জনের মত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। মা শিশুকে শান্ত করিয়া কোলে নিলে সে যেমন সমস্ত ভুলিয়া যায়, সেরূপ স্বামী নাগমহাশয়ের স্নেহমাখা কথায় সব ভুলিয়া গেলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে প্রকারান্তরে আমার কাছে যাইতে বলিলেন। স্বামী মনে মনে বলিলেন, আপনি বলিলেই আমি যাইব। সন্ন্যাসী হওয়া ভগবান্‌কে সুখী করার জন্য, সেই ভগবান্ যদি সংসারে থাকিলে সুখী হন, তবে আমি কাহার জন্য সন্ন্যাসী হইব। অপর পক্ষে এমন স্ত্রী পাইয়াও যখন আমার সুখ হইল না, কাহার জন্য

সংসারেই বা থাকিব। নাগমহাশয় আবার তাঁহাকে বুঝাইয়া পঞ্চসার পাঠায়া দিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি কটু কথা বলিবেন। নাগমহাশয় আমাকে ভালবাসায়, আমার সুখের জন্য তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। নাগমহাশয়ের আদরের জিনিষ মনে করিয়া তিনি আমাকে একটা কটু কথাও বলিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, তোমার ভগবানে ভক্তি আছে, যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আজ তুমি তাঁহার আদরের জিনিষ, তোমার কাছে আসিলে তিনি সুখী হইবেন, তাই আমি আসিলাম। নচেৎ আমি কখন তোমার মুখ দেখিতাম না। আমি বলিলাম, তাহা আমি জানি। আমি যেখানে থাকি, তিনি তোমাকে আমার কাছে আনিয়া দিবেন।

যখন স্বামীর বয়স ১৭ বৎসর, তিনি মুন্সীগঞ্জস্কুলে পড়িতেন। রবিবার আসিলে তাঁহার প্রাণ বড়ই অস্থির হইত। সেদিন আর কাটিত না, প্রাণ কেবল ছট্‌ফট্ করিত। অগ্রহায়ণ মাস। এক দিবস তিনি দিনের বেলায় ঘুমাইয়া ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয়ে বড় জ্বাল হইয়াছে, প্রাণ কেবল নাগ-মহাশয়কে দেখিতে চায়। ইহার পূর্ব্বেই বর্ষার সময় তিনি দুইবার নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। বর্ষাকালে নৌকায় দেওভোগ যাইতে হয়। অন্য সময় কোন পথে নারায়ণগঞ্জ হইতে দেওভোগ যাওয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন না। মুন্সীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পৌছিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। তিনি পথ চিনেন না, কি করিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ী যাইবেন, তাহা একবার মনে হইল সত্য, কিন্তু প্রাণ এমন আকুল হইয়া উঠিল যে, নাগ-মহাশয়কে না দেখিয়া কোন মতেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না।

তিনি আকুল মনে রওনা হইলেন। নারায়ণগঞ্জ যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। কোন পথে নাগমহাশয়ের বড়ী যাইবেন জানা নাই। এক ভদ্র লোকের সহিত জানা ছিল, তিনি নারায়ণগঞ্জ পোষ্ট অফিসে বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, পোষ্টেল কোয়াটর্সে তাহার সহিত দেখা করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমি নাগমহাশয়ের বাড়ী চিনি না, আপনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিন্। পথ দেখান দূরের কথা, তিনি কতকগুলি ভয়ের কথা বলিয়া দিলেন। পথে ভূতের ভয় আছে, রাত্রিতে কোথায় যাইবে? আজ এখানে থাক, কাল সকালে পথ দেখাইয়া দিব, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। স্বামী কোন বাধাই মানিলেন না। তাঁহার মনে হইতে ছিল কতক্ষণে নাগমহাশয়কে দেখিবেন। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন ঘোর অন্ধকার হইয়াছে! কোন পথ জানা ছিল না। তিনি জানিতেন, লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির পশ্চিমদিকে, এবং নাগমহাশয়ের বাড়ী যাইতে হইলে সেই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে হয়।

স্বামী পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন। কতকদূর যাইয়া এমন এক স্থানে গেলেন যেখানে তিনদিকে তিনটী পথ গিয়াছে। নিকটে কোন লোক দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অগ্রসর হইবেন। আন্ধকারের মধ্যে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কোন্ পথে যাইবেন ভাবিতে ভাবিতে একপথ ধরিয়াই চলিতে লাগিলেন। সামান্য পথ যাইয়া দেখিতে পাইলেন, একটী লোক তাঁহার আগে আগে চলিতেছেন। অন্ধকারে পথ ভাল দেখা যায় না। তিনি হতাশ হইয়া সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? উত্তরে জানিতে পারিলেন, হরপ্রসন্নবাবু নাগমহাশয়ের

বাড়ীতে যাইতেছেন। একত্রে দুইজন তাঁহার বাড়ী গেলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া স্বামীর প্রাণ জুড়াইল। তিনি তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন, শুনিতে পাইলেন, নাগমহাশয় বলিতেছেন, মনে করিয়াছিলাম, একবার ষ্টেশনে যাইব। হরপ্রসন্ন আসিল, আর গেলাম না। স্বামী তাঁহার দয়া দেখিয়া নিজকে ভুলিয়া গেলেন। তিনি এক দৃষ্টে সর্ব্বজ্ঞ নাগমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পরবৎসর সংসারের নানা গোলমালে বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন ভাবিয়া, স্বামী নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলেন। মনে স্থির করিয়া ছিলেন, যাইবার পূর্ব্বে নাগমহাশয়কে একবার দেখিবেন। সন্ন্যাসী হইয়া নাগমহাশয়ের কৃপালাভ করিবেন আশা করিয়া বাড়ী হইতে টাকা লইয়া দেওভোগ গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান্ কি সুধু জঙ্গল চিনেন?' তিনি কি আমার বাড়ী ঘর চিনেন না? যদি তিনি দয়া করিয়া দেখা দেন, আমার বাড়ীতে আসিয়াই দেখা দিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নাগমহাশয় সকল অবস্থাতেই তাঁহার মঙ্গল করিবেন। তিনি আর সন্ন্যাসী হইলেন না।

যখন স্বামী ঢাকা কলেজে পড়িতেন, অনেক শনিবারে নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন। ২টার সময় কলেজ ছুটি হইলে, হাঁটিয়া রওনা হইতেন। হাঁটিয়া আসিতে তাঁহার বিশেষ কোন কষ্ট হইত না। কিন্তু নাগমহাশয়ের এমত স্নেহ ছিল, একদিন তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, আপনি হাঁটিয়া আসিবেন না। স্বামী বলিলেন, তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই। নাগমহাশয় বলিলেন, দরকার কি? তিনি

স্থির করিলেন, তিনি আর ঢাকা হইতে হাঁটিয়া আসিবেন না। নৌকা যোগে কতদূর আসিয়া দেওভোগে যাইবেন। নাগমহাশয় আন কিছু বলিলেন না। ঢাকা রওনা হইবার সময় নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে পয়সা আছে? স্বামী আছে বলায়, তিনি হাসিতে হাসিতে তাহা দেখাইতে বলিলেন। রেলের ভাড়া দুই আনা, তাঁহার সহিত মাত্র এক আনা ছিল। নাগমহাশয় দেখিতে চাহিয়াছেন, তিনি না দেখাইয়া পারিলেন না। এক আনা পয়সা কম দেখিয়া, নাগমহাশয় দুই আনা পয়সা দিলেন। তিনি তাহা হাত পাতিয়া নিলেন। কাহার সাধ্য নাগমহাশয়ের অমিয়মাখা কথা ফেলে। তাহার পব তিনি আর হাঁটিয়া দেওভোগ যান নাই। আমবা পাষাণ, তাই নাগমহাশয়কে ভুলিযা আছি। মানুষ হইলে, তাঁহার স্নেহ ভূলিয়া সুখে থাকিতে পাবিতাম না। পশু, পক্ষী, মাছ সকলেই তাঁহার স্নেহে ভূলিয়া যাইত। তাহারাই নাগমহাশযের গুণ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিল, মানুষ হইয়া আমরা অহংকারে মত্ত।

নাগমহাশয় দুর্গা পূজা করিতেন। পূজার সময় অনেক লোক হইত। বাড়ীতে মোটে চারিখানা ঘর ছিল। উত্তবেব ভিটিতে মণ্ডপ ঘর, পূর্ব্বদিকে বড় ঘর, রান্না ঘর পশ্চিমে ও দক্ষিণ ভিটিতে যে ঘর ছিল, পূজার সময় সেই ঘরে নানা মত লোক থাকিত। একবার এক রাত্রিতে নাগমহাশয় মণ্ডপ ঘরেব বারান্দায় শুইয়াছেন। দক্ষিণের ঘরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তামাক সাজিয়া খাইতেছেন। কাহার সাহস হয় না, নাগমহাশয়কে এক ছিলিম তামাক দেন, কারণ তিনি শিশুকাল হইতে নিজের সুখের জন্য অপরকে কষ্ট দেন নাই, এবং সকলের হাতে খান নাই। বড় হইয়া

তিনি কেবল জীবের সেবা করিয়াছেন। কাহার সেবা গ্রহণ করেন নাই। তাহার উপর, সেই দিন বৃষ্টি হওয়ায় উঠানে কাদা হইয়াছে। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। সকলেই জানিতেন, এসময় যে তাঁহার জন্য তামাক নিয়া যাইবে, সে অপ্রস্তুত হইবে। নাগমহাশয় কখন তামাক খাইবেন না। তামাক নিয়া গেলে লোকে যে কষ্ট পাইবে, নাগমহাশয় সেই কষ্ট দেখিয়া, হায়, হায়, করিয়া নিজেই কাদায় নামিয়া আসিবেন। নাগমহাশয়ের জন্য তামাক হাতে লইয়া কাদায় পা দিতে না দিতে তিনি কাদায় নামিয়া, হুকা হাতে করিয়া নিয়া তাহাকেই তামাক খাওয়াইবেন। নাগমহাশয়কে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইবে। তাঁহার কষ্ট দেওয়া কাহার ইচ্ছা ছিল না। একটী লোক স্বামীকে বলিলেন, আপনি নাগমহাশয়কে তামাক দিয়া আসুন। স্বামী কাহাকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কারণ তিনি চিরকালেই শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের সাথে বাদানুবাদ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। তিনি হুকা লইয়া চলিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর, আজ যদি তুমি এই তামাক না খাও, লোকের নিকট বড় লজ্জা পাইব। তুমি জান, আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই। আমি কোন সাহসে তোমাকে তামাক দিব! যদি তুমি নিজগুণে তামাক নেও, তবেই আমি দিতে পারি। এইরূপ ভাবিয়া, তিনি হুঁকা নিয়া নাগমহাশয়কে দিলেন। নাগমহাশয় হাতবাড়াইয়া হুঁকা নিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না, স্নেহে দুই চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। তিনি স্বামীর মনের ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। স্বামীর মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন স্বামী দেওভোগে আছেন। পাত্রে কতকগুলি পান ছিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি নাগমহাশয়কে একটী পান-বানাইয়া দেন। একটী পান সাজিলেন। ভয়ে ভয়ে তিনি নাগমহাশয়ের হাতের নিকট পানটী ধরিলেন। নাগমহাশয় দয়া করিয়া পানটী হাতে নিয়া খাইলেন। স্বামীর মনে অতিশয় সুখ হইল। সেই সুখের সঙ্গে দুঃখ আসিয়া জুটিল। লোক যেরূপ পানের সঙ্গে একটু চুনও দেয়, তিনি সেইরূপ একটী কৌটার করিয়া সামান্য চুনও দিলেন। নাগমহাশয় যেমন পান মুখে দিলেন, তেমন চুনও খাইয়া ফেলিলেন। পানে যেরূপ চুন ঠিক করিয়া লইতে হয়, তেমন কিছু করিলেন না। পান ও চুন তাঁহার নিকট সমান হইল। কিন্তু যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদযে ব্যথা লাগিল। কি করিবেন ? নাগমহাশয় সুখী হইলেন। চুণে যেন কোন কষ্ট পান নাই, এই ভাব প্রকাশ করিয়া স্নেহের সহিত তাঁহাব দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্বামী তাঁহার দয়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অনেক সময় নাগমহাশয়কে কোন কথা বলিতে হইত না। মনে কোন কথা উঠিলে, নিজেই তাহার উত্তর দিতেন। একদিন স্বামীর মনে হইয়াছিল, হিন্দুমাত্রেই কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা মানে। সমস্ত ছাড়িয়া যে নাগমহাশয়কে ইষ্টদেব বলিয়া ধরিলাম, শেষে ত ঠকিব না ? সারা জীবন একভাবে চলিয়া যাইবে, সুখে হউক, দুঃখে হউক, একভাবে দিন কাটিবে। অবশেষে শেষের দিন উপস্থিত হইলে, যদি তিনি আমাকে রক্ষা না করেন, তিনি শেষের সেই দিনে যদি আমাকে ভবপারে না নিয়া যান, তবে কি হইবে! জগতে দেখিতে পাই, যাহারা কালী দুর্গা প্রভৃতি মানিয়া

চলেন, তাহারা ইহকালে সংসারের শত আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া স্থির পদবিক্ষেপে চলিয়া যান, কোনদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। পরকালে কি হয়, তাহা দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু শাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা পরকালে তাঁহাতেই মিশিয়া যান, কিম্বা তাঁহাদের সহিত একত্রে অবস্থান করেন। নাগমহাশয়কে মানিলে আমি কি সেইরূপ চলিয়া যাইতে পারিব ? সংসারে আরও দেখিতে পাই. কত লোক ভণ্ডামি করিয়া, কত লোক মজাইয়া, পথের ভিখারী কবিযা দেয়, ইহকাল ও পরকাল উভয় নষ্ট করিয়া দেয়। তবে কি হইবে ? আমি কি করিয়া জানিব, নাগমহাশয় সত্য সত্যই ভবকর্ণধার, ইহকালে সংসারের সহস্র প্রলোভনে, লক্ষ কদর্য্য পথে আমাকে রক্ষা করিবেন এবং অন্তিমে তাঁহার রাতুল চবণে স্থান দিবেন ? এই কথাগুলি মনে হওয়া মাত্র নাগমহাশয় বলিযা উঠিলেন, দেখুন, আমরা আজ হই নাই, অনন্তকাল যাবত অবস্থান করিতেছি, অনন্তকাল যাবত পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া মায়াময় জগতে রহিয়াছি। কত জীবনইত গেল, আজ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মানি, তিনি যদি ভগবান্ নাই হন, তবে আর একটা জীবন বৈত নয় ? স্বামী সুস্থ হইলেন, তাঁহার শ্রীচরণে জীবন বিকাইলেন।

স্বামি বলেন, নাগমাহাশয় আমাকে নিজ গুণে রক্ষা করিলেন। আমি যে পাষণ্ড, যদি নাগমহাশয় এই কথা না বলিতেন, আমি কোথায় যে চলিয়া যাইতাম, কি অন্যায় কাজ যে না করিতাম, তাহার ঠিক ছিল না। এই আবর্ত্তপূর্ণসংসারসাগরে, নাগমহাশয়ের দয়া ধ্রুবতারা। যখন মায়ার তাড়নায় ভগ্নহৃদয় লইয়া হতাশকুয়াশার ভিতর দিয়া কিছু দেখিতে

পাই না, যখন বিষয়-বাসনা ঝঞ্ঝাবাতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া, নিজকে সামলাইতে না পারিয়া, জীবন-তরীকে ডুবাইতে বসি, উর্দ্ধমুখ হইয়া আমার ধ্রুবতারার দিকে আকুল মনে তাকাই, কুয়াশা লুকাইয়া যায়, ঝঞ্ঝাবতি প্রশমিত হয়, নির্ম্মল সংসার-পাথারে জীবনতরী তর্ তর্ করিয়া চলে, অনাবিল আনন্দে চারিদিক ভর্ পুর্ হয়।

স্বামীর মনে বিশ্বাস ছিল, ভক্তের মনে কষ্ট দিলে, ভগবান্ও কষ্ট পান। এই বিশ্বাস হেতু যখন আমি ভয় পাইয়া নাগমহাশয়ের কাছে গিয়া সুস্থ হইয়া নাগমহাশয়ের ধ্যান করিতাম, তিনি আমাকে কিছু বলিতেন না। যে দিন ইচ্ছা হইত আমরা একত্র শুইতাম, ইচ্ছা না হইলে আমরা ভিন্ন বিছানায় শুইতাম। আমি ভয় পাইয়া নাগমহাশয়েব কাছে গিয়াছি পর, কি কাজ করিলে নাগমহাশয় সুখী হইবেন, তাহা আমার চেযে স্বামী অধিক বিচার করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস নাগমহাশয় উপহাস ছলেও কখন মিথ্যা কথা বলেন না এবং যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে নাগ মহাশয় নিজে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি কখন নাগমহাশয়কে মুখে কিছু বলিতেন না। আমি কুচিয়ামোড়া হইতে চলিয়া আসিলাম পর, আমার পিতা মনে করিলেন, এ মেয়ে নিয়া সংসার করা চলিবে না, সুতরাং তিনি স্বামীকে অপর বিবাহ করিতে বলিলেন। স্বামী মনে কষ্ট পাইলেন, কাহাকে কিছু বলিলেন না। এদিকে পিতা দেওভোগ যাইয়া নাগমহাশয়কে বলিলেন, ঠাকুর ভাই, আমি পার্ব্বতীকে অপর বিবাহ করিতে বলিলাম। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পিতাকে বলিলেন, পার্ব্বতী আবার বিবাহ করিবে? না। পার্ব্বতী আর বিবাহ করিবে না। পিতা

বলেন, আমি ঠাকুর ভাইয়ের এমন মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই। চক্ষু দুইটী ঢল ঢল করিতে লাগিল। তাঁহার সেই মূর্ত্তি এবং বিস্ফারিত লোচন এখনও আমার নয়নে ভাসিতেছে। অবশেষে নাগমহাশকে বলিলেন, পার্ব্বতার দিকে তাকাইতে আমার কষ্ট হয়। ছেলে মানুষ, সে কি করিবে? নাগমহাশয় বলিলেন, এখন খুকীকে যেমন দেখিতেছ, এই রূপ থাকিবে না। তাহাকে সংসার করিতে হইবে। পিতা অতিশয় সুখী হইয়া বাড়ীতে আসিলেন। নাগমহাশয়ের বাক্য বেদবাক্য। বেশ সংসার করিতেছি; এমন সংসার আর কতদিন যে করিতে হইবে, নাগমহাশয়ই জানেন।

এবার স্বামীর সঙ্গে কুচিয়ামোড়া যাওয়া স্থির হইল। পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি যদি তথায় যাইতে চাও যাও, অনর্থক গোলমাল কবিয়া কোন লাভ নাই। মা আমার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। আমরা সকলে দেওভোগ গেলাম। নাগমহাশয় মুখ ধুইতে ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে জল ছিল। তিনি অপর পার হইতে নৌকা ঠেলিয়া দিলেন। আমরা নৌকায় উঠিলাম। স্বামী নৌকায় উঠিলেন না, তিনি জলে নামিয়া অপর পার গেলেন। আমি নাগমহাশয়কে দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, তুমি স্বপ্নে আমার মন ঘুরাইয়া দিয়াছ। স্বপ্নের চিত্র যেন এখনও সত্য বলিয়া বোধ হয়। স্বামী সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। এখন মনে ভয় হয়, আমি স্বামীবাড়ী না গেলে যদি তিনি সন্ন্যাসী হন। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্বামীর সাথে যাওয়া স্থির হইল। মা ঠাকুরাণী বাঁধিতে পারিলেন না। আমার মা মহা আনন্দে নাগমহাশয়ের

জন্য রান্না করিলেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইলেন। আসিবার সময় মা নাগমহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মা, তুমি যদি শান্ত হইয়া থাক, সকলেই শান্তি পাইবে। তোমাকে ক্ষেপা দেখিলে সকলের কষ্ট হয়। আমি মনে মনে বলিলাম, তুমি স্বপ্ন দেখাইয়া মন ঘুরাইয়া দিয়াছ, আমি আর অস্থির হইব না। নাগমহাশয় স্নেহ দৃষ্টির সহিত স্বামীর দিকে তাকাইয়া আমার মাথায় হাত বুলাইলেন। তাঁহাকে তাকাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীর সাথে যাইতে বলিলেন। মাকে মধুর বাক্য সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, ঠাকুরের দিকে তাকান। ভগবান্ মঙ্গল করিবেন। নাগমহাশয়ের স্নেহে বশীভূত হইয়া আমরা সকলে একমনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। কতক সময় থাকিয়া, আমরা ফিরিয়া আসিলাম। যতদূর দেখা গিয়াছিল, নাগমহাশয় চাহিয়া ছিলেন।

আমরা কুচিয়ামোড়া আসিলাম। মা আমাকে তথায় রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। স্বামী অতিশয় সুখী হইয়া ঠাকুরের নামের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। যখন আমি ঠাকুরের নাম করিতাম, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতাম। যতক্ষণ ইচ্ছা ঠাকুরের নাম করিতাম। সকালে ও সন্ধ্যায় ঠাকুরের নাম করিতাম। এই ভাবে ৯।১০ দিন গেল। জগদ্ধাত্রীপূজা আসিল। আবার দেওভোগ যাওয়ার জন্য আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। পিতা নৌকা পাঠাইয়া দিলেন। নৌকা দেখিয়া তথাকার লোক গালাগালি দিতে লাগিল। স্বামীকে বলিলাম, আমি দেওভোগ যাইব, তুমি আমাকে নিয়া চল। স্বামী বলিলেন, সকলে

তোমাকে এখান হইতে পাঠাইতে মানা করিতেছে। আমি কি করিয়া তোমাকে নিয়া যাইতে পারি? আমি বলিলাম, তুমি নিলে কে ধরিতে পারে? এই ভাবে সকল রাত্রি স্বামীকে বলিলাম। স্বামী বলিলেন, তুমি সংসার জান না, তাই এই ভাবে বল। আমি বলিলাম, আমি কোন অবস্থায়ই জগদ্ধাত্রী-পূজায় এখানে থাকিব না। আমি দেওভোগ যাইব। অবশেষে স্বামী বলিলেন, যদি তুমি আমাকে নাগমহাশয়কে দেখাইতে পার, তবে আমি তোমাকে নিয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম, আমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখাইব। এবার স্বামী অস্বীকার করিলেন। আমার মনে হইল, আমি যখন যে বিপদে পড়ি, তিনি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করেন। এবার বলিব, যদি তুমি আমার স্বামীকে দেখা না দাও, স্বামী সন্ন্যাসী হইবেন, এবং তিনি আমার কষ্ট দূর করিতে, দয়া করিয়া স্বামীকে দেখা দিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া, স্বামীর কথা স্বীকার করিয়া, দেওভোগ রওনা হইলাম। স্বামীর ভগ্নি অতিশয় রাগিয়া গেলেন। স্বামী আমাকে পথে বলিলেন, দেখেছ, সমস্ত ছাড়িয়া তোমাকে নিয়া চলিলাম, যদি তাঁহাকে না দেখাও, আমি সন্ন্যাসী হইব। আমি নাগমহাশয়কে স্মরণ করিতে করিতে স্বামীর সাথে দেওভোগ চলিলাম।

দেওভোগ যাইয়া দেখিতে পাইলাম, পিতা পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, আমি ভাবিতে-ছিলাম, তাহারা বোধহয় তোমাকে আসিতে দিবে না। ঠাকুর ভাইকে বারম্বার বলিয়াছি, এত দেরি হইতেছে কেন? নাগমহাশয় আমাকে এত ভাল বাসিতেন, আমি পিতার সাথে কথা বলিতেছি,

আমি তাঁহার কাছে না গেলেও, তিনি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার বাড়ী। অনেক লোক হইয়াছে। পিতা ও আমি রান্না ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার কি করিয়া আসিলে? আমি কুচিয়ামোড়া গিয়া কিভাবে ছিলাম, কি রকম ব্যবহার পাইয়াছি, তিনি সব শুনিলেন। হায় ভগবন্ আজ তুমি কোথায়? সংসারে হাবু-ডুবু খাইলেও একবার আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াও না! আমার উপর চিরকালই তাঁহার দয়া ছিল। স্বামীর ছুটি ফুরাইলে, আমি যে কুচিয়ামোড়া থাকি, তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল না। নাগমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আবার কুচিয়ামোড়া যাইবে? শীঘ্রই বোধহয় পার্ব্বতীর কলেজ খুলিবে? আমি পিতাকে এই কথা বলিলাম। পিতা বলিলেন, স্বামী নিয়া যাইতে চাহিলে নিতে পারে। নাগমহাশয় আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

স্বামী ধীর স্থির। তিনি চিরকালই বড় চালাক ছিলেন। স্বপ্নের কথা স্বামীকে বলিয়াছিলাম। স্বামী তখনই বলিলেন, সকলই তাঁহার কৌশল। তিনি সন্ন্যাসী হইবেন, এই ভয়ে মন যাহাতে আরও ব্যাকুল হয়, তজ্জন্য কুচিয়ামোড়া যাওয়ার সময় নৌকায় নিমাই সন্ন্যাসের কথা বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুমের অবস্থায় যে নিমাই ঘরের বাহির হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। নিমাই সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নৌকায় থাকিয়া মনে মনে নাগমহাশয়কে বলিতে লাগিলাম, ভগবন, কি উপায় হইবে? যদি তোমাকে দেখাইব না বলিতাম, তবে

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তোমাব সাথে দেখা হইত না। তোমাকে দেখাব জন্য মন এত অস্থির হইল, কি উপায়ে আসিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। স্বামীকে অনেক বলিলাম। তিনি বলিলেন. যদি তোমাকে দেখাইতে পাবি, তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। আমি তোমাব সন্তান, আমার উপব তোমার অসীম দয়া, এই মনে কবিযা তাঁহাকে দেখাইতে স্বীকাব করিলাম; আমার কি শক্তি আছে যে, তোমাকে দেখাইতে পারি। তুমি যদি নিজগুণে আমাকে দেখা দেও, আমি তবিয়া যাই। আমি আবার কাহাকে দেখাইব? নাগমহাশয়ের বিষযও নিমাই সন্ন্যাস স্বামী যাহা বলিলেন, সমস্তই শুনিলাম। যে কথাব উত্তর দিতে হয় দিলাম।

সন্ধ্যার সময় কুচিয়ামোড়া আসিলাম। যে স্থানে আমি ঠাকুরের নাম করিতাম, সেইখানে ঠাকুবের নাম কবিতে বসিলাম। স্বামী বলিলেন, আজ তুমি আমাকে ঠাকুর দেখাইবা, আমি তোমার কাছে ঠাকুবের নাম নিতে বসিব। স্বামী আমার কাছে বসিলেন। সেদিন আমি তাঁহার নাম নিব কি, ভয়ে ভযে কেবল বলিতে লাগিলাম, ভগবন, তুমি কে, আমি তাহা জানি না। তবে প্রথম দেখার পর হইতে তোমার কৃপা অনুভব করিতেছি। সংসারের যন্ত্রণায আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, তুমিই আড়ালে থাকিয়া বলিলা, তোমাকে ভগবান্ দেখা দিবেন, একাজ করিও না, তোমার কষ্ট শীঘ্রই শেষ হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ভয় পাইলাম। তুমি দেখা দিলে। এক বৎসরের মধ্যে সংসারের কষ্ট শেষ হইল। এখানে আসিয়া যখন পাগলের মত একাকী ঘরের বাহির হইলাম, তুমি পথ দেখাইয়া

নিলে এবং তুমিই সম্মুখে একখানা নৌকা আনিয়া, আমাকে তোমার কাছে লইয়া গেলে; মহাবিপদ হইতে ত্রাণ করিলে। ছোট সময় তোমাকে দেখার পূর্ব্বে, যখন ভয়ে অন্ধকার দেখিতাম, ঘুম আসিত না, তখন তুমিই জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেখা দিতে এবং আমাকে শান্তি দিতে। পিতঃ, তুমিত সমস্ত জান। এখন তুমি তোমার ভক্তকে দেখা দিয়া, আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। যদি তুমি আজ তাঁহাকে দেখা না দেও, তোমার ভক্ত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। আমার কি উপায় হইবে? আমি এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, তোমার কাছে আর যাইতে পারিব না। দয়াময়, তোমার ভক্তকে দেখা দিয়া আমাকে রক্ষা কর। দেওভোগ হইতে পঞ্চসার যাইয়া, তুমি আমাকে দেখা দিয়েছিলে। নাগমহাশয়কে এই ভাবে মনে মনে বলিতে বলিতে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল।

আমার জ্ঞান হইলে, আমি কোথায় আছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একবার মনে হইতে লাগিল, দেওভোগ পড়িয়া গেলে, যেমন নাগমহাশয় আসিয়া কোলে নিতেন, সেই রূপ তিনি ধরিয়া আছেন। আবার ভাবিলাম, আমরা দেওভোগ হইতে চলিয়া আসিয়াছি। এই ভাবে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় স্বামী বলিলেন, তিনি আমায় দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন, তুমি সুস্থ হও। তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলা, আমি তোমাকে ধরিয়া বসিয়াছি। এই তোমার জ্ঞান হওয়ায় নড়িয়া উঠিয়াছ। স্বামীর কথা শুনিয়া, তাঁহার দয়া মনে পড়ায়, আমার কান্না আসিতে লাগিল। স্বামীকে বলিলাম, দেখ, এ সময় তিনি তোমাকে দেখা দিতেনই, আমাকে তোমার কাছে ভাল বানানের জন্য এতটুকু করিলেন।

তিনি আমার জন্য কি না করিলেন? দেওভোগ হইতে পঞ্চসার গেলেন। সেখানে আহার ও নিদ্রা কিছুই হইল না। রাত্রিতে জলে সাঁতার দিয়া বাড়ী গেলেন। আমি এই সমস্ত কষ্টের কারণ। আর তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবিতেছেন, কিসে আমার সুখ হইবে। স্বামী বলিলেন, তাঁহার কৃপার সীমা কোথায়! লোকে যেন এই সব কথা শুনিতে না পায়। অনেক সময় হইয়া গিয়াছে, এখন চল। স্বামীর কথামত ঠাকুরের নাম করার স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে যেন কেমন একটা ভার রহিল।

স্বামী নাগমহাশয়কে হৃদয়ে দেখিযাছেন। স্বামীর মন তাঁহাতে একবারে ডুবিয়া গিযাছে। আমি যেমন নাগমহাশয়কে দেখিয়া কাহার সাথে বেশী কথা বলিতে পারিতাম না, সময় মত থাইতাম না, স্বামীরও সেই ভাব। তিনি থাইতে বসিতেন, অন্ন দুটী থাইয়া উঠিয়া যাইতেন। তিনি কেবল নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। রাত্রিতে তিনি আমার কাছে শুইতেন, কিন্তু তাঁহার সাড়া শব্দ থাকিত না। অবসর থাকিলে তিনি দিবসেও আমার কাছে থাকিতেন। নাগমহাশযের কথা বলিতাম। নাগ-মহাশয়ের বিষয় আমার জানা আছে কিনা, তাই আমার সঙ্গে যাহা হয বলিতেন। ৪।৫ রাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই। তিনি কেবল নাগমহাশয়ের চিন্তা করিতেন। আমার মনে সুখই হইত। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া, দেশের সকল লোক ইচ্ছামত আমাকে গালাগালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। আবার অন্য কেহ বলিল, দুর্গাচরণ নাগ উহাকে ঔষধ থাওয়াইয়াছে; দুর্গচারণ নাগ ছিল কাল সাপ।

আমি বড় বিপদে পড়িয়া গেলাম। আমার ভয়, অধিক কথা বলিলে যদি স্বামীর ভাব নষ্ট হইয়া যায়। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু নাগমহাশয়ের নিন্দা প্রাণে বড় লাগিত। স্বামী তাঁহার ভাবে বিভোর। একদিন বড়ই অসহ্য হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইঁহারা সকলে অযথা নাগমহাশায়ের নিন্দা করিতেছে। আমি আর এখানে থাকিব না। যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে বলুক, তিনি কি করিয়াছেন যে, ইহারা তাঁহাকে গালাগালি দিতেছে। এমন সময় আমার ননাস নাগমহাশয়কে গালি দিলেন। ইহাতে স্বামীর অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, আপনারা তাঁহার নিন্দা নিয়া মরিতেছেন কেন? যদি তাঁহার নাম নিযা আবার কিছু বলিবেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই সকল ভাঙ্গিয়া চুবিয়া একদিকে চলিয়া যাইব। স্বামীর রাগ দেখিয়া কেহ নাগমহাশয়কে আর কিছু বলিত না।

স্বামীর নিয়মমত খাওয়া ছিল না এবং অনিদ্রায় তাঁহার শরীর কাতর হইল। তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে লাগিলেন, রাত্রে ও সব রক্ত চুষিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। ওঝা দেখাইয়া বৌটাকে ছাড়াইতে হইবে। ও যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই থাকুক। পিতার নাম লোপ হইতে বসিল। তাহা এভাবেও থাকিবে না, ওভাবেও থাকিবে না। সকালে ও সন্ধ্যায় এত সময় বসিয়া কি করে? এরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল। আমি মনে মনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং গোপনে কাঁদিতাম। স্বামী তখন মহাভাবেই আছেন। তিনি কোন কথাই জানিতেন না। কলেজ খোলার ২।৩ দিন বাকী আছে। একদিন স্বামী বলিলেন, শীঘ্রই কলেজ খুলিবে।

লোকের সাথে মিশিতে হইবে। সকলের সঙ্গে কথা বলিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ কবিবা যেন আমাব মন তাঁহাতে রাখিতে পারে। আমি বলিলাম, যিনি তোমাকে দেখা দিয়াছেন, তাঁহাকে বল। মানুষের ইচ্ছায় কিছু যায় আসে না। তিনি বলিয়াছেন, ভগবান্ গুণ দেখিয়া ধরেন না, আবাব দোষ দেখিয়া ছাড়িয়া দেন না। জীব তাঁহাব কৃপা ছাড়া তাঁহাকে ধবিতে পারে না। আমি একদিন দেওভোগ হইতে আসাব সময় নাগমহাশয়কে বলিয়াছিলাম, এখন যাই। তিনি কোন উত্তব দিলেন না। আবাব যাই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অমন হাসি মাখা মুখ ঈষৎ মলিন করিয়া বলিতেছেন, যাই যাই, কি গো মা, যাই বলিতে নেই। ইহা বলিয়া তিনি আমাব হাত ধবিলেন। তাঁহাব এইরূপ স্নেহ দেখিয়া, আমাব মনে হইল, তাঁহার নিজ দেহ কাটিয়া এক খণ্ড মাংস দূরে ফেলিলে তিনি যত ব্যথা পাইতেন না, আমি তাঁহার কাছে যাই বলায় তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইয়াছেন। যিনি আমাদিগকে এত ভালবাসেন, তিনি কোন অবস্থায় আমাদিগকে ছাড়িতে পারিবেন না। তাঁহাব দয়া প্রত্যক্ষ অনুভব কবিলে—ভাবিয়া দেখ না, যখন দেওভোগ হইতে আসার সময় নাগমহাশয়কে বল, "এখন আসি," তিনি কেমন স্নেহ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাড়ান। যখন তাঁহাকে নমস্কাব করিতে যাও, স্নেহভরে তাঁহাব দুইটী চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে থাকে। নমস্কার করিলে যেন কিছু আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে একটু সড়িয়া যান, আবার স্নেহভরে তাকাইয়া সাথে সাথে হাটিতে থাকেন, যেন কতদূর চলিয়া যাইতেছি, যেন তিনি বুঝাইয়

লেন, যাহার যে কাজ, তাহা করিতে হইবে। তিনি এইরূপ অনুমতি দিয়াও, যতদূর দেখা যায়, তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার সেই স্নেহ মনে করিয়া কাজ করিবা। আমি তোমাকে আর কি বলিব, তাঁহার উপর আমার চেয়ে তোমার বিশ্বাস অধিক। তিনি বলিয়াছেন, গলায় পড়িয়াছে ঢোল বাজালেই সিদ্ধি। ˋ ৷৷ ৲

স্বামী বলিলেন, এখন তোমার কোন কষ্ট নাই। তুমি এখানেই থাক। আমি বলিলাম, তুমি ঢাকা যাইতেছ, আমি কাহার কাছে থাকিব? সকলে ওঝা আনিবে। স্বামী বলিলেন আমি সমস্ত বুঝাইয়া দিব। প্রত্যেক শনিবার আমি আসিব। তৎপর তিনি নিজ ভগ্নীকে বলিলেন, ধর্ম্মে হাত দিবেন না। সময়মত খায় আর না খায়, দুইবেলা ঠাকুরের নাম করিতে দিবেন। দেখিবেন যেন কোন অনিয়ম না হয়। যদি ওঝা আনেন, ভাল হইবে না। আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ও যে কি তাহা আমি জানি। জীবন্ত মাছ মারিবে না। কোন রকম শাক উঠাইবে না। দরজা বন্ধ করিয়া ঠাকুরের নাম করিবে, সে সময় কেহ গোলমাল করিতে পারিবে না। ইহা ভাল কি মন্দ, আমি বেশ জানি। ইহাতে অন্যের বিচার দরকার নাই। কাহাকেও আমাকে বুঝাইতে হইবে না। স্বামী সব ঠিক করিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। নাগমহাশয়ও বলিয়াছেন, ভগবান্ সকল স্থানে আছেন। তোমার উপর তাঁহার অপার দয়া, তোমার আবার ভয় কি? স্বামীর ভক্তি ও বিশ্বাস আমার চেয়ে বেশী। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বীর-পুরুষ বলিতেন। তাঁহার জীবন বড়ই পবিত্র। তাঁহার বয়স যখন ১৪ বৎসর, তিনি বিবাহ করেন।

আমি তাঁহার প্রায় সমস্ত জীবন জানি। কিছুতেই তাঁহাকে সত্যপথ হইতে টলাইতে পারে নাই।

নাগমহাশয় আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন; জগতে তাহার তুলনা হয় না। যখন ছোট ছিলাম, কিছু জানিতাম না, তাঁহার ভালবাসা ভালভাবে বুঝিতাম না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, চাড়া গাছে বেড়া দেওয়া হইয়াছে। লাউ কুমড়ার যেমন আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে, সেইরূপ আমার অভীষ্ঠ লাভের পর সাধনা। শিশুকালে এমন ধর্ম্ম ভাব কাহার হয়! এইরূপ তিনি দয়া করিয়া অনেক কথা বলিতেন। স্বামীর বিষয় হাসিয়া হাসিয়া বলিতেন, সকালেব তোলা মাখন, এ আর নষ্ট হইবে না। এ রকম কত কথা বলিতেন। আমাকে কত স্নেহ যত্ন করিয়াছেন কত আদর করিয়াছেন। সে সব এখন স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি আমাকে সকল অবস্থাতেই স্নেহ করিতেন। তিনি আমার সকল কাজেই সুখী ছিলেন। ছোট সময়ে এ ভাবে প্রসংশা করিয়া হাসিতে হাসিতে আদর করিতেন; যখন বড় হইলাম, স্বপ্ন দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম, তখন তিনি স্বামীর হাতে আমাকে তুলিয়া দিয়া, এত সুখী হইলেন, তাহা লিখিবার নয়। সে সময় নাগমহাশয়কে দেখিয়া আমার মনে হইল, পিতা যেমন বড় মেয়েকে উপযুক্ত জামাতার হাতে সঁপিয়া দিয়া সুখী হন, তিনি আমাকে স্বামীর কাছে সুখী দেখিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করিলেন। নাগমহাশয়ের স্নেহ বর্ণনা করা যায় না।

নাগমহাশয় বলিতেন, পথে পথে থাকিলে একদিন ভগবানের দয়া হয়। এলো-মেলো করিলে ধর্ম্ম হয় না। তিনি আদর করিয়া আমাদিগকে লক্ষীনারায়ণ বলিতেন। তিনি আমাকে

এত স্নেহ করিতেন, তাহা কি করিয়া ব্যক্ত করিব, জানি না। একদিন আমি স্নান করিয়া, নাগমহাশয়কে নমস্কার করিব মনে করিয়া, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দুর্গার ডানদিকে দাঁড়া করাইলে লক্ষ্মীর মত দেখা যায়। আমি লজ্জা পাইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি এত পাষাণ হইলাম কেন? কি করিয়া তাঁহার এত স্নেহ ভুলিয়া গেলাম? নাগমহাশয় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। ছোট সময় এক ভাবে গেল। নাগমহাশয় কিসে সুখী থাকিবেন, স্বামী সে বিচার করিতেন। যখন বড় হইলাম, তখন আর তত বিচার রহিল না। মানুষ শত চেষ্টা করিলেও সময়ের গতি রোধ করিতে পারে না। একবার আমরা দুই জন নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলাম। আমি মনে মনে তাঁহাকে বলিলাম, তুমি একবারে নিষ্কাম, জীব কি করিয়া কর্ম্মদ্বারা তোমাকে সুখী করিবে? নাগমহাশয় বলিলেন, তোমাদিগকে সুখে দেখিলেই আমি সুখী। তাঁহার সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে যাহা হইয়াছে, সকল কথার উত্তর দিলেন। নাগমহাশয় কখন আমাকে পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কখন নলদময়ন্তীর কথা বলিতেন। সময় সময় সাবিত্রী সত্যবানের জীবনের ঘটনা কহিতেন। স্বপ্ন দেখাইয়া মন ভুলাইয়া সতী রমণীর উপাখ্যান হইতে উপদেশ তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। ছোট সময় শিলা পিলা ও সাধ্বী রমণীর কথা বলিয়াছিলেন। একদিন নাগমহাশয় শিব পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, মা, চিরকালই লোকের কষ্ট। এক সময় জল ছিল না। গৌতম ঋষিগণের তপস্যা করিয়া জল আনিয়াছিলেন।

প্রতিবেশীদের অদমনীয় ঈর্ষ্যার ফলে গৌতমের লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। অন্যান্য মুনিদিগের তপস্যায় বশীভূত হইয়া গণেশ গোশিশুর রূপ ধারণ করিলেন, এবং গৌতমের ক্ষেত্রে যাইয়া ফসল খাইতে লাগিলেন। গৌতম তাহাকে তাঁহার ক্ষেত্র হইতে তাড়াইতে গেলেন। গণেশ অন্তর্ধান হইলেন। গোশিশু পড়িয়া রহিল। গৌতম গোহত্যা পাপে অপরাধী হইলেন। মুনিরা বলিলেন, তাহারা গৌতমের মুখ দেখিবেন না। গৌতম অতিশয় বিপদে পড়িলেন এবং মুনিদিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন, যাহাতে তিনি পাপমুক্ত হইতে পারেন। এ পর্যান্ত শুনিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম, নাগমহাশয় আমার পানে চাহিয়া আছেন। আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিলে পর তিনি বলিলেন, বাজারেব বেলা হইয়াছে, এখন বাজারে যাইব। তাঁহাব এত স্নেহ ছিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কষ্ট পাইব মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

নাগমহাশয় বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মা ঠাকুরাণী রাঁধা করিতে গেলেন। আমি কুটনা কুটিলাম। নাগমহাশয় আমাদের নিকট বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মা, সংসার বড় ভয়ঙ্কর স্থান। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। একজন ব্যতীত জগতকে পুত্রের মত দেখিবে। তিনি আবার পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এক দিন অহল্যা স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, ইন্দ্র তাহাকে সিক্ত বস্ত্রে দেখিতে পাইয়া কামাতুর হইলেন। কি করিয়া অহল্যার কাছে যাইবেন সেই অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিষ্য হইলে অনেক সময় গৌতমের আশ্রমে থাকিতে পারিবেন। গৌতম

কখন আশ্রমে থাকেন, কখন আশ্রমের বাহিরে যান, সমস্তই জানিতে পারিবেন, সুতরাং ইন্দ্র গৌতমের শিষ্য হইলেন। কয়েক দিনের পর, একদা ইন্দ্র দেখিলেন, গৌতম তপস্যা করিতে যাইতেছেন, অমনি গৌতমেব রূপ ধাবণ কবিয়া অহল্যার নিকটে গেলেন। অহল্যা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ এত শীঘ্র ফিবিয়া এলেন যে? গৌতমরূপী ইন্দ্র বলিলেন, কতদুব যাইয়া আমাব মন চঞ্চল হইল, তাই ফিরিয়া আসিলাম। অহল্যা গৌতম-রূপধারী ইন্দ্রকে জানিতে পারিলেন না। উভয়ে নিভৃত স্থানে গেলেন। গৌতম ধ্যানে সব জানিতে পারিলেন এবং ধ্যান ভঙ্গ কবিয়া আশ্রমে আসিলেন। গৌতমকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে পালাইতে লাগিলেন। গৌতম পলায়নপব ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। অহল্যা গৌতমকে দেখিয়া কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইলেন এবং ইন্দ্রকে পলাইতে অবলোকন করিয়া তাহাব চৈতন্য হইল। তিনি বাতা-হত কদলীপত্রেব ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গৌতমের পদযুগলে পডিলেন। অহল্যা পাষাণী হইলেন। ইন্দ্রেব সমস্ত শরীব ভগে পূর্ণ হইল। অহল্যা নাজানিয়া দোষ করিয়াছে জানায় মুনির মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, ত্রেতাযুগে যখন পিতৃ সত্য পালন কবিতে রামচন্দ্র বনে আসিবেন, তাঁহার চরণস্পর্শে তোমার শাপ মোচন হইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, মেয়েলোকের সাথে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও, কিন্তু পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান। দেখ না, পরমহংসদেবের ব্রাহ্মণী পুরুষেব সাথে বড় কথা বলেন না। তুমিও ঐ রকম থাকিও। নাগমহাশয় আমাকে তিনবার সাবধান করিলেন এবং বলিলেন,—

যত দিন পুড়ে শ্মশানে না পড়ে ছাই,
তত দিন সতীত্বের বিশ্বাস নাই।

নাগমহাশয় বলিলেন, মা, একটী মেয়ে সতী ছিল। তাহার অতিশয় অসুখ হইল। সকলে মনে করিল, এবার সে মারা যাইবে। তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া পিতা বলিলেন, আজ দেশ সতীশূন্য হইল। মেয়েটী অমনি বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি এখনও মরি নাই। এখন কিছু বলিবেন না। যদি বাঁচিয়া কোন কুকার্য্য করিয়া বসি। নাগমহাশয় আমাব মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহা তিনি বলিতেন। সাবিত্রী সত্যবানের গল্প বলিতে বলিতে কহিয়াছিলেন, মা, সাবিত্রী সতীত্বের জোরে মরা স্বামী বাচাইয়া আনিলেন। সাবিত্রীর তেজ দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইল না। সাবিত্রীর বিবাহেব বযস হইয়াছে। সাবিত্রীর পিতা তাঁহাকে স্বামীবরণ করিতে বলিলেন। একদিন তিনি বনে যাইয়া সত্যবানকে মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করিলেন এবং পিতাকে সকল কথা বলিলেন। নারদ তাহা শুনিয়া বলিলেন, সত্যবানের সকলই গুণ, দোষ মাত্র একটী। সত্যবানের আয়ু ১৬ বৎসর। রাজা সত্যবানেব সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, মনে মনে যাহাকে একবার বরণ করিয়াছি, তাহাকেই বিবাহ করিব। নারদ অনেক কথা বলিলেন। সাবিত্রী কোন কথাই মানিলেন না। রাজা সত্যবানের পিতার নিকট চর পাঠাইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। সত্যবানের মৃত্যুর দিন সমুপস্থিত দেখিয়া সাবিত্রী একটী ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রতের শেষ দিন সত্যবানের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। সাবিত্রী তাহা জানিতেন, অন্য কেহ সেই কথা জানিত না।

সত্যবান কাষ্ঠ আহরণ করিতে বনে গেলেন। সাবিত্রী তাহার সঙ্গে যাইবেন বলায় শ্বশুর বারণ করিলেন। অবশেষে সাবিত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে সত্যবানের সহিত বনে যাইতে দিলেন। কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিয়া সত্যবান অস্থির হইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী নিজ ক্রোড়ে স্বামীর মাথা রাখিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন, যম সত্যবানকে নিতে আসিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? এখানে কেন আসিয়াছেন? যম বলিলেন, আমি যম। সত্যবানেব আযুঃকাল শেষ হইয়াছে। আমি তাহাকে নিতে আসিয়াছি। তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি ইচ্ছা করিলে বর নিতে পার। সাবিত্রী বলিলেন, আমার পিতার পুত্র নাই। যম 'পুত্র হইবে' বলিয়া বব দিয়া যাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী পিছনে চলিলেন, যম তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আর এক বব দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, 'আমার শ্বশুব অন্ধ'। যম তাহার দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন। সাবিত্রী আবাব পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং আর এক বর চাহিতে আদিষ্টা হইলেন। সাবিত্রী শ্বশুরের হৃতরাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন। যম তাহাও দিলেন। তৎপর যমের সহিত সাবিত্রীর অনেক কথা হইল, তাহাতে সন্তুষ্ট হইযা যম আর এক বর দিতে রাজি হইলেন এবং সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে শত পুত্র চাহিলেন। যম তথাস্তু বলিলেন। যম আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আবার সাবিত্রীকে পিছনে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন, আর কেন? অনেক বর দিয়াছি, এখন ফিরিয়া যাও। সাবিত্রী বলিলেন, তাহা কিরূপে হইবে? আপনি বর দিয়াছেন, সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্র হইবে, অথচ আপনি

তাহাকে লইয়া যাইতেছেন। যম সাবিত্রীর কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি সত্যবানকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমার সতীত্বের জোরে মরা স্বামী জীবন লাভ করিল। চারি যুগে তোমার কীর্ত্তি ঘোষিবে।

নাগমহাশয় বলিলেন, মা, মেয়েদের সতীত্ব থাকিলে সমস্তই থাকে। দময়ন্তী বনে গেলেন, দস্যুগণ তাঁহার সতীত্বের তেজ দেখিয়া নিকটে যাইতে পারিল না। মীরাবাই সতীলক্ষ্মী ছিলেন। সতী থাকিলে মুক্তি হয়। মীরাবাইয়ের নির্ব্বান লাভ হইয়াছে। নাগমহাশয় আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে কত উপদেশ দিয়াছেন। এক সাধ্বী রমণীর স্বামীর কুষ্ঠরোগ ছিল। প্রত্যহ রজনীশেষে সেই রমণী স্বামীকে মাথায় লইয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিতেন। একদা গঙ্গাস্নান করিয়া, স্বামীকে মাথায় করিয়া নিয়া আসিতেছেন, দৈবাৎ এক তাপসের গায় তাহার পা লাগিল। তাপস ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, তোর স্বামী নিয়া এত অহঙ্কার। তাহাকে মাথায় নিয়া আমার শরীরে পা তুলিয়া দিতেও তোর একবার মনে ভয় হইল না। রাত্রি ভোর হইলে তোর স্বামী দেহত্যাগ করিবে। সাধ্বী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইলেন, কি করিবেন। না দেখিয়া তাপসের গায়ে পা দিয়াছেন, তাহার কোন দোষ ছিল না। তাই তিনি বলিলেন, যদি আমি সতী হই, এ রাত্রি আর ভোর হইবে না। রাত্রি আর ভোর হয় না। একই ভাবে চলিতে লাগিল। দেবতাগণ তাপসের বহুতর নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, সতীর কোন দোষ নাই। সে না দেখিয়া তোমার গায় পা দিয়াছে। তুমি তাহাকে অভিশাপ দিলে কোন? সতীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, রাত্রি

ভোব হইবে না। তাপস বলিলেন, আমার কথাও মিথ্যা হইবে না। দেবতাগণ সতীকে অনেক বুঝাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, তোমার কথা তুমি ফিবাইয়া লও। এখন তোমাব স্বামীব কুষ্ঠ আছে, এই দেহত্যাগ হইলে, তাহার শবীর সুন্দব ও নিরাময় হইবে। তুমি তোমাব বাক্য প্রত্যাহাব কব। সাধ্বী রাজি হইলেন এবং বলিলেন, আমাব কোন পাপেব ফলে স্বামীব কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপেব ফলে আমাব বাক্য মিথ্যা হউক, বাত্রি ভোব হউক। বাত্রি ভোব হইল। স্বামী সুন্দব দেহধাবণ কবিয়া স্বাধ্বীব কাছে গেলেন।

একদিন নাগমহাশয় বলিলেন, এক মুনি বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, অনেক দিন হইয়া গেল, ভগবান্ দেখা দেন না, মনে কষ্ট পাইয়া সংসাবে ফিবিয়া আসিতে লাগিলেন। একদল কবুতর আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে মুনিব মাথায মলত্যাগ কবিল। মুনি বোষকষায়িত লোচনে আকাশপানে তাকাইলেন। কবুতরগুলি ভস্ম হইয়া গেল। তাহা দেখিযা মুনি ভাবিলেন, তাহার তপস্যার একটী ফল হইয়াছে। পথেব ধারে একটী বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইযা উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, এক বমণী স্বামীব পদসেবা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সেই বমণী উঠিলেন না। রেগে গর গর করিতে করিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া বমণী বলিয়া উঠিলেন, আমিত আব কবুতর নই যে, আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। মুনি অবাক হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া জানিলেন, আমি কবুতর ভস্ম করিয়াছি। সাধ্বী রমণী বলিলেন, আমি পতিসেবা করিয়া

ঘরে বসিয়া সব জানিতে পারি। মুনি বলিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি এতকাল তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করিতে পারিলাম না, আপনি ঘরে বসিয়াই এক পতিসেবা করিয়া সেই শক্তিলাভ করিলেন। সাধ্বী উত্তর করিলেন, আপনারা কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফললাভ করেন, আমরা ঘরে বসিয়া এক পাতিব্রত্য পালন করিয়া তাহা লাভ করি। নাগমহাশয় সময় বুঝিয়া সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন।

একদিন আমরা দুইজন নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি। কি এক সামান্য কথা নিয়া স্বামীর সহিত বাদানুবাদ হইয়াছিল। স্বামীর চক্ষে আমার দৃষ্টি পড়ায় আমি গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইলাম। স্বামী হাসিতে হাসিতে নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, ও ভ্রমরীর মত পাগল। ভ্রমরী স্বামীকে বড় ভালবাসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার সহিত তুচ্ছ বিষয় লইয়া ঝগড়া করিত। তাহার বাসনা ছিল যেন সে স্বামীর কাছে মরিতে পারে। কালক্রমে তাহার মৃত্যুর দিন আসিল। তাহার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে, সে চাঁদের আলো দেখিতে দেখিতে অন্তিম শয্যায় শুইয়া স্বামীর কথা মনে করিতে লাগিল। স্বামী এক জমিদারের অধীনে কাজ করিত। কোন কারণবশতঃ সেইরাত্রে বাড়ী আসিল। ভ্রমরীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল। ভ্রমরী স্বামীকে দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিল। নাগ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অমঙ্গল হয় না। তোমরা সাধ্বী থাকিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে। মেয়েদের সতীত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। পাঁচ মণ দুধে এক

ফোটা গোমূত্র পড়িলে সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। পতিব্রতা ধর্ম্মপালন করিলে ভগবান্ সুখী হন। স্বামীকে অপ্রীতিকর বাক্য বলিতে নাই। যদি স্বামী কখন কড়া কথা বলেন, মনে করিতে হয়, আমারই দোষ থাকায় কড়া কথা শুনিলাম, নচেৎ স্বামী তাহা বলিবেন কেন? স্বামী কড়া কথা বলিলেও তাহাকে নারায়ণ জ্ঞান করিতে হয়। স্বামীর দোষ মনে করা পাপ। নাগমহাশয় আমাকে এত স্নেহ করিতেন, আমি সামান্য কষ্ট পাইলে, তিনি তাহা বোধ করিতেন।

গিরিশবাবু বলিয়াছেন, সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে ভক্তের উপর নাগমহাশয়ের মাতৃবৎ স্নেহ। তাহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছি। যখন স্বামী বি এ পড়েন, তিনি এক শনিবার নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন, অপর শনিবার আমার কাছে আসিতেন। একবার ছয় দিনের ছুটি পাইয়া স্বামী আমার কাছে আসিয়াছেন। দুইদিন বাকি থাকিতে বলিলেন, তিনি সেই দিন চলিয়া যাইবেন, কারণ পড়ার অতিশয় ক্ষতি হইতেছিল। আমি ছুটি থাকিতে তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজি হই নাই। তাঁহাকে সেখানে পড়িতে বলিলাম। তিনি কোন মতে স্বীকার করিলেন না এবং অনেক ওজর দেখাইলেন। আমিও কিছু মানিলাম না। অবশেষে তিনি একটু বিরক্তি দেখাইয়া বলিলেন, যেমন আজ যাইতে পারিব না, দুই মাসের আগে আর এখানে আসিব না। মনে মনে এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া ছুটির শেষ দিন ঢাকা গেলেন। পরের সপ্তাহে নাগ-মহাশয়কে দেখিতে দেওভোগ গিয়াছেন। ঢাকা ফিরিয়া যাওয়ার সময় নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চসার

গিয়াছিলেন কি? দুই মাসের পূর্ব্বে তথায় যাইবেন না বলিয়া মনে মনে উত্তর দিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আগামী শনিবার পঞ্চসার যাইবেন। স্বামী মনে মনে বলিলেন, আমরা পঞ্চসার গ্রামে এক ঘরের এক কোণে বসিয়া কি কথা বলিয়াছি, তাহা তুমি দেওভোগ বসিয়া শুনিয়াছ এবং মধ্যস্থ হইয়া গোল মিটাইয়া দিলে। শনিবার রাত্রিতে স্বামীকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল একাদশী তিথি, তোমার উপবাস। আজ ঠাণ্ডা ভাত খাইয়া কি করিয়া থাকিবে? জানা থাকিলে, তোমার খাওয়ার জিনিষ তৈয়ার রাখিতাম। এখন অনেক রাত্র হইয়াছে। তোমার যে দৃঢ়পণ, আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি দুই মাসের পূর্ব্বে এখানে আসিবে না। স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমি নাগমহাশয়ের যে আদরের মেয়ে, তোমার মনে আবার কষ্ট দেওয়া যায়। দেওভোগ হইতে ঢাকা যাওয়ার সময় নাগমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পঞ্চসার গিয়াছিলাম কিনা। দুই মাসের পূর্ব্বে এখানে আসিব না মনে করিয়া, যিনি সমস্ত জানেন তাঁহাকে মূর্খের মত মনে মনে উত্তর দিলাম, হাঁ, সেদিন গিয়াছিলাম। তিনি আর কিছু না বলিয়া আমাকে শনিবার আসিতে বলিলেন, তাই আজ আসিয়াছি। নাগমহাশয়ের স্নেহ দেখিয়া আমি বলিতে লাগিলাম, সকল অবতারের সময়ে ভুল হয়, কিন্তু নাগমহাশয়ের মুহূর্ত্তের তরে ভুল দেখিতে পাইলাম না। সাক্ষাতে ত মনের কথার উত্তর দেনই, তাঁহার অসাক্ষাতে কি করিতেছি, তাহাও দেখিতেছেন। শুধু দেখা না, সামান্য অসুবিধা হইতে দিতেছেন না। আমাদের সামান্য কষ্ট দেখিতে পারিলেন

না। তিনি আমার জন্য না পারিলেন, এমন কাজ নাই। মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ভুলশূন্য হয়, এমন কোথায় দেখা যায় না। তিনি সব জানিয়া এমন ভাবে নিজকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, লোক মনে করে, তিনি কিছুই জানেন না। এমন আত্মগোপন আর কেহ করে নাই। তিনি সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে সমভাবে স্নেহ করিয়াছেন, যেন ভক্তের সামান্য অভাব বোধ না হয়।

একদিন নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, তিনি স্নেহের সহিত আমাকে বুঝাইতেছেন, কি করিয়া ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর হয়। তিনি বলিলেন, ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর কথাটী সোজা, কাজ সোজা নয়। যে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া, ভগবান্ রক্ষা করিবেন বলিয়া, তাল গাছের উপর হইতে পড়িয়া যাইতে পারে, তাহার ভগবানে নির্ভর হইয়াছে; সে সুখে দুঃখে সমভাবে ভগবানের উপর তাকাইয়া থাকিতে পারে। আপনার এক চুল চেষ্টা থাকিতে ভগবানে নির্ভর আসে না। কুরুসভায় যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে কাপড় ধরিয়া রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততক্ষণ দেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন নিরুপায় হইয়া নিজের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জোরহাত করিয়া উর্দ্ধনেত্রে বলিলেন, কৃষ্ণ আমায় রক্ষা কর, শ্রীমধুসূদন আমার লজ্জা নিবারণ কর, তখন ভগবান্ বস্ত্ররূপী হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। যখন জীব দ্রৌপদীর মত ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, ভগবান্ তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, তাহার অভিপ্সিতরূপে অনুভূত হন, তাহার মনোমত রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। জীব মায়ামোহে অভিভূত হইয়া, তাঁহাকে চায় না। বাজারের সময় হইল, তিনি

তিনি আমার জন্য কি না করিলেন? দেওভোগ হইতে পঞ্চসার গেলেন। সেখানে আহার ও নিদ্রা কিছুই হইল না। রাত্রিতে জলে সাঁতার দিয়া বাড়ী গেলেন। আমি এই সমস্ত কষ্টের কারণ। আর তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবিতেছেন, কিসে আমার সুখ হইবে। স্বামী বলিলেন, তাঁহার কৃপার সীমা কোথায়! লোকে যেন এই সব কথা শুনিতে না পায়। অনেক সময় হইয়া গিয়াছে, এখন চল। স্বামীর কথামত ঠাকুরের নাম করার স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে যেন কেমন একটা ভার রহিল।

স্বামী নাগমহাশয়কে হৃদয়ে দেখিযাছেন। স্বামীর মন তাঁহাতে একবারে ডুবিয়া গিয়াছে। আমি যেমন নাগমহাশয়কে দেখিয়া কাহার সাথে বেশী কথা বলিতে পারিতাম না, সময় মত খাইতাম না, স্বামীরও সেই ভাব। তিনি খাইতে বসিতেন, অন্ন দুটী খাইযা উঠিয়া যাইতেন। তিনি কেবল নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। রাত্রিতে তিনি আমার কাছে শুইতেন, কিন্তু তাঁহার সাড়া শব্দ থাকিত না। অবসর থাকিলে তিনি দিবসেও আমার কাছে থাকিতেন। নাগমহাশয়ের কথা বলিতাম। নাগ-মহাশয়ের বিষয আমার জানা আছে কিনা, তাই আমার সঙ্গে যাহা হয বলিতেন। ৪।৫ রাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই। তিনি কেবল নাগমহাশয়ের চিন্তা করিতেন। আমার মনে সুখই হইত। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া, দেশের সকল লোক ইচ্ছামত আমাকে গালাগালি দিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। আবার অন্য কেহ বলিল, দুর্গাচরণ নাগ উহাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছে; দুর্গচারণ নাগ ছিল কাল সাপ।

আমি বড় বিপদে পড়িয়া গেলাম। আমার ভয়, অধিক কথা বলিলে যদি স্বামীর ভাব নষ্ট হইয়া যায়। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু নাগমহাশয়ের নিন্দা প্রাণে বড় লাগিত। স্বামী তাঁহার ভাবে বিভোর। একদিন বড়ই অসহ্য হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইহারা সকলে অযথা নাগমহাশয়ের নিন্দা করিতেছে। আমি আর এখানে থাকিব না। যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে বলুক, তিনি কি করিয়াছেন যে, ইহারা তাঁহাকে গালাগালি দিতেছে। এমন সময় আমার ননাস নাগমহাশয়কে গালি দিলেন। ইহাতে স্বামীর অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, আপনারা তাঁহার নিন্দা নিয়া মরিতেছেন কেন? যদি তাঁহার নাম নিয়া আবার কিছু বলিবেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একদিকে চলিয়া যাইব। স্বামীর রাগ দেখিয়া কেহ নাগমহাশয়কে আর কিছু বলিত না।

স্বামীর নিয়মমত খাওয়া ছিল না এবং অনিদ্রায় তাঁহার শরীর কাতর হইল। তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে লাগিলেন, রাত্রে ও সব রক্ত চুষিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। ওঝা দেখাইয়া বৌটাকে ছাড়াইতে হইবে। ও যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই থাকুক। পিতার নাম লোপ হইতে বসিল। তাহা এভাবেও থাকিবে না, ওভাবেও থাকিবে না। সকালে ও সন্ধ্যায় এত সময় বসিয়া কি করে? এরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল। আমি মনে মনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং গোপনে কাঁদিতাম। স্বামী তখন মহাভাবেই আছেন। তিনি কোন কথাই জানিতেন না। কলেজ খোলার ২।৩ দিন বাকী আছে। একদিন স্বামী বলিলেন, শীঘ্রই কলেজ খুলিবে।

লোকের সাথে মিশিতে হইবে। সকলের সঙ্গে কথা বলিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করিবা যেন আমার মন তাঁহাতে রাখিতে পারে। আমি বলিলাম, যিনি তোমাকে দেখা দিয়াছেন, তাঁহাকে বল। মানুষের ইচ্ছায় কিছু যায় আসে না। তিনি বলিয়াছেন, ভগবান্ গুণ দেখিয়া ধরেন না, আবার দোষ দেখিয়া ছাড়িয়া দেন না। জীব তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহাকে ধরিতে পারে না। আমি একদিন দেওভোগ হইতে আসার সময় নাগমহাশয়কে বলিয়াছিলাম, এখন যাই। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আবার যাই বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অমন হাসি মাখা মুখ ঈষৎ মলিন করিয়া বলিতেছেন, যাই যাই, কি গো মা; যাই বলিতে নেই। ইহা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। তাঁহার এইরূপ স্নেহ দেখিয়া আমার মনে হইল, তাঁহার নিজ দেহ কাটিয়া এক খণ্ড মাংস দূরে ফেলিলে তিনি যত ব্যথা পাইতেন না, আমি তাঁহার কাছে যাই বলায় তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইয়াছেন। যিনি আমাদিগকে এত ভালবাসেন, তিনি কোন অবস্থায় আমাদিগকে ছাড়িতে পারিবেন না। তাঁহার দয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিলে—ভাবিয়া দেখ না, যখন দেওভোগ হইতে আসার সময় নাগমহাশয়কে বল, "এখন আসি," তিনি কেমন স্নেহ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাড়ান। যখন তাঁহাকে নমস্কার করিতে যাও, স্নেহভরে তাঁহার দুইটী চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে থাকে। নমস্কার করিলে যেন কিছু আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে একটু সড়িয়া যান, আবার স্নেহভরে তাকাইয়া সাথে সাথে হাটিতে থাকেন, যেন কতদূর চলিয়া যাইতেছি, যেন তিনি বুঝাইয়

দেন, যাহার যে কাজ, তাহা করিতে হইবে। তিনি এইরূপ অনুমতি দিয়াও, যতদূর দেখা যায, তাকাইয়া থাকেন। তাঁহাব সেই স্নেহ মনে কবিয়া কাজ করিবা। আমি তোমাকে আব কি বলিব, তাঁহাব উপব আমার চেয়ে তোমাব বিশ্বাস অধিক। তিনি বলিয়াছেন, গলায় পডিয়াছে ঢোল বাজালেই সিদ্ধি।

স্বামী বলিলেন, এখন তোমাব কোন কষ্ট নাই। তুমি এখানেই থাক। আমি বলিলাম, তুমি ঢাকা যাইতেছ, আমি কাহাব কাছে থাকিব? সকলে ওঝা আনিবে। স্বামী বলিলেন আমি সমস্ত বুঝাইয়া দিব। প্রত্যেক শনিবার আমি আসিব। তৎপব তিনি নিজ ভগ্নীকে বলিলেন, ধর্ম্মে হাত দিবেন না। সময়মত খায় আব না খায়, দুইবেলা ঠাকুবেব নাম কবিতে দিবেন। দেখিবেন যেন কোন অনিয়ম না হয়। যদি ওঝা আনেন, ভাল হইবে না। আপনাদেব সর্ব্বনাশ হইবে। ও যে কি তাহা আমি জানি। জীবন্ত মাছ মারিবে না। কোন বকম শাক উঠাইবে না। দরজা বন্ধ করিয়া ঠাকুরেব নাম কবিবে, সে সময় কেহ গোলমাল কবিতে পারিবে না। ইহা ভাল কি মন্দ, আমি বেশ জানি। ইহাতে অন্যেব বিচাব দরকাব নাই। কাহাকেও আমাকে বুঝাইতে হইবে না। স্বামী সব ঠিক কবিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। নাগমহাশয়ও বলিয়াছেন, ভগবান্ সকল স্থানে আছেন। তোমার উপব তাঁহাব অপার দয়া, তোমার আবাব ভয় কি? স্বামীর ভক্তি ও বিশ্বাস আমার চেয়ে বেশী। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বীর-পুরুষ বলিতেন। তাঁহার জীবন বড়ই পবিত্র। তাঁহার বয়স যখন ১৪ বৎসর, তিনি বিবাহ করেন।

আমি তাঁহার প্রায় সমস্ত জীবন জানি। কিছুতেই তাঁহাকে সত্যপথ হইতে টলাইতে পারে নাই।

নাগমহাশয় আমাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, জগতে তাহার তুলনা হয় না। যখন ছোট ছিলাম, কিছু জানিতাম না, তাঁহার ভালবাসা ভালভাবে বুঝিতাম না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, চাড়া গাছে বেড়া দেওয়া হইয়াছে। লাউ কুমড়ার যেমন আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে, সেইরূপ আমার অভীষ্ঠ লাভের পর সাধনা। শিশুকালে এমন ধর্ম্ম ভাব কাহার হয়! এইরূপ তিনি দয়া করিয়া অনেক কথা বলিতেন। স্বামীর বিষয় হাসিয়া হাসিয়া বলিতেন, সকালের তোলা মাখন, এ আর নষ্ট হইবে না। এ রকম কত কথা বলিতেন। আমাকে কত স্নেহ যত্ন করিয়াছেন কত আদর করিয়াছেন। সে সব এখন স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি আমাকে সকল অবস্থাতেই স্নেহ করিতেন। তিনি আমার সকল কাজেই সুখী ছিলেন। ছোট সময়ে এ ভাবে প্রসংশা করিয়া হাসিতে হাসিতে আদর করিতেন; যখন বড় হইলাম, স্বপ্ন দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম, তখন তিনি স্বামীর হাতে আমাকে তুলিয়া দিয়া, এত সুখী হইলেন, তাহা লিখিবার নয়। সে সময় নাগমহাশয়কে দেখিয়া আমার মনে হইল, পিতা যেমন বড় মেয়েকে উপযুক্ত জামাতার হাতে সঁপিয়া দিয়া সুখী হন, তিনি আমাকে স্বামীর কাছে সুখী দেখিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করিলেন। নাগমহাশয়ের স্নেহ বর্ণনা করা যায় না।

নাগমহাশয় বলিতেন, পথে পথে থাকিলে একদিন ভগবানের দয়া হয়। এলো-মেলো করিলে ধর্ম্ম হয় না। তিনি আদর করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলিতেন। তিনি আমাকে

এত স্নেহ করিতেন, তাহা কি করিয়া ব্যক্ত করিব, জানি না। একদিন আমি স্নান করিয়া, নাগমহাশয়কে নমস্কার করিব মনে করিয়া, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দুর্গার ডানদিকে দাঁড়া করাইলে লক্ষ্মীর মত দেখা যায়। আমি লজ্জা পাইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি এত পাষাণ হইলাম কেন? কি করিয়া তাঁহার এত স্নেহ ভুলিয়া গেলাম? নাগমহাশয় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। ছোট সময় এক ভাবে গেল। নাগমহাশয় কিসে সুখী থাকিবেন, স্বামী সে বিচার করিতেন। যখন বড় হইলাম, তখন আর তত বিচার রহিল না। মানুষ শত চেষ্টা করিলেও সময়ের গতি রোধ করিতে পারে না। একবার আমরা দুই জন নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলাম। আমি মনে মনে তাঁহাকে বলিলাম, তুমি একবারে নিষ্কম, জীব কি করিয়া কর্ম্মদ্বারা তোমাকে সুখী করিবে? নাগমহাশয় বলিলেন, তোমাদিগকে সুখে দেখিলেই আমি সুখী। তাঁহার সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে যাহা হইয়াছে, সকল কথার উত্তর দিলেন। নাগমহাশয় কখন আমাকে পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কখন নলদময়ন্তীর কথা বলিতেন। সময় সময় সাবিত্রী সত্যবানের জীবনের ঘটনা কহিতেন। স্বপ্ন দেখাইয়া মন ভুলাইয়া সতী রমণীর উপাখ্যান হইতে উপদেশ তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। ছোট সময় শিলা পিলা ও সাধ্বী রমণীর কথা বলিয়াছিলেন। একদিন নাগমহাশয় শিব পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, মা, চিরকালই লোকের কষ্ট। এক সময় জল ছিল না। গৌতম বরুণের তপস্যা করিয়া জল আনিয়াছিলেন।

প্রতিবেশীদের অদমনীয় ঈর্ষ্যার ফলে গৌতমের লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। অন্যান্য মুনিদিগের তপস্যায় বশীভূত হইয়া গণেশ গোশিশুর রূপ ধারণ করিলেন, এবং গৌতমের ক্ষেত্রে যাইয়া ফসল খাইতে লাগিলেন। গৌতম তাহাকে তাঁহার ক্ষেত্র হইতে তাড়াইতে গেলেন। গণেশ অন্তর্ধান হইলেন। গোশিশু পড়িয়া রহিল। গৌতম গোহত্যা পাপে অপরাধী হইলেন। মুনিরা বলিলেন, তাহারা গৌতমের মুখ দেখিবেন না। গৌতম অতিশয় বিপদে পড়িলেন এবং মুনিদিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন, যাহাতে তিনি পাপমুক্ত হইতে পারেন। এ পর্যন্ত শুনিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম, নাগমহাশয় আমার পানে চাহিয়া আছেন। আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিলে পর তিনি বলিলেন, বাজারের বেলা হইয়াছে, এখন বাজারে যাইব। তাঁহার এত স্নেহ ছিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কষ্ট পাইব মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।

নাগমহাশয় বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মা ঠাকুরাণী রান্না করিতে গেলেন। আমি কুটনা কুটিলাম। নাগমহাশয় আমাদের নিকট বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মা, সংসার বড় ভয়ঙ্কর স্থান। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। একজন ব্যতীত জগতকে পুত্রের মত দেখিবে। তিনি আবার পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এক দিন অহল্যা স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, ইন্দ্র তাহাকে সিক্ত বস্ত্রে দেখিতে পাইয়া কামাতুর হইলেন। কি করিয়া অহল্যার কাছে যাইবেন সেই অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিষ্য হইলে অনেক সময় গৌতমের আশ্রমে থাকিতে পারিবেন। গৌতম

কখন আশ্রমে থাকেন, কখন আশ্রমের বাহিরে যান, সমস্তই জানিতে পারিবেন, সুতরাং ইন্দ্র গৌতমের শিষ্য হইলেন। কয়েক দিনের পর, একদা ইন্দ্র দেখিলেন, গৌতম্ তপস্তা করিতে যাইতেছেন, অমনি গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকটে গেলেন। অহল্যা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ এত শীঘ্র ফিরিয়া এলেন যে? গৌতমরূপী ইন্দ্র বলিলেন, কতদুর যাইয়া আমার মন চঞ্চল হইল, তাই ফিরিয়া আসিলাম। অহল্যা গৌতম-রূপধারী ইন্দ্রকে জানিতে পারিলেন না। উভয়ে নিভৃত স্থানে গেলেন। গৌতম ধ্যানে সব জানিতে পারিলেন এবং ধ্যান ভঙ্গ করিয়া আশ্রমে আসিলেন। গৌতমকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে পালাইতে লাগিলেন। গৌতম পলায়নপর ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। অহল্যা গৌতমকে দেখিযা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইলেন এবং ইন্দ্রকে পলাইতে অবলোকন করিয়া তাহার চৈতন্য হইল। তিনি বাতা-হত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাপিতে গৌতমের পদযুগলে পড়িলেন। অহল্যা পাষাণী হইলেন। ইন্দ্রের সমস্ত শরীর ভগে পূর্ণ হইল। অহল্যা নাজানিয়া দোষ করিয়াছে জানায় মুনির মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, ত্রেতাযুগে যখন পিতৃ সত্য পালন করিতে রামচন্দ্র বনে আসিবেন, তাঁহার চরণস্পর্শে তোমার শাপ মোচন হইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, মেয়েলোকের সাথে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও, কিন্তু পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান, পুরুষ সাবধান। দেখ না, পরমহংসদেবের ব্রাহ্মণী পুরুষের সাথে বড় কথা বলেন না। তুমিও ঐ রকম থাকিও। নাগমহাশয় আমাকে তিনবার সাবধান করিলেন এবং বলিলেন,—

* যত দিন পুড়ে শ্মশানে না পড়ে ছাই,
ততদিন সতীত্বের বিশ্বাস নাই।

নাগমহাশয় বলিলেন, মা, একটী মেয়ে সতী ছিল। তাহার অতিশয় অসুখ হইল। সকলে মনে করিল, এবার সে মারা যাইবে। তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া পিতা বলিলেন, আজ দেশ সতীশূন্য হইল। মেয়েটী অমনি বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি এখনও মরি নাই। এখন কিছু বলিবেন না। যদি বাচিয়া কোন কুকার্য্য করিয়া বসি। নাগমহাশয় আমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহা তিনি বলিতেন। সাবিত্রী সত্যবানের গল্প বলিতে বলিতে কহিয়াছিলেন, মা, সাবিত্রী সতীত্বের জোরে মরা স্বামী বাচাঁইয়া আনিলেন। সাবিত্রীর তেজ দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইল না। সাবিত্রীর বিবাহের বয়স হইয়াছে। সাবিত্রীর পিতা তাঁহাকে স্বামীবরণ করিতে বলিলেন। একদিন তিনি বনে যাইয়া সত্যবানকে মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করিলেন এবং পিতাকে সকল কথা বলিলেন। নারদ তাহা শুনিয়া বলিলেন, সত্যবানের সকলই গুণ, দোষ মাত্র একটী। সত্যবানের আয়ু ১৬ বৎসর। রাজা সত্যবানের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, মনে মনে যাহাকে একবার বরণ করিয়াছি, তাহাকেই বিবাহ করিব। নারদ অনেক কথা বলিলেন। সাবিত্রী কোন কথাই মানিলেন না। রাজা সত্যবানের পিতার নিকট চর পাঠাইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। সত্যবানের মৃত্যুর দিন সমুপস্থিত দেখিয়া সাবিত্রী একটী ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রতের শেষ দিন সত্যবানের মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। সাবিত্রী তাহা জানিতেন, অন্য কেহ সেই কথা জানিত না।

সত্যবান কাষ্ঠ আহরণ করিতে বনে গেলেন। সাবিত্রী তাহার সঙ্গে যাইবেন বলায় শ্বশুর বারণ করিলেন। অবশেষে সাবিত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে সত্যবানের সহিত বনে যাইতে দিলেন। কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিয়া সত্যবান অস্থির হইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী নিজ ক্রোড়ে স্বামীর মাথা রাখিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন, যম সত্যবানকে নিতে আসিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? এখানে কেন আসিয়াছেন? যম বলিলেন, আমি যম। সত্যবানের আয়ুঃকাল শেষ হইয়াছে। আমি তাহাকে নিতে আসিয়াছি। তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি ইচ্ছা করিলে বর নিতে পার। সাবিত্রী বলিলেন, আমার পিতার পুত্র নাই। যম 'পুত্র হইবে' বলিয়া বর দিয়া যাইতে লাগিলেন। সাবিত্রী পিছনে চলিলেন, যম তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আর এক বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, 'আমার শ্বশুর অন্ধ'। যম তাহার দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন। সাবিত্রী আবার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং আর এক বর চাহিতে আদিষ্টা হইলেন। সাবিত্রী শ্বশুরের হৃতরাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন। যম তাহাও দিলেন। তৎপর যমের সহিত সাবিত্রীর অনেক কথা হইল, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যম আর এক বর দিতে রাজি হইলেন এবং সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে শত পুত্র চাহিলেন। যম তথাস্তু বলিলেন। যম আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আবার সাবিত্রীকে পিছনে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন, আর কেন? অনেক বর দিয়াছি, এখন ফিরিয়া যাও। সাবিত্রী বলিলেন, তাহা কিরূপে হইবে? আপনি বর দিয়াছেন, সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্র হইবে, অথচ আপনি

তাহাকে লইয়া যাইতেছেন। যম সাবিত্রীর কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি সত্যবানকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমার সতীত্বের জোরে মরা স্বামী জীবন লাভ করিল। চারি যুগে তোমার কীর্ত্তি ঘোষিবে।

নাগমহাশয় বলিলেন, মা, মেয়েদের সতীত্ব থাকিলে সমস্তই থাকে। দময়ন্তী বনে গেলেন, দস্যুগণ তাঁহার সতীত্বের তেজ দেখিয়া নিকটে যাইতে পারিল না। মীরাবাই সতীলক্ষ্মী ছিলেন। সতী থাকিলে মুক্তি হয়। মীরাবাইয়ের নির্ব্বান লাভ হইয়াছে। নাগমহাশয় আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে কত উপদেশ দিয়াছেন। এক সাধ্বী রমণীর স্বামীর কুষ্ঠরোগ ছিল। প্রত্যহ রজনীশেষে সেই রমণী স্বামীকে মাথায় লইয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিতেন। একদা গঙ্গাস্নান করিয়া, স্বামীকে মাথায় করিয়া নিয়া আসিতেছেন, দৈবাৎ এক তাপসের গায় তাহার পা লাগিল। তাপস ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, তোর স্বামী নিয়া এত অহঙ্কার। তাহাকে মাথায় নিয়া আমার শরীরে পা তুলিয়া দিতেও তোব একবার মনে ভয় হইল না। রাত্রি ভোর হইলে তোর স্বামী দেহত্যাগ করিবে। সাধ্বী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইলেন, কি করিবেন। না দেখিয়া তাপসের গায়ে পা দিয়াছেন, তাহার কোন দোষ ছিল না। তাই তিনি বলিলেন, যদি আমি সতী হই, এ রাত্রি আর ভোর হইবে না। রাত্রি আর ভোর হয় না। একই ভাবে চলিতে লাগিল। দেবতাগণ তাপসের বহুতর নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, সতীর কোন দোষ নাই। সে না দেখিয়া তোমার গায় পা দিয়াছে। তুমি তাহাকে অভিশাপ দিলে কোন? সতীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, রাত্রি

ভোর হইবে না। তাপস বলিলেন, আমার কথাও মিথ্যা হইবে না। দেবতাগণ সতীকে অনেক বুঝাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, তোমার কথা তুমি ফিরাইয়া লও। এখন তোমার স্বামীর কুষ্ঠ আছে, এই দেহত্যাগ হইলে, তাহার শরীর সুন্দর ও নিরাময় হইবে। তুমি তোমার বাক্য প্রত্যাহার কর। সাধ্বী রাজি হইলেন এবং বলিলেন, আমাব কোন পাপের ফলে স্বামীর কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপের ফলে আমার বাক্য মিথ্যা হউক, রাত্রি ভোর হউক। রাত্রি ভোর হইল। স্বামী সুন্দর দেহধারণ করিয়া স্বাধ্বীর কাছে গেলেন।

একদিন নাগমহাশয় বলিলেন, এক মুনি বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, অনেক দিন হইয়া গেল, ভগবান্ দেখা দেন না, মনে কষ্ট পাইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। একদল কবুতর আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে মুনির মাথায় মলত্যাগ করিল। মুনি রোষকষায়িত লোচনে আকাশপানে তাকাইলেন। কবুতরগুলি ভস্ম হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া মুনি ভাবিলেন, তাহার তপস্যার একটী ফল হইয়াছে। পথের ধারে একটী বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, এক রমণী স্বামীর পদসেবা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সেই রমণী উঠিলেন না। রেগে গর গর করিতে করিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া রমণী বলিয়া উঠিলেন, আমিত আর কবুতর নই যে, আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। মুনি অবাক হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া জানিলেন, আমি কবুতর ভস্ম করিয়াছি। সাধ্বী রমণী বলিলেন, আমি পতিসেবা করিয়া

ঘরে বসিয়া সব জানিতে পারি। মুনি বলিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি এতকাল তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করিতে পারিলাম না, আপনি ঘরে বসিয়াই এক পতিসেবা করিয়া সেই শক্তিলাভ করিলেন। সাধ্বী উত্তর করিলেন, আপনারা কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফললাভ করেন, আমরা ঘরে বসিয়া এক পাতিব্রত্য পালন করিয়া তাহা লাভ করি। নাগমহাশয় সময় বুঝিয়া সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন।

একদিন আমরা দুইজন নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি। কি এক সামান্য কথা নিয়া স্বামীর সহিত বাদানুবাদ হইয়াছিল। স্বামীর চক্ষে আমার দৃষ্টি পড়ায় আমি গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইলাম। স্বামী হাসিতে হাসিতে নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, ও ভ্রমরীর মত পাগল। ভ্রমরী স্বামীকে বড় ভালবাসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তাহার সহিত তুচ্ছ বিষয় লইয়া ঝগড়া করিত। তাহার বাসনা ছিল যেন সে স্বামীর কাছে মরিতে পারে। কালক্রমে তাহার মৃত্যুর দিন আসিল। তাহার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে, সে চাঁদের আলো দেখিতে দেখিতে অন্তিম শয্যায় শুইয়া স্বামীর কথা মনে করিতে লাগিল। স্বামী এক জমিদারের অধীনে কাজ করিত। কোন কারণবশতঃ সেইরাত্রে বাড়ী আসিল। ভ্রমরীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল। ভ্রমরী স্বামীকে দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিল। নাগ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অমঙ্গল হয় না। তোমরা সাধ্বী থাকিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে। মেয়েদের সতীত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। পাঁচ মণ দুধে এক

ফোটা গোমূত্র পড়িলে সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। পতিব্রতা ধর্ম্মপালন করিলে ভগবান্ সুখী হন। স্বামীকে অপ্রীতিকর বাক্য বলিতে নাই। যদি স্বামী কখন কড়া কথা বলেন, মনে করিতে হয়, আমারই দোষ থাকায় কড়া কথা শুনিলাম, নচেৎ স্বামী তাহা বলিবেন কেন? স্বামী কড়া কথা বলিলেও তাহাকে নারায়ণ জ্ঞান করিতে হয়। স্বামীর দোষ মনে করা পাপ। নাগমহাশয় আমাকে এত স্নেহ করিতেন, আমি সামান্য কষ্ট পাইলে, তিনি তাহা বোধ করিতেন।

গিরিশবাবু বলিয়াছেন, সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে ভক্তের উপর নাগমহাশয়ের মাতৃবৎ স্নেহ। তাহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছি। যখন স্বামী বি এ পড়েন, তিনি এক শনিবার নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন, অপর শনিবার আমার কাছে আসিতেন। একবার ছয় দিনের ছুটি পাইয়া স্বামী আমার কাছে আসিয়াছেন। দুইদিন বাকি থাকিতে বলিলেন, তিনি সেই দিন চলিয়া যাইবেন, কারণ পড়ার অতিশয় ক্ষতি হইতেছিল। আমি ছুটি থাকিতে তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজি হই নাই। তাঁহাকে সেখানে পড়িতে বলিলাম। তিনি কোন মতে স্বীকার করিলেন না এবং অনেক ওজর দেখাইলেন। আমিও কিছু মানিলাম না। অবশেষে তিনি একটু বিরক্তি দেখাইয়া বলিলেন, যেমন আজ যাইতে পারিব না, দুই মাসের আগে আর এখানে আসিব না। মনে মনে এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া ছুটির শেষ দিন ঢাকা গেলেন। পরের সপ্তাহে নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভোগ গিয়াছেন। ঢাকা ফিরিয়া যাওয়ার সময় নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চসার

গিয়াছিলেন কি? দুই মাসের পূর্ব্বে তথায় যাইবেন না বলিয়া মনে মনে উত্তর দিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আগামী শনিবার পঞ্চসার যাইবেন। স্বামী মনে মনে বলিলেন, আমরা পঞ্চসার গ্রামে এক ঘরের এক কোণে বসিয়া কি কথা বলিয়াছি, তাহা তুমি দেওভোগ বসিয়া শুনিয়াছ এবং মধ্যস্থ হইয়া গোল মিটাইয়া দিলে। শনিবার রাত্রিতে স্বামীকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল একাদশী তিথি, তোমার উপবাস। আজ ঠাণ্ডা ভাত খাইয়া কি করিয়া থাকিবে? জানা থাকিলে, তোমার খাওয়ার জিনিষ তৈয়ার রাখিতাম। এখন অনেক রাত্র হইয়াছে। তোমার যে দৃঢপণ, আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি দুই মাসের পূর্ব্বে এখানে আসিবে না। স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমি নাগমহাশয়ের যে আদরের মেয়ে, তোমার মনে আবার কষ্ট দেওয়া যায়। দেওভোগ হইতে ঢাকা যাওয়ার সময় নাগমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পঞ্চসার গিয়াছিলাম কিনা। দুই মাসের পূর্ব্বে এখানে আসিব না মনে করিয়া, যিনি সমস্ত জানেন তাঁহাকে মূর্খের মত মনে মনে উত্তর দিলাম, হাঁ, সেদিন গিয়াছিলাম। তিনি আর কিছু না বলিয়া আমাকে শনিবার আসিতে বলিলেন, তাই আজ আসিয়াছি। নাগমহাশয়ের স্নেহ দেখিয়া আমি বলিতে লাগিলাম, সকল অবতারের সময়ে ভুল হয়, কিন্তু নাগমহাশয়ের মুহূর্ত্তের তরে ভুল দেখিতে পাইলাম না। সাক্ষাতে ত মনের কথার উত্তর দেনই, তাঁহার অসাক্ষাতে কি করিতেছি, তাহাও দেখিতেছেন। শুধু দেখা না, সামান্য অসুবিধা হইতে দিতেছেন না। আমাদের সামান্য কষ্ট দেখিতে পারিলেন

না। তিনি আমার জন্য না পারিলেন, এমন কাজ নাই। মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভুলশূন্য হয়, এমন কোথায় দেখা যায় না। তিনি সব জানিয়া এমন ভাবে নিজকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, লোক মনে করে, তিনি কিছুই জানেন না। এমন আত্মগোপন আর কেহ করে নাই। তিনি সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে সমভাবে স্নেহ করিয়াছেন, যেন ভক্তের সামান্য অভাব বোধ না হয়।

একদিন নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, তিনি স্নেহের সহিত আমাকে বুঝাইতেছেন, কি করিয়া ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর হয়। তিনি বলিলেন, ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর কথাটী সোজা, কাজ সোজা নয়। যে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া, ভগবান্ রক্ষা করিবেন বলিয়া, তাল গাছের উপর হইতে পড়িয়া যাইতে পারে, তাহার ভগবানে নির্ভর হইয়াছে; সে সুখে দুঃখে সমভাবে ভগবানের উপর তাকাইয়া থাকিতে পারে। আপনার এক চুল চেষ্টা থাকিতে ভগবানে নির্ভর আসে না। কুরুসভায় যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে কাপড় ধরিয়া রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততক্ষণ দেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন নিরুপায় হইয়া নিজের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জোরহাত করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বলিলেন, কৃষ্ণ আমায় রক্ষা কর, শ্রীমধুসূদন আমার লজ্জা নিবারণ কর, তখন ভগবান্ বস্ত্ররূপী হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। যখন জীব দ্রৌপদীর মত ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, ভগবান্ তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, তাহার অভিপ্সিতরূপে অনুভূত হন, তাহার মনোমত রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। জীব মায়ামোহে অভিভূত হইয়া, তাঁহাকে চায় না। বাজারের সময় হইল, তিনি

আসিয়াছেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া হরপ্রসন্নবাবুর হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় মোট মাটিতে রাখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

নাগমহাশয়ের জীবনী লেখক শরৎবাবু একদিন বলিয়া ছিলেন, নাগমহাশয় যে কি, আমি তাহা জানি না, রমণীর সঙ্গে থাকিয়া রমণীর সঙ্গ না করা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অসাধ্য। আমি নাগমহাশয়কে বলিয়াছি, তুমি যে কি তাহা জানি না, তবে তোমার মত কাহাকে ভাল লাগে না। তুমি ছাড়া যে আমার আর কেহ আছে, তাহা আমি জানি না। তুমি আমার সব। তোমার গলায় মালা দিয়াছে বলিয়া আজ ইহাকে (মাঠাকুরাণীকে) মা বলি। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে শরৎবাবুকে বলিলেন, আপনি যে উঁহাকে মা বলিলেন, উঁহার বহু ভাগ্য।

একদিন শরৎ বাবু নাগমহাশয়কে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ঢাকা হইতে রেল গাড়ীতে নারায়ণগঞ্জ যান। তিনি তখন ঢাকায় কলেজে পড়িতেন। সে সময় বর্ষাকাল। মুসলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও নৌকার যোগার করিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া, জলে নাবিলেন এবং শস্যপূর্ণ মাঠের ভিতর দিয়া, যেখানে অগাধ জল তথায় সাঁতার কাটিয়া চলিলেন। প্রাণ অধৈর্য্য, নাগমহাশয়কে না দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারেন না। তিনি নাগমহাশয়ের বাড়ীর নিকট যাইয়া দেখিলেন, নাগমহাশয় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া, পথে দাঁড়াইয়া আছেন। নাগমহাশয় জানিতে পারিয়াছিলেন, শরৎবাবু জলে সাঁতার কাটিয়া আসিতেছেন। তিনি শরৎবাবুকে দেখিবা মাত্র বলিলেন, একি করিয়াছেন? একি করিয়াছেন? এরূপ বর্ষার

সময় কত বিষধর সাপ জলে বেড়ায়। এমন কাজ কি করিতে হয়? শরৎবাবু বলিলেন, কি করি? আপনাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। আমার অন্য উপায় ছিল না, তাই জলে সাঁতার দিয়াছি। আপনি এই বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন? নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি আমার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, জলে সাঁতার দিলেন, আর আমি সামান্য বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না?

যখন শরৎবাবু কলিকাতা পড়িতেন, একদিন দালানের ছাদে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এমন মহাপুরুষকে পাইয়া হারাইলাম। এই জীবন রাখিয়া কি লাভ! আজই এই দেহভার ত্যাগ করিব। তৎপর তিনি ছাদ হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করিবেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, নাগমহাশয় তাহার পর-দিন কলিকাতা আসিবেন। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। পর দিন সকালবেলা নাগমহাশয় তাহাদের মেসের দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শরৎ বাবু বাসায় আছেন কি না। শরৎবাবু তাঁহার নিকটে গেলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, এমন কাজ কি করিতে হয়? আপনি কি করিয়া বসেন ভাবিয়া, আজ আমাকে কলিকাতা আসিতে হইল। যে রাত্রিতে শরৎ বাবু আত্মহত্যা করিতে যান, সেই দিন প্রাতে নাগমহাশয় দেওভোগ হইতে রওনা হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জানা ছিল, তিনি সব দেখিতে পাইতেন বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে শরৎ বাবুর জন্য রওনা হইলেন এবং ছাদ হইতে লাফাইবার পূর্ব্বে আকাশ পথে তাঁহাকে বলিলেন, তিনি পর দিন কলিকাতা পৌঁছিবেন।

শরৎ বাবু অনেকদিন নাগমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে মন্ত্র দিন্। প্রত্যেকদিন নাগমহাশয় বলিতেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে পারে না, কারণ সে তাহার অধিকারী নয়। আপনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত লোক, আমি মূর্খ। আমি আপনাকে কি মন্ত্র দিব? অনেকদিন নাগমহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। যতক্ষণ তিনি নাগমহাশয়ের নিকট থাকিতেন, ততক্ষণ শান্তভাবে রহিতেন। একদিন নাগমহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাজারে যাইতেছেন, শরৎবাবু সঙ্গে চলিলেন। একস্থানে পথ বড় সরু ছিল। দুইধারে বেত বন। তিনি নাগমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে মন্ত্র দিন্। শরৎ বাবু এমনভাবে সকাতরে বলিলেন, ভক্তবৎসল নাগমহাশয় আর ভক্তের অনুরোধ ফেলিতে পারিলেন না। নাগমহাশয় বলিলেন, শিব আপনার গুরু হইবেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শরৎবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন, এবার নাগমহাশয় আমাকে বর দিলেন। শিব গুরু হইবে। নিশ্চয় শিবগুরু পাইব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি নাগমহাশয়ের বাক্য অব্যর্থ মনে করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয়কে মন্ত্র দেওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিতেন না। একদিন শরৎবাবু বেলুড় মঠে গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দজী শুইয়া আছেন। শরৎবাবু তাঁহার পাশে যাইয়া বসিলেন। স্বামীজী ঘুমাইয়া পড়িলেন। শরৎবাবু বসিয়া থাকিয়া দেখিতেছেন, স্বামীজী আর তথায় নাই, তাঁহার জায়গায় শিব শুইয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানী শরৎবাবু রোমাঞ্চিত কলেবরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই শঙ্কর শুইয়া আছেন। তখন তাঁহার

নাগমহাশয়ের বরের কথা মনে পড়িল। শরৎবাবু শঙ্কররূপী স্বামীজী হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। নাগমহাশয়ের বর স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, নাগমহাশয় বলিয়াছেন, শিব আমার গুরু হইবে, তাই তিনি স্বামীজীকে শিবরূপে দেখাইয়া, আমার স্মরণ পথে আনিয়াছেন। তিনি কায়স্থকুলচূড়ামণী স্বামীজীর মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

একদিন নাগমহাশয়ের এক ভক্ত তাঁহার কাছে বসিয়া বলিতেছিলেন, আমরা কুকর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের সাধ্য নাই যে, আমরা মুক্ত হইতে পারি। স্বামী বলিলেন, তাহা কেন হইবে? আমার কর্ম্ম দ্বারা আমি বদ্ধ হইয়াছি, আমার কর্ম্মদ্বারা আমি মুক্ত হইব, কে ধরিবে? নাগমহাশয় তাহা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইয়া বলিলেন, ঠিক কথা। যদি আমি আমার কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইতে পারি, আমি আমার কর্ম্মদ্বারা মুক্ত হইতে পারিব না কেন? সেই ভক্ত নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া স্বামীকে বলিলেন, ভাই, তোমার সাথে কার কথা? তুমি নাগমহাশয়ের কৃপাপাত্র।

নাগমহাশয়কে দেখিয়াই স্বামীর হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। নাগমহাশয়কে ভক্তি করেন বলিয়া, মা ঠাকুরাণীকেও ভক্তি করেন। যদি আমরা কোন বিষয়ে মর্ম্মাহত হইয়া মা ঠাকুরাণীর কার্য্য আলোচনা করিতাম, তিনি বলিতেন, ভগবানের চিন্তা কর। আমাদের মা ঠাকুরাণীর ব্যবহার বিচার করিয়া লাভ কি? আমরা নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভোগ যাই। তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাঁহার চরণ ধূলি না লইলে ত্রাণ পাইবার উপায় নাই। মা ঠাকুরাণীর আদর

কিম্বা অন্তের ভাল ব্যবহার পাইতে দেওভোগ যাওয়া হয় না। মা বাবার সাথে যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, সন্তানের সেই সব দেখা উচিত নয়, কিম্বা উহা তাহাদের আলোচনার বিষয় হওয়া ঠিক নয়। যখন নাগমহাশয় নিজগুণে তাঁহার রাতুল চরণে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার চিন্তা কর, মঙ্গল হইবে।

অন্তলোক গেলে মা ঠাকুরাণী কত যত্ন করিতেন। এমন কি পিষ্টক তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। কিন্তু স্বামী গেলে মা ঠাকুরাণী বলিতেন, আমি উহার ভাত রান্না করিতে পারিব না এবং অনেক কথা লইয়া নাগমহাশয়ের সহিত ঝগড়া করিতেন। নাগমহাশয় বলিতেন, যে দিন লোকের মন জানিতে পারিবে, সেই দিন কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিবে ও হায় হায় করিবে। মা ঠাকুরাণীর এই রকম ব্যবহারে নাগমহাশয় সদানন্দ হইয়াও সময় সময় নিরানন্দ হইতেন। তিনি স্বামীকে বড় স্নেহ করিতেন। স্বামী মনে কষ্ট পাইবেন বলিয়া স্বামীর কাছে গিয়া কত উপদেশ, কত মধুমাখা কথা বলিতেন। তিনি মাঠাকুরাণীকে বলিতেন, যাহারা আমাকে আপন ভাবিয়া, নিজের সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া, আমাকে দেখিতে আসে, আমি তাহাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। স্বামী এত ধীর স্থির ছিলেন, মা ঠাকুরাণীর এই মত ব্যবহার দেখিয়া, তিনি মনে করিতেন, মার মায়ার খেলা।

একবার হরপ্রসন্নবাবু ও অনেক লোক দেওভোগ গিয়াছিলেন। স্বামী সেই দিন তথায় ছিলেন। শীতের দিন। রাত্রিতে থাকিলে নাগমহাশয়ের কষ্ট হইবে ভাবিয়া অন্যান্য লোকের সাথে তিনি ঢাকা চলিয়া গেলেন। সেইদিন মা ঠাকুরাণী পিষ্টক তৈয়ার

করিলেন। স্বামী চলিয়া যাওয়ায় নাগমহাশয়ের স্নেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সদানন্দ হইয়া একটু নিরানন্দ হইলেন। তাহার পর দিন আমার পিতা নাগমহাশয়কে দেখিতে যান। নাগমাহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, দেখ রাজকুমার, আমি কাল কি করিলাম? বাড়ীতে পিষ্টক হইল, আর আমি খেয়াল না করিয়া পার্ব্বতীকে ঢাকা পাঠাইয়া দিলাম। পার্ব্বতীকে পিষ্টক খাওয়াইতে পারিলাম না। পিতা বলিলেন, ঠাকুব ভাই, তজ্জন্য আপনি মনে এত কষ্ট পাইলেন কেন? পার্ব্বতীর উপর যে আপনাব দয়া আছে, ইহাই যথেষ্ট। পিষ্টক খাইলে আর তাহাব কত সুখ হইত। নাগমহাশয়ের স্নেহ দেখিয়া পিতা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। সেইদিন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে এক সভা ছিল। তিনি ঢাকা যাইয়া স্বামীকে বলিলেন, তুমি কাল চলিয়া আসায়, তোমাকে পিষ্টক খাওয়াইতে না পারিয়া ঠাকুর ভাই মনে বড় কষ্ট পাইয়াছেন। স্বামী নাগমহাশয়ের দয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, জীবের উপর তাঁহার এত দয়া। আজ একাদশী তিথি। সেই জন্য বেলের ভিন্নমত মিষ্টতা অনুভব করিলাম। বেলের স্বাদ কখনও এইরূপ হয় না। নাগমহাশয় আমাকে পিষ্টক খাওয়াইবেন, তাঁহার ইচ্ছায় সকল হয়। বেল পিষ্টকে পরিণত হইল। আমাব উপর তাঁহার স্নেহের সীমা নাই।

একদিন আমরা দেওভোগ যাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় একখানা কাগজে গান লিখিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া গানের কাগজ গুলি সরাইয়া রাখিলেন। তিনি সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, কেমন আছ? আমি

ভাল* আছি বলিযা তাঁহার কাছে বসিলাম। নাগমহাশয়েব চক্ষুদুইটী ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন হয় পার্ব্বতী পঞ্চসার গিয়াছিল? আমি বলিলাম, কয়েক দিন হয় তথায় গিয়াছিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা কবিলেন, ১৫ দিন হইয়াছে? নাগমহাশয়েব মুখ দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তিনি স্বামীকে দেখিতে চান। আমি বলিলাম কেন? শীঘ্র এখানে আসেন নাই? এক শনিবাব আপনার নিকট আসেন, অপব শনিবার পঞ্চসার যান। নাগমহাশয় বলিলেন, কোথায়? এখানে অনেক দিন হয় আসে না। আমি মনে মনে তাঁহাকে বলিলাম, তোমাব এত দয়া। তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, দুব ও নিকট উভয় তোমাব সমান। তথাপি স্বামীর মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে নিকটে আনিয়া দেখিতে চাও। প্রকাশ্যে বলিলাম, আমি বাড়ী গিয়া চিঠি লিখিব, যেন তিনি অনতিবিলম্বে এখানে আসিয়া আপনাব সাথে দেখা করেন। বাড়ী যাইয়া স্বামীকে লিখিলাম, যাঁহাকে মুনি ঋষিগণ ধ্যানে জানিতে পাবেন না, তিনি তোমাকে দেখিতে চান। পত্র পাওয়ামাত্র দেওভোগ যাইও। তোমার উপর নাগমহাশয়ের যে দয়া দেখিলাম, তাহা বর্ণনা কবা যায় না। তুমি দেওভোগ বেশী যাইও এখানে সময় সময় আসিও। তাঁহাব ভালবাসা ইহকাল ও পবকালের সঙ্গী।

জীবের প্রতি নাগমহাশয়ের বড স্নেহ ছিল। তাহার স্নেহ এত মধুর ছিল, লেখা যায় না। সকলে বলে মাতৃস্নেহ অন্য সকল স্নেহ পরাজয় করে, তাহা আমরা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি, কিন্তু নাগমহাশয়ের স্নেহ মাতৃস্নেহ হইতেও শতগুণ অধিক মধুর

অনুভব করিয়াছি। মাতৃস্নেহের সীমা আছে, কিন্তু তাঁহার স্নেহ আকাশের মত অসীম। তিনি নিজ দেহ অপেক্ষা পরের দেহকে অধিক স্নেহ করিতেন। জগতে দেখা যায়, মাতা সন্তানকে স্নেহ করেন, কিন্তু তাহা নিজ দেহের স্নেহের বা ভালবাসার চেয়ে বেশী নয়। যদি শিশু সন্তান মাতৃ-স্তন্য পান করিতে করিতে কখন দন্ত দ্বারা স্তন কর্ত্তন করে, মা অমনি শিশুকে স্তন ছাড়াইয়া দূরে রাখিয়া দেন এবং তাহার দাঁতে আঘাত করেন, যেন সে স্তন আর না কামড়ায়, কিন্তু নাগমহাশয় অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সমাগত অতিথিদিগকে পরম সুখে রাখিয়াছেন, দেহপাত পরিশ্রম করিয়া চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য যোগাইয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। নিজের দেহে আগুন লাগিলেও বোধ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে একটী পিপিলিকা সামান্য কষ্ট পাইলে হৃদয়ে লাগিত, তাঁহার হাসিমাখা মুখপদ্ম ঈষৎ মলিন হইত। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। নাগমহাশয় জীবের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ছিলেন।

নাগমহাশয়ের বাড়ীর দুইদিকে দুইটী পুকুর ছিল। একটী উত্তরের দিকে, অপরটী দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দক্ষিণের পুকুর নাগমহাশয়দের নিজের এবং উত্তরের পুকুর অন্যের সহিত ভাগে ছিল। সময়ে দক্ষিণের পুষ্করিণীর জল কমিয়া যাইত। জল কমিয়া গেলে সাপ মাছ খাইতে আসিত। নাগমহাশয় মাছের কষ্ট দেখিয়া যে পুষ্করিণীতে অধিক জল থাকিত, তাহাতে মাছ ধরিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিতেন। একদিন ভোরের বেলায়, যখন তিনি মাছ ধরিতে গিয়াছেন, সে সময় সাপ জলে নামিয়াছিল। তিনি আদর করিয়া মাছ উঠাইতে গিয়াছেন, সাপ খাদ্য জিনিষ মনে

করিয়া তাঁহার অঙ্গুলি কামড়াইয়া ধরিল। যখন সাপ তাঁহার অঙ্গুলি ইচ্ছামত কামড়াইয়া দেখিতে পাইল, উহা মৎস্যের মত গিলিতে পারিতেছে না, অঙ্গুলি ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল। তৎপর নাগমহাশয় হাত সরাইয়া আনিলেন, যেন তাঁহার কিছু হয় নাই। সাধারণ লোকের মত বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার হাতে রক্ত দেখিয়া, একজন ব্রাহ্মণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, এক সাপ আহার মনে করিয়া অঙ্গুলি কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, পরে বুঝিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণ অমনি যজ্ঞসূত্র খুলিয়া নাগমহাশয়ের হাত বাঁধিয়া দিলেন। তিনি নাগমহাশয়েব বাধা মানিলেন না। ব্রাহ্মণ হাত বাঁধিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ওঝা ডাকিয়া বিষ ফেলিতে দিলেন না। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, সাপ খাদ্য মনে করিয়া অঙ্গুলি কামড়াইয়াছে, ইহাতে কোন অপকার হইবে না, আমার কোন যন্ত্রণা নাই। এইরূপ বলিয়া অন্যান্য মানুষের মত বসিয়া রহিলেন। লোকের কথায় কোন কাজ হইল না। ব্রাহ্মণ পৈতা খুলিয়া লইলেন। নাগমহাশয় তামাক সাজিয়া, হাসিতে হাসিতে তাহাকে খাইতে দিলেন। কেহ কেহ বলিল, উনি মানুষ নন। বিশ্বম্ভর বিনা কেহ বিষের জ্বালার হাত এড়াইতে পারে না। উনি গোপনে মানবের ঘরে লীলা করিতেছেন।

একদিন আমি দেখিয়াছি, নাগমহাশয় তামাক খাইতেছেন। একটী মশক তাঁহার হাতে বসিয়া ইচ্ছামত রক্ত পান করিতেছে। আমার মনে হইল, ইঁনি কেমন স্নেহ করিয়া হাসিয়া হাসিয়া মশককে খাওয়াইতেছেন। যখন মশক প্রাণভরিয়া রক্তপান করিয়া চলিয়া গেল, তিনি একবার দংষ্ট্র স্থান হাত দিয়া চুলকাইলেন, যেন

আমাকে বলিয়াদিলেন, তিনি জানেন যে মশক তাঁহাকে কামড়াইতেছিল। সাপে কামড়াইলে যাহাব কষ্ট হয় নাই, তাঁহার কি আর মশকের দংশনে যন্ত্রণা হইবে?

সকল সময়েই জীবের উপর নাগমহাশয়ের অসীম স্নেহ ছিল। শরৎবাবু বলিয়াছিলেন, যখন বরাহনগরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠ ছিল, এক উৎসবের দিন এক নাগশিশু তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই মারমার ববে তাহার নিকট গেল। নাগমহাশয় কোথায় ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া, সেইস্থানে যাইয়া, নাগশিশুকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নাগশিশু মস্তক হেট করিয়া তাঁহার পশ্চাতে চলিল, এবং নাগমহাশয়ের নির্দ্দেশ মত চক্ষের আড়ালে গেল। সমাগত ভক্তমণ্ডলী অবাক্ হইয়া তাঁহার অসীম শক্তি দেখিলেন, বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্নেহেব মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় ব্যতীত অন্য কাহাকে সাপের উপর এত স্নেহ করিতে শুনা যায় না, কোন যুগের কোন পুস্তকে দেখা যায় না।

নাগমহাশয়ের স্নেহে সকল জীব মোহিত ছিল। সকলেই নাগমহাশয়কে আপন মনে কবিত। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিতেন। পক্ষিগণ গান কবিতে থাকিলে, তিনি বলিতেন, এখন সকলেই মনের আনন্দে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ডাকিতেছে, এখন সত্য যুগ। এ সময়ে ভগবানে মন রাখিতে হয়। লোকের প্রতি স্নেহ কবিয়া লোকেব মঙ্গলের জন্য, এই কথা বলিয়া বারান্দার এক কোণে বসিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেন। তাঁহার স্নেহমাখা মধুর হাসি এবং তাঁহার সেই মহাভাবপূর্ণ নয়নকমল দেখিলে জীবের মনে হইত, যেন ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান্

—কৃপা করিয়া জীবদিগকে জ্বালার হাত এড়াইতে ভগবান্‌কে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। পাখীগণ তাঁহাকে দেখিয়া, মহা আনন্দে ডাকিত এবং তাঁহাব চারিদিকে ঘুরিত। একবার আমি নাগ মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। ছুইটী শালিক তাঁহার কাছে আসিয়া, মাথা কাত করিয়া তাঁহাব দিকে তাকাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া ডাকিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় তাহার কত আত্মীয়। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, মাগো, অতিথি আসিয়াছে, ছুইটী চাউল দাও। আমি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া আছি। তিনি আবাব মধুর স্বরে বলিলেন, ছুইটী চাউল দাও। আমি তাঁহাকে চাউল দিলাম। শালিক ছুইটি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইল। তাহা সত্বেও তাহারা চলিয়া গেল না, কারণ তাহারা জানিত নাগমহাশয়ের নিকট তাহাদের কোন ভয় নাই। তৎপব তাহারা নাগমহাশয়ের হাত হইতে চাউল খাইতে আরম্ভ করিল, যেন তিনি শালিক দম্পতির মহা আপন। আমি ও নাগমহাশয়ের একটি ভক্ত বিস্ময়ের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলাম। বনের পাখী কি করিয়া বুঝিতে পারিল, নাগমহাশয় তাহাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না—কেবল শান্তি দিবেন। ধন্য পাখী! ধন্য নাগমহাশয়ের স্নেহ! যাহাতে জীবকুল তাঁহাকে বুঝিতে পারিত, এবং তাঁহার স্নেহমূর্ত্তি দেখিতে চাহিত।

জলের মাছ তাঁহার পায়ের শব্দে বুঝিতে পারিত যে, নাগ মহাশয় তাহার নিকট গিয়াছেন। নাগমহাশয়দের বাড়ীর উত্তর দিকে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহাতে একটী মাগুর মৎস্য বাস করিত। যখন নাগমহাশয় সেই পুকুরের পারে যাইতেন,

মাছটী তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। নাগমহাশয় জল নাড়িলে, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে জলে ভাসিত এবং আনন্দে জলের উপর সাঁতার কাটিত। তিনি চলিয়া আসিলে সে জলের নীচে যাইত। নাগমহাশয় খাইয়া আঁচাইতে যাওয়ার সময় তাহার জন্য এক মুঠো ভাত নিয়া যাইতেন এবং জলেব নীচে হাত রাখিতেন। মাছটী মহাআনন্দে তাঁহার হাত হইতে ভাত খাইত। জলচর মৎস্য কি করিয়া জানিল, নাগমহাশয় তাহার আপন? এমন স্নেহ কে কোথায় দেখিয়াছে?

বর্ষার সময় একদিন নাগমহাশয় বাজারে যাইবেন। একটী কুকুব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গ জলে ভাসিতে থাকে। মাঠ পথ ঘাট জলে ডুবিয়া যায়। সুতরাং একপাড়া হইতে অন্যপাড়া যাইতে হইলে নৌকার দরকার হয়; হাট বাজার ত দূরের কথা। নাগমহাশয় নৌকায় উঠিলেন। যে স্থানে নৌকা বাঁধা ছিল, একটী কুকুর তথায় যাইয়া বসিল। যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, সে নাগমহাশকে দেখিতে লাগিল। যখন আর তাঁহাকে দেখা গেল না, কুকুর আকাশ পানে মুখ তুলিয়া কাঁদিয়া জলে ঝাঁপ দিল, এবং সাঁতার দিয়া নাগমহাশয়কে ধরিল, আমি ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, যখন কুকুর জলে ঝাঁপ দিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন। ইহা ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, নাগমহাশয়ের হাসি-মাখা মুখখানা কুকুরের কষ্টে ঈষৎ মলিন হইয়াছে। কুকরকে নৌকায় লইয়া আসিতেছেন। তিনি বাড়ীতে উঠিলেন, কুকুর লাফাইয়া বাড়ীতে আসিল। তিনি কতটুক সময় স্নেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া, এদিকে ওদিকে যাইতে

লাগিলেন এবং অবশেষে অন্যপথে নৌকায় উঠিয়া বাজারে গেলেন। কুকুর তাঁহার স্নেহে মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। পশু হইয়া কি করিয়া বুঝিল নাগমহাশয় তাহার এত আপন। হায়, হায়, আমরা মানুষ হইয়া তাঁহার সহিত কি ব্যবহাব কবিলাম।

শবৎ বাবু বলেন, জন্মিবামাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় নাগমহাশয়ের ধর্ম্মভাব সহজাত ছিল। দেবতা চিরকালই দেবতা। শিশুকাল হইতেই জীবেব প্রতি তাঁহার অপরিমিত স্নেহ ছিল। যখন নাগমহাশয়েব প্রথম বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর। একটী বিড়ালের অসুখ হওয়ায় গায়ের সকল লোম ঝড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল। নাগমহাশয়ের বিবাহেব দিন বিড়াল কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগমহাশয় বিড়ালের সেই অবস্থা দেখিয়া, ঘর হইতে এক পাতিল ক্ষির আনিয়া, তাহার গায় মাখিয়া দিলেন এবং জঙ্গলে নিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অন্য কতকগুলি বিড়াল আসিয়া, তাহার গায়ের ক্ষীর চাটিয়া খাইল। বিড়ালটী ভাল হইয়া নাগমহাশয়রে বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার নিকট বসিল। যখন নাগমহাশয় এক পাতিল ক্ষীর বিড়ালের গায়ে মাখেন, তাঁহার এক জ্ঞাতি ভগ্নী বলিয়াছিলেন, দুর্গাচরণ, তুমি এক পাতিল ক্ষীর নষ্ট করিলে? সে সময় তিনি তাঁহার কোন উত্তর দিয়াছিলেন না। বিড়ালকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, এই দেখুন, বিড়ালটী ভাল হইয়াছে। একটী প্রাণীর চেয়ে কি এক পাতিল ক্ষীরের অধিক মূল্য? ক্ষীরের লোভে অন্য বিড়াল উহার গা চাটিয়া গরম করিয়া দিয়াছে, এবং সে ভাল হইয়াছে।

বিড়াল কি করিয়া জানিল, নাগমহাশয় তাহার দুঃখ মোচন করিবেন?

বর্ষাকালে যখন অবিশ্রান্ত বারিপাতে পুকুর ভরিতে আরম্ভ করে, মেঘ গর্জ্জনে কই প্রভৃতি মৎস্যগণ প্রাণের আনন্দে পুকুর হইতে বাহির হয় এবং ক্ষীণা জলধারা ধরিয়া যেদিকে ইচ্ছা হয় গমন করে। সে সময় লুব্ধ মানব সামান্য রসনার তৃপ্তির জন্য সেই মৎস্যসকল ধরে। নাগমহাশয়ের দেশেও তাহা হইত। তাঁহার সমবয়সী বালকগণ এই সময় মৎস্য ধরিতে মাঠে যাইত। নাগমহাশয় তাহাদের সাথে থাকিতেন। সকলে মাছ ধরিয়া ঘরে নিয়া আসিত, কিন্তু নাগমহাশয় তাহা ধরিয়া আনিয়া, দয়া-পরবশ হইয়া, বড় পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিতেন। সারদাপিসী বলেন, তিনি মহা ঔৎসুক্যের সহিত মাছ ধরিতে যাইতেন এবং প্রত্যেক দিন রিক্তহস্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। তখন তাহার বয়স ১০।১১ বৎসর। এমন স্নেহ, জীবের প্রতি এমন ভালবাসা, এমন পরসুখানুগতপ্রাণ কি কোথায় দেখা যায়?

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় একটী লোক জল হইতে একটী বাঁশ উঠাইয়া আনিয়াছিল। সেই বাঁশের মধ্যে মৎস্যগণ বাস করিয়াছিল বলিয়া একটী মাছ বাঁশের সঙ্গে আনীত হয়। যে স্থানে বাঁশ রাখা হইয়াছিল, সেখানে মাটিতে মাছটী পড়িয়া ধর্‌ফর্‌ করিতেছিল। কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। নাগমহাশয় কোথায় ছিলেন, দেখিতে পাই নাই। তিনি কোথা হইতে আসিয়া, মাছটী ধরিয়া নিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন। যখন তিনি মাছ ধরিতেছেলেন, সে সময় আমরা দেখিলাম, তাহা ধর্‌ফর্‌

করিতেছে নাগমহাশয়ের সেই মূর্ত্তি, সেই চাঞ্চল্য, এখনও আমার চক্ষে ভাসিতেছে।

তাঁহার নিজের শরীর দগ্ধ হইলে, কখন তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে যে কোন জীব হউক না কেন কষ্ট পাইলে, তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইতেন, কষ্টদূর করিতে অমনি অগ্রসর হইতেন। ইনি কি মানুষ? অথবা অন্য কেহ গোপনে জীবের দুঃখ মোচন করিতে মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন?

নাগমহাশয় দুর্গাপূজা করিতেন। প্রতিমা তৈয়ার করার জন্য তাঁহার বাড়ীতেই ভাল মাটি ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি মাটি কিনিয়া আনিয়া প্রতিমা প্রস্তুত করিতেন। যাহারা প্রতিমা গড়াইত, তাহারা তাঁহাকে বলিল, আপনার বাড়ীতে ভাল মাটি আছে, প্রতিমা তৈয়ার করিতে মাটি কিনিয়া আনিতে হইবে না। নাগমহাশয় বলিলেন, ঐ মাটি কাটিলে ওখানে সে সব গাছ আছে, তাহাদের জোর কমিয়া যাইবে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, এত গাছ দিয়া কি হইবে? মাটি থাকিতে আবার মাটি কিনিয়া আনিবেন কেন? নাগমহাশয় বলিলেন, যাহাকে গড়িতে পারিবে না, তাহা নষ্ট করিবে কেন?

একদিন একজন মৎস্যজীবী এক ঝুড়ি মৎস্য লইয়া নাগমহাশয়ের বাড়ীর উপর দিয়া যাইতেছিল। নাগমহাশয় তাহার মাথা হইতে মাছের ঝুড়ি নামাইয়া দেখিলেন, সমস্ত মাছগুলিই জীবন্ত। তিনি মাছের দাম করিয়া ধীবরকে প্রাপ্য পয়সা দিয়া, সমস্ত মাছ নিজ পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন। জেলে নাগমহাশয়ের কাজ দেখিয়া অতিশয় ভয়াতুর হইয়া, পয়সা লইয়া দৌড়াইয়া পালাইল। কোন দিনও সে লোককে এই রকম কাজ করিতে দেখে নাই। সুতরাং

ধীবর নাগমহাশয়ের অলৌকিক কাজ দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইল, আপন প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল।

অপর একদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন। এক জেলের নিকট অনেক জীবন্ত মাছ ছিল। তিনি সকল মাছের দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর অন্যের নিকট যে দামে মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ হারে সকল মৎস্যের দাম চাহিল। নাগমহাশয় একটি কথা বলিলেন না, সে যে দাম চাহিয়াছিল, তাহা চুকাইয়া দিয়া, সমস্ত মাছ নিকটবর্ত্তী এক পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন। বাজারের লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার অমানুষিক কার্য্য দেখিতে লাগিল। একটী লোক সেই ধীবরকে অন্য লোকের নিকট কতক মাছ বিক্রয় করিতে দেখিয়াছিল। নাগমহাশয় হইতে দ্বিগুণহারে দাম লওয়ায়, সে জেলেকে অনেক তিরস্কার করিল এবং বলিল, তুমি এমন মানুষকে ঠকাইলে। কোন দিনও তোমার অন্ন জুটিবে না। তুমি এখনই তাঁহার নিকট হইতে অন্যায় মত লওয়া পয়সা ফিরাইয়া লও, নচেৎ তোমার অতিশয় অমঙ্গল হইবে। তাহার কথা শুনিয়া এবং নাগমহাশয়ের অলৌকিক কাজ দেখিয়া, জেলে ভীত হইল এবং নিজ ন্যায্য পয়সা রাখিয়া, অবশিষ্ট পয়সা নাগমহাশয়কে ফিরাইয়া দিতে গেল। তখন নাগমহাশয় অন্য এক দোকানে মৎস্য কিনিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। জেলে তাঁহার নিকট যাইয়া, পয়সা ফিরাইয়া দিতে চাহিল। নাগমহাশয় নিতে রাজী ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, আপনার যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহা দিয়াছি, আমি আর উহা নিতে পারিব না। নাগমহাশয় পয়সা ফিরাইয়া নিবেন না, জেলেও তাহা রাখিবে না। জেলে অতিশয় পীড়াপীড়ি করায়

নাগমহাশয় সেইস্থানে যে মাছ কিনিয়াছিলেন, তাহা ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়াইযাছিল। অনেকেই তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিল। তাঁহার যে পয়সায় মমতা ছিল না, তাহা বলিযা সকল লোক নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

একদিন আমার পিতা দেওভোগ গিয়াছিলেন। নাগ-মহাশয়কে বাড়ীতে না দেখিয়া, মাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুবভাই কোথায়? তিনি বিবক্তিব সহিত বলিলেন, আপনাদের সাধুব কাজ দেখুন। ঐ পুকুবের জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, লোকে মাছ ধবিয়া নিবে বলিয়া, ভোরেব সময় একটি লোক সঙ্গে লইয়া মাছ ধরিতেছেন। দুই প্রহব বেলা হইয়া গেল, এখনও তাঁহাব দেখা নাই। আর যে কত সময় লাগিবে কে জানে? নিজে মাছ মাবিবেন না, ভাল কথা। অন্যে মাছ ধবিবে, তাহাতে তাঁহাব কি ক্ষতি হইবে? তাহা শুনিয়া, যে পুকুবে নাগমহাশয় মাছ ধরিতে ছিলেন, পিতা সেই পুকুরের পাবে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি অতিশয় যত্নের সহিত মাছ উঠাইয়া পাত্রে রাখিতেছেন, যেন তাহাতে মাছের কোন কষ্ট না হয়। যে লোকটাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন, নাগমহাশয় তাহাকে বলিতেছেন, ধীরে ধীরে মাছ ধরিবেন, উহাদের বড় ভয় হইতেছে। অনেক সময় মাছ পাত্রে রাখিলে তাহাদের কষ্ট হইবে বলিয়া, কয়েকটা মাছ ধরিয়া বড় পুকুরে লইয়া যান এবং জলে ছাড়িয়া দেন। যাতায়াত করিতেও কত সময় লাগিতেছে। পিতা বলেন, নাগমহাশয়ের মুখ দেখিয়া মনে হইল এই কাজে তাঁহার কোন কষ্ট হইতেছে না। মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া, তাহাদের সুখে সুখী হইতেছেন। যে লোকটা

সঙ্গে গিয়াছিল, সে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছে। তিনি তাহার মাছ লইয়া যাইয়া বড় পুকুরে ছাড়িয়া দিতেছেন। তিনি পিতাকে দেখিলে কোন স্থানেই থাকিতেন না, বাড়ীতে চলিয়া আসিতেন। কিন্তু সেই দিন আর বাড়ীতে আসিলেন না। পিতা পুকুরের পারে দাঁড়াইয়া তাঁহার দয়াব বিকাশ দেখিতে লাগিলেন। কতক সময় পর পিতা বলিলেন, ঠাকুবভাই, বাড়ীতে যাইবেন না? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আব বেশী সময় লাগিবে না। যদি উহাদিগকে উঠাইয়া অন্য পুকুরে লইয়া না যাই, তাহাদের বড় কষ্ট হইবে। তাঁহাকে আর কোন কথা বলিতে পিতার সাহস হইল না। তিনি চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, ঠাকুরভাই মাছ ধরা শেষ না করিয়া বাড়ীতে আসিবেন না। এমন স্বামী পাইয়া আপনি কেন কষ্ট কবিতেছেন? তাঁহার মত কাজ কবিতে শিখুন। ঠাকুরভাই সকাল হইতে দাঁড়াইয়া মাছ ধবিতেছেন, হাসিমাখা মুখ, তাঁহাৱঁ কোন কষ্ট হইতেছে না।

একদিন মুন্সীগঞ্জের এক উকীল ও চারিজন ব্রাহ্মছাত্র নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। সকলই তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইয়া, যাহার যে ধর্ম্ম, সে তাহা বলিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সকলের কথাই শুনিতেছেন। ব্রাহ্ম ছাত্রগণ বলিল, ব্রহ্ম এক, নিরাকার। সে কি আর দুই হইতে পারে? নাগমহাশয় বলিলেন, হা, ব্রহ্ম নিরাকার। ইহা সত্য কথা। তিনি অনন্ত। তিনি সাকারও হইতে পারেন। তিনি ঘটে, পটে, সকল স্থানেই বিরাজ করিতেছেন। যখন তিনি রূপ ধারণ করেন, তখন জীব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মুক্তিলাভ

করে। ”ইহা বলিতে বলিতে নাগমহাশয় সমাধিমগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া উকীল ও ব্রাহ্মণগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহারা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। কতক সময় পর নাগমহাশয়ের মন বাহ্য জগতে আসিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু দুইটী ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলের মনে হইল, তিনি সাকার ও নিরাকার, উভয়ই ভগবানের রূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ঠাকুরদাদা দুর্গানাম লিখিবার সময় কথা বলিতেন, তাহা নাগমহাশয়ের ভাল লাগিত না। তজ্জন্য তিনি ঠাকুরদাদাকে দেশে লইয়া আসেন। তাঁহার মনে ছিল, দেশে এত বন্ধু বান্ধব নাই যে, দুর্গানাম লেখার সময় কথা বলিতে হইবে। দুর্গানাম লেখা হইলে মন খুলিয়া যে বাজে কথা বলিবেন, এমন লোকও দেশে মিলিবে না। নাগমহাশয় পিতাকে দেশে রাখিয়া বলিলেন, আপনি এখন আর সংসারের ছাইভস্ম ভাবিবেন না। আমি সমস্ত কাজ করিব। আপনার কোন কষ্ট হইবে না। আপনি আপনার ইষ্টচিন্তা করুণ। ঠাকুরদাদা তাহাই করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি ভোর ৫টার সময় জাগিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে আরম্ভ করিতেন। প্রায় ৮টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেন। তৎপর নাগমহাশয় তাঁহাকে একছিলুম তামাক দিতেন। ঠাকুরদাদা তামাক খাইয়া, পাইখানা হইতে আসিয়া, গায় তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেন। ৯।৯৷৷০ টার ভিতর স্নান করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিতেন। ২।৩টা বাজিয়া যাইত, মন্ত্রের শেষ হইত না। পূজা করিয়া খাইতে ৩।৩৷৷টা বাজিয়া যাইত। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে সর্ব্বদা লোক

থাকিত। তথায় নানামত লোক যাইত। ব্রাহ্মণ গেলে নিজ হাতে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। অন্যান্য লোক মাঠাকুরাণীর হাতেই খাইতেন। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ১ টার পূর্ব্বে সকল লোকের খাওয়া শেষ হইত না, সকলে খাইয়া বিশ্রাম করিয়া উঠিলে দেখা যাইত, ঠাকুরদাদা খাইতে বসিয়াছেন। অতিথির খাওয়া না হইলে, নাগমহাশয় কখন খাইতেন না। কোনদিন নাগমহাশয় খাইয়া উঠিয়াছেন, দেখিতেন, তাঁহার স্নান মাত্র শেষ হইয়াছে, বাড়ীতেও আসেন নাই। ঠাকুরদাদার খাওয়া হইলে, নাগমহাশয় তাঁহাকে একছিলিম তামাক সাজিয়া দিতেন। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, নাগমহাশয় তামাক দিয়া আসার পূর্ব্বে বাড়ীর লোক এবং দেশের লোক একত্রিত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আগত অভ্যাগতদিগকে বাড়ীর লোক বলিলাম, তিনি ও ঠাকুর দাদা ব্যতীত বাড়ীতে আর কোন পুরুষ ছিল না।

ঠাকুরদাদা অল্প সময় বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিতেন। এক-আধ ছিলুম তামাক খাইয়া ঘরে যাইয়া বসিতেন এবং আবার জপ আরম্ভ করিতেন। রাত্রি ১২।১ টার পূর্ব্বে তাঁহার জপ শেষ হইত না। সুতরাং লোকের সাথে তাঁহার কথা বলার বড় অবসর ছিল না। কোন লোক তাঁহার সহিত কথা বলিতেও সাহস পাইত না, কারণ সকল লোক জানিত, যদি ঠাকুরদাদা বাজে কথা বলেন, নাগমহাশয় বিরক্ত হইবেন। ইহা ছাড়া নাগমহাশয়ের এমন এক শক্তি ছিল, কেহ তাঁহার সাক্ষাতে মায়াপুরাণ বলিতে পারিত না। তিনি বাজে কথাকে মায়াপুরাণ বলিতেন। তাঁহার সংসর্গের এমনই প্রভাব ছিল, ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত,

যাহা :বর কর্ত্তব্য, তাহা সকলের মধ্যে বিকসিত হইত। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন :—বিদ্যারূপে দিয়া জ্ঞান, কাকে কর পরিত্রাণ, কাকে অবিদ্যায় আবৃত করে মোহগর্ত্তে টেনে ফেল। বিদ্যা অবিদ্যা তাঁহারাই প্রভাব।

ঠাকুরদাদা এইভাবে ইষ্টনাম জপ করিতে থাকিতেন। ইহার ভিতরে যদি তাঁহার মনে কোন বাজে কথা উঠিত. তাহা বারণ করার জন্য তিনি অনেক সময় পিতাকে অপ্রীতিকর বাক্য বলিতেন। তাহাতে ঠাকুরদাদা লজ্জা বোধ করিতেন এবং সেই কথা আর মনে তুলিতেন না। সুতরাং অনেক সময় পিতা ও পুত্রে বাদানুবাদ হইত। একদিন ঠাকুরদাদা বীরের মত বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি দেখিয়া আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার কর? আমি জীবনে কোন পাপ কিম্বা অন্যায় কাজ করি নাই। তবে বহুকালের অভ্যাস হেতু সময় সময় সংসারের কথা মনে উঠে। ছোট সময় একদিন আমি শোল মাছের ছোট বাচ্চা ধরিয়া আনিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটী মাছ জলে ঘা দিল। অমনি আমার মনে হইল, আহা, উহাদের মা উহাদিগকে না দেখিয়া শোকে এমন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমি সমস্ত বাচ্চাগুলি জলে ছাড়িয়া দিলাম। আর একদিন নদীর পারে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক ঘটি মোহর দেখিলাম। মনে করিলাম, ইহা পরের দ্রব্য। তৎপর মাটি চাপা দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। আমার যে অবস্থাছিল, মোহরগুলি আনিলে আমার কষ্টদূর হইত। কেবল অধর্ম্ম হইবে বলিয়া পরের মোহর আনিলাম না। আমার কোন্ কর্ম্ম দেখিয়া, তুমি আমাকে এত কথা বল, তাহা বুঝিতে পারি না। ঠাকুরদাদার কথা শুনিয়া, নাগমহাশয়

পিতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পিতাও ছেলের রূপে মোহিত হইয়া রহিলেন।

ঠাকুরদাদার মন বড় ভাল ছিল। একবার দুর্গাপূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা আসেন। বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় একখানা মুকুট কিনিয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া, নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মুকুটখানা কেন আনিয়াছেন? ঠাকুরদাদা নিজের অভাব জানিতেন। পুত্র দুর্গা পূজা করিতে পারিবে না ভাবিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কালীপূজা করিতে ইচ্ছা হয়। নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনি যে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, সে পূজাই হইবে। আমি দুর্গাপূজা করিব। আপনার ইচ্ছায় সমস্ত হয়। ইহা বলিয়া, নাগমহাশয় পিতার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। দুর্গা পূজার ১১দিন মাত্র বাকি ছিল। পূজার ঘর নাই। প্রতিমা তৈয়ার করিতে হইবে। দরমা দ্বারা ঘর তৈয়ার করাইয়া, তাহার মধ্যে প্রতিমা গড়াইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসর দরমার ঘরে পূজা করিলেন। ঠাকুরদাদা কালী-পূজা করিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি কালীপূজা করিলেন; জগদ্ধাত্রী পূজাও হইল। ঠাকুরদাদা অতিশয় সন্তোষলাভ করিলেন। তিনি মনের আনন্দে বলিতেন, আমার দুর্গার কি ভক্তি! এ অবস্থায়ও সে পূজা করিল! এমন পিতা মা হইলে এমন ছেলে পায়!!

একবার অর্দ্ধোদয়যোগের পূর্ব্বদিন নাগমহাশয় কলিকাতা হইতে বাড়ী যান। ঠাকুরদাদা তাহাতে দুঃখিত হইয়া নাগমহাশয়কে বলিলেন, কত লোক টাকা খরচ করিয়া, অর্দ্ধোদয়যোগের

সময় গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতা যায়, আর তুমি গঙ্গার পারে থাকিয়া যোগের পূর্ব্বদিন চলিয়া আসিলে। তুমি বলিলে, আমি গঙ্গাস্নান করিতে পারিব না। সুতরাং তুমিও গঙ্গাস্নান করিলে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি স্নান না করিলে, আমার স্নান করা হইল না। তোমার কাজই এই রকম। নাগমহাশয় বলিলেন, মনমে চাঙ্গা ত কোঠরমে গঙ্গা। মনে করিলে ঘরে বসিয়াই গঙ্গাস্নান করা যায়। ঠাকুরদাদা বিরক্তির সহিত বলিলেন, তুমি কতই না পার? নাগমহাশয় আর কিছু বলিলেন না। অর্দ্ধোদয় স্নানের দিন ঠাকুরদাদাকে ঘরে গঙ্গাস্নান করাইতে মানস করিয়া, দেবী গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া পিতার পাশে বসিয়া রহিলেন। বাড়ীর অগ্নি কোণে একস্তূপ মাটি ছি1। মাঠাকুরাণী গৃহ-কাজের জন্য তথা হইতে মাটি আনিতে গিয়াছিলেন। হাতে করিয়া অল্প মাটি তুলিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইলেন, মাটি ভেদ করিয়া কল কল করিয়া জল উঠিতে লাগিল। মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। নাগমহাশয় তাহা দেখিতে পাইয়া ঠাকুরদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা গঙ্গা নিজগুণে এখানে আসিয়াছেন। ঠাকুরদাদা তাড়াতাড়ি আসিয়া, ঘটিভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া, ভক্তিভরে নিজ মস্তকে ঢালিতে লাগিলেন। সেই জলে ঠাকুরদাদাকে স্নান করিতে দেখিয়া, সারদা পিসী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন, মাঘ ফাল্গুন মাস। চতুর্দ্দিক শুষ্ক। কোথা হইতে এত জল আসিল? নিশ্চয়ই আমার ভাই গঙ্গা আনিয়াছেন। পিসীমা ও নাগমহাশয়ের শ্বশ্রূ মহাভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গণ্ডূষ করিয়া জল পান করিলেন; নাগ-মহাশয় ও মাঠাকুরাণী ভক্তিগদগদ হইয়া তাহাতে স্নান করিয়া,

করজোড়ে গঙ্গাকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাদা ইচ্ছামত স্নান করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা দিলেন এবং গঙ্গাজল পান করিলেন। নাগমহাশয়ের শ্বশ্রূ ও সারদাপিসী মনের আনন্দে স্নান করিয়া ভক্তিভবে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সফেন জল উঠিতে লাগিল। ঠাকুর-দাদার মনে হইল যে, তিনি কলিকাতা আছেন, কালীবাড়ী গিয়াছেন। স্নান করিয়া কালীর মন্দিরে যাইয়া সষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি তন্ময় হইয়া কালী দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার ভাব ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখনও গঙ্গাজল উঠিতেছে। পাড়ার লোক জানিতে পারিতেছে। যেস্থান হইতে গঙ্গাজল উঠিতে-ছিল, নাগমহাশয় সেই স্থানে "জয় গঙ্গে" বলিয়া হাত চাপা দিলেন। অমনি গঙ্গা নিজ বেগ সম্বরণ করিলেন এবং স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নাগমহাশয়ের শ্বশুর ও মাঠাকুরাণীর এমন সুখেও দুঃখ আসিল। সেই সময় মাসী নাগমহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি এমন গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহার জন্য একটী মাটির ঘট করিয়া সেই গঙ্গার জল রাখিয়া দিলেন। মাসীকে ডাকাইয়া আনিয়া, মাঠাকুরাণী তাঁহাকে গঙ্গাজল দিলেন। তাহা পানকরিয়া মাসী বহুদিনের গুল্মরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। পিসীর ও নাগমহাশয়ের শ্বশ্রূ এই কথা বলিয়া, নাগমহাশয়ের অসীম ক্ষমতার কথা মনে করিয়া, এখনও রোদন করেন।

ঘরে বসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া, কালীপ্রতিমা দেখিয়া, ঠাকুরদাদার"

হৃদয়ের ময়লা একেবারে চলিয়া গেল। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা মনে করিয়া, পলকহীন নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় পিতার নিকট আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু পিতার মন ভগবৎভাবে পূর্ণ রহিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাদা বসিয়া আছেন, আমি ও নাগমহাশয় তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছি। ঠাকুরদাদা নাগমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া, মহাভাবে অভিভূত হইয়া, আপন মনে ফুস ফুস করিয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্গা কি সামান্য! সে ঘরে বসিয়া গঙ্গা দেখাইতে পারে। সে আমাকে কালী ও গঙ্গা দেখাইয়াছে। নাগমহাশয় তাহা শুনিয়া, সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া, পিতার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরদাদা আর কিছু বলিলেন না। অন্য লোকের মত সন্ধ্যা করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সময় সময় পিতার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া, দেব-দেবী দর্শন করাইয়া, আত্মগোপন করিতেন, ঠাকুরদাদা সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন।

যখন আমরা দেওভোগ যাইতাম, নাগমহাশয়ের স্নেহেতে ভুলিয়া, তাঁহার অমিয়মাখাকথায় বিভোর হইয়া, তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতাম। তখন যদি ঠাকুরদাদার নিকট নাগমহাশয়ের শিশুকালের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি অতিশয় সুখী হইয়া তাঁহার দুর্গাচরণের পূতচরিত বলিতেন। তখন তাঁহার কথা কে শুনিয়াছে? সে সময় আমরা সকলেই মনে করিয়াছি, এই দিন এই ভাবেই যাইবে। একদিন ঠাকুরদাদা অতিশয় আনন্দের সহিত বলিলেন, কেহ দুর্গাচরণকে দশটাকা দিলেও একটা গাছের পাতা ছাঁড়াইতে পারিবে না। এই কথাই

শুনিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তখন যদি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি কত আনন্দিত হইয়া কত কথা বলিতেন। একদিন তিনি আমার মাকে বলিলেন, দুর্গাচরণের সংসারেব কোন বিষয়ে মন নাই, ভালমন্দ বিচার নাই। দুর্গাচরণ কেরাসিন তৈল খাইয়া থাকিতে পাবে, কেবল আমার জন্য সংসারে কলের পুতুলের মত আছে। সে বাজার করে, লোকের সাথে কথা বলে, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহার মন নাই। সংসারে আছে, তাই যাহা করিতে হয় সে করে, খাওয়াত নাই, তবে সে লোক দেখাইয়া খায়। আমি আছি বলিয়া সে বাড়ীতে আছে। নচেৎ ঘবে আগুন লাগাইয়া সে একদিকে চলিয়া যাইত। তাহাকে একাকী বাড়ীতে রাখিয়া কোন স্থানে থাকা যায় না।

একদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন। ঠাকুরদাদা বলিতে লাগিলেন, দুর্গা ডাক্তারী আরম্ভ করিয়া গরীব দুঃখীর উপকার করিতে বেশ সুযোগ পাইয়াছিল। যদি রোগীর বাড়ীতে যাইয়া দেখিত রোগী গবীব, সে ভিজিট না লইয়া ফিরিয়া আসিত। প্রথমে আমি মনে করিতাম, দুর্গার দয়ার শরীর, রোগীর কষ্টে নিজে কষ্ট অনুভব কবে. তাই ভিজিট আনিতে পারে না। শেষে যখন আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, পুত্রের ব্যবহারে রাগিয়া যাইতাম। দুর্গা রোগীর বাড়ী হইতে কখনও টাকা চাহিয়া আনিত না। কেহ বেশী দিতে চাহিলেও অবস্থা বুঝিয়া টাকা আনিত। যদি রোগীর কষ্ট দেখিত, কিছুতেই টাকা লইত না। ভাল লোক হইলে, টাকা পকেটে ফেলিয়া দিত। জগতে সেই রকম লোক বড় কম। চতুর লোক অতিশয় সুবিধা নিত। উহার যে রকম

হাতযশ ছিল, যদি অন্যলোকের মত টাকা নিত, আমাদের কোন কষ্ট থাকিত না। একবার রোগী দেখিতে যাইয়া, দুর্গা দেখিতে পাইল, রোগী শীতের সময় মাটিতে শুইয়া আছে। বাড়ীতে আসিয়া নিজের তক্তপোষখানা তাহাকে দিয়া আসিল। এক রোগীর শীত বস্ত্র নাই, নিজের গায়ের খেস খানা ছাড়িয়া দিয়া, শীতের সময় কাপড় গায় দিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার ব্যবহারে আমার অত্যন্ত রাগ হইল। আমি তাহাকে অনেক গালাগালি দিয়া আর একখানা খেস কিনিয়া দিলাম। সুরেশবাবু ও আমি তাহাকে কত বলিয়াছি। আমি বলিলাম, গরীব দুঃখীর উপকার করাত বেশ ভাল কথা। যাহারা টাকা দিতে পারে, তাহাদের টাকা আনিতে দোষ কি? সে কখন কখন আমাকে বলিত, রোগী বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, আত্মীয় স্বজন মলিন মুখে বসিয়া আছে, এই অবস্থা দেখিয়া কি করিয়া তাহাদের টাকা হাত পাতিয়া লইব? আমি বলিতাম, রোগ হইলে যন্ত্রণা হইবেই, আত্মীয়েব যন্ত্রণা দেখিলে অপরের মলিন মুখ হইবেই, ইহা ত সাধারণ কথা। তুমি ঔষধ দিয়া রোগের শান্তি করিতে গিয়াছ। ঔষধ দিয়া তাহাকে ভাল করিবে, তাহা হইতে টাকা আনিতে দোষ কি? তোমার ঔষধে তাহার রোগের শান্তি হইবে, টাকাতে তোমার দাবি আছে। সে বলিত, রোগীর শান্তি দেখিলে, সে যাহা দেয় তাহা আনিব, আমি তাহার কষ্ট দেখিলে টাকা আনিতে পারিব না। সুরেশবাবু উহার কথা শুনিয়া তাকাইয়া থাকিতেন। রোগীকে দেখিতে যাইয়া, তাহার পথ্যের পয়সা দিয়া আসিত। রোগীর পথ্যের পয়সা দিয়াও

তাহার শান্তি হইত না, সময় সময় তাহার শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করিয়াছে। এমন ডাক্তার কে না ডাকে? দুর্গার হাত-যশ দেখিয়া, আমি তাহার জন্য একটী প্যাণ্ট ও একটী কোট তৈয়ার করাইয়া দিলাম। আশা বড় লোকের বাড়ীতে ডাক পরিলে, তাহার কোনরূপ অনাদর হইবে না। সে তাহা পরিয়া বাহির হইত, কিন্তু আসিয়াই ছাড়িয়া ফেলিত, যেন কেহ দেখিতে না পায়। অনেক দিন দুর্গা রোগীর শুশ্রূষা করিয়া সকল রাত কাটাইয়াছে। ডাক্তার রোগীর পাশে এক রাত্রি থাকিলে কত টাকা পায়। শুশ্রূষার ত কথাই নাই, রোগী সুস্থ থাকিলে ২।৪ টাকা যাহা সে ইচ্ছা করিয়া পকেটে ফেলিয়া দিত, তাহা লইয়া বাড়ীতে আসিত। রোগী মারা গেলে, টাকা আনা দূরের কথা, আত্মীয়ের কষ্ট দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত। তাহা দেখিয়া আমি মনে করিতাম, এমন কোমল প্রাণ লইয়া কি ডাক্তারীতে উন্নতিলাভ করিতে পারে! এই ডাক্তারী লইয়া তাহার সহিত আমার অনেক বাদানুবাদ হইত।

একদিন ঠাকুরদাদা নাগমহাশয়ের অসাক্ষাতে আমাদের নিকট বলিতে লাগিলেন, দুর্গা কেরোশিন তৈল খাইয়া থাকিতে পারে। উহার ভালমন্দ জ্ঞান নাই। না খাইয়া থাকিলেও দুর্গার কোন কষ্ট হয় না। যখন আমি কলিকাতা থাকিতাম, আমার জন্য রীতিমত রান্না হইত। উহাকে কলিকাতা রাখিয়া বাড়ীতে আসিলে, দুর্গা নিজের জন্য প্রত্যহ রান্না করিত না; যদি কখন তাহা করিত, ভাতেভাত রাঁধিত। একদিনও মাছ কিম্বা তরকারি রাঁধে নাই। তাহাকে শুধুভাত রাঁধিতে দেখিয়া কৃত্তিবাস জানা বলিত, আপনার সময়ের অভাব, আমি মাছ

তরকারি তৈয়ার করিয়াদি আপনি শুধু রান্না করিয়া নিন্। দুর্গা বলিত, না, আমার কোন কষ্ট হয় না। শুধুভাত আমার মন্দ লাগে না। কৃত্তিবাস বলিত, আপনার কোন অবস্থায় কষ্ট দেখিতে পাই না। সময়মত খান না। সকলদিন রান্না করেন না। যে দিন রান্না করেন না, সেই দিন আপনি কি খান, জানি না। বুড়োকর্ত্তা আপনার খাওয়া দেখিতে বলিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? তখন দুর্গা বিনয়ের সহিত বলিত, ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য খাওয়া, যখন আমার ক্ষুধা বোধ হয়, তখনই আমি খাই। আমি কলিকাতা গেলে, কৃত্তিবাস আমাকে সকল কথা বলিত।

লোকের উপর দুর্গার অতিশয় দয়া ছিল। ভিখারীকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া নিয়ম। দুর্গার কাছে তাহা ছিল না। ভিকারীর দাবি অনুসারে চাউল, ডাইল, তরকারী, পয়সা দিয়া তাহাকে সুখী করিত। সমস্তদিন পর সন্ধ্যার সময় রান্না করিত; রান্নার পূর্ব্বে কোন ভিক্ষারী আসিলে, রান্না করার চাউল পর্য্যন্ত দান করিয়া, নিজে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া রহিয়াছে। ইহাতেও তার মুখ মলিন হইত না। সে ডাক্তারীর টাকা কি করিত, কৃত্তিবাস সব জানিতে পারিত না। সময় সময় লোক তাহা হইতে টাকা ধার নিত, কিন্তু কখনও তাহা ফিরাইয়া দিত না। দুর্গা কখনও কাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে বলিত না। তাহারাও দিবার উদ্দেশ্য করিয়া দুর্গার নিকট হইতে টাকা নিত না। এক এক দিন এরূপ হইয়াছে, দুর্গা যাহা আনিয়াছে, সেই সব লোক সমস্ত লইয়া গিয়াছে। দুর্গা যে কি খাইবে, তাহাও ভাবে নাই। দুর্গা ৫।৭৲ টাকা আনিয়া ধার করিয়া দুই এক

পয়সায় মুড়ি খাইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছে, তোমার চিন্তা কি, ভগবান্ তোমাকে দিবেন। উহার কষ্ট হইবে বলিয়া, অত্যন্ত দরকারী কাজ না হইলে, আমি দুর্গাকে একাকী কলিকাতায় রাখিয়া বাটীতে আসিতাম না। আমার অসাক্ষাতে দুর্গা যে এইরূপ করিবে, তাহা আমি জানিতাম। অপরের নিকট শুনার কোন দরকার হইত না। সেই জন্যই কৃত্তিবাসকে দুর্গাকে দেখিতে বলিতাম। ইহা শুনিয়া আমার এক পিসী বলিলেন, ঠাকুর খুড়ো, দুর্গা কি মানুষ? এমন সময় নাগমহাশয় বাজার হইতে আসিলেন। আমি তাঁহার কাছে চলিয়া গেলাম। তাঁহার দেব চরিত্র আমার আর শুনা হইল না।

ঠাকুরদাদা জানিতেন, নাগমহাশয় তাঁহার জন্য সংসারে আছেন। নাগমহাশয়ও সময় সময় বলিতেন, পিতা আমার সুখের জন্য সকল সুখ ত্যাগ কবিয়াছেন। যতদিন পিতা জীবিত আছেন, আমি থাকিব। তাঁহার স্নেহে ভুলিয়া, তাঁহার এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার বাক্য বেদবাক্য। পিতা মারা গেলেন। নিয়ম মত পিতার সমস্ত কাজ করিলেন। বৎসরান্তে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিলেন। পিতা দেহত্যাগ করিলে পর, তাঁহার আর নিয়ম মত খাওয়া ছিল না। গয়া হইতে আসিলে তাঁহার অসুখ হইল। দুই বৎসর অসুখ লইয়া রহিলেন।

এক কায়স্থের মেয়ে বিধবা হইয়া অভিভাবকের অভাবে, কাজ খুজিয়া ঘুড়িতে ছিল। একদিন গঙ্গার ঘাটে ঠাকুরদাদাকে দেখিতে পাইয়া, কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিল, বাবা, আমি কায়স্থের মেয়ে, স্বামী ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। চাকুরী করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিব, মনে করিয়াছি। এখন একটী স্থান পাইলে হয়,

যেখানে মানও ইজ্জত রাখিয়া কাজ করিতে পারি। তাহা শুনিয়া ঠাকুরদাদার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, এই অনাথা মেয়েটীকে কি করিয়া আশ্রয় দিতে পারি? সামান্য আয়, কোনমতে নিজেদের খাওয়া পরা চলিতেছে। ইহাকে মাহিনা দিতে হইবে। যদি আমি না রাখি, সে কোথায় মান ও ইজ্জত লইয়া থাকিতে পারিবে? ভদ্রলোকেব মেয়ে কি মাহিনাই বা দিব? দয়া পরবশ দীনদয়াল অনেক ভাবিয়া তাহাকে বলিলেন, আমি চারিটাকার বেশী মাহিনা দিতে পারিব না। আমাব এক ছেলে আছে, সে তোমাকে নিজের ভগ্নির মত দেখিবে। তাহা শুনিয়া মেয়েটী সুখী হইয়া, গঙ্গার ঘাটে ঠাকুবদাদাকে ধর্ম্মের পিতা বলিল। ঠাকুরদাদা তাহাকে বাসায় আনিলেন এবং নাগমহাশয়কে বলিলেন, ও আমাদের কাজ করিতে আসিয়াছে। ইহার নাম যোগমায়া। সেই অবধি নাগমহাশয় তাহাকে বোনদিদি বলিয়া ডাকিতেন। তিনি কখনও তাহার সহিত পরিচারিকার মত ব্যবহার করিতেন না। এমন কি তিনি এক ঘটি জলও তাহার নিকট চাহিতেন না। সে আপনার লোকের মত যাহা ইচ্ছা তাহা করিত। নাগমহাশয় কখনও তাহাকে কোন হুকুম দিতেন না। সে তাঁহার অনেক বড় ছিল। নাগমহাশয়দের সচ্চরিত্র দেখিয়া, যোগমায়া আপন পিতা ও ভাই মনে করিয়া, তাহাদের নিকট অবশিষ্ট জীবন রহিল। ঠাকুরদাদার প্রাণে বড় দয়া ছিল। তিনি কায়স্থের মেয়ে। যোগমায়াকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তাহার হাতে খাইতেন না। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ বলিতেন, তাহাকে চারিটাকা মাহিনা দিয়া রাখিলে, স্বজাতির হাতে খাইতে দোষ কি? তোমার অন্য কাজই বা

কি? ঠাকুরদাদা বলিলেন, আমার কাজের জন্য তাহাকে রাখি নাই, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দিয়াছি।

একদিন সকালবেলা নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মা, বাপমহাশয় বলিতেছেন, বংশনশ হইল, নাম লোপ পাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বংশ, নাম কতদিনের জন্য? আপনি বংশ বংশ বলেন, ছেলেকে এত স্নেহ করেন, আজ যদি আমি শুকর হইয়া খোদ্ খোদ্ করিতে করিতে বাড়ীতে আসি, আপনি একটা ঠেঙ্গা লইয়া আমাকে তাড়াইতে আসিবেন। তখন আর পুত্র বলিয়া স্নেহ করিবেন না। এই রূপ জীবের কত স্থানে কত বংশ আছে, কে জানে? যখন দেহেব শেষ হইলে, সকলই শেষ হইয়া যায়, দুই দিনের জন্য বংশ দিয়া কি করিবেন? যিনি অনন্ত কাল যাবত আছেন, যাঁহাকে চিনিলে অচেনা হয় না, তাঁহাকে চিনুন। আপনার নাম লোপ হইবে না। আমি মনে মনে বলিলাম, আপনি যাঁহার ঘরে আসিয়াছেন, তাঁহার নাম চারিযুগে বর্ত্তমান থাকিবে। যদি ঠাকুরদাদা আপনার মায়ায় না ভুলিয়া, আপনাকে চিনিতে পারিতেন, আপনি কে, তাহা হইলে, তিনি এইরূপ বলিতেন না। নাগমহাশয় স্নেহের সহিত আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাব ঐরূপ দেখিয়া, আমার এক ভাব হইল, নাগমহাশয় ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার এক অপরূপ রূপ দেখিতে পাইলাম। ভাব ছুটিয়া গেলে, আমি দেখিলাম, নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। এমন সময় একজন লোক আসিল। তিনি বাজারে যাওয়ার জন্য উঠিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মা, বেলা হইয়াছে, বাজার হইতে আসি ?

নাগমহাশয়কে সংসারভাববিবর্জ্জিত দেখিয়া একদিন ঠাকুরদাদা ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহাকে বলিলেন, আমি মরিলে, তুমি নেংটা হইয়া থাকিবে এবং বেঙ্ খাইবে। নাগমহাশয় বাড়ীর বাহির হইয়া পথে একটী মরা বেঙ্ দেখিতে পাইলেন। তিনি বেঙ্‌টী উঠাইয়া মুখে দিলেন এবং সুখাদ্য জিনিষের মত চিবাইতে চিবাইতে পিতার সামনে আসিয়া দাড়াইলেন। তাঁহার মুখে ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষের কোন চিহ্ন ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি কোন সুস্বাদু খাদ্য চিবাইতেছেন। পুত্রের মুখে বেঙ্ অবলোকন করিয়া ঠাকুরদাদার মনে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি নাগমহাশয়কে কোন কথা বলিতে সাহস পাইলেন না। দুর্গাগত প্রাণ দীনদয়াল দুর্গাকে মরা বেঙ্ চিবাইয়া খাইতে দেখিতেছেন, অথচ তাঁহাকে বিরত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিল। নাগমহাশয় বেঙ্ খাইয়া পরিধৃত বসনখানা ত্যাগ করিলেন। নেংটা হইয়া পিতার সম্মুখে দাড়াইয়া বলিলেন, আপনার উভয় কথা পালন করিলাম। আপনি আমার জন্য আর চিন্তা করিবেন না। আপনি সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট চিন্তা করুণ, তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে। ঠাকুরদাদা পুত্রের কাজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। মা ঠাকুরাণী ঘাটে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া নাগমহাশয়কে মরা বেঙ্ চিবাইয়া খাইতে দেখিয়া, ঘৃণায় অধীরা হইলেন। তিনি বলেন, তাঁহাকে বেঙ্ খাইতে দেখিয়া আমার এত ঘৃণা হইয়াছিল, তিনমাস পর্য্যন্ত খাইতে বসিলে, এই কথা মনে

পড়িত এবং পেট ভরিয়া খাইতে পারি নাই। নাগমহাশয়কে খাইতে দেখিলেই বেঙ্‌য়ের নাড়িগুলির কথা মনে পড়িত।

তাহার কতক দিন পরে আমার পিতা দেওভোগ গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, রাজকুমার, আমি কি কাজ করিলাম? বাবা রাগ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, খাবি বেঙ্‌? আমি বাড়ীর বাহির হইয়া পথে একটী মরা বেঙ্‌ পাইলাম। তাহা খাইয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছেন। আমার পিতা নাগমহাশয়কে মনে মনে বলিলেন, আপনার সুখ নাই, দুঃখ নাই, ভাল নাই, মন্দও নাই। মানুষ মরা বেঙ্‌ হাতে ধরিয়া মুখে দিতে পারে না। তাহা দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। তিনি আর কিছু না বলিয়া ঠাকুরদাদার কাছে গেলেন। ঠাকুরদাদা দুঃখিত অন্তঃকরণে পুত্রের সকল কাজ তাঁহার নিকট বলিলেন। আমার পিতা ঠাকুরদাদাকে বলিলেন, এ মানুষকে মায়াম্বারা বাঁধে কাহার সাধ্য? যতদিন তিনি সংসারে থাকেন, এই ভাবেই থাকুন। তাঁহাকে আর কিছু বলিবেন না। তাহা হইলে তিনি ঘরে আগুন লাগাইয়া একদিন চলিয়া যাইবেন। ইহাতে তাঁহার তিলমাত্র কষ্ট হইবে না। পিতা মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, ঠাকুর ভাই ঘরে আছেন, তাই তাঁহাকে দেখিতে পান। বাহির হইয়া গেলে, সেটুকুও চলিবে না। ঘরে যে আছেন, ইহা বহু ভাগ্য বলিতে হইবে। মরা বেঙ্‌ দেখিলে মানুষ ঘৃণা করে, ঠাকুরভাই নিজহাতে ধরিয়া তাহা মুখে দিলেন। তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। মাঠাকুরাণী কাঁদিতে লাগিলেন। এ ঘটনার পর ঠাকুরদাদা পুত্রকে আর বিশেষ কিছু বলিতেন না।

পুত্র কায়মনোবাক্যে পিতার সেবা করিয়াছেন। পিতার

হুকুম পাইলে নাগমহাশয় নিজ জীবন কৃতার্থ মনে করিবেন বলিয়া ভাবিতেন। পিতা কখন নিজের কাজের জন্য তাঁহাকে কোন হুকুম দিতেন না। নাগমহাশয় সর্ব্বদা অবসর খুঁজিতেন, পিতা কোন আদেশ করেন কি না। ঠাকুরদাদা তামাক খাওয়ার অভাব বোধ করিলে, নাগমহাশয় চুপ করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি মনে করিতেন, এবার পিতা ডাকিয়া তামাক দিতে বলিবেন। ঠাকুরদাদা কিছুই বলিতেন না। নাগমহাশয় কতক সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিতেন, পিতা নিজেই তামাক সাজিতে যাইবেন, অমনি তামাক সাজিয়া নিয়া পিতাকে দিতেন। নাগমহাশয় অনেকের নিকট বলিয়াছেন, বাবা কোন অবস্থায় আমাকে কোন হুকুম দেন নাই। যখন ঠাকুরদাদার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন নাগমহাশয় পিতার আদেশ পাওয়ার আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহা পিতার আবশ্যক, নিজেই সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিতেন।

পিতা ঘাটে বসিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। নাগমহাশয় তাঁহার স্নান করিতে যাওয়ার পূর্ব্বেই, যাহাতে তিনি স্বচ্ছন্দে বসিয়া তাহা করিতে পারেন, এইভাবে ঘাট তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। শীতকাল। একদিন ঠাকুরদাদা স্নান করিতে গিয়া, কি মনে করিয়া, নাগমহাশয়ের তৈয়ারী ঘাট ভাঙ্গিয়া, জলে দাঁড়াইয়া, নূতন করিয়া ঘাট বান্ধিলেন। নাগমহাশয় সমস্ত দেখিলেন। শীতের সময় পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কষ্ট করিবেন বলিয়া, আমি আপনার আসার আগে ঘাট তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি, আর আপনি তাহা ভাঙ্গিয়া, জলে দাঁড়াইয়া ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন। যখন জলে

নামিয়াছেন, সামনে পায়খানা আছে, তাহাতে নামুন না কেন? নিষ্ঠাবান পিতা ধার্ম্মিক পুত্রের মুখে পায়খানায় নামিবার কথা শুনিয়া, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন, তুই ধার্ম্মিক হইয়া, বৃদ্ধ বয়সে স্নানের সময় আমাকে যাহা করিতে বলিলি, সংসারের কাম কাঞ্চনের দাস হইয়াও পিতাকে একথা কেহ বলে না। তোর যাহা কিছু অধর্ম্ম কামিনী ও কাঞ্চনে। আমি তোর মুখ আর দেখিব না। তুই আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যা।

নাগমাহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, আপনি তাহা ভাঙ্গিয়া, ঐ কাঁদাজলে নামিয়া অকারণ কষ্ট করিতেছেন। পায়খানায় নামিলে দোষ কি? নিষ্ঠাবান পিতা আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন, তুমি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে, আমি জল গ্রহণ করিব। নাগমহাশয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। ঠাকুরদাদা স্নানান্তে ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে পিতার সামনে দাঁড়াইলেন। পিতা রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানে কে দাঁড়াইয়া আছে? নাগ-মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে ঠাকুরদাদা বলিলেন, তুমি আমাকে সংসারের নরক পায়খানায় নামিতে বল। তুমি আমার বাড়ীতে থাকিলে, আমি জল গ্রহণ করিব না। নাগ-মহাশয় বলিলেন, আপনি খাইলে পর আমি চলিয়া যাইব। বৃদ্ধের অন্তরাত্মা তখনই উড়িয়া গেল। তিনি জানিতেন, পুত্র নিজ কথা রাখিবে। তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া ঠাকুর-দাদা খাইতে বসিলেন।

নাঁগমহাশয় পিতার জন্য তামাক সাজিলেন। পিতা খাইয়া উঠিলে তাঁহার হাতে হুঁকা দিয়া, কাপড়খানা পিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি আমাকে যাইতে বলিয়াছেন, আমি চলিলাম। তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন। মাঠাকুরাণী পাড়ার লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনারা দেখুন, এতকাল পিতার সেবা করিয়া, এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে ফেলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। আমি কিন্তু বুড়োর সেবা করিব না। তিনি যে পথে যাইবেন, আমিও সেই পথে যাইব। বুড়োকে কে দেখিবে? পাড়ার লোক চিৎকার শুনিয়া নাগ-মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, দুর্গাচরণ, তুমি কি করিতেছ? তোমার পিতা বৃদ্ধ, এ বয়সে পুত্র শোক পাইবে? তুমি চলিয়া গেলে, বৃদ্ধ দীনদয়াল জীবনে মরিবে। এ অবস্থায় কে তোমার পিতাকে দেখিবে? দুর্গাদাচরণ, তুমি এত ধার্ম্মিক, তুমি জগতকে ধর্ম্ম বুঝাইতে পার, আর এই বয়সে বুড়োকে ছাড়িয়া চলিলে? প্রতিবেসীদের কথায় নাগমহাশয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে ঠাকুরদাদা পুত্রকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন। কিছু করিতে পারেন না, কাহাকে কোন কথা বলিতে পারেন না। নিজেই পুত্রকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কেন এমন কাজ করিলাম, কেন ক্রোধভরে জীবনসর্ব্বস্ব দুর্গাকে এমন কথা বলিলাম। তিনি বার বার নিজ অবিমৃশ্যকারিতাকে ধিক্কার দিতেছেন। নাগ-মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার দেহে প্রাণ আসিল, রসনায় শক্তি আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্গা, তুমি আসিয়াছ? নাগমহাশয় বলিলেন, কেন, আপনিইত আমাকে

যাইতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার আবার বাক্‌শক্তি রহিত হইল, তিনি পুত্রের মুখের দিকে আনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পুত্র পিতার নিকট বসিলেন।

নাগমহাশয় লোকের মনে কষ্ট দিয়া কথা বলিতেন না। পিতার মঙ্গলের জন্য, সংসারের কোন কথা তাঁহার মনে উঠিলেই তিনি তাঁহাকে সেইরূপ চিন্তা হইতে বিরত করিতেন। অপ্রীতিকর কথায় ঠাকুরদাদার মনে বড় কষ্ট হইত। তিনি নাগমহাশয়ের ভয়ে সংসারের কোন বিষয় চিন্তা করিতেন না, মনে উঠিবা মাত্র বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতেন। শেষ সময়ে তিনি পূজা করিবার কালে ভগবতীকে দেখিতে পাইতেন। নাগমহাশয়ের বাটীতে দুইটী জবা ফুলের গাছ আছে। ঠাকুরদাদা পুত্রবধূকে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ফুল তুলিয়া রাখিতে বলিতেন। সেই ফুল দিয়া পূজা করার সময় তাঁহার মনে হইত, যেন মা আসিয়া হাত পাতিয়া ফুল গ্রহণ করিতেছেন। নাগমহাশয় একথা অনেকের নিকট বলিয়াছেন। সুরেশবাবু তাঁহার চিরবন্ধু ছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার নিকট অনেক কথা বলিতেন। যখন ঠাকুরদাদার মনে সংসারের নানা কথা উঠিত, সে সময় নাগমহাশয় কলিকাতা আসিয়া সুরেশবাবুকে বলিতেন, বিষয় রূপ কাল সাপে একবার দংশন করিলে, সে বিষ নাশ করা বড় শক্ত। যে বার তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, সুরেশবাবু নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখন বাবা কেমন আছেন? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখন তিনি ভাল হইয়াছেন। তাঁহার মহাভাবের মত হয়। তিনি বলেন, তাহার মনে হয়, পূজা করিতে বসিয়া যে অঞ্জলি দেন, তাহা যেন মা হাত পাতিয়া লইয়া যান। সুরেশবাবু এই কথা শরৎবাবুর নিকট

বলিয়াছেন। যাঁহার আহ্বানে গঙ্গা দেওভোগ গিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার পিতার মনের ময়লা দূর হইবে, ইহা বড় অশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ঠাকুরদাদার মৃত্যু কি সুন্দর! তিনি সময় মত শয্যা ত্যাগ করিলেন। তামাক খাইয়া পায়খানা যাইবার পথে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। সেই সময় নাগমহাশয় বাজারে রওনা হইয়াছিলেন। বাজারের অর্দ্ধেক পথ গেলে, একজন লোক দৌড়াইয়া যাইয়া তাঁহাকে জানাইল, বুড়ো কর্ত্তা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন। নাগমহাশয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতার ঈষৎ কষ্টের লক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি কেহ সংসারে থাকিয়া স্ত্রীলোক মাত্রেই মা বলিয়া দেখিয়া থাকে, তবে আমি যদি; এখন সংসারে কেহ অবতার থাকিয়া থাকে, তবে আমি; চন্দ্র সূর্য্য তোমরা সাক্ষী, আমি আমার বাবার কষ্ট নিলাম। আমি আমার বাবার সমস্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ঠাকুরদাদার মহাভাব আসিয়া পড়িল। মুখ হইতে আনন্দ ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কণ্ঠে কফের ঘর ঘর শব্দ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে হরিহর হরিহর বাক্য শুনা যাইতে লাগিল। যন্ত্রনা দূরে পলায়ন করিল। নাগমহাশয় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নাগমহাশয় মনে করিলেন, এসময় যদি তিনি তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্নেহ করেন, আবার পুত্রের পিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তিনি পিতাকে ভগবান্ স্মরণ করিতে বলিলেন। অমনি আবার হরিহর বলিতে বলিতে প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল।

মৃত্যুর চারি দিন পূর্ব্বে ঠাকুরদাদা বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া মণ্ডপ ঘরের দিকে তাকাইয়া আছেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে তামাক দিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুরদাদা বলিলেন,

দুর্গা, তুই মণ্ডপ ঘরে কিছু দেখিস্? নাগমহাশয় বলিলেন, কেন, আপনি কি দেখেন? তিনি ইহা বলিয়া, মণ্ডপ ঘরের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। পিতাও পুত্র চুপ করিয়া রহিলেন। অন্য কোন কথা হইল না।

ঠাকুরদাদার দেহত্যাগের চারিদিন পর আমরা দেওভোগ গেলাম। তখন নাগমহাশয় বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। তিনি সংসারের সমস্ত নিয়ম অটুট ভাবে পালন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস ছিল, ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তিঁনি আর বাড়ীতে থাকিবেন না। নৌকা হইতে ঠাকুরদাদার চিতা দেখিয়া, আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। আমাকে দেখিয়াই, নাগমহাশয় বলিলেন, কিগো মা, কিগো মা! ইহা বলিয়া তিনি আমার মনের দুঃখ ভার লইয়া গেলেন। তৎপর হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমার বাবাব নির্ব্বাণ হইয়াছে। তিনি আর এই সংসারে আসিবেন না। কফের শব্দের সহিত যে হরিহর শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা যে তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন, পুত্র স্নেহ থাকিলে যে আবার পুত্রের পিতা হইয়া জন্মিতে হইবে, এবং শেষকালে যে তাঁহার মহাজ্ঞান হইয়াছিল, এই সমস্ত কথা বলিলেন। নাগমহাশয় পিতার কর্ম্মগ্রহণ করিতে যে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া ছিলেন, তাহা মা ঠাকুরাণী বলিয়া ছিলেন।

নাগমহাশয় চিরকাল আত্মগোপন করিতে চাহিতেন, সকল সময় তাহা পারিতেন না। জীবের উপর দয়া করিয়া, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতেন। সর্ব্বদাই মনের কথার উত্তর দিতেন, কিন্তু তিনি কি ছিলেন, তাহা কখন সোজাভাবে বলিতেন না। শুধু পিতার কষ্ট দেখিয়া, তদানিন্তন আত্মবিস্মরণ

হইল, যাহা আর কোন দিন মুখেও আনেন নাই, তাহা বলিয়া ফেলিলেন। পিতার দেহত্যাগের পর, নাগমহাশয়ের এক জ্ঞাতি ভগ্নী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দুর্গাচরণ, তুমিত সব জান, তবে কেন ঠাকুরকাকা মাটিতে পড়িয়া গেলেন? তুমিত জানিতে, এই সময় ঠাকুরকাকা অজ্ঞান হইবেন, তবে কেন তুমি বাজারে গেলে? নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বোন দিদি, মানুষের ঘরে হইলে, সময় সময় তাহার ভুল হয়। যখন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াছিলেন, সে সময় রামচন্দ্র তাঁহার পদ্মহস্ত আঘাত স্থানে বুলাইলে, লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিতেন। তিনি তাহা না করিয়া কোথায় গন্ধমাদন পর্ব্বত, কোথায় বিশল্যাকরণী, তাহার আবার সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে ব্যবহার হওয়া চাই,—রামচন্দ্র এই সমস্ত করিলেন এবং লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন। যাহা হবার, তাহা হইবেই হইবে। শাস্ত্রে আছে, শেষ সময় ভূমিশয্যা করিতে হয়। পিতা সময় মত নিজেই সেই ভূমিশয্যা করিলেন। নাগমহাশয় এই কথা বলিবার সময় যে হাসিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার সেই হাসি আমার চক্ষে ভাসিতেছে।

সন্ধ্যার সময় সকলে ঠাকুরদাদার চিতার সামনে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। নাগমহাশয় তাহাদের সঙ্গে শ্মশান প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কখন দাঁড়াইতেছেন, মহাভাবে অভিভূত হইয়া তুরি দিতেছেন, আবার তাঁহাদের সাথে ঘুরিতেছেন। সেই স্থানে পিতা ও আমি দাঁড়াইয়া আছি। তিনি দুইবার পিতার নিকট আসিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, পার্ব্বতী ভাল গান করিতে পারে। প্রথমবার পিতা কোন উত্তর দিলেন না।

দ্বিতীয়বার নাগমহাশয় বলিলে, পিতা বলিলেন, পার্ব্বতী খবর পাইলেই আসিবে। তাহা শুনিয়া তিনি বালকের মত একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি বাড়ী আসিয়া স্বামীকে লিখিলাম, ঠাকুরদাদা মারা গিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, কিন্তু সুখের বিষয় এই, যাঁহাকে জীব ধ্যানে পায় না, তিনি তোমার চিন্তা করেন। সেদিন কীর্ত্তন হইতে ছিল, নাগমহাশয় দুইবার পিতাকে বলিলেন, পার্ব্বতী ভাল গান করিতে পারে। স্বামী চিঠি পাওয়ার পূর্ব্বে নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। পরের শনিবার পঞ্চসার গেলেন। নাগমহাশয়কে যেরূপ দেখিলেন, তাহা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, তুমি লিখিয়াছ, নাগমহাশয় গানের সময় আমাকে মনে করিয়াছিলেন। তিনি নিজগুণে সর্ব্বদা আমাকে মনে রাখেন। তিনি শুধু মনে রাখেন, তাহা নয়, অহৈতুক দয়াহেতু সময় মত কোন কোন বিষয় আমাকে জানান। যে দিন ঠাকুরদাদা দেহত্যাগ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের নাম নিতে বসিয়া দেখিলাম, একটা চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, কোন মতে তাহা মানসিক দৃষ্টির অগোচর করিতে পারিলাম না। মনে বড় অশান্তি আসিল। পরের দিন দেওভোগ যাইয়া, নাগমহাশয়কে দেখিয়া, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহার দয়া অনুভব করিলাম। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম কিনা স্বামী তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অস্বীকার করিলে, স্বামী বলিলেন, যাহাদের ভক্তি বিশ্বাস আছে, তাহারা নিজের মনে নিজে থাকে, কিন্তু যাহাদের ভক্তি বিশ্বাস নাই, ভগবান্ নিজগুণে তাহাদিগকে মনে রাখেন, তাই তাঁহার পতিতপাবন, অধমতারণ নাম।

একদিন আমি স্বামীকে বলিলাম, যখন নাগমহাশয় পিতার চিতা নমস্কার করেন, আমি তাঁহার মাথার নিকট আমার মাথা রাখিয়া নমস্কার করিয়া শুনিতে পাই, তিনি বসুদেব বসুদেব বলিয়া নমস্কার করেন। তাহা শুনিয়া, স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরদাদা বসুদেব ছিলেন, তাই নাগমহাশয় তাঁহাকে বসুদেব বলিয়া নমস্কার করেন। তিনি যাহা বলেন, তাহা সত্য। তিনি উপহাসের ছলেও মিথ্যা কথা বলেন না। ভগবানের পিতা বাসুদেবই থাকেন। তবে বলিতে পারা যায, যখন একসঙ্গে দুই অবতার হয়, সেই সময় ভগবানের পিতা অন্যেও হইতে পারে, কিন্তু বসুদেব ভগবানের পিতা ভিন্ন অন্যের পিতা হইতে পারেন না। বসুদেবের ঘরে ভগবান্ থাকিবেনই। ভগবানের সঙ্গে অন্যসন্তান থাকিতে পারে। নাগমহাশয় যে ভগবান্, তাহা চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য। এই যে তিনি ঠাকুরদাদাকে বসুদেব বলিয়া নমস্কার করেন, তাহা তাহার একটী প্রমাণ। ঠাকুরদাদা দুর্গা-চরণকে পুত্র পাইয়া যত সুখী হইতে পারিলেন, অন্য কোন পুত্র হইতে ততসুখ লাভ করেন নাই। প্রত্যেক অবতারেই তাঁহাকে পুত্রের বিরহ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রামের শোকে দশরথের প্রাণ গেল। কৃষ্ণ যোগাসনে দেহত্যাগ করিলে পরও বসুদেব জীবিত ছিলেন। দুর্গাচরণকে পুত্র পাইয়া বসুদেব সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেলেন। জীবদ্দশায় তিনি দুর্গাচরণকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন, ঘরে বসিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। শুধু তাহা নয়। তিনি স্নানান্তে কালী দর্শনও করিলেন। অবশেষে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। এজীবনে তিনি যে সুখ পাইলেন, কেহ কোন দিন এমত সুখ পায় না। ভগবান্ কল্পতরু বলিয়া শুনা যায়, দুর্গাচরণ

তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। কল্পতরুর তলে বসায়, দীনদয়ালের সকল বাসনার পূরণ হইল, যাহা কোন দিন চাহিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, তাহাও লাভ করিলেন।

নাগমহাশয় সংসারে প্রচলিত সমস্ত নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। হবিষ্য করার সময় ক্ষিরার খোসা, শশার খোসা খাইয়াছেন। ভিজা কাপড় গায় শুকাইয়াছেন। যদি মাঠাকুরাণী বলিয়াছে, হবিষ্য করিয়া সকলেই ফল খায়, আপনি খাইবেন না কেন? তিনি উত্তর দিতেন, যদি সুখের জন্য সুখাদ্য খাই, তবে পিতার জন্য কি কষ্ট করিলাম? তিনি কোন দিন কোন ফল খান নাই। যে দিন তিনি ভাত খাইয়াছেন, ভাতের সঙ্গে অন্য কোন জিনিষ খাইতেন না। সামান্য একমুঠো ভাত খাইয়া কত কাজ করিয়াছেন। পিতার শ্রাদ্ধের প্রায় সকল জিনিষই নিজে আনিয়াছেন। কত জায়গায় যে ঘুরিয়াছেন, কাহার নিকট বলেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, তিনি ভোরের সময় বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কোন দিন সন্ধ্যার সময়, অন্য কোন দিন রাত্রি ১০।১১ টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এক মুঠোভাত কিম্বা ক্ষীরার খোসা ও শসার খোসা খাইয়া এত পরিশ্রম করিতেন, তথাপি কখন তাঁহার মলিন মুখ দেখি নাই। তিনি সকল সময় হাসিতেন, মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহাকে ক্লান্ত দেখা যায় নাই। সুখও দুঃখ তাঁহার সমান ছিল। কিন্তু তিনি লোকের সুখ অতিশয় দেখিতেন। নিজে এত কষ্ট করিয়া হবিষ্য করিতেন। নিরামিশ খাইতে লোকের কষ্ট হইবে বলিয়া, সকাল বেলা একটী ইলিশ মাছ আনিতেন। মাছ বাড়ীতে রাখিয়া, তিনি অন্য কাজ করিতে যাইতেন, যেন লোকের খাইতে দেড়ি না হয়।

নাগমহাশয় কত বৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন, কাহাকে কোন কাজ করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, আমার পিতার কাজ আমি করিব। তিনি সমস্ত কাজ করিতেন, আমরা কেবল খাইতাম আর তাঁহাকে দেখিতাম। শ্রাদ্ধের অল্প আগে এক দিন বলিলেন, এতদিন পিতা মহাশয়ের কাজ ছিল, তাহা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। মাসের শেষ দিন তিনি অতি প্রত্যুষে বাহির হইলেন, একপ্রহর বেলা থাকিতে ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষৌরকার আসিয়াছিল, তিনি নখ ও চুল কাটাইতে বসিলেন। তিনি কখন কাহাকে তাঁহার পায় হাত দিতে দিতেন না। সেই দিন ক্ষৌরকার বড় সুবিধা নিল। সে বলিল, আপনার পায়ের নখ না কাটিয়া মস্তকে হাত দিতে পারিব না। নাগমহাশয় অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিলেন, পায়ের নখ থাকুক, তাহা কিছু নয়। দরকার হইলে আমিই কাটিব। আপনি আমার মাথা মুণ্ডন করুণ। ক্ষৌরকার বলিল, তাহা হইবে না। আপনি সংসারের সকল নিয়ম পালন করিলেন, নখ কাটাইবেন না কেন? আপনার পায় হাত না দিয়া মাথায় হাত দিতে আমার সাহস হয় না। এই সমস্ত কথা হইতেছে, এমন সময় সারদাপিসী বলিলেন, ঠাকুরভাই, পিতার কাজ এই শেষ হইয়া যায়। আপনি সকল কাজ নিয়মমত করিয়া সামান্য বিষয়ে অনিয়ম করিতেছেন কেন? ক্ষৌরকার আপনার পা না ধরিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতে সাহস পাইতেছে না। আপনার পায়ের নখ কাটিতে দিন্, পরে অন্য কাজ করিবে। ভগ্নীর কথায় পায়ের নখ কাটিতে দিলেন। আমি দেখিলাম, নাপিত মহা আনন্দে অতিশয় যত্নের সহিত ধীরে ধীরে পায়ের নখ কাটিয়া দিল। তাহার চিরকালের

আশা পূরণ হইল, সে নাগমহাশয়ের চরণযুগল মনের মত সেবা করিল।

নাগমহাশয়ের মাথার চুল চাঁছিবার সময় তালুতে একটী দাগ দেখা গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই ব্যাথা কোথায় পাইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, বৃষ্টি হইতেছিল, অন্ধকারে চলিতেছিলাম, পথের পাশে একটী গাছের শাখা নীচু হইয়া ছিল। সরু পথ, যেমন মাথা উঠাইয়াছি, অমনি লাগিল। আমার মনে বড় কষ্ট হইল। আমি বলিলাম আহা, কত কষ্টই না পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কোন কষ্ট হয় নাই, বেশী লাগে নাই। সারদাপিসী বলিলেন, কি কষ্ট, কোথায় যান ঠিক থাকে না। শরীরের দিকে একবারেই চান না। অল্প জোরে লাগিলে, মাথায় এইরূপ দাগ থাকিত না। আপনি নিশ্চয়ই তখন অতিশয় ব্যাথা পাইয়াছিলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, কেবল মায়াপুরাণ। মাথায় দাগ দেখিয়া, নাপিতও মুখ মলিন করিল এবং সাবধানের সহিত চুল চাঁছিতে লাগিল। এইরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়াছি, যাহাতে বুঝা গিয়াছে, তাঁহার দেহাত্মবোধ ছিল না। মাথায় যে আঘাত লাগিয়াছিল, দেহাত্মবোধ থাকিলে, তিনি সেই দিন হাঁটিয়া বাড়ীতে আসিতে পারিতেন না।

পিতামাতার কাল হইলে, শ্রাদ্ধ না করা পর্য্যন্ত পুত্র যাহা খায়, কাককে তাহা হইতে দিতে হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তিনি কাককে খাইতে দিতেন, কাক অমনি খাইয়া যাইত। এত অল্প সময় লাগিত, লোক এই বিষয়ে মনোযোগ না দিলে, কোনমতেই তাহা দেখিতে পাইত না।

ইহা না হইবেই বা কেন, নাগমহাশয় সকলের আপন ছিলেন। পাখী তাঁহার হাত হইতে খাইতে কত আনন্দ বোধ করিত।

নাগমহাশয় স্নান করিয়া তিলদান করিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে বৈতরণী পারের জন্য গাভী দান করিতে বলিলেন। নাগমহাশয় আমারদিকে তাকাইয়া কহিলেন, এখন বৈতরণী পারের সময় নয়। যদি কেহ নিজ কর্ম্মফলে স্বর্গে যায়, তাহাকে এই বৈতরণী পারের সময় নামিয়া আসিতে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন বৈতরণী পার করা উচিত? তিনি বলিলেন, যখন মৃত্যুর প্রাক্‌কালে কাহাকে ঘরের বাহির করে, তখন বৈতরণী পার করিতে হয়, কারণ লিঙ্গপুরুষ গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া স্বর্গে যায়। তবে আমি পিতার উদ্দেশে এসময় বৈতরণী পারের জন্য গাভী দান করিব। আমার পিতার নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম লাগাল পাইবে না। নাগমহাশয় বৈতরণী পার করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইতে লাগিল, ইঁনিইত আমার ভবপারের কর্ত্তা। মহাভাবে নাগমহাশয়ের চক্ষু দুইটী ঢুল ঢুল করিতে লাগিল। তৎপর তিনি পিতার শ্রাদ্ধ করিতে গেলেন। পুরোহিত আমাকে মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আর নাগমহাশয়ের নিকট যাইতে পারিলাম না, কারণ বহুলোক তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল।

নাগমহাশয় পিতার শ্রাদ্ধ ভাল মত সমাপন করিলেন। অনেক দুঃখী ও গরীব লোক মহা আনন্দে ভোজন করিল। কাহার মনে কোন অভাব রহিল না। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন মুষলধারায় বৃষ্টি হইয়াছিল। নাগমহাশয়ের বাটী ছোট, অনেক লোক

তথায় একত্রিত হওয়ায় বাড়ীতে খুব কাদা হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের দিন বৃষ্টি ছিল না সত্য, কিন্তু এত কাদা ছিল যে, তাহাতে পা ডুবিয়া যাইত। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ আসিলেন। নাগমহাশয় কয়েকজন ব্রাহ্মণের পা ধোয়াইয়া দিলেন। পরে স্বামী সকল ব্রাহ্মণের পা ধোয়াইয়া ছিলেন। নাগমহাশয় শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন। কতক দুর্ব্বার দরকার হইল। একটী লোক পাঠাইয়া স্বামীকে ডাকাইয়া আনিলেন। স্বামী মহা আনন্দে নাগ-মহাশয়ের নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাকে কতক দুর্ব্বা আনিয়া দিতে বলিলেন। নাগমহাশয় কখন কাহাকে হুকম দিতেন না। তাঁহার হুকুম পাইয়া, মনের উল্লাসে স্বামী দুর্ব্বা আনিয়া দিলেন। পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে অনেকের বাসনা পূরণ করিলেন। নাপিত মনের আনন্দে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া নখ কাটিল। স্বামী তাঁহার আদেশ অনুসারে দুর্ব্বা আনিয়া দিলেন। আমার পিতা তাঁহার ব্যবহারের জন্য জল আনিয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহার কাজ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের পর রান্না করিয়া নাগমহাশয় ঠাকুরদাদার উদ্দেশে অন্ন ও ব্যঞ্জন দিতে গেলেন। সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নাগমহাশয় স্নান করিতে গেলেন, সকলে তাঁহার সঙ্গে পুকুরের ঘাটে গেল। তিনি স্নান করিয়া বাড়ীতে আসিলে, সকলেই মনের সুখে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। নাগমহাশয় ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ঘরে গেলেন, কীর্ত্তন বন্ধ হইল। সকল দিন উপবাশ করিয়া আছেন, যদি কীর্ত্তন বন্ধ না করিলে, তিনি না খান; তজ্জন্য সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রিতে

রান্না করিয়া নাগমহাশয় সামান্য আহার করিলেন। তৎপর বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। আমি তখন বসিয়া ছিলাম। তিনি আমাকে শুইয়া থাকিতে বলিলেন। কাদায় আমার পায় বড় ঘা হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, তৈল গরম করিয়া ঘায় দিয়া শুইব। এই কথা বলিলে, নাগমহাশয় বলিলেন, কাদার ঘার জ্বালার অবধি নাই। তুমি শুইয়া থাক। তৈল গরম করিয়া ঘায় লাগাইলে যাহা হইবে, তুমি কাল সকালে তাহার চেয়ে ভাল দেখিতে পাইবে। আমি শুইলাম। আমি পরদিন প্রাতে দেখিলাম, সমস্ত ঘা একেবারে শুকাইয়াছে। তাঁহার বাক্য এমনই ছিল। জীবের উপর তাহার এমনই দয়া ছিল। আমি একটু বসিয়া আছি, তিনি সেই কষ্টটুকু সহিতে পারিলেন না। আমি কি পাষাণী! আমি কি করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলাম। আমি যেমন পাষাণী, আমার সাজাও কম হয় নাই।

শ্রাদ্ধের পর মাছ খাওয়ার দিন, জ্ঞাতির হাতে খাইতে হয়। তজ্জন্য আমার পিতা বাড়ীতে লোক রাখিয়া, চারি দিনের জন্য মাকে নিয়া, দেওভোগ থাকিবেন স্থির করিয়া আসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মা সেইদিন রান্না করিতে পারিলেন না। শ্রাদ্ধের পর দিন মাঠাকুরাণী আমার মাকে বলিলেন, বোনদিদি, আজ জ্ঞাতির হাতে খাইতে পারে। আপনি স্নান করিয়া আসিয়া, আপনার ভাসুরের জন্য রান্না করুণ। আমিও খাইতে পারিব। এইকথা শুনিয়া মা মনের আনন্দে রান্নার স্থান পরিস্কৃত করিয়া, স্নান করিয়া আসিলেন এবং মাঠাকুরাণীকে কি রান্না করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা

করিলেন। আমার মা স্নান করিতে গেলে, মাসী মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, নাগমহাশয় যাহা খাইবেন, তুমি রান্না কর, তোমার জ্যা অন্য ঘরে সকলের জন্য রান্না করিবে। মাঠাকুরাণী আমার মাকে তাহাই বলিলেন। মা জানিতেন, এ সুযোগ হারাইলে, আর নাগমহাশয়কে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ; এমন সুবিধা আর তাঁহার কপালে ঘটিবে কিনা, কে জানে? সুতরাং মাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া মা মনের দুঃখে তখনই পঞ্চসার চলিয়া আসিলেন। যখন তিনি রওনা হন, নাগ-মহাশয় বালকের মত চাহিয়া রহিলেন। এত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মা বলিলেন, আমাদের বাড়ীতে লোক নাই। আমি এখনই চলিয়া যাইব। আমরা মাতার সহিত ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া আসিলাম। সেদিন তাঁহাকে বিষণ্ণমনে চলিয়া আসিতে হইল, কিন্তু দয়াময় যতকাল এই দেহ ধরিয়া দেওভোগে বাস করিয়াছিলেন তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে। তিনি দেওভোগ গিয়া দেখিতেন, মাঠাকুরাণী রাঁধিতে পারেন না, রজস্বলা হইয়াছেন। মা মনের সাধ পুরাইয়া রান্না করিয়া নাগমহাশয়কে খাওয়াইয়াছেন। ধন্য তাঁহার দয়া! জীব শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

আমার পিতা বাড়ীতে আসিলে পর শুনিতে পাইলাম, নাগ-মহাশয় ও তিনি একঘরে খাইতে বসিয়াছিলেন। সংসারে নিয়ম আছে, জ্ঞাতির থালা হইতে মৎস্য তুলিয়া দিতে হয়। পিতা তাঁহার থালা হইতে মৎস্য তুলিয়া নাগমহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি বালকের মত বলিলেন, মাছ খাই। পিতা তাঁহাকে মৎস্য খাইতে বলিলেন। তাঁহার পর দিন স্নান করার সময় কাঠের

বৃষ জলে দিতে হয়। নাগমহাশয় ও পিতা, দুই ভাই বৃষ ধরিয়া জলে ফেলিলেন। অন্য একজন লোক তাহা ধরিতে আসিয়াছিল, জ্ঞাতি ভিন্ন অন্যলোক ধরিতে পারে না বলিয়া তিনি তাঁহাকে ধরিতে দিলেন না। পিতা বলিলেন, এই কয়েকদিন ঠাকুর ভাইয়ের জ্ঞাতির কাজ করিলাম। আমার মনে বড় সুখ হইয়াছে। জ্ঞাতি হইয়া ছিলাম বলিয়া ঠাকুর ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করিতে পারিলাম।

ঠাকুর দাদার শ্রাদ্ধে শরৎবাবু কুড়ি টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কুপনে লিখিয়াছিলেন, যদি আপনি আমার এই টাকা গ্রহণ না করেন, আমি আপনাকে বাবা বলিব না। নাগমহাশয় ভক্তের জিদ রক্ষা করিলেন। নাগমহাশয় আর কোন লোকের টাকা নেন নাই। কেহ তাঁহাকে দিতেও সাহস করে নাই।

ঠাকুরদাদা দেহত্যাগ করিয়াছেন পর নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, আমার পিতা সদাশিব ছিলেন। ৪৫ বৎসর যাবত আমার মা মারা গিয়াছেন। ৪০ বৎসরের মধ্যে স্বপ্নেও তাঁহার রেতঃ পাত হয় নাই। শাস্ত্রে আছে দ্বাদশ বৎসর রেতঃ পাত না হইলে জীব উর্দ্ধরেতা হয়, আমার পিতা ৪০ বৎসর ছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, যাঁহার জন্য হওয়া, যাঁহার জন্য বনে বসিয়া তপস্যা করা, আপনার পিতা তাঁহার জন্য সংসারের সমস্ত সুখ ছাড়িয়া, তাঁহাকে বুকে করিয়া বসিয়া ছিলেন। যাঁহাকে চিন্তা করিলে মনে পবিত্র হয়, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কবিলে, মায়ার সম্পর্ক কি থাকিতে পারে?

একদিন নাগমহাশয় স্বামীকে বলিয়াছিলেন, দেখুন, আমি কোন দিন পিতার আদেশ মত কোন কাজ করিতে পারি নাই।

তিনি আমাকে কখনও কোন কাজ করিতে বলেন নাই। আমি সর্ব্বদা তাকে তাকে থাকিতাম, বাপমহাশয় কখন আমাকে একটি হুকুম দিবেন। তিনি কোন অবস্থায় আমাকে কোন হুকুম দেন নাই। এমন কি শেষ অবস্থায়, যখন তিনি সামান্য দিশাহারা হইয়াছিলেন, তখনও রাত্রে বাহিরে আসিয়া ঘরে যাইতে না পারিলে, এদিকে ওদিকে চলিয়া যাইতেন, তথাপি তিনি আমাকে ডাকিয়া বলেন নাই, আমি ঘরে যাইতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে বিছানায় পৌছাইয়া দাও। আমি এসময় সমস্ত রাত কান পাতিয়া রহিয়াছি। যখন দেখিতাম, পথ ধরিতে তাঁহাব কষ্ট হইতেছে, আমি বাহিরে আসিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইতাম। শতকষ্ট পাইলেও তিনি আমাকে কোন কাজ করিতে বলিতেন না। স্বামী মনে মনে বলিলেন, এমন না হইলে কি আর তোমাধনে পুত্ররূপে পাইতে পারেন? নাগ-মহাশয় বলিলেন, আমার পিতা শিব ছিলেন। আমি অন্যায় মত তাঁহাকে অনেক বিষয়ে তাড়না দিয়াছি, তাঁহার মত হইতে পারিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়।

ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের পর দিন, নাগমহাশয়ের বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। হরপ্রসন্নবাবুর আফিস ছিল। তিনি কোনমতেই সেই দিন আফিশে না যাইয়া পারিবেন না। মা ঠাকুরাণী হরপ্রসন্নবাবুকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ৮টার মধ্যে রান্না করিলেন। স্বামীও সকাল বেলা চলিয়া আসিবেন। রান্না হইয়াছে দেখিয়া নাগমহাশয় তাঁহাকে না খাইয়া আসিতে দিলেন না। হরপ্রসন্নবাবু ও স্বামী খাইতে বসিলেন। নাগ-মহাশয় গোয়াল বাড়ী হইতে দুগ্ধ নিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে

খাইতে দেখিয়া, হরপ্রসন্নবাবুর পাতে একটু দুধ দিয়া ঘটীটা হাতে করিয়া দাড়াইয়া স্বামীকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের জন্য আনিত দুগ্ধ, কি করি? স্বামী মনে মনে বলিলেন, আমাকে উহা দিবেন না। নাগমহাশয় বড় ঘরে চলিয়া গেলেন। নাগমহাশয়ের সেই স্নেহ স্মরণ করিয়া, স্বামী বলেন, তাঁহার কত স্নেহ ছিল! কলা পাতায় খাইতে বসিয়াছিলাম, কলাপাতায় আর কতটুকু দুগ্ধ দিতে পারিতেন? এক গণ্ডুষ দুগ্ধ হইলেই কলা পাতা ভরিয়া যাইত। এই সামান্য দুগ্ধ দিতে না পারিয়া, মহা আপনের মত আমাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের জন্য দুধ, কি করি? যদি পিতা ব্রাহ্মণসেবার জন্য কোন জিনিষ আনেন, তাহা কখনও ব্রাহ্মণকে না খাওয়াইয়া পুত্রকে খাইতে দেন না, কিন্তু নাগমহাশয়ের এত স্নেহ ছিল, এই সামান্য বিষয়েও তাঁহার স্নেহ উদ্বেলিত হইল।

একবার দুর্গা পূজার সময় আমার পিতা আমাকে বলিয়া ছিলেন, পূজার সময় তোমরা ত দেওভোগে থাক। এবার তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে বলিয়া নবম দিন সকলে আসিও। আমি বলিলাম, দেখিব। অষ্টমী রাত্রিতে নাগমহাশয় শুইয়া আছেন, আমি তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া আছি। আমি বলিলাম, পিতা নবমী দিন সকাল বেলা যাইতে বলিয়াছেন। নাগমহাশয় কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবার তাঁহাকে বলিলাম, পিতা নবমী দিন অনেক লোক নিমন্ত্রণ করেন। আমাকে সকাল বেলা যাইতে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, নবমী দিন যাইতে বলিয়াছে, যাইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি মনে করিলাম, তিনি সকাল বেলাই যাইতে বলিবেন। কতটুকু সময় বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে ছিলাম, তিনি বলিলেন, মা, রাত্রি অধিক হইয়াছে, শুইতে যাও।

তিনি বড় ঘরের বারান্দায় শুইলেন, আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে ঘরের মধ্যে শুইলাম। রাত্র ভোর হইল। এখন চলিয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, তাঁহার কাছে যাইয়া বসিলাম। তাঁহার নিয়ম, ভোরের সময় সত্যযুগ, ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হয়। আমি বসিয়া থাকিয়া, নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিলাম। পক্ষিগণ মনের আনন্দে তাঁহার দিকে তাকাইয়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া, ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। সকলেই স্বীয় কাজে ব্যস্ত হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আসি? তাহা শুনিয়া নাগমহাশয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, পিতা একাকী সকল কাজ করেন। অমনি তিনি বলিলেন, মা, সংসারে সকলেই একাকী। আজ এখানেও অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ও চলিয়া যাইবে। এখন যাইও না। তাহা শুনিয়া, আমি বুঝিতে পারিলাম, স্বামীকে না খাওয়াইয়া যাইতে দিবেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেল পর তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীকে খাইতে দিতে বলিলেন। তাঁহাকে খাইতে দেখিয়া, নাগমহাশয় অতিশয় সুখী হইলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। যেমন মা সন্তানের খাওয়া দেখিলে সুখী হন, নাগমহাশয়ের হাসি মাখা মুখ-পদ্ম দেখিয়া আমার মনে তাহা পড়িল। তিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন। তৎপর আমাকে খাইতে বলিলেন। আমি খাইয়া, তাঁহার সামনে যাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, এখন আসি? নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এস, মা, রাজকুমার যাইতে বলিয়াছে। বাড়ীতে যাইয়া স্বামীকে বলিলাম, তিনি তোমাকে এত স্নেহ করেন! তিনি

ভাল দধি ও ক্ষীর তোমাকে খাওয়াইয়া কতসুখী হইলেন !! স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয় জানেন আমি বড় পেটুক, তাই আমার উপর এত দয়া।

নাগমহাশয় যখন ছিলেন, যাহাকে দেওভোগে দেখিয়াছি, তাহাকেই নাগমহাশয়ের ভক্ত মনে করিয়াছি। আমাদের মনে হইত, আমাদের ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, যাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, মা ঠাকুরাণী তাহাদিগকে ভাল বাসেন। এই কারণে নাগমহাশয়কে কিছু খাইতে দিতে পারি নাই। নাগমহায়ের স্নেহে ভুলিয়া, নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি। যত সময় দেওভোগ রহিয়াছি, তাঁহার নিকটই থাকিয়াছি। নাগমহাশয়ও দয়া করিয়া কত উপদেশ দিয়াছেন, কত কথা বলিয়াছেন। সকল কথাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছিল, বাজে কথা একবারেই হইত না। আমাদের উপরে যে নাগমহাশয়ের এত স্নেহ ছিল, অনেকের তাহা ভাল লাগিত না। মা ঠাকুরাণী ও মাসীর ইচ্ছা ছিল, যেমন সংসারের লোক আপনার লোক ভালবাসে, স্ত্রীর বান্ধবকে ভালবাসে, নাগমহাশয়ও সেই রূপ মা ঠাকুরাণী যাহাদিগকে স্নেহ করেন, তাহাদিগকে ভাল বাসুন, মা ঠাকুরাণী যাহাদিগকে ভালবাসেন না, তাহাদিগকে দেখিতে না পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বাসনা পুরণ হইল না। ভগবান্ সকলের আপন, কেহ তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। যতক্ষণ নাগমহাশয়ের নিকট রহিয়াছি, অনন্ত সুখ অনুভব করিয়াছি। যদি কোন দ্রব্য নাগমহাশয়কে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়াছি, তখন মা ঠাকুরাণীর কাছে যাইতে হইয়াছে।

একবার আমার মা নাগমহাশয়ের জন্য কয়েকটী মর্ত্তমান কলা ও দুগ্ধ লইয়া দেওভোগ যান। মা ঠাকুরাণী ও মাসীর ইচ্ছা

নাগমহাশয় তাহা না খান। তাঁহারা সকলকে সেই কলা ও দুগ্ধ খাইতে দিলেন, কেবল নাগমহাশয়কে খাইতে দিলেন না। মাসী বলিতেন, নাগমহাশয় পরের জিনিষ খান না। আমার মা এই কথা শুনিয়া, নিজেও দুধ খাইলেন না, সন্তান-দিগকেও তাহা দিলেন না। তিনি নাগমহাশয়ের এক ভগ্নীদ্বারা বলাইলেন, যদি তিনি এই দুধ ও কলা না খান, তাহার মনে বড় কষ্ট হইবে। তাঁহার সেই ভগ্নী নাগমহাশয়কে বলিলেন, দুর্গা, যদি তুমি এই দুগ্ধ ও কলা না খাও, বধূ মনে বড় কষ্ট পাইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, সন্তানদিগকে দিন, তাহা হইলেই হইবে। ভগ্নি বলিলেন, দুর্গাচরণ, যাহা তোমার জন্য আনিয়াছে, তাহা তুমি না খাইলে মনে কেমন লাগে, তাহা বুঝিতে পার? তৎপর নাগমহাশয় বালকের মত একটা কলা ও একবাটিতে কত-টুকু দুগ্ধ লইয়া খাইলেন এবং বাটিটী আপনিই ধুইয়া আনিলেন। নাগমহাশয়ের দয়া দেখিয়া আমরা সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। অন্যের অন্যায় ব্যবহারে কিছু ক্ষতি হইল না।

একবার নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছি। আমার এক ছোট ভগ্নী মঙ্গলচণ্ডীব্রত করিয়াছিল। মাঠাকুরাণী রাঁধিতে পারিলেন না। আমি রান্না করিলাম। সকলে খাইতে বসিল, আমার ছোট ভগ্নী নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া রহিল। নাগ-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ও খাইবে না? সে উত্তর দিল, সে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছে, উপবাস করিবে। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, মঙ্গলচণ্ডীর উপবাশ কর, তিনি কি বলিলেন? তিনি এমন ভাবে এই প্রশ্ন করিলেন, আমার মনে হইল, নাগমহাশয় যেন তাহাকে

বুঝাইয়া দিতেছেন, এই ব্রত করিলে ভগবতীকে দেখা যায়। আমি নাগমহাশয়ের ভাত লইয়া বসিয়াছিলাম। নাগমহাশয় খাইতে আসিতেছেন না। স্বামী মনে করিলেন, আমার ভগ্নী উপবাশ করায় বোধ হয় তিনি খাইবেন না। আমি স্বামীকে বলিলাম, তুমি নাগমহাশয়কে বল, আমি তাঁহার ভাত লইয়া বসিয়া আছি। স্বামী তাঁহাকে সেই কথা বলিলেন। নাগ-মহাশয় রান্নাঘরে যাইয়া খাইতে বসিলেন। আমাকে বলিলেন, মা, আমাকে একটী বাটিতে তুইটী ভাত দাও, আমি অত ভাত খাইতে পারিব না। এখন আমি বেশী খাই না। আমাব ভয় হইল, আমি রান্না করিয়াছি বলিয়া কি তিনি খাইবেন না? নাগমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, না, মা, আমি খাইলে দেখিতে পাইবে, পূর্ব্বে যাহা খাইতাম, তাহার চেয়ে অনেক কম খাই। রাত্রিতে একবারেই খাই না। তুমি ভাত নিয়া বসিয়া আছ, তাই তুটী খাইব। নাগমহাশয় একমুঠো ভাত এবং আধ বাটি জল খাইলেন। আমি মাঠাকুরাণীকে খাইতে দিলাম। নাগমহাশয়কে একমুঠো ভাত খাইতে দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল। আমার খাইতে ইচ্ছা হইল না। মাতাঠাকুরাণী আমাকে খাইতে বলিলেন। আমি খাইব না বলায়, নাগমহাশয় রান্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ভাত লইয়া খাইতে বস। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। নাগমহাশয় আবার আমাকে খাইতে বসিতে বলিলেন এবং যে পর্য্যন্ত আমি ভাত না নিলাম, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি খাইতে বসিলাম, নাগমহাশয় তামাক খাইতে গেলেন। এখন সেই স্নেহ কোথায় রহিল?

নাগমহাশয়ের এমন এক শক্তি ছিল, কেহ তাঁহার সাক্ষাতে মায়াপুরাণ বলিতে পারিত না। জাগ্রতাবস্থায় মনে কিছু উঠিলে, নাগমহাশয়ের ভয়ে তাহা না বলা সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু কেহ ঘুমাইয়া অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে পারে না। সুষুপ্তি অবস্থা চলিয়া গেলে, মনে নানা মত কথা উঠে, তাহা সকলেই জানে। নাগমহাশয়ের সান্নিধ্য হেতু নিদ্রাবস্থায় মন জাগিয়া রহিয়াও তাঁহার বিমল শ্বাসপ্রশ্বাসসংস্পর্শে, তাঁহাতে লয় হইয়া যাইত, সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া নাগমহাশয়ের শ্বাসের মাধুর্য্য অনুভব করিত। স্বামী তুইরাত্র নাগমাশয়ের সহিত এক বিছানায় শুইয়া ছিলেন। বিছানা যে বড় ছিল, তাহা নয়। ছোট বিছানায়, ছোট একখানা মশারির নীচে একটী বালিশে, একটী পাটিতে তাঁহারা শুইয়া ছিলেন। স্বামী আগে শুইলেন, নাগমহাশয় পরে শুইতে গেলেন। নাগমহাশয় স্বামীর সহিত একত্র শোয়ায় আমার মনে অতিশয় সুখ হইয়াছিল। আমি জানিতাম, তিনি কাহার সহিত শোন না।

এক রাত্রিতে আমি নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। স্বামী শুইয়াছেন। নাগমহাশয় আমাকে শুইতে যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি শুইবেন না? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি উহার সহিত শুইব? তাহা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্না হইলাম। তিনি সকলের সাথে এক বিছানায় বসেন সত্য, বিছানা বড় থাকে, সকলে গানকরে কিম্বা ভাগবত পাঠ করে এবং তিনি বিছানার এককোনে বসিয়া থাকেন। তিনি অন্যের সাথে এক বিছানায় বসেন, কিন্তু লোকের অত্যন্ত নিকটে বসেন না, একটু তফাতে থাকেন। এক বালিশে,

এক মশারির নীচে স্বামীর সাথে শুইবেন, স্বামীর কি সৌভাগ্য এবং নাগমহাশয়ের কি দয়া! এক রাত্রে একবারে মুক্তিলাভ! আমার মনে অতিশয় সুখ হইল। নাগমহাশয় শুইতে গেলেন। বিছানা কতবড় তাহা দেখিতে আমি নাগমহাশয়ের সাথে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, মা, তুমি শুইতে যাও নাই কেন? আমি বলিলাম, আজ রাত্রি বেশী হয় নাই। এখনই শুইতে যাইব। তিনি মনের কথা জানেন। তিনি মশারির বাহিরে বিছানায় বসিলেন। আমি সেই সুযোগে নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া কত বড় যায়গা, কতটুক বিছানা কতবড় বালিশ, সমস্ত দেখিলাম। তাহা দেখিয়া, আমি মনে মনে বলিলাম, কি দায়, কোন লোক গায় লাগিবে বলিয়া, তুমি এক কোণে বসিয়া থাক, আর দয়া করিয়া স্বামীর সাথে এক বালিশে মাথা রাখিয়া শুইবে। তোমার শ্বাস প্রশ্বাসে মশারির ভিতরের বিছানা বৈকণ্ঠকে পরাজয় করিবে। আমি তাঁহাকে বলিয়া শুইতে চলিয়া আসিলাম। নাগমহাশয় কি করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অন্তর্যামী নাগমহাশয় অমনি প্রদীপ নিবাইয়া মশারির ভিতর গেলেন। আমি আমার মার কাছে শুইয়া রহিলাম এবং ভক্তের উপর তাঁহার অসীম কৃপা, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরদিবস স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নাগমহাশয় তোমার কাছে শুইয়াছিলেন, তোমার কেমন সুখ হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, আমি কিছুই জানি না। এমন কি, নাগমহাশয় কখন শুইলেন, আবার কখন উঠিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার দেহ অন্য দেহের সহিত লাগিলে,

কর্ম্ম কি আর থাকে? যতটুকু সময় নাগমহাশয় আমার সহিত শুইয়া ছিলেন, ততক্ষণ কল্পনাও পালাইয়া ছিল, আমি পরমাত্মাস্বরূপ হইয়াছিলাম। নাগমহাশয় ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন, আমি জাগিয়া উঠিলাম; কারণ আমি সর্ব্বদা তাঁহার আগে শয্যা ত্যাগ করিয়াছি। আমি প্রত্যেক দিন নাগমহাশয়ের উঠার পূর্ব্বে উঠিয়া বসিয়া থাকি, যেন বাহিরে আসিলেই, তাঁহাকে দেখিতে পাই। এমন কি তাঁহার উঠার পূর্ব্বে হাতমুখ ধুইয়া বসিয়া থাকি, যেন তিনি আসিলেই তাঁহার কাছে বসিতে পারি। নাগমহাশয় দয়া করিয়া তাঁহার পাশে শোয়াইয়াছিলেন, সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। তিনি কত দয়ালু, এ জগতেই সাযুক্ত মুক্তির ফল লাভ করিলাম।

নাগমহাশয়ের কথার এমন এক শক্তিছিল, যদি কেহ কোন বিষয়ে ভয় পাইয়া, কিম্বা কষ্ট পাইয়া, তাঁহার কাছে যাইত, তিনি স্নেহের সহিত তাকাইয়া, কিম্বা অমিয়মাখা কথা বলিয়া, তাহার ভয় অথবা কষ্ট দূর করিয়া দিতেন। তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি কিম্বা মধুমাখা হাসি মনে থাকিত। একবার আমার ছোট ভগ্নী হেমাঙ্গিনীর প্রবল জ্বর হয়। জ্বরের প্রকোপে নানা মত প্রলাপ বকিতে থাকে। জ্বরের বেগ কমিলে, হেম বলিতে লাগিল, সে হরিরলুট দিবে। হরিরলুট দিবার জন্য তাহার দৃঢ়সংকল্প হইল। সেই সংকল্প জ্বরের বেগ হেতু কিম্বা অন্য কোন কারণ থাকায় হইল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক দিন পর জ্বরেরে বিরাম হইল, হেম ভাল হইল, কিন্তু সর্ব্বদা মলিনমুখে বসিয়া থাকিত এবং কাঁদিত। ইহা দেখিয়া, মা ভয় পাইলেন। আমি হেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এইরূপ

কর কেন? ঘরের কোণে একাকী মলিন মুখে বসিয়া থাকিয়া কাঁদ কেন? সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি দেখিতে পাই, আমার সম্মুখে লবণের বড় বড় গোলা রহিয়াছে, হাঁটিয়া যাইতে পায় লাগে। যখন আমি মনে করি, হরির লুট দিব, একটু ভাল থাকি। হরির লুট বা কত দিব? আমি বলিলাম, কেন, প্রত্যেক দিন আমি তুলসী তলায় হরির লুট দিয়া থাকি। হেম বলিল, আমার কেবল ভয় হয় এবং মনে হয় হরির লুট দিব। তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া মাকে বলিলাম, তুমি হেমকে সঙ্গে করিয়া দেওভোগ যাও। সে যেরূপ বলে, তাহাতে আমার মনে হয়, ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ উহাকে ভাল করিতে পারিবে না, কারণ দেহের রোগে তাহারা ঔষধ দিয়া ভাল করে, মনের রোগ কি ঔষধে যায়? একে মেয়ে, বিবাহ হয় নাই, যদি পাগল হইয়া যায়, সকল রকমে বিপদে পড়িবে। আমি তাহাকে কত বলিলাম, কোন ভয় করিও না, হরির লুট দেওয়া হইয়াছে, সে কোন কথা মানে না, কেবল নিজের কথাই বলে। মা আমার কথা মত উহাকে লইয়া দেওভোগ গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। হেম বলিল, জ্যেঠামহাশয়কে দেখিয়াই আমার মন ভাল লাগে। আমি বলিলাম, লোক চলিয়া গেলে, তুমি জ্যেঠামহাশয়ের নিকট যাইয়া তোমার সকল কথা বলিও। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেওভোগ পৌছিয়া ছিলাম, লোক আরও বেশী হইল। হেম বলিতে লাগিল, জ্যেঠমহাশয়কে দেখিয়াই ভাল লাগিতেছে, তাঁহার কাছে গেলে আরও ভাল লাগিবে। লোক কমে না, আরও বাড়িতেছে। আমি বলিলাম, সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন হইবে। তাহার পর তাঁহার কাছে যাইতে পারিবে।

হেম দূরে দাঁড়াইয়া নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইয়াছিল। হেম সেই রাত্রিতে নাগমহাশয়ের সহিত কোন কথা বলিতে পারিল না। পরদিন ভোরে নাগ-মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া, ঠাকুরদাদাকে এক ছিলিম তামাক দিয়া মণ্ডপ ঘরে চলিলেন। হেম তাঁহার কাছে বসিল। নাগমহাশয় তাহাকে তাঁহার কাছে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ও সীতাদেবীর মত বসিয়া আছে কেন? আমি বলিলাম, সে আপনাকে কি বলিবে। নাগমহাশয় উহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হেম লজ্জাশীলা ছিল। সে সহজে লোকের সাথে কথা কহিতে পারিত না। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, উহার কি হইয়াছে? আমি সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, হরির লুট দেওয়াত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে ভয় কিগো মা? নাগমহাশয়ের এক কথায় ভয় কোথায় পালাইয়া গেল, তাহা হেম নিজেই খুজিয়া পাইল না। আমি কত কথা বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে চাহিয়া ছিলাম, তাহাতে ভয় আরও বাড়িয়া উঠিতে ছিল, কিন্তু নাগমহাশয়ের এক কথায় সে শান্তি পাইল। নাগমহাশয় প্রাণে কথা বুঝাইয়া দিতেন।

নাগমহাশয় যে প্রাণে কথা বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আমি আরও দেখিয়াছি। শরৎবাবু যে রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কথা লিখিয়াছেন, তিনি নাগমহাশয়কে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। নাগমহাশয় বাজারে যাওয়ার কালে, রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাঁহাকে বাজারের পয়সা দিয়া, কোন্ কোন্ জিনিষ আনিতে হইবে, সমস্ত বলিয়া দিতেন। যে দিন তিনি নাগমহাশয়কে বাজারের

পয়সা দিতেন, সে দিন ত তিনি তাহার সকল জিনিষ আনিয়া দিতেনই, পয়সা না দিলেও নাগমহাশয় তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য বাজার হইতে আনিয়া দিতেন। রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী বাজার হইতে আনীত জিনিষ দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, দুর্গা, কত পয়সা দিয়া এই সব জিনিষ আনিয়াছ? নাগমহাশয় কোন জিনিষের দাম বলিতেন, কোন জিনিষের দাম বলিতেন না। যে জিনিষের দাম বলিতেন না, রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী আবার তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেন। নাগমহাশয় বলিতেন, আপনি লইয়া যান। রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী কতক সময় বাদানুবাদ করিয়া তাহা লইয়া যাইতেন। আমি হাসিতাম এবং নাগমহাশয়কে মনে মনে বলিতাম, আমরা শুনিতে পাই, তুমি চুপি চুপি কথা বলিতেছ, তোমার শব্দ রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর হৃদয় ভেদ করিয়া দিতেছে। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে আমারদিকে তাকাইতেন এবং রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সহিত কথা বলিতেন। তিনি আমার সাথে যে ভাবে কথা বলিতেন, তাঁহার সঙ্গেও সেই ভাবে কথা বলিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিতেন। রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী এত কম শুনিতেন যে, আমরা চিৎকার করিয়াও কোনমতে তাঁহাকে কোন কথা বুঝাইতে পারিতাম না। যদি কোন সময় বিশেষ দরকার হইত, লিখিয়া কথা বুঝাইতাম। বোধ হয় তিনি ঢাকের শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ শুনিতে পাইতেন না। কিন্তু নাগমহাশয়ের সকল কথাই বুঝিতে পারিতেন।

আমি রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সামনে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি,

তিনি নাগমহাশয়ের প্রত্যেক কথার উত্তর দিতেন। তিনি যে নাগমহাশয়ের কথা বুঝিতে পারেন, তাহা আমি আমার ছোট সময় মাকে বলিয়াছি। মা উত্তব দিলেন, তাঁহার ইচ্ছায় রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী কথা বুঝিতে পারেন। স্বামী বলিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছায় বোবা কথা বলে, অন্ধ চক্ষে দেখে, তাঁহার শব্দ বধিরের কানে পৌছিবে না? ইহা আর বেশী কি? অনেক দিন আমি দেখিয়াছি, নাগমহাশয় বাড়ীতে না থাকিলে যদি রামলক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাঠাকুরাণীকে কোন কথা বলিতে আসিতেন, মাঠাকুরাণী চিৎকার করিয়াও তাঁহাকে অনেক কথা বুঝাইতে পারিতেন না, হাত ঘুড়াইয়া কোন কোন কথা বুঝাইতেন। অনেক সময় আমি দেখিয়াছি, নাগমহাশয় এত চুপে চুপে কথা বলিতেন, কোন শব্দ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তিনি কি বলিতেন, তাহা বুঝিতাম।

নাগমহাশয়ের মায়ার খেলা ছিল না। যাহা দেখিয়াছি, সকলই তাঁহার দয়া, সমস্তই অলৌকিক। তাঁহার একেবারেই দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। এক দিন তিনি তামাক খাইতে-ছিলেন, বড় এক খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা মাটিতে পড়িয়াছিল, আমাকে আগুনের নিকট দেখিয়া, আগুন হাতে লইয়া, দুই অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া, চাপিয়া নিবাইলেন। আমি তাঁহারদিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিছু বলিতে পারিলাম না। মাঠাকুরাণীর দিকে চাহিলাম, তিনি উনুন হইতে আগুন তুলিয়া, তামাক খাইবার জন্য এক পাতিলে দিতেছেন। এক দিন স্বামী নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছেন, তিনি তামাক সাজিলেন। সামনে গনগনে আগুনের পাতিল। নাগমহাশয় হাতে করিয়া,

আগুন উঠাইয়া কল্‌কিতে রাখিলেন। স্বামী মনে কষ্ট পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিমটা কি নাই? নাগমহাশয় আর একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়া দুই অঙ্গুলির মধ্যে রাখিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, দেখুন, মনে লাগিলেই কষ্ট নচেৎ কিছুই নয়।

যে কোন লোক নাগমহাশয়কে দেখিত, সে বলিত, এমন কখন দেখি নাই, অথচ তিনি সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। যদি কেহ নাগমহাশয়কে যোড়হাত করিয়া নমস্কার করিত, তবে তিনি ভূমিষ্ঠ ইহয়া প্রণাম কবিতেন। তথাপি তিনি সময় সময় ভক্তের নিকট ধরা দিতেন। একদিন নাগমহাশয় ও স্বামী দক্ষিণের ঘবে বসিয়া আছেন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। ঘরে বসিয়া আকাশেব তারকাগুলি গণিতে পারা যাইত। নাগমহাশয় এমন কৌশল দেখাইলেন, চালের ভিতর দিয়া এককোঁটা বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে পড়িল না। স্বামী তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, আপনার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে,—ইহা আর বেশি কি?

একবার একটী স্ত্রীলোক নাগমহাশয়ের রান্নাঘরের খড়ের চালার উপর এক পাতিল আগুন ঢালিয়া দিয়াছিল। চৈত্রমাস। প্রখর রৌদ্রের তাপ। আগুন নাগমহাশয়ের চালার খড় স্পর্শ করিয়া, শৈত্য অনুভব করিল এবং নিজতেজ সংবরণ করিল। তাঁহার ঘরের একটী খড় ও দগ্ধ হইল না, তাহা দেখিয়া দেশের লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। যে আগুন দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিতা হইল। নাগমহাশয় মানা করায় কেহ সেই স্ত্রীলোককে কোন কথা বলিল না। স্বামী নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছেন।

তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া, বালকের মত, যে স্থানে আগুন দিয়াছিল, সেই স্থান হাতে ধরিয়া দেখাইলেন। স্বামী মনে মনে বলিলেন, তোমার ইচ্ছায় কি না হয়? আগুনও জলে পরিণত হয়।

একদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন। মাঠাকুরাণী না-দেখিয়া, এক সাপ মাড়াইয়া, বড় ঘরে গিয়াছেন। সর্প ক্রোধ ভরে বড় ঘরের দিকে চলিল। সেখানে অনেক লোক ছিল। মাঠাকুরাণী তাহাদিগকে সর্প তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। সকলেই সর্প মারিবার জন্ত প্রস্তুত হইল, এমন সময় নাগমহাশয় বাড়াতে আসিলেন। সর্পকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া, তিনি যুক্ত-করে বলিলেন, মা মনসাদেবী, আপনি দরিদ্রের কুটার ছাড়িয়া আপনার আবাসস্থানে যান। নাগমহাশয়ের কথা অনুসারে সাপ জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। সে সময় স্বামী মণ্ডপ ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখুন, যে যাঁহাকে বিশ্বাস করে, তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। জগতে কাহার অনিষ্ট না করিলে, কেহ কখন তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। মাঠাকুরণীকে বলিলেন, বনের সাপে খায় না, মনের সাপে যায়। ভগবানের নিয়ম ঠিক আছে, আমরা বুদ্ধির দোষে মরি। এখনও এত অবিশ্বাস? নাগমহাশয়ের স্নেহে জগত বশীভূত ছিল। বনের সাপ যাঁহার স্নেহে বশীভূত হইয়া বনে চলিয়া গেল, ভক্তের উপর তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল, সহজেই অনুভব করা যায়।

স্বামী নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলে, তিনি সুখী হইয় কাছে

আসিতেন, স্নেহ করিয়া কত কথা বলিতেন। নাগমহাশয়ের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, যাহাতে তাঁহার ভাল হইবে, নাগমহাশয় নিজেই তাহা করিবেন। নাগমহাশয় মন জানিয়া, আপনিই তাঁহার নিকট অনেক কথা বলিতেন এবং যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, তাহা করিতেন। নাগমহাশয় আমাদিগকে স্নেহ করিয়া অনেক সময় কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি স্বামীকে দেখিলে সুখী হইতেন, তাহা অপরের ভাল লাগিত না। নাগমহাশয মাঠাকুরাণীর ব্যবহারে সময় সময় বড়ই দুঃখিত হইতেন। যেমন পিতা বিমাতাবার সম্মুখে সন্তানকে মনোমত খাওয়াইতে পারেন না, আদর যত্ন করিতে পারেন না, ন্যায় অন্যায় কোন কথা বলিতে পারেন না, প্রথম পক্ষের সন্তান লইয়া স্ত্রীর কাছে চোব হইয়া থাকিতে হয়, আমাদিগকে লইয়া নাগমহাশয়ের সেই অবস্থা হইয়াছিল। মাতৃহীন সন্তান সমস্ত বুঝিয়া, পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে, পিতা সন্তানের মুখ দেখিয়া আপন বলিয়া স্নেহ কবেন, মিষ্ট কথা বলেন এবং যেমন সুখী করিয়া রাখেন, নাগমহাশয় কখন কখন আমাদের সাথে সেইরূপ করিতেন।

আমি ভয় পাইয়া, নাগমহাশের নিকট যাইয়া ভাল হইলাম দেখিয়া, স্বামী একান্তমনে নাগমহাশয়ের আশ্রয় নিলেন। সেই সময় তাঁহাকে একাদশী করিতে হইত, কারণ তখনও তাঁহার পিতার সপিণ্ডকরণ হয় নাই। তিনি এক একাদশীতিথিতে নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার বিবেচনা হইল না যে, তাঁহার জন্ম মাঠাকুরাণীকে ভিন্ন বন্দোবস্ত করিতে যাইয়া কষ্ট পাইতে হইবে। মাঠাকুরাণী তাঁহাকে দেখিয়াই দুঃখিতা, তাহার

উপর আবার ভিন্নমত খাদ্য তৈয়ার করিতে হইবে। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে কি বলিলেন, স্বামী তাহা জানেন না। নাগমহাশয় তাঁহার জন্য রুটী তৈয়ার করিলেন এবং আগুন জ্বালিয়া তাহা সেকিলেন। তাহা দেখিয়া স্বামীর সুখ হইল, কারণ নাগমহাশয় তাঁহার এত যত্ন করিতেছেন। তিনি পুকুরপাড়ে যাইয়া বসিয়া রহিলেন, আশা নাগমহাশয় সব ঠিক করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবেন। তিনি ভাবিলেন, ভগবান্ ডাকিলে কি সুখ হইবে! রুটি তৈয়ার করিয়া নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে খাইতে যাইতে বলিলেন। স্বামী খাইতে বসিলেন, নাগমহাশয় খাওয়ার জিনিষ দিতে লাগিলেন। তিনি খাইতে লাগিলেন। সে সুখ স্বর্গ সুখকেও পরাজয় করিতেছে। নাগমহাশয় দুগ্ধ গরম করিয়া তাঁহার থালায় ঢালিয়া দিলেন। বাজার হইতে দুগ্ধ ও ময়দা আনিয়া, রুটি তৌয়ার করিয়া, এমন স্নেহের সহিত খাওয়াইলেন এবং তাঁহাকে খাইতে দেখিয়া তিনি যেন নিজের খাটুনি সুখকর মনে করিলেন। এখন সেই স্নেহ কোথায়? স্বামী এখন অনুতাপ করিয়া বলেন, হায়, এমন ভগবান্‌কে দিয়া রুটী তৈয়ার করিয়া খাইয়াছি। এ একাদশী হইতে কি আসিবে? জীব চিরকালই পাপচারী, ভগবান্ পাপীর জন্য এত কেন করেন? গিরিশবাবু কেমন বুদ্ধিমান ছিলেন, দূরে থাকিয়া নাগমহাশয়ের মাতৃবৎ স্নেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অনেক সময় নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীর ব্যবহারে দুঃখিত হইতেন। একবার কালীপূজার সময় আমরা দেওভোগ গিয়াছিলাম। পূজা হইলে পর মাঠাকুরাণী সকলকে প্রসাদ দিলেন। তাহারা মাঠাকুরাণীর বন্ধু বান্ধব। নাগমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,

পার্ব্বতীকে প্রসাদ দাও। মাঠাকুরাণী তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার বলিলেন, মাঠাকুরাণী অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তৃতীয়বার নাগমহাশয় বলিলেন, পার্ব্বতীকে প্রসাদ দাও, মাঠাকুরাণী চুপ করিয়া রহিলেন। নাগমহাশয় আর কোন কথা না বলিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পরদিন যখন আমরা চলিয়া আসিব, মাঠাকুরাণী বলিলেন, পার্ব্বতীকে প্রসাদ নিতে বল। নাগমহাশয় ও আমি তথায় দাঁড়াইয়াছিলাম। নাগ-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কাল পার্ব্বতীকে প্রসাদ দাও নাই? তিনি বলিলেন সে ঘুমাইয়াছিল। নাগমহাশয় সমস্ত জানিতেন, তিনি বিষণ্ণমুখে বলিলেন, তুমি আর দিয়াছ! নাগ-মহাশয় স্বামীর সাথে মাতৃহীন ছেলের মত ব্যবহার করিতেন।

একবার দুর্গাপূজার সময় নাগমহাশয়ের জ্ঞাতি ভগ্নী, হরপ্রসন্ন-বাবুর স্ত্রী ও আমি নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। নাগ-মহায় হাসিতে হাসিতে হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রীর কাছে স্বামীর হাতের লেখার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ছেলেটী দেখিতে যেমন শান্ত, ভিতরেও তাহার তেমন গুণ আছে। বি, এ পড়ে, হাতের লেখাও বেশ সুন্দর। বাঙ্গালা লেখা একপ্রকার আছে, ইংরাজী লেখা বড়ই সুন্দর। হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী নাগমহাশয়ের কথায় যোগ দিলেন, স্বামীর অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, পার্ব্বতীবাবু দেখিতে যেমন, তাহার গুণও তেমন। আপনার বাড়ীতে আছে, কেহ জানিতে পারে না। কত লোক কত মত কথা বলিতেছে, কত লোক গোলমাল করিতেছে, কিন্তু পার্ব্বতীবাবু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যায় না যে, সে এখানে আছে। যদি কখন আমাদের বাসায় যায়, তখনও সে

এইমত শান্তভাবে থাকে। ছেলেমানুষত, কাহার দিকে মাথা তুলিয়া তাকায় না, কিম্বা কাহার সহিত কথা বলে না। তাহার লজ্জা দেখিয়া, আমিই সরিয়া যাই। নাগমহাশয় বলিলেন, বড় ধন্ত বীর পুরুষটী, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেই সময় একজন লোক অন্ত একজন লোকের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিল, দুইটীই একমত। নাগমহাশয় বলিলেন, সে যা তাই। সেই লোকটী আবার সেই কথা বলায়, নাগমহাশয় বিরক্তির সহিত বলিলেন, আপনি কাহার সাথে কাহার তুলনা করিতেছেন। ইহা বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। যে ভক্তের সহিত অন্তের তুলনা দিয়াছিল, তিনি তাহার সহিত অবশিষ্ট জীবনে আর ভালভাবে কথা বলেন নাই। যাঁহার এত দয়া, যাহার স্নেহের অবধি নাই, যাহার ভালবাসার তুলনা দেওয়া যায় না, যিনি সহ্যগুণে পৃথিবীকেও পরাজয় করিয়াছেন, তিনি ভক্তের সমান্ত নিন্দায়—নিন্দা না বলিলেও চলে—অধৈর্য্য হইলেন। লোকের সাথে তুলনা দেওয়ায় ভক্তের গুণ স্বীকার না করিয়া, সাধারণ লোক বলা হইল, তাহাতে নাগমহাশয় দোষ গ্রহণ করিলেন। শুনিয়াছি ভক্তের নিন্দা ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। নাগমহাশয়ে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যাঁহার এই সামান্ত নিন্দা মনে লাগে, তাঁহাকে না দেখিয়া কি করিয়া থাকিতে পারা যায়? জীব নাগমহাশয়কে ইচ্ছা করিয়া দেখিতে যাইত না। নাগমহাশয়ের অহৈতুক দয়ার টানে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইত।

স্বামী মাঠাকুরাণীকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহার যে কাজ করিতে কষ্ট হইত, তিনি তাহা বুঝিতেন। বুঝিয়া কি

করিবেন? নাগমহাশয়ের এমনি আকর্ষণ শক্তি ছিল, তাঁহার নিকট না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন স্বামী ভোরের বেলায় পঞ্চসার হইতে খাইয়া নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলেন। তিনি এই মনস্থ করিয়া ছিলেন, নাগমহাশয় তাঁহাকে খাইতে বলিলে, তিনি বলিবেন, তিনি খাইবেন না, খাইয়া আসিয়াছেন। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে ১।২ টার পূর্ব্বে খাওয়া হইত না। একটার সময় পঞ্চসার ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। পরীক্ষা নিকটে, বেশি সময় দেওভোগ থাকিতে পারিবেন না। পর দিন ঢাকা যাইতেই হইবে। নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভোগ গেলেন। তিনি তখন বসিয়া ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার সামনে আসিলেন, যেন কত আপন, কত দিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল। কেমন আছেন, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, তিনি বাজারে যাইবেন। স্বামী বলিলেন, তিনি খাইয়া আসিয়াছেন। পরীক্ষা নিকটে, আজ আবার পঞ্চসার যাইয়া, পরদিন ঢাকা যাইবেন। তাহা শুনিয়া নাগমহাশয় একটু দুঃখ পাইলেন ও বলিলেন, এইত শ্মশান ভূমি, এখানে কেহ কিছু আশা করিতে পারে না। স্বামীও কষ্ট পাইয়া মনে মনে বলিলেন, আপনার কাছে আশা না করিলে, কাহার কাছে আশা করিব? আপনি বিনা আমার কে আছে? নাগমহাশয় স্নেহ করিয়া, যতক্ষণ স্বামী তথায় ছিলেন, স্বামীর নিকট বসিয়া রহিলেন। আসার সময় হইল, স্বামী উঠিলেন। নাগমহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন এবং তাঁহার সহিত পথ চলিতে লাগিলেন। কতকদূর আসিলে, স্বামী ভাবিলেন, কি কাজ করিলাম? তিনি না খাইয়া আমার সাথে আসিতেছেন। স্বামী

বিদায় চাহিলে, নাগমহাশয় বলিলেন, আপনাকে দেখিলে আমার সুখ হয়, কোন কষ্ট হয় না। স্বামী আবার আসিব বলিলেন। নাগমহাশয় আবার স্নেহের সহিত বলিলেন, অপনাদিগকে দেখিলে আমার সুখ হয়। স্বামী তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামী মনে করিলেন, নাগমহাশয় না খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর এমন কাজ করিব না। তৎপর নাগমহাশয় তাঁহাকে চলিয়া আসিতে দিলেন। স্বামী আসিতে আসিতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, নাগমহাশয় তখনও দাঁড়াইয়া আছেন।

নাগমহাশয় না খাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সুতরাং স্বামী আর বেশি ফিরিয়া তাকাইলেন না। তাড়াতাড়ি হাটিতে লাগিলেন। পঞ্চসার আসিলে আমরা বলিলাম, ইহাই ভাল হইয়াছে। না খাইয়া গেলে, তাঁহার বড় কষ্ট হয়। একবার বাজার করা হইলে, আমরা গেলে, তিনি আবার বাজার করিতে যান। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হয়। স্বামী বলিলেন, না, আমি আর খাইয়া দেওভোগ যাইব না। নাগমহাশয় আমাদিগকে খাওয়াইয়া কষ্ট পান না। আজ না খাইয়া আসিবার সময়, তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, আপনাদিগকে দেখিলে আমার সুখ হয়। যতদূর দেখা গেল, তিনি না খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নাগমহাশয়কে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার মনে বড় দুঃখ হইল। আমার মনে হইল, আমি কেন খাইয়া আসিলাম? যখনই দেওভোগ হইতে আসি, নাগমহাশয় কতকদূর আসেন এবং যতদূর দেখা যায় তাকাইয়া থাকেন; কিন্তু এবার তাঁহার মুখখানা ভিন্ন মত দেখিলাম। ছেলে না খাইয়া কোথাও

গেলে, মার খাইতে যেমন কষ্ট হয়, নাগমহাশয়ের মুখ দেখিয়া আমার সেই কথা মনে পড়িল।

নাগমহাশয়ের স্নেহ দেখিয়া মাতৃস্নেহ ভুল হইয়া যাইত। একদিন আমি দেওভোগ গিয়াছি। সেদিন নাগমহাশয়ের বাড়ীতে অনেক লোক গিয়াছে। নাগমহাশয় তাহাদের সাথে বসিয়া আছেন। যেস্থানে বসিলে তাঁহাকে দেখা যায়, সেখানে আমি বসিলাম। নাগমহাশয় উঠিয়া আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইলেন। তিনি আমার সামনে আসিলেন, আমি মহা আনন্দিত মনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। নাগমহাশয় স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন। তাঁহাকে মনে রাখিতে হয়। এমন সময় মাঠাকুরাণী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হরপ্রসন্নের অসুখ হইয়াছে, আপনি ঢাকা গেলেন না? তাহা শুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি ঢাকা চলিয়া গেলে, কিভাবে এখানে থাকিব। তাঁহার বড় ভক্তের অসুখ, মাঠাকুরাণী যাইতে বলিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আজ যাইব না। মাঠাকুরাণী বার বার তাঁহাকে ঢাকা যাইতে বলায়, তিনি অল্প সময় আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আমি বড় ঘরে চলিয়া আসিলাম। নাগমহাশয় দয়া করিয়া আবার বড় ঘরে গেলেন। আমি তাঁহার দয়া হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আমাদের বাড়ী আবার যাইবেন? ভাবের ঘোরে ঢুলু ঢুলু আঁখি করিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, মাগো দেবী অংশ, এখানেই ত তোমাকে দেখিতে পাই। মা, যখন তোমার মনে হয়, তখনই ত আস। আমি তাঁহার স্নেহে ভুলিয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

নাগমহাশয় স্নেহমূর্তিধারণ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজই আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি বলিলেন, একটু পরে গেলেও চলিবে। সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইল। নাগমহাশয় একটী বাতি হাতে নিয়া, রান্না ঘরে যাইয়া, মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, উহাকে খাইতে দাও। আমি বলিলাম, আমার ক্ষুধা নাই, বাড়ী যাইয়া খাইব। নাগমহাশয় আমাকে অল্প দুটী খাইবার জন্য জিদ করিলেন। আমি খাইতে বসিলাম। মাঠাকুরাণী আমাকে খাইতে দিয়া সন্ধ্যা করিতে চলিয়া আসিলেন। তিনি ঠাণ্ডায়, রান্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার পাষাণ মনে একবার হইল না, নাগমহাশয শীতের মধ্যে আমাব জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, আর আমি ইচ্ছামত সুখে বসিয়া খাইয়া উঠিলাম। তিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট থালা রাখিয়া দেওয়ার জন্য বলিলেন, মা, শীতের সময় পুকুরের ঘাটে যাইতে কষ্ট হইবে। আমি বলিলাম, আমিই উহা ধুইব, মাঠাকুরাণীকে ধুইতে দিব না।

আমি পুকুরের ঘাটে গেলাম। নাগমহাশয় প্রদীপ লইয়া আমার সঙ্গে গেলেন। আমি পাষাণী, তাই সুখ অনুভব করিয়া মুখ ধুইয়া আসিলাম। আমার পাষাণ মন একবার ভাবিল না, নাগমহাশয় দেবের অরাধ্য হইয়া এই শীতে একটা কীটের জন্য এত কষ্ট করিতেছেন। দেওভোগে মধ্যাহ্নকালে খাইতে বেলা হইত। ১।২টার সময় খাইয়া কি আবার সন্ধ্যার পর ক্ষুধা বোধ হয়? নাগমহাশয় কীটের উপর অহৈতুক কৃপা ছিল, তাই কীট অনেক সময় তাঁহাকে বিনা হেতুতে অনেক কষ্ট দিয়াছে। ' যেমন ঘৃণিত কীট, সব সময় তেমন নিজের সুবিধা

দেখিয়াছে ; যাহা মনে হইয়াছে, তাহা করিয়াছে। একবারও ভাবে নাই, কিসে নাগমহাশয়ের সুখ হইবে, কি হইলে তাঁহার কষ্ট হইতে পারে। যাঁহাকে দেবতাগণ পূজা করিতে পারেন নাই, তিনি ঘৃণিত কীটের ব্যবহারে সুখী হইয়া বলিতেন, ক্ষেপা চণ্ডী, আমি ভাবি ক্ষেপা চণ্ডী কখন কি করিয়া বসে। তাহা শুনিয়া কীট মনে করিত, এইদিন এইভাবেই যাইবে। একবারও ভাবে নাই, একদিন নাগমহাশয় ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি কীটের জন্য আলো ধরিয়া দাঁড়াইলেন, কীট কি আর তখন নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে? তাহার ইচ্ছায় নাগমহাশয় চলিতেন না সত্য, তথাপি কীটের একবার ভাবা উচিত ছিল।

যতদিন নাগমহাশয় আমাদের ভিতর ছিলেন, আমি কোন বিষয়ে কোন চিন্তা করি নাই, যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতাম। আমার কাজের জন্য অনেক সময় নাগমহাশয়কে বেগ পাইতে হইয়াছে। একদিন আমি দেওভোগ গিয়াছি। তখন তিনি বাড়ীতে নাই। নটবরবাবু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একখানা নাটক লিখিয়াছিলেন এবং তাহার অভিনয়কালে নাগ-মহাশয়কে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনেক দিন বলিয়াছিলেন। সেইদিন নটবরবাবু নাগমহাশয়কে বলিলেন, আমরা কি রকম সাজাইয়াছি তাহা একবার দেখিতে চলুন। আপনি তথায় গিয়াই চলিয়া আসিবেন, শুধু একটীবার দেখিবেন। এইরূপ অনেকবার বলায় ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। নাগমহাশয় নাটক দেখিতে গেলেন। যখন আমরা তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়াছি, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নাগমহাশয়কে না দেখিয়া, তাঁহার শ্বশ্রূকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, জামাতা নটবরদের বাড়ী গিয়াছেন। আমি মনে করিলাম, এখন কি করি? এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে। নটবরবাবুর বাড়ী যাইতে রাত্রি হইবে। অন্ধকারে একাকী গেলে, নাগমহাশয় রাগ করিবেন। তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া তথায় যাইতে সাহস হইল না। নাগমহাশয় বাড়ীতে নাই, সেই বাড়ীতে থাকিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। যে পথে তিনি বাড়ীতে আসিবেন, সেই পথে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েকটী ছেলে নাটক দেখিতে যাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায় যাইবে? তাহারা নাটক দেখিতে যাইবে শুনিয়া, আমার মনে হইল, আমিও উহাদের সঙ্গে গেলে নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব। এমন সময় তাঁহার শ্বশ্রু বিরক্তির সহিত বলিলেন. কোন দিন তিনি কোথায়ও যান না, আজ একটু গিয়াছেন, তাহাতে গোলমাল বাধিল। তোমাকে দেখিলেই চলিয়া আসিবেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঢাকা কলেজের একজন পণ্ডিত নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেই বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছেন। আমাকে বলিলেন, মা, কোন বিষয়ে অস্থির হইতে নেই। আপনি যে নাগমহাশয়ের জন্য অস্থির হইয়াছেন, তিনি ওখানে বসিয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি আপনার মনের টানে এখনই আসিবেন। অন্ধকার পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন? ইহা শুনিয়া আমার মনে সুখ ও দুঃখ, উভয় যুগপৎ উপস্থিত হইল। সুখ হইবার ,কারণ, নাগমহাশয় যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা লোক বুঝিতে পারিয়াছে। এত লোকের বাধা মানিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া

মনে অতিশয় দুঃখ হইল। তখন স্বামী ঢাকা কলেজে পড়িতেন। আমাদের বাড়ীর চাকর আমাকে বলিল, আপনি বাড়ীতে আসুন, ঢাকা কলেজের পণ্ডিত জামাতাকে চেনে। যদি তিনি জামাতাকে কিছু বলেন। আমার আরও বিরক্তি জন্মিল। নাগমহাশয়ের শ্বশ্রূ বির্ বির্ করিয়া বকিতে লাগিলেন।

আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি দেখিতে পাইলাম, নাগ মহাশয় দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নাগমহাশয় আমার সাক্ষাতে আসিলেন। আমি বড় ঘরে গেলাম। নাগ-মহাশয় বারান্দায় বসিলেন। আমি তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া-ছিলাম বলিয়া, তিনি অতিশয় দ্রুতগতিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষেপা মা। এমন সময় পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি একটু বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। সে সময় বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছিল। তিনি সকলকেই ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাহাকে তামাক দিয়া, কাহাকে বাতাস করিয়া, কাহার সহিত কথা বলিয়া, সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। নাগমহাশয়ের ব্যবহারে সকলেই সুখী হইল। কেহ তাঁহার সুখ বুঝিল না। যদি কাহার আত্মীয় কোন স্থান হইতে বাড়ীতে আসে, সকলেই তাহাকে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইতে দেখিলে, তাহার সহিত কথা বলে। নাগমহাশয়ের সাথে কাহার সেই বিচার ছিল না। তিনি কাঁধে করিয়া বাজার হইতে প্রকাণ্ড বোঝা আনিয়াছেন, বোঝা নামাইয়া লোকের জন্য তামাক সাজিতে বসিয়াছেন।

নানা জাতীয় লোক নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইত। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কায়স্থ, কেহ নীচ জাতীয়। তিনি সকলকে সমান ভাবে যত্ন করিয়াছেন। একবার কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া রান্না করিতে বসিয়াছেন। নাগমহাশয় তাঁহাদের নিকট অনেক সময় দাঁড়াইয়া যখন দেখিলেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত দেওয়া হইয়াছে, ঘরের ভিতর যাইয়া একটু শুইলেন। তাঁহার শূলের ব্যথা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ নাগমহাশয়কে ডাকিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিলেন, আমাব কেমন একটু বোধ হইতেছে। তাঁহারা বলিলেন, তোমার আবার দুঃখ কি? তুমি আমাদের কাছে বস। আমবা তোমাকে দেখি। নাগমহাশয় হাসিমুখে তাহাদের কাছে দাঁডাইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, আমরা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, তুমি আমাদের সাক্ষাতে বস।

একদিন আমবা দেওভোগ হইতে চলিয়া আসিতেছি, নাগ-মহাশয় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, মা, এজগতে কেহ কাহার কষ্ট বোঝে না। একদিন আমি বাজারে যাইতেছিলাম। লক্ষ্মী-নারায়ণজীউব মন্দিরের নিকট গেলে, আমার এমন ব্যথা হইল, অপর মানুষ হইলে ইহাব চারিভাগের একভাগ ব্যথায় প্রাণ হারাইত। নরেন্দ্র ইহার একভাগ ব্যথায় মারা যায়। আমি ব্যথায় বসিয়া পড়িলাম এবং সামান্য কম বোধ হইলে বাজারে গেলাম, কেহ আমার কষ্ট বুঝিল না। কয়েকটী লোক আমার কাছে আসিয়া তাহাদের কষ্ট বলিতে লাগিল। তাহাতে আমার অতিশয় হাসি পাইল। আমি মনে মনে বলিলাম, তোমার কষ্ট কে বুঝিবে? তুমি জীবের কষ্ট দেখিয়া, জীবকে রক্ষা

করিতে, নিজে তাহার কর্ম্মের বোঝাগ্রহণ করিয়া ভুগিতেছ। তোমার কি কোন পাপ আছে, যাহাতে তোমার শূলের ব্যথা হইতে পারে? এই জঘন্য সংসারে আসিলে কেন? অন্যান্য অবতার সুখেও থাকেন, অন্যের কর্ম্মও গ্রহণ করেন। তুমি এই জগতে আসিয়া একদিনের তরেও সুখভোগ করিলে না, কেবল জীবের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজ দেহে ভোগ করিতেছ। অসুস্থ দেহ লইয়া জীবকে সুখাদ্য যোগাইতেছ। দেখিলেত জীব কি তোমার কষ্ট বুঝিতে পারে? তুমি না জানিতে এমন কিছু নাই, জানিয়া এ পাপ সাংসারে কেন আসিলে? জীবের দুর্গতি দেখিয়া, জীবকে সুখ দিতে আসিয়া থাকিলে, বড়ই ভুল করিয়াছ, কারণ জীব মুক্তিলাভ করিয়া যথেষ্ট সুখী হইতে পারিত। তাহার উপর বাজার করিয়া, মাথায় বোঝা লইয়া, খাদ্যদ্রব্য আনিয়া জীবকে ভাল খাওয়াইয়া সুখী করার কি দরকার ছিল? জীবত এসব কিছুতেই সুখী হইবে না। তুমি সময়ে বলিতে,

মহাপ্রভু বলে শোন নিত্যানন্দ ভাই। কলির জীবের ঠাঁই কোনকালে নাই।

তৎপর তাঁহাকে প্রকাশ্যে বলিলাম, লক্ষ্মী-নারায়ণজীউর মন্দিরের নিকট আপনার ব্যথা হইল, আপনি বসিয়া পড়িলেন, ব্যথা কম বোধ হইলে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন না কেন? নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বাড়ীতে লোক ছিল এবং অপর লোক বাজারের পয়সা দিয়াছিল। বাজার না করিয়া কি করিয়া ফিরিতে পারি? যখন বাজার করিতেছিলাম, তখন আমার শরীর ভাল ছিল,। আমি বলিলাম, অন্যকেহ এই অবস্থায় বাজার করিত না। তিনি বলিলেন, সেই দিন বাজার না করিলে, যাহারা পয়সা দিয়াছিল,

তাহাদের বড় কষ্ট হইত। বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কষ্টের সীমা রহিত না। আমি বলিলাম, জীব আপনাকে কি কষ্টই না দিল? যাহারা নাগমহাশয়ের নিকট যাইত, তাহারা আপন সুখ ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। কেবল নাগমহাশয়ই এই সমস্ত লোক আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যত্র স্থান হইত না।

একবার বর্ষার সময় ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ নাগমহাশয়কে দেখিতে যান। তিনি তাঁহাদের রান্নার আয়োজন করিলেন। তাঁহাদিগকে রান্না করিয়া লইতে বলায়, তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা তখনই চলিয়া যাইবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, এখন কি করিয়া যাইবেন? রান্নার সমস্ত তৈয়ার হইয়াছে, রান্না করিয়া দুটী খান। আজ এখানেই থাকুন, কাল সকালে যাহা হয় করিবেন। তাঁহারা কোন মতেই নাগমহাশয়ের বারণ শুনিলেন না। তাঁহারা রওনা হইলেন। নাগমহাশয় আলো হাতে করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তখন অল্প বৃষ্টি হইতে ছিল। পা হরকাইয়া যাওয়ায় নাগমহাশয় পড়িয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা চলিতে লাগিলেন, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, তখন নাগমহাশয়ের কি অবস্থা হইয়াছে। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। নাগমহাশয়ের নিয়ম ছিল, ব্রাহ্মণের নামে কোন জিনিষ রাখিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকে তাহা দিতেন না, নিজেও খাইতেন না। ব্রাহ্মণদিগের রান্নার জন্য যাহা যোগাড় করিয়াছিলেন, সমস্ত ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের জন্য আলো ধরিতে যাইয়া ভূমিশায়ী হওয়াই তাহার লাভ হইল। যখন নাগমহাশয়কে দেখিয়াই চলিয়া যাওয়া মনস্থ ছিল, তাঁহাকে এত কষ্ট দেওয়ায় কোন

দরকার ছিল না। রান্না ত নিজেরাই করিতেন, যদি নাগমহাশয়ের কষ্ট হইবে মনে করিয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে রান্নার যোগার করার পূর্ব্বে গেলেন না কেন? নাগমহাশয় কতমত লোক আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাদের ব্যবহারে নাগমহাশয় ব্যতীত সকলেই বিরক্ত হইয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন। নাগমহাশয় তাঁহার খাওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি নিজে তাঁহার রান্নাব যোগাড় করিয়া দিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণটী রান্না করিতে বসিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেন। কোন দিন তিনি জঙ্গলে বসিয়া থাকিতেন, অপর দিন অনেকদূরে চলিয়া যাইতেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে খুজিতে বাহির হইয়া, যেদিন তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেন, সেদিন তাঁহার খাওয়া হইত, নাগমহাশয়ও খাইতেন। কিন্তু যেদিন তিনি অনেকদুর চলিয়া যাইতেন, সেদিন আর নাগমহাশয়ের খাওয়া হইত না। ব্রাহ্মণ রান্না করিতে আরম্ভ করিয়া না খাইলে, নাগমহাশয় কি করিয়া জল গ্রহণ করিবেন? মাঠাকুরাণী শত চেষ্টা করিয়াও নাগমহাশয়কে খাওয়াইতে পারেন নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন রান্না করিতে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ কোথায় চলিয়া গেলেন। সকল দিন গেল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। নাগমহাশয় উপবাসী রহিলেন। অনেক রাত্রি হইল, তথাপি সেই ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন না। নাগমহাশয় না খাইয়া শুইয়া রহিলেন। মাঠাকুরাণী শুইতে গেলেন। জীবের উপর তাঁহার এত দয়া ছিল, নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, উহার বিছানার নিকট কয়েকটী আম রাখিয়া আস। মাঠাকুরাণী

একটু বিরক্ত হইলেন, নাগমহাশয় যাহার কারণে উপবাসী রহিলেন, তাহার খাওয়ার জন্য আম রাখিতে হইবে। তিনি নাগমহাশয়ের কথা মত তাঁহার বিছানার কাছে এক বাটী আম রাখিয়া আসিয়া নাগমহাশয়কে বলিলেন, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এত রাত্রিতে আসিয়া আম খাইবে! নাগমহাশয় বলিলেন, আর কতকক্ষণ পর দেখিবে, সে আসিয়া আম খাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। কতক সময় পর নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, এখন আলো লইয়া গেলে দেখিতে পাইবে, সে আম খাইয়া শুইয়া আছে। মাঠাকুরাণী আলো লইয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন, যথার্থই সে আম খাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। মাঠাকুরাণী আসিলে নাগমহাশয় একটী আমি খাইতে চাহিলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন, সে ত পেট ভরিয়া আম খাইয়াছে, আপনিও বেশ করিয়া আম খান। নাগমহাশয় বলিলেন, না খাইয়া থাকিলে আমার কোন কষ্ট হয় না। তুমি মনে কষ্ট পাইয়া বার বার বলিয়াছ, তাই একটী আমি খাইব। এখন আর কিছু খাইব না। ধন্য নাগমহাশয়! ধন্য তাঁহার স্নেহ!! যিনি তাঁহাকে উপবাসী রাখিলেন, নাগমহাশয় শুইয়া থাকিয়াও তাহার খাওয়ার চিন্তা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণটী একবারও ভাবিলেন না, তিনি কি কাজ করিতেছেন। লোক এভাবে নাগমহাশয়কে অকারণ কষ্ট দিয়াছে। তিনি হাসি মুখে সকল সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিলে মনে হইত, জীবই তাঁহার জন্য কষ্ট করিতেছে। যে ভাবেই হউক, জীবকে সুখ দিতে পারিলেই, তিনি সুখী হইতেন। যে ব্রাহ্মণটী নাগমহাশয়কে উপবাসী রাখিতেন, তাহাকে দুগ্ধ, ভাল মাছ খাওয়াইতে

পারেন না বলিয়া নাগমহাশয় আমার নিকট কত আক্ষেপ করিয়াছেন।

একবার পূজার সময় নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, এই ব্রাহ্মণকে রোহিত মৎসের মাথা রান্না করিতে দিও এবং খাওয়ার সময় দুগ্ধ দিও। পূজার বাড়ী মাঠাকুরাণী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নিজে দেখিয়া দিতে পারেন নাই। তাহাকে মাছের মাথা ও দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল না। ব্রাহ্মণ খাইয়া আসিলেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উঁহাকে মাছের মাথা ও দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল কি না। তিনি বলিলেন, আমি মাকে তাহা দিতে বলিয়াছিলাম, জানি না কেন তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তখন মাঠাকুরাণী খাইতে বসিয়াছিলেন। নাগমহাশয় চলিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমি জানি না কেন এই ঠাকুরকে ভাল খাওয়াইতে পারি না। এমন কি আমি নিজে চেষ্টা করিয়াও দেখিয়াছি তাহা হয় না। সে সময় স্বামী সামনে ছিলেন। তিনি ও আমি মনে মনে বলিলাম, তোমাকে যে না খাওয়াইয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহার ফল। নাগমহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে আমি বলিলাম, এই ব্রাহ্মণ আপনাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, তাই সে খাইতে সুখ পায় না। নাগমহাশয় বলিলেন, সে কেন আমাকে কষ্ট দিবে? আমি কহিলাম, লোক ব্রত করিতে এক দিন উপবাস করিলে কষ্ট অনুভব করে, সে আপনাকে অকারণ উপবাসী রাখিয়াছে, আর কি কষ্ট দিতে পারে? নাগমহাশয় মুখখানা ঈষৎ মলিন করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। কত লোক কত ভাবে নাগমহাশয়কে কষ্ট দিয়াছে, তাহার শেষ নাই। তিনি কাহার

দোষ গ্রহণ করেন নাই, সকলকেই আপন ভেবে গ্রহণ করিয়াছেন।

নাগমহাশয়ের স্নেহ লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমাকে ৫ বৎসরের শিশুর মত দেখিতেন। যখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসর হইয়াছিল, তিনি যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই আমি তাঁহার সামনে বসিয়া থাকিতাম। যদি তাঁহার কাছে লোক থাকিত, দূর হইতে মনে প্রাণে কেবল তাঁহাকে দেখিতাম। লোক নিকটে না থাকিলে, তিনি অসাক্ষাতে যে লীলা দেখাইতেন, তাহা বলিতাম। উহা শুনিয়া তিনি কত সুখী হইতেন এবং মা, মা বলিয়া আদর করিয়া, মাথায় ও পীঠে হাত বুলাইতেন। যেরূপ দর্শন করিতাম, তাহা বলিলে, তিনি যাঁহার রূপ তাঁহার নাম বলিয়া বলিতেন, মা, ঐরূপে দর্শন করিয়াছ? আমি মনে মনে বলিয়াছি, উহা আপনার রূপ, আপনার সকল রূপ আমার ভাল লাগে। তিনি বলিতেন, মা, সকলই ভগবানের রূপ। যখন তিনি যেরূপে ইচ্ছা করেন, সেইরূপে দেখা দেন। ইহা শুনিয়া আমার মনে হইত, তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাকে দেখা দিয়া সুখী করিতেছেন। নাগমহাশয় দেওভোগে বসিয়া পঞ্চসারে দেখা দিতে পারেন, সুতরাং তিনি নানারূপও ধারণ করিতে পারেন। যত দেবতা দেখিতে পাই, তিনি সকলের মূলে বিদ্যমান আছেন। মনের ভাব দেখিয়া, মহাভাবে তাঁহার চক্ষু ঢুলুঢুলু করিত। তিনি তাকাইয়া থাকিতেন, কোন কথা বলিতেন না; হাসিতেনও না। তাহা দেখিয়া, সময় সময় আমার মনে হইত, তিনি ওভাবে রহিলেন কেন? তখনই আবার শান্তরূপ ধারণ করিয়া মা, মা বলিতেন। আমি ভাবিতাম, তিনি ভগবতী মাকে

ডাকিতেছেন। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া বলিতেন, মাগো, ধন্য তুমি। ভগবতীকে ডাকিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, ভগবান্ আবার ভগবতীকে ডাকেন কেন? ভগবতী কি তাঁহার চেয়ে বড়? তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য অকালে বোধন করিয়া, ১০৮টী পদ্ম দিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। আবার এই সীতা সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ করিলেন। সেই সময় রামচন্দ্র সীতাদেবীকে মা বলিয়া স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার উদ্ধারের জন্য দেবীর পূজা করিলাম কেন? তুমিইত সেই দেবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রামচন্দ্র সহস্রস্কন্ধরাবণ বধ করিলেন না কেন? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাম লক্ষ্মণ তাহা পারিলেন না। সীতা মহাকালীর রূপ ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধরাবণ বধ করিলেন। মহাকালীর রূপ দেখিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে মা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল, ভগবান্ একই, নানা রূপ ধারণ করিয়া, একরূপে অন্যরূপের পূজা করেন। এই কথা মনে হওয়া মাত্র, নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার হাসির সাথে জ্যোতি বাহির হইতেছে। তিনি জ্যোতির্ম্ময় হইলেন। জ্যোতির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতি মিশিয়া গেল।

আমার উপর নাগমহাশয়ের এত দয়া ছিল। গোপনে এইভাবে সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সমভাবে তাঁহার লীলা দেখাইয়াছেন। দেওভোগ গেলে আমি প্রায় সকল সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। কখন নাগমহাশয়ের বাড়ীতে এত লোক হইত,

ঘর ভরিয়া যাইত। তখন আমি আর সেই ঘরে যাইতে পারিতাম না। অন্যঘরে বসিয়া মনে করিতাম, তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। তখন দয়াময় দয়া করিয়া যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘরে যাইয়া আমার সামনে বসিতেন এবং ভগবানের কথা বলিতেন। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, সময় সময় গান শুনিতে থাকিতাম। তিনি একবার আমার কাছে আসিতেন, আবার কীর্ত্তনের মধ্যে যাইতেন। অনেক সময় আমার কাছে থাকিতেন। ছোট সময় এইভাবে গেল। যখন ১৬।১৭ বৎসর হইল, তখন আর লোকের সামনে নাগমহাশয়ের কাছে বসিতাম না। তিনি আমার উপর দয়া করিয়া, বাহিরে একখানা চটের উপর বসিতেন, আমি তাঁহার সামনে বাহিরে বসিয়া থাকিতাম। যদি তিনি ঘরে বসিতেন, দরজার কাছে বসিয়া থাকিতেন। আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কতটুক সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে, দয়াময় দয়া করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিতেন। আমি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া, মনের আনন্দে তাঁহার পিছনে চলিয়া আসিতাম। তিনি কৃপা করিয়া আমার সামনে বসিয়া থাকিতেন। অল্প সময় আমার কাছে থাকিয়া, আবার লোকের কাছে যাইতেন। আমি কতটুক সময় তাঁহার অপেক্ষা করিয়া, আবার তাঁহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইতাম। যদি কেহ সেই সময় নাগমহাশয়ের সহিত কথা বলিত, কথা শেষ না হইলে আর তিনি উঠিতে পারিতেন না। আমাকে বলিতেন, মা, ঘরে যাও, ঘরে যাইয়া বস। আমি যাইব যাইব করিয়া একটু দেড়ি করিতাম। আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিতেন, মা, এইভাবে কোণে কোণে দাঁড়াইয়া থাকে

না। তখন* আমি চলিয়া আসিতাম। অল্প সময় পরে তিনি আমার সাক্ষাতে আসিয়া বসিতেন। এই ভাবে দিন যাইত। সন্ধ্যা হওয়া মাত্র তিনি আমার খোজ করিতেন। সন্ধ্যা হইলে নাগমহাশয় আমাকে বাহিরে কোন জায়গায় থাকিতে দেন নাই। যদি কখন হাত মুখ ধুইতে ঘাটে যাইতাম, তিনি ঘাটে যাইয়া আমাকে একাকী দেখিয়া বলিতেন, মা, সন্ধ্যার সময় এখানে-সেখানে একাকী থাকিতে নেই, ঘরে যাও। আমাকে ঘরে রাখিয়া তিনি লোকের কাছে যাইতেন। রাত্র হইলে, আমি একাকী বড় ঘরের বারান্দায় থাকিতাম। অনেক সময় তিনি আমার সামনে থাকিতেন। যে পর্য্যন্ত আমি শুইতাম না, তিনি একবার লোকের কাছে যাইতেন, আবার আমার কাছে আসিতেন, যেন আমি ৫ বৎসরের মেয়ে, একাকী থাকিতে ভয় পাইব।

নাগমহাশয় এই ভাবে আমাকে স্নেহ করিয়া, যত্নে ও সাবধানে রাখিয়াছেন: আমি পাষাণী মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার কষ্ট বুঝি নাই। তিনি আমার জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন, আমার জন্য, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারেন নাই। ভ্রমেও আমার মনে হয় নাই, তাঁহাকে এত কষ্ট দিতেছি। আমাকে ও স্বামীকে নিয়া এমন ভাব করিতেন যেন ৫।৭ বৎসরের মেয়ে ও ছেলের বিবাহ হইয়াছে। উভয়েই তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া থাকিতাম। তিনি কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যতদিন ঠাকুরদাদা জীবিত ছিলেন, কখন কখন আমাদের একত্র শোয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একদা স্বামী ও আমি তাঁহার নিকট বসিয়া আছি। রাত্র ১টা বাজিয়া গেল।

তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা। তিনি আমাদের কাছে বসিয়া রহিলেন। গভীর রাত্র। তাঁহার কেমন এক রূপ দেখিলাম। বাতি জ্বলিতে ছিল। বাতির জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ করিয়া তাঁহার শরীরের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। বাতির আলো মিটমিটে। তাঁহার শরীর হইতে সূর্য্যের জ্যোতির মত প্রখর জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। আমি মোহিতা হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম। অল্প সময় পর তাহা লুকাইল। তখন নাগমহাশয় স্বামীকে বলিলেন, কল্য কলেজ আছে, শুইতে যান। স্বামী তাঁহার কথামত শুইতে গেলেন। তিনি তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তামাক খাওয়া শেষ হইলে, নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, মা, এখন শুইয়া থাক। আমি শুইতে যাইতেছি। আলোর সামনে বসিয়াছিলাম, বাহিরে আসিয়া ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পড়িলাম। বর্ষাকাল। বাড়ীতে জল উঠিয়াছিল। জলে পা দিয়াছি, ৫ বৎসরের শিশুকে মা যেমন বলেন, সেইরূপ নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, দেখিও, জলে যেন কাপড় না ভিজে। কোন ভয় নাই, আমি যাই। আমার সঙ্গে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। আমি ঘরের পিছনে গেলাম। তিনি উঠানে দাড়াইয়া কাস দিয়া জানাইলেন, কোন ভয় নাই, আমি এখানে আছি। আমি উঠানে আসিয়া বলিলাম, আপনি জলে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন? মণ্ডপ ঘরে বসিয়া থাকিলেই ত আমার ভয় হইত না। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমি শুইতে যাও। আমি শুইতে গেলাম। তিনি ঘরের সামনে জলে দাঁড়াইলেন। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিলাম। তিনি শুইতে গেলেন। তাঁহার শব্দ

পাইয়া, স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি জলে নামিয়া তোমার সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঐঘর হইতে এই ঘরে আসিবে, তাহাতে তিনি পিছনে পিছনে জলে নামিয়া আসিলেন? আমি বলিলাম, কি করিব? তুমি চলিয়া আসিলে। তিনি তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি মনে করিলাম, তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখি। তামাক খাওয়া শেষ হইল। তিনি বলিলেন, মা, তুমি শুইতে যাও। আমি তাঁহার জ্যোতিতে বসিয়া ছিলাম। গভীর রাত্রে অন্ধকারে আসিয়া মনে একটু ভয় হইল। তিনি জলে নামিলেন। নাগমহাশয়ের অসীম দয়া দেখিয়া, উভয়ে তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোর হইল। নাগমহাশকে স্মরণ করিয়া উঠিলাম। তাঁহার পবিত্র বাতাসে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকিত। তাঁহার ভাব থাকা পর্য্যন্ত, তাঁহার অসাক্ষাতেও মন প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলে নাই। তাঁহার গুণ, তাঁহার মহিমা মনে হইলে রোমাঞ্চিত হয়! কেবল মনে হয়, হায়, হায়, কাহাকে লইয়া কি ভাবে খেলা করিয়াছি। যাহার ইঙ্গিতে গঙ্গার আগমন, যাহাকে স্পর্শ করিয়া দেবী গঙ্গা মনের আনন্দে তাঁহার বাড়ী ভাসাইতে ছিলেন, লোক জানিবে বলিয়া যেস্থান হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, জয় গঙ্গে বলিয়া সেই স্থান যিনি চাপা দিলে, দেবী গঙ্গা অন্তর্ধান হইলেন, জীব হইয়া তাঁহার সহিত কি খেলাই না খেলিয়াছি। অনেক সময় অশান্ত হইয়া, লোক জন না মানিয়া, যেখানে নাগমহাশয় গিয়াছেন, সেখানে যাইতে চাহিয়াছি। তখন তিনি হাত ধরিয়া, মা বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন। এখন সেই কথা মনে হইলে, শরীর শিহরিয়া উঠে।

যিনি দেবী গঙ্গাকে একবার হাতের চাপা দিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, জীবকে শান্ত করিতে তাঁহাকে অনেকবার হাত ধরিতে হইয়াছে। অনেক সময় বিনয়ের সহিত তিনি লোকের কাছে বলিতেন, আমার সংসারের কোন জ্ঞান নাই; যেন লোক আমাকে মন্দ না বলে। আমার জন্য তাঁহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে।

মা ঠাকুরাণী আমাদিগকে নাগমহাশয়ের নিকট দেখিলে কেমন হইয়া যাইতেন এবং নাগমহাশয়ের এক ভক্তের নিকট মনের বেদনা বলিতেন। সুতরাং সেই ভক্ত মনে করিত, আমরা দেওভোগ না গেলেই ভাল; নাগমহাশয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। এক দিন আমি নাগমহাশয়ের সাক্ষাতে বসিয়া আছি, সেই ভক্ত অন্য দিকে শুইয়া আছে। এসময় এক রমণী, যিনি নাগমহাশয়কে ছোট সময় সর্ব্বদা কোলে কাঁখে করিতেন, কোন কারণে ভক্তের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কটু কথায় দুঃখ পাইয়া নাগমহাশয়কে বলিলেন, ওদের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ আমাকে বাদিনী বলে। নাগমহাশয় মুখখানা ঈষৎ মলিন করিয়া বলিলেন, তাহারা আপনার দিদিমাকে কি এই সব কথা বলিতে পারে? উপরওয়ালা নাই, তাই এমন হইয়াছে। ভক্ত বলিল, প্রত্যেকের উপরওয়ালা আছে। তিনি বলিলেন, স্বামীত খুব উপরওয়ালা। হাইকোর্টের জজ, সকলের বিচার করে, ঘরে গেলে জোড় হাত। তখন ভক্ত রাগিয়া গিয়াছে। সেই ভক্ত বলিল, মেয়েলোক রাক্ষস; উহাদের কি ধর্ম্মভাব আছে? তিনি বলিলেন, বিদ্যারূপিণী ছাড়া। ভক্ত বলিল, যদি বিদ্যারূপিণী থাকে, সে মা। ইহা ছাড়া সকলগুলিই নরকের দ্বার স্বরূপ। তখন নাগমহাশয়ের মুখ কাল

হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার চক্ষের উপর আছে। আমি আপনার কথা বিশ্বাস যাইব কেন? এই কথা বলিয়া নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভক্ত ক্রোধে গড়্‌গড়্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। প্রভুর এত দয়া, এত স্নেহ ছিল। সেই ভক্ত মাঠাকুরাণীর ছেলে। নাগমহাশয়ের সাথে অযথা তর্ক করিয়া নিজে সরিয়া পড়িল। দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে শ্রীচরণের পাশে রাখিলেন।

আমার উপর নাগমহাশয়ের দয়ার শেষ ছিল না। এক কালী-পূজার দিন, কালীর পায় অঞ্জলি দিব মনে করিয়া কুচিয়ামোড়া হইতে দেওভোগ গেলাম। আমাকে উপবাস করিতে দেখিয়া, সুখী হইয়া নাগমহাশয় স্বামীকে বলিলেন, কলিকালে উপবাসই তপস্যা। আমি যাহা কিছু ধর্ম্মের জন্য করিতাম, তাহাতেই তিনি অতিশয় সুখী হইতেন। কালীপূজা হইয়া গেল। অঞ্জলি দিলাম। তিনি আমার পিছনে পিছনে যাইয়া বলিলেন, মা, প্রসাদ লও। কালীর প্রসাদ দিতেছে। এমন সময় কে তাঁহাকে ডাকিল। আমার মা নিকটে ছিলেন। মা বলিলেন, ঠাকুরের কথা মত প্রসাদ নিয়াছ? লোকে তাঁহাকে ডাকিয়া নিল, তিনি কখন আসেন ঠিক নাই। তুমি খাইতে চল, আমি ভাত দিব। আমি রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছি, তিনি আসিয়া মাঠাকুরাণীকে অতিশয় মৃদুস্বরে বলিলেন, খুকী উপবাস করিয়াছে, খাইতে দাও। মা ঠাকুরাণী বলিলেন, সে রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে দেখিয়া দিতেছে? মা ঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, কাজের বাড়ীতে কে কাহাকে দেখিয়া দিতে পারে!

তাদৃশ রূঢ়ভাব দেখিয়া, তিনি নিজেই আমার খাওয়া দেখিতে গেলেন। আমার মাকে রান্নাঘরে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। খাইয়া উঠিলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. মা, সকল দিন পর কি খাইলে? আমি বলিলাম, মা খাইতে দিয়াছিলেন, মাছ তরকারী সকলই ছিল, আমি ভাল খাইয়াছি। তাঁহার সমস্ত জানা থাকা সত্বেও খাওয়ার সময় আমাকে দেখিতে যাওয়ায়, তাঁহার অসীম স্নেহ প্রকাশ পাইল। নিজে উপবাসী রহিয়াছেন, আমার খাওয়ার জন্য মাঠাকুরাণীর নিকট তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া তিরস্কৃত হইলেন।

একবার দুর্গা পূজার সময়, রাত্রিতে বারান্দায় বসিয়া নাগ-মহাশয় তামাক খাইতে ছিলেন, আমি তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া ছিলাম। ঘুম পাইল। তিনি বলিলেন, মা, ঘুমাইবে? না খাইয়া ঘুমাইও না। দুইটী খাইয়া ঘুমাও। ঘুম হইতে উঠিয়া খাইলে, সহজ অবস্থা হইতে অধিক খাওয়া যায়, ভালও লাগে, কিন্তু অসুখ হয়। আমাকে ইহা বলিয়া, বাহিরের দিকে তাকাইলেন। মাঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, খুকীকে খাইতে দাও। উহার ঘুম পাইয়াছে। মাঠাকুরাণী চটিয়া বলিলেন, পরে দিব। সন্ধ্যার সময় ঘুমের কি হইল? তিনি বলিলেন, তা কি করিবে? ছেলে মানুষের ঘুম বেশিই থাকে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আমি এখন দিতে পারিব না। তখন তিনি নিজ সন্তানের ন্যায় আমাকে বলিলেন, ঘুম হইতে উঠিয়া আর খাইও না। মুখখানা কাল হইল। আমি বলিলাম, আমি এখন ঘুমাইব না।

স্বামী অনেক সময় ভাবিতেন, যদি নাগমহাশয় আমাকে একটী লোক দেখাইয়া-বলেন, উহাকে মারিয়া ফেল। আমি কি তাহা

করিতে পারিব? প্রথমতঃ প্রাণী হত্যা, দ্বিতীয়তঃ আইন বিরুদ্ধ। এই রকম কাজকি তাঁহার কথা মত করিতে পারি? যদি তাহা না করি, ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে। আজ্ঞা লঙ্ঘন মহা পাপ। একদিন তিনি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি ভগবান্ বলেন, উহাকে হত্যাকব, আমি কি তাহা করিতে পারিব? যদি তাঁহার কথা মত হত্যা না করি, আমার পাপ হইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, কেহ ভগবানেব কথা ফেলিতে পারে না। যদি তিনি কোন কাজ করিতে বলেন, তাহা সম্পন্ন হইবেই। তিনি সেই কার্য্য সমাধার শক্তি নিজেই দিযা থাকেন। স্বামী তাহা শুনিয়া শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

একদিন স্বামী নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি কি করিয়া হয়? নাগমহাশয় বলিলেন, আয়ুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয় না। যখন আমি জন্মিয়াছি, তখনই আমার মৃত্যুর দিন ধার্য্য হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পাপ কাজ করে, সে অযথা সময় নাশ করিল; ভগবান্‌কে স্মরণ করার সময় তাহার কমিয়া গেল। সুতরাং তাহার আয়ুঃকাল কমিয়া গেল। ইহার অর্থই পাপে আয়ু ক্ষয় হয়। আবার এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে তাঁহাকে স্মরণ করে, সে সেই সময়টুকু রক্ষা করিল। সময়ের অপব্যয়ের তুলনায় উহা বাড়িল। এই অর্থেই আয়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধির কথা লোকে বলে। প্রকৃত পক্ষে আয়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, মার্কণ্ডমুনির ১৪ বৎসর আয়ু ছিল, তিনি চারি যুগ বাঁচিয়া গেলেন। ইহা কি করিয়া হইল? নাগমহাশয় বলিলেন, ইহা অবধারিত ছিল, মার্কণ্ড মুনির ১৪ বৎসর বয়সে যম তাঁহাকে নিতে আসিবেন। তখন মার্কণ্ড মুনি শিবের শরণাপন্ন

হইবেন। যম চলিয়া যাইবেন। মুনি তপস্যা করিয়া চারিযুগ বাঁচিবেন। যাহারা বর্ত্তমানদর্শী, তাহারা দেখিবে, মার্কণ্ডমুনির ১৪ বৎসর আয়ুঃকাল ছিল। যমকে ফিরাইয়া তপস্যা করিয়া ৪যুগ অমর হইলেন। যাঁহারা দুরদর্শী, তাঁহারা বুঝিবেন, ১৪বৎসরের সময় যম আসিবেন, তিনি ফিরিয়া যাইবেন। মুনি তপস্যা করিবেন, চার যুগ অমর হইবেন।

একদিন প্রাতঃকালে আমি নাগমহশয়ের কাছে বসিয়া আছি। ৭।৮ জন রাখাল বালক কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া, জোড় হাত করিয়া প্রণাম করিল ও বলিল, ও ঠাকুর নমস্কার! তাহাদের মুখ হাসিমাখা, নয়নকমল হইতে আনন্দ রাশি ছুটিয়া পড়িতেছে। তাহারা যে ভাবে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল, সেই ভাবেই দৌড়াইয়া পালাইল। তাহাদের ভয়, নাগমহাশয় তাহাদিগকে প্রণাম করিলে তাহাদের অতিশয় প্রত্যবায় হইবে। তাহারা নমস্কার করিল এবং ছুটিয়া পলাইল। নাগমহাশয় তাহাদিগের কাজ দেখিয়া, আঁখি কুঞ্চিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন, হাত দুইটী তুলিয়া নিজ শির স্পর্শ করিলেন। তিনি তাহা করিবার অনেক পূর্ব্বেই রাখাল বালকগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে থাকিলেন, তাঁহার সে মধুর হাসি হৃদয় স্পর্শ করিল এবং বিমল আনন্দে ডুবাইয়া দিল। অপর একদিন বৈকাল বেলা স্বামী সেই রাখাল বালকদিগকে নাগমহাশয়ের নিকট আসিয়া, ও ঠাকুর নমস্কার বলিয়া, নিজ নিজ কর কপালে লাগাইয়া দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া ছিলেন। তাহারা বোধ হয় নাগমহাশয়ে বাড়ীর নিকট গরু চড়াইতে আসিলে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিত এবং উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ

জীবন পবিত্র করিত। তাহারা তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের তরে দাঁড়াইত এবং নাগমহাশয়কে প্রণাম করিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া যাইত।

একবার স্বামী পঞ্চসার গিয়াছিলেন। আমার পিতা দেওভোগ গেলেন। নাগমহাশয় পিতা হইতে পূর্ব্বপুরুষদের নাম লিখিয়া লইলেন, তিনি গয়া যাইবেন। পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরভাই গয়া যাইয়া জ্যেঠামহাশয়ের সপিণ্ডকরণ করিবেন। পূর্ব্বপুরুষের নাম চাহিয়া ছিলেন, আমি তাহা দিয়া আসিলাম। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, এখন ঠাকুরদাদা জীবিত নাই, তিনি কত দিনে যে দেশে ফিরিয়া আসিবেন, তাহা ঠিক নাই। আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব। পরদিন পিতা বলিলেন, কাচারিতে তাঁহার এক অতিশয় দরকারী মোকদ্দমা আছে, তিনি কোন মতেই যাইতে পারিবেন না। আমি স্বামীর সহিত দেওভোগ যাইতে চাহিলাম। স্বামী বলিলেন, তিনি কলেজ কামাই করিতে পারিবেন না। আমার মনে বড় কষ্ট হইল। আমি বলিলাম, আজ তুমি নিশ্চয়ই দেওভোগ যাইবে। আমাকে সঙ্গে নিতে চাও না কেন? তিনি বলিলেন, আমাকে লইয়া গেলে, সেই দিনই আমাকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। রাত্রিতে নাগমহাশয়ের নিকট থাকিতে পারিবেন না এবং দুই দিন কলেজ কামাই করিতে পারিবেন না। এই অবস্থায় তিনি আমাকে লইয়া যাইতে রাজি নন। আমি বলিলাম, এত স্বার্থপর হইলে সংসারে চলে না। তুমি রাত্রে তথায় থাকিতে পারিবে না, আর আমি নাগমহাশয়েকে একবারও দেখিতে পাইব না। তৎপর স্বামী আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। আমরা দেওভোগে গেলাম। নাগমহাশয় বড় ঘরের

বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া আমাদের নিকট এগিয়ে আসিলেন। আমি বারান্দায় উঠিয়া, তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া বসিলাম। আমি বসিলে পর তিনি স্নেহের সহিত স্বামীর দিকে তাকাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় আমাকে বলিলেন, উঁহার গায় বড় ঘামাচি হইযাছে। আমি কোন উত্তব না দিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বহিলাম। তিনি আবার বলিলেন, উহাব গায় বড ঘামাচি হইয়াছে। আমি মনে মনে বলিলাম, গরমের সময় ঘামাচি হইবেই। স্বামী অন্যঘরে চলিযা যাইতেছেন, নাগমহাশয় তাঁহাকে ডাকিযা বলিলেন, আপনার গায অতিশয ঘামাচি হইয়াছে। স্বামী হাসিতে লাগি-লেন। নাগমহাশয় বলিলেন, উঁহাতে শ্বেত চন্দন দিবেন। স্বামী নতশিরে তাহা স্বীকার করিলেন। নাগমহাশয তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন। গ্রীষ্মের সময় গায় ঘামাচি হইলে, কে কাহাব জন্য এমন ভাবে দুঃখ প্রকাশ করে? নাগমহাশয় যে শুধু দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তাহা নয়, কিরূপে উহাব প্রতীকার হইবে, তাহও বলিলেন। জগতে কে এমন স্নেহ করিতে পারে? স্ত্রী হইয়া বলিলাম, গরমের সময় ঘামাচি হইয়াই থাকে। আমার মনে একচুল লাগে নাই। এই জন্যই গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন, ভক্তের উপর নাগমহাশয়ের মাতৃবৎ স্নেহ। আমার বিশ্বাস তাঁহার স্নেহ মাতৃস্নেহকে পরাজয় করিয়াছে।

নাগমহাশয় আবার বলিলেন, গবমের সময় ভিজা গামছা দ্বারা শরীর পুছিলে ঘামাচি হয়। স্বামী বলিলেন, আমি গরমে ঘামাইলে, ভিজা গামছা দিয়া গা পুছিয়া ফেলি, তাহাতে ঠাণ্ডা বোধ হয়। নাগমহাশয় বলিলেন, উঁহাতে সাময়িক ঠাণ্ডা হয় সত্য,

কিন্তু গরমশরীরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে ঘামাচি জন্মে। নাগ-মহাশয়ের সেই স্নেহপূর্ণ উপদেশ মনে রাখিয়া, আজও তিনি ভিজা গামছা দ্বারা শরীরের ঘাম পুছেন না। বাজারের বেলা হইল। নাগমহাশয় বাজার করিতে উঠিলেন। নাগমহাশয় কোন স্থানে যাইতে হইলে, বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া যাইতেন। সুতরাং আমরা দেওভোগে থাকিলে, তিনি আমাদিগকেও বলিয়া যাইতেন। তিনি বালকের মত আমাদের সামনে যাইয়া বলিতেন, আমি অমুক স্থান হইতে আসি। আমরা তাঁহার স্নেহ দেখিয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। যতদূর দেখা যাইত নাগ-মহাশয়কে দেখিতাম। তিনি চক্ষের আড়ালে যাইলে, মনে হইত, তিনি কতক্ষণে আসিবেন। তিনি বাজারে গেলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমি না আসিলে, রাত্রিতে স্বামী তাঁহার কাছে সুখে থাকিতে পারিতেন। তিনি গয়া গেলে কত দিনে ফিরিয়া আসেন কে জানে? নাগমহাশয় বাজার করিয়া আসিলেন। আমি কুটনা কুটিয়া দিয়া, তাঁহার কাছে যাইয়া বসিলাম। রান্না হইল। স্বামীকে বড় ঘরে খাইতে দিতে বলিলেন। আমাকে ভাত দিতে দেখিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, ইহাকে নারায়ণ জ্ঞানে খাইতে দিবে। তিনি সামনে দাঁড়াইয়া খাওয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কোন ত্রুটী না হয়। স্বামীর খাওয়ার সমস্ত জিনিষ দেওয়া হইলে, তিনি রান্না ঘরে খাইতে বসিলেন। নাগমহাশয় অতি অল্প ভাত খাইতেন। তিনি খাইতে বসিতেন ও উঠিতেন। সেই দিন নাগমহাশয় খাইয়া বিশ্রাম করিলেন না। আমাদের নিকট বসিয়া রহিলেন। স্বামী ও আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত দেখিতে লাগিলাম। অন্য কোনও লোক ছিল না। ধ্যান করিতে হইলে, আরাধ্য দেবতাকেই

যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ আমরা সেই দিন নাগমহাশয়কে একাকী পাইয়া দেখিয়াছিলাম। এক নাগমহাশয়ই আছেন। অপর কেহ নাই। মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। নৌকার মাঝি তাড়া দিতে লাগিল। নদীর অপর পার যাইতে হইবে। আর দেরি করা উচিত নয়। নাগমহাশয় তাহা শুনিতে পাইয়া সস্নেহে আমাদের দিকে তাকাইলেন। স্বামী মাঝিকে বলিলেন, আর অল্পপরে যাইব। আমরা নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়াছি, সময় যে চলিয়া যাইতেছে, তাহার খেয়াল নাই। মাঝি আবার আসিয়া রওনা হওয়ার কথা বলিল। স্বামী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, যখন যাইতে হইবে, এখন রওনা হইলেই হয়। তাহা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, হুঁসের সহিত সব কাজ করা ভাল। ঠাকুর বলিতেন, মান ও হুঁস, যাহাদের মান হুঁস আছে, তাহারা মানুষ। চলিয়া আসিব ভাবিয়া উভয়ে মনে কষ্ট পাইলাম। নাগমহাশয় গয়া যাইবেন, আবার কতদিনে তাঁহাকে দেখিব, জানা নাই। নাগমহাশয়ের মুখপদ্ম ঈষৎ মলিন হইল। আমরা চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিলাম। নাগমহাশয় আমাদের সঙ্গে উঠিলেন। আমরা নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া বাহির হইলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। নৌকার কাছে আসিয়া আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্নেহে দুইটী চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত নৌকা দেখা গেল, তিনি তাকাইয়া রহিলেন। ভগবন্, তোমার এমন স্নেহ কি করিয়া ভুলিলাম? পশু পক্ষী তোমার স্নেহে পাগল হইল, তোমার অভাব অসহ্য হওয়ায় তাহারা প্রাণ

দিতে চাহিল, আর আমি মানুষ হইয়া, তোমাকে ভুলিয় সুখ অনুভব করিতেছি?

একদিন আমি উঠিয়াছি! ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তখনও নাগমহাশয় উঠেন নাই। পাখীগুলি গাছের উপর বসিয়া, বাড়ীর দিকে তাকাইয়া ডাকিতেছে। তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয়কে দেখিবার জন্য যেন তাঁহাকে ডাকিয়া জাগাইতেছে। আমি মনের আনন্দে পাখি-কুল-কাকলি শুনিতে লাগিলাম। একটী পাখী দেখিয়া স্বামীর কথা মনে পড়িল। এক সময় স্বামী ও আমি সেই পাখীর রব শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু পাখীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম না। একটু অগ্রসর হইয়া পাখাটী কি রকম তাহা দেখিতেছি। অমনি অন্তর্যামী নাগমহাশয় আমার অন্তর জানিয়া, হাসিতে হাসিতে আমার পিছনে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেই সুধামাখা হাসি দেখিয়া আমার জ্ঞান হইল, এখন সত্যযুগ, ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হয়। পাখিগণ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ডাকিতেছে, আর আমি [illegible]বাড়ীতে তাঁহার সাক্ষাতে কি করিতেছি? লজ্জা পাইয়া [illegible] তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলাম এবং তাঁহার শরণাপন্না হইলাম। নাগমহাশয়কে দেখিয়া মনে হইল, যেন পিতা শিশু মেয়েকে শাসন করিলেন। তাঁহার স্নেহপূর্ণ সরল হাসিমাখা মুখপদ্ম এখনও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। আমি যাঁহাকে ভুলিয়া পাখী দেখিতেছিলাম, তিনি হাসিতে হাসিতে আমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। আমি ভগবান্‌কে ভুলিয়া অন্যায় কাজ করিতে-ছিলাম, তিনি একচুল বিরক্ত কিম্বা বিদ্বেষ ভাব দেখাইলেন না। আমি লজ্জিতা হইলেও তিনি আমারদিকে তাকাইয়া জানাইলেন,

তিনি বিরক্ত হন নাই, এখন আমার ভগবান্‌কে স্মরণ করা উচিত।

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না, কেবল তাঁহার অসীম দয়া স্মরণ কবিয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনি পায়খানায় চলিয়া গেলেন। আমি ঘরেব বাবান্দায বসিয়া তাঁহাব আসিবার অপেক্ষা করিলাম। তিনি হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন এবং আমার নিকট বসিলেন। আমার মঙ্গলের জন্য হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, মা, এসময় কেবল ভগবান্‌কে মনে রাখিতে হয়। তাঁহাব কৃপায় একুল ওকুল দুকুল থাকে। জীব তাঁহাকে ভুলিয়া নানামত যন্ত্রণা পায়, পুনঃ পুনঃ আসে আর যায়, ছিদ্দতের অবধি থাকে না। তাঁহাব কৃপা হইলে, জীব আর যন্ত্রণা পায় না। আমি বলিলাম, সকাল বেলা সত্যযুগ, সেই সময়ে ভগবানে মন রাখিয়া, সকল দিন কি করিব? তিনি বলিলেন, তৎপর সংসারের কর্ত্তব্য কাজ কবিতে হয। পথে পথে থাকিলে, আপনিই তাঁহার দয়া আসিয়া পড়ে। আগে ভগবান্ দেখিবে, পরে ভগবান্ যাহাকে দিয়াছেন, তাহাকে দেখ। তাঁহার অমিয় মাখা উপদেশ শুনিয়া, আমার মনে হইল, শুনিয়াছি মানব দেহ ধারণ করিলে, ভগবানের সময় সময় ভুল হয়, কিন্তু মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার ভুল দেখিলাম না। আমি পথে দাঁড়াইয়া, স্বামীর কথা মনে করিয়া পাখী দেখিতেছিলাম, তখনই তিনি আমাকে ফিবাইয়া আনিলেন, পরে তাঁহার অসাক্ষাতে সংসারে কি করিব, তাহা বলিয়া দিলেন। এই কথা মনে হইলে নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

কতক সময় পর নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, খাটি সোনার গরণ চলে না। আমি মনে মনে বলিলাম, আপনার মধ্যে কোন মায়া নাই। এই যে দেখিতে পাই, আপনি সময় দুইটী খান, আমাকে স্নেহ করিয়া খাওয়াইতে চান, এই মায়াটুকু লইয়া আসিয়াছেন, নচেৎ আপনার কাজে আর কোন মায়া দেখিতে পাই না। আপনি নিগুর্ন ব্রহ্ম। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি আবার মনে মনে বলিলাম, ভগবানের সুখ নাই, দুঃখ নাই, তাঁহার আবার খাওয়া কি? না খাইলেই বা কি? ঐ খাওয়াটুকু মায়া। ইহা ভিন্ন আপনার আর কোন মায়ার খেলা দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহার সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে নাগমহাশয়ের পূর্ণ জ্ঞান দেখিতে পাইয়াছি।

বাল্মিকিরামায়ণ পাঠ করিয়া স্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্র যে দুর্গা পূজা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কল্পনা। সত্য ঘটনা হইলে, উহা বাল্মিকি রামায়ণে পাওয়া যায় না কেন? বাল্মিকি রামের জন্মিবার পূর্ব্বে রামের লীলা মানসপটে দেখিয়া ছিলেন। আমি বলিলাম, একদিন নাগমহাশয় তোমাদের গান শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, ওভাবে ডাকিলে মা জাগেন না। যদি এই রমক ডাকিলে মা জাগিতেন, সংসারে অনেকেই মাকে জাগাইতে পারিত। রামচন্দ্র চক্ষুদান করিতে যাইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব মাথা দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া ছিলেন। আত্মদান না করিলে, মুখের কথায় মা জাগেন না। স্বামী বলিলেন, ভগবান্ কোন বিষয় অমান্য করেন না। রামের পূজা দেশাচার। সকলে রামের

দুর্গা পূজার কথা বলে, তাই তিনিও বলিয়াছেন। আমি বলিলাম, এই কথা সত্য না হইলে, তিনি তাহা বলিতে পারিতেন না। রামকৃষ্ণ দেব কালী পূজা করিতে বসিয়া মাকে বলিলেন, মা, দেখা দে। মা দেখাদিতেছেন না, তিনি খড়্গ লইয়া নিজের মাথা কাটিয়া অর্ঘ দিতে যাইতেছেন, এমন সময় মা তাঁহার হাত ধরিলেন। রামচন্দ্রও দুর্গাপূজা করিতে বসিয়া একটী পদ্ম কম হইল দেখিয়া, ধনুতে বান সংযোজন করিয়া, নিজ কমল নয়ন উৎপাটিত করিয়া মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবেন, দেবী তাঁহার হাত ধরিলেন। ইহা শুনিয়া স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

কতক দিন পর আমরা দেওভোগ গেলাম। আমি নাগ-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাল্মিকীরামায়ণে রামের দুর্গাপূজা নাই কেন? নাগমহাশয় বলিলেন, এক এক ভক্ত এক এক কথা লিখিয়াছেন। অঙ্গদ রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার কথা লিখা আছে। আমরা মা কত খানা পুস্তক পড়িয়াছি, আমরা কি জানি? নাগ-মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, স্বামী বাল্মিকী রামায়ণ পড়িয়া যে বলিয়াছিলেন, রামের পূজা দেশাচার, তাই তিনি বুঝাইয়া দিলেন, আমরা কতখানা পুস্তক পড়িয়াছি যে সমস্ত বিষয় জানিব। প্রকাশ্যে তাঁহাকে কিছু বলিলাম না, মনে মনে বলিলাম, স্বামীবাটীর এক ঘরের কোণে বসিয়া, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি শুনিতে পাইয়াছ। তুমি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকল দেখিতেছ। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমরা জীব, পদে পদে আমাদের ভুল। যিনি দয়া করিয়া এই ভাবে ভুল ধরাইয়া দেন, তিনি ভগবান্! স্বামীর সাথে দেখা হইলে, তাঁহাকে এই সকল কথা বলিলাম। তিনি অতিশয় সুখী হইয়া

আমাকে বলিলেন, আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, আমি অনেক ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। তিনি দয়া করিয়া বলিয়া দিলেন, কতখানি পুস্তক পড়িয়াছ যে এত অহঙ্কার হইল। তিনি ভগবান্ আর আমি জীব।

একদিন আমি নাগমহাশয়ের সহিত তর্ক করিয়াছিলাম, তাহা মনে উঠিলে অতিশয় কষ্ট হয়। কোন একটী অসৎ লোককে মারিয়া দেশের লোক তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে মার খাইয়া আমাদের দেশে আসে। আমাকে দেখিয়াই নাগমহাশয় বলিলেন, সে অমুক দেশে গিয়াছিল, সকলে এক জুট হইয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। আমার মতিভ্রম হইল। আমি বলিলাম, সে বলিয়াছে, সে সেই দেশ হইতে ভাল ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে গিয়াছিল শুনিয়া, তিনি আমার দিকে তাকাইয়া চুপ করিলেন। তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি দেখিয়া আমার ভ্রম দূর হইল। আমি নতশিরে স্বীয় দোষ স্বীকার করিলাম। তাঁহার কথার উপর আমার কথা বলা অন্যায় হইয়াছিল। দয়াময় আমাকে জানাইলেন, তাহাতে আমার কোন দোষ নাই। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি জীব, জীবের কাজ করিলাম, তাঁহার ভুল ধরিলাম। তিনি শিব, শিবের কাজ করিলেন, আমার মূর্খতা বুঝিয়া দোষ ধরিলেন না। দয়াময়ের এত কৃপা পাইয়াও তাঁহার ভ্রম দেখাইতে গিয়াছিলাম। কিম্বা আমার কোন দোষ নাই, ইহা জীবের প্রকৃতি। এমন জীবের জন্য তাঁহার নরদেহ ধারন!

আমাদের জন্য নাগমহাশয় কত কষ্ট করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে মরমে মরমে বুঝিতে পারি, আমি মহা ঘৃণিত জীব। তিনি

মহান্ বলিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিয়াছিলেন। আমি একদিনের তরেও তাঁহার সুখের দিকে তাকাই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই, তিনি একটু সুখে থাকুন। একদিন তিনি বাজার করিয়া আসিয়াছেন। আমি মাছ তরকারি কাটিতে বসিলাম। নাগমহাশয় বারান্দায় শুইলেন। আমি তরকারি কাটিতে কাটিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, দেখিও হাত যেন কাটা যায় না। আমি বলিলাম, হাত কাটিব না। অমনি দয়াল প্রভু উঠিয়া আসিয়া আমার নিকটে বসিলেন। যতক্ষণ আমি কাজ করিলাম, তিনি রান্না ঘরের সামনে মাটিতে বসিয়া রহিলেন। আমার কাজ শেষ হইলে বড় ঘরের বারান্দায় বিছানায় বসিলেন। আমিও তাঁহার কাছে যাইয়া বসিলাম। তিনি হাসিমুখে কত অমিয়মাখা কথা বলিতে লাগিলেন। এখন মনে হয়, যখন তিনি শুইয়াছিলেন, তাঁহার নিশ্চয় শূলের ব্যথা হইয়াছিল, কারণ বাজারে যাওয়ার অল্প আগে অনেক-বার বলিয়াছিলেন, বলিবার বেলা ধর্ম্মকথা, ভুগিবার বেলা শূলের ব্যথা। মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন সত্য, একেবারেই দেহের ভোগ ছিল না। শূলের ব্যথা লইয়াও হাসিমুখে আমার সামনে মাটিতে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সুখী, তিনি আমার কাছে বসিয়া আমাকে সুখী করিলেন। শূলের ব্যথা-জনিত নিজের দুঃখ দেখিলেন না।

এক সপ্তমী পূজার রাত্রিতে স্বামী ও আমি দেওভোগ গিয়াছিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া, নাগমহাশয় সুখী হইয়া, আমাদের নিকট দাঁড়াইলেন। স্বামী তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। আমি নমস্কার করিয়া উঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমাকে

এইভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, স্বামী দক্ষিণের ঘরে গেলেন। যেখানে অন্য স্ত্রীলোক ছিল, সেইস্থানে বসিবার সুবিধা ছিল না। পূজার বাড়ী। অনেক লোক হইয়াছে। কতটুক সময় আমার কাছে দাঁড়াইয়া, নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, আমি দক্ষিণের ঘরে যাইয়া শুই। আমি বলিলাম, আচ্ছা, আপনি শুইয়াছিলেন, আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়াছেন। অনেক রাত্র হইয়াছে। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আমি বড় ঘরে যাইয়া বসিয়াছি, মাঠাকুরাণী আমাকে দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহাকে কত কষ্টই দিতেছে। মানুষের জ্বালায় সময় মত খাইতে পারেন না, সময় মত শুইতে পারেন না, ইহা শুনিয়া, আমার মনে বড় কষ্ট হইল। মনে হইল, আমি তাঁহার পর, তাই আমাদের জন্য তাঁহার এত কষ্ট। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। তখন নাগমহাশয় স্বামীর সাথে কথা বলিতেছেন। আমি মনের আবেগে নাগমহাশয়ের কাছে চলিয়া গেলাম।

আমাকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, এত রাত্রিতে এখানে কেন, মা? অন্তর্যামী নাগমহাশয় স্নেহের সহিত এমন ভাবে তাকাইলেন, মনের কথা মুখে না বলিয়া পারিলাম না। তাহা শুনিয়া, তিনি বালকের মত বলিয়া উঠিলেন, মা, ধর্ম্ম সাক্ষী, যদি আমি তোমাদিগকে পর ভাবি। তোমাদের ভালর জন্যই আমি। তাঁহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিতে দেখিয়া, আমি মনে বড় কষ্ট পাইলাম। আমি বলিলাম, আপনি কেন ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন? আপনা হইতে কি ধর্ম্ম অধিক আপনার মুখের কথা বেদবাক্য। তখন

অন্তর্যামী নাগমহাশয় বলিলেন, তোমাকে আপন ভাবিয়া আসিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিলাম, অনেক রাত্রি হইয়াছে, তাই তিনি আমাকে বিছানা ছাড়িয়া দিয়া এখানে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। হা কর্ম্ম, যিনি এত স্নেহ করিয়াছেন, তাঁহাকে পর ভাবিলাম! আর তিনি করিলেন কি? মহা আপন বলিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন। অথচ তিনি আমাকে শপথ করিতে বারণ করিয়াছেন। এখন সেই কর্ম্ম ভুগিতেছি। মা ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, তিনি সাক্ষাতে আমার প্রসংশা করেন, অসাক্ষাতে নিন্দা করেন। যদি তাঁহার এই কথার বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আমি জানি না, তিনি আর কি শপথ করিতেন। নাগমহাশয়কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া ভালই করিযাছি, উহা কেবল তাঁহার দয়া।

নাগমহাশয়েব অসীম দয়া হেতুই আমাব ভুল হইয়াছে, নচেৎ এক এক দিন আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। তখন আমি সময়ের অপেক্ষায় রহিয়াছি, কতক্ষণে তাঁহাকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কি অসাক্ষাতে আমার নিন্দা করেন? কিন্তু দয়াময়ের এমনই দয়া, তাঁহার অমিয়মাখা মুখপদ্ম, স্নেহ উদ্বেলিত হাসি ও হৃদয়ের তাপহারক দৃষ্টি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়াছে। শান্তিময়কে দেখিয়া অশান্তি পালাইয়া গিয়াছে। নাগমহাশয়কে বাজার হইতে আসিতে দেখিয়া, আমি এগিয়ে গিয়াছি। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিতেন, সেই স্নেহমূর্ত্তি এখনও আমার চক্ষে ভাসিতেছে। এখন মনে করি, যদি সেই রাত্রের ঘটনা দিবসে হইত এবং সেই সময় তিনি বাজারে থাকিতেন, তাহা হইলে ঘর-

হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। তাঁহাকে না দেখিলেই মনে হইত, তিনি কোথায় গিয়াছেন? কখন আসিবেন? ইহা ভাবিতে ভাবিতে পথে দাঁড়াইতাম, শান্তিময়ের রূপ হৃদয় জুড়িয়া বসিত। শান্তিময়কে দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা একবারেই দূর হইয়া যাইত। তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না, তিনিও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেন না। আমার যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। আমি নিকৃষ্ট জীব; তিনি এত স্নেহ করিতেন, তাঁহাকে পর বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হৃদয়ে একটু বাজিল না। ধিক্ এই হৃদয়ে!

কেহ নাগমহাশয়ের পর ছিল না। একবার বর্ষার সময় নাগ-মহাশয় ও মা ঠাকুরাণী বাড়ীতে আছেন। কোন অতিথি নাই। বাড়ীতে জল উঠিয়াছে। তাঁহার ঘরের পিছনে বাঁশের ঝোপ ছিল। বাঁশের ডগা চালা ভেদ করিয়া তাঁহার ঘরের ভিতরে গিয়াছে। জলে মাঠ পথ সমস্ত ডুবাইয়া ফেলায় সাপ বাঁশগাছ অবলম্বন করিয়া-ছিল, তাহারাও ঘরে যাইত। এক রাত্রিতে তাঁহারা শুইয়া আছেন; এক সাপ মশারির উপর পড়িয়া ঘুড়িতেছে। তাহা দেখিয়া মাঠাকুরাণীর প্রাণ আতঙ্কে উড়য়া গেল। নাগমহাশয় বলিলেন, কোন ভয় নাই। জগতে কাহার অনিষ্ট না করিলে, অনিষ্ট হয় না। মাঠাকুরাণী ভয়ে বিহ্বলা হইয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! উপরে সাপ খেলিবে, আমরা নীচে শুইয়া থাকিব! তাহা হইতে পারে না। আমি এই মশারির মধ্যে শুইতে পারিব না, আপনাকেও শুইতে দিব না। কতদিন বলিয়াছি, বাঁশগুলি কাটাইয়া ফেলুন। তাহা কাটা হইলে, সাপের এত ভয় থাকিত না। নাগমহাশয় বলিলেন, ভগবানের নিকট তুমিও যেমন,

বাঁশও তেমন। কাহার সুখের জন্য কাহাকে কষ্ট দিব? কোন ভয় নাই, তুমি শুইয়া থাক। মাঠাকুরাণী বলিলেন, মশারি ছোট, আমরা দুইজন শুইয়াছি। পাশ ফিরিব, অমনি সাপ রাগিয়া কামড়াইয়া দিবে। তাঁহার ভয় দেখিয়া, নাগমহাশয় তাঁহার জন্য ভিন্ন বিছানা করিয়া দিলেন; মশারি বিছানার নীচে গুজিয়া রাখিলেন। তিনি বলিলেন, ঘরে সাপ ত আছেই, ইহাকে দেখিয়াছ, তাই এত ভয়। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। আজ সাপ আমার মশারি ছাড়িবে না। তুমি ত অন্য বিছানায় শুইলে। আমি যেভাবে মশারি গুজিয়া দিয়াছি, সেইভাবেই রাখিও। মাঠাকুরাণী অন্য বিছানায় যাওয়া মাত্র সাপ মশারির উপর বেগে ঘুরিতে লাগিল। তিনি মা-ঠাকুরাণীকে বলিলেন, তুমি ভয় করিও না। সময়ে ও আপনিই চলিয়া যাইবে। সাপকে আপন ভাবিয়া, মশারির উপর সাপ রাখিয়া, নাগমহাশয় নির্ব্বিঘ্নে শুইয়া রহিলেন। সাপও তাঁহাকে মহা আপন ভাবিয়া, তাঁহার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিল। মানুষের ভয়ে সাপ পলাইয়া যায়, কিন্তু এই সাপটী কোথায়ও গেল না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মশারির উপর রহিল।

মাঠাকুরাণী আমার নিকট এই ঘটনা বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া, আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া, আমি নাগমহাশয়ের নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, কি করিয়া সাপ লইয়া শুইয়াছিলে? তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কাহার অনিষ্ট না করিলে, কেহ অনিষ্ট করে না। আমি মনে মনে বলিলাম, ইহা ভগবানে সম্ভবে। জীবের কি সাধ্য সে কাহারও অনিষ্ট করিবে না। তিনি আমার

দিকে তাকাইয়া বলিলেন, সেইজন্যই সর্ব্বদা হুঁষ করিয়া চলিবে। তাঁহার স্নেহমাখা কথা শুনিয়া, আমার মনে হইল, ও সাপ তাঁহার সাথে রাত্রি যাপন করিবে, তাহাকে দেখিয়া সুখী হইয়া, তাঁহার মশারির উপর থাকিবে, তাই তিনি সাপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মাঠাকুরাণীর কষ্ট বা ভয় দেখিয়া, নাগমহাশয় তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহার কোন যন্ত্রণা না হয়। মাঠাকুরাণী যে বলেন, সংসারে সকলের ব্যবস্থা আছে, নাগমহাশয়ের কাছে তাঁহার কিছুই নাই, ইহা শুধু মতিভ্রম। আমার কর্ম্ম এমনই মন্দ, যদি মাঠাকুরাণী তাঁহার বিষয়ে কোন কথা বলিতেন, তাহা তাঁহার নিন্দা বই আর কিছু ছিল না। যিনি বিষধর পর্য্যন্ত ভালবাসেন, তিনি মাঠাকুরাণীর সাথে কেন ভাল ব্যবহার করিবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। মাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া সেইদিন আমারও মতিভ্রম হইয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, বিছানায় সাপ রাখিয়া শোয়ার কি দরকার ছিল? তাঁহার আদেশ অনুসারে সাপ স্বস্থানে চলিয়া যায়। তিনি মাঠাকুরাণীর সাথে এইরূপ করেন কেন? মনে কি একভাব হইল, অমনি আমি নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া, কেবল তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম এবং মনের কথা বলিলাম। দয়াময় দয়া করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন। মা-ঠাকুরাণী সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন। সমান্য বাতাসে কয়েকটী পাকা আম পড়িল। আমি আমগুলি কুড়াইয়া আনিলাম। নাগ মহাশয় বাড়ীতে আসিয়াছেন। আবার দুইটী আম পড়িল।

আমি কুড়াইতে চলিলাম। আম দুইটী নিয়া বাড়ীতে আসিয়াছি। একটী বৌ কতকদূর আসিয়া ফিরিয়া গেল। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, ভগবান্ সকলকেই সুমিষ্ট আম খাইতে দিয়াছেন। তুমি সব আম কুড়াইয়া আনিয়াছ। অন্যদিন উহারা আম কুড়াইয়া নেয়, আজ তাহা নিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল। তাঁহার সে স্নেহমাখা কথা শুনিয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া, তাঁহার রূপ দেখিয়া আমার মনে হইল, ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ইঁনি সকলের সমান। ইঁহার জিনিষের উপর সকলের সমান অধিকার। তাই তিনি দয়া করিয়া, আমাকে পরিচয় দিয়া বলিয়া দিলেন, মা, ভগবান্ সকলকেই মিষ্ট ফল খাইতে দিতেছেন। তাহার এমন মহিমা, তাঁহার সাক্ষাতে জীবের সামান্য হিংসা বা দ্বেষ থাকিতে পারিত না। আমার মনে হইয়াছিল, নাগমহাশয় কিছু বলেন না। মাঠাকুরাণী সন্ধ্যা করিতে বসেন, উহারা আমগুলি নিয়া যায়। নাগমহাশয় এক কথায় হৃদয়ের দ্বেষ ভাব দূর করিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণী সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়া বলিলেন, আজ মেয়ে আম আনিয়াছে, তিনি বিশেষ কিছু বলিলেন না। পাকা আম ত পারিবেনই না। যদি আম পাকিয়া পড়িয়া যায় এবং আমি আনিতে যাই, তিনি বলেন, এই বাড়ীর জিনিষ তুমি যে ভাবে খাইবে, অন্যেও সেই ভাবে খাইবে। মনে এই রূপ অহঙ্কার করিও না, তোমাকে একটী ফুল দিয়া শুদ্ধ করিয়া নিয়াছি বলিয়া তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, অন্য কেহ নয়। এবাড়ী তোমার যেমন, অন্যেরও তেমন। মা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বলিলাম, তিনি আমাকেও শাসন করিয়াছেন। মা ঠাকুরাণীর কাল মুখ দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

জীবের কি সুখের সময় গিয়াছে? গাছ কষ্ট পাইবে বলিয়া, নাগমহাশয় কাহাকে আম পারিতে দিতেন না। আম ঝড়িয়া পড়িত, যাহার ইচ্ছা কুড়াইয়া নিত। পায়ের নীচে প্রাণী মারা যাইবে বলিয়া নাগমহাশয় অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া পথ চলিতেন।

জীবের প্রতি নাগমহাশয়ের অতিশয় স্নেহ ছিল। একদিন নাগমহাশয় ও আমি পথে দাঁড়াইয়া আছি। নাগমহাশয় সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অসাক্ষাতে তাঁহাকে কেমন দেখি। আমি তাঁহার স্নেহে আত্মহারা হইয়া, নাগমহাশয়কে ধরিতে তাঁহার সামনে যাইতেছি, হঠাৎ তিনি মলিনমুখে বলিলেন, ওকি করিতেছ? ওকি করিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অমল মুখপদ্ম মলিন দেখিয়া, আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে ওভাবে তাকাইতে দেখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা পিপিলিকা দেখাইয়া বলিলেন, পায়ের নীচে পিপিলিকা পড়িয়াছে। আমি একটু সরিয়া গেলাম। নাগমহাশয় স্নেহের সহিত তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, ঐ দেখ, উহারা ভয়ে পথ ফেলিয়া চারিদিকে চলিয়া যাইতেছে। তৎপর তিনি পিপিলিকার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আর ভয় নাই। তাহাদিগকে অভয় দিয়া, আমার সামনে আসিলেন।

একবার আমি দুর্গা পূজার সময় যজ্ঞের বেল পাতা বাছিতে যাইয়া, এক পোকার বাসা ভাঙ্গিয়া, পোকা ফেলিয়া দিয়া, যজ্ঞের জন্য সেই পাতা রাখিব মনে করিয়া নাগমহাশয়কে দেখাইলাম। একটু দাগ আছে, এই পাতা যজ্ঞে লাগিবে কি না, তাহা তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি মলিন মুখে বলিলেন, তুমি যাও, আমি আসিতেছি। তিনি ত সকল কথাই জানেন। কিরকম বেলপাতা বাছিতে হয়, তাহা দেখাইতে যাইয়া বলিলেন, পোকার বাসা ভাঙ্গিও না। পোকে কাটাপাতা যজ্ঞে লাগে না। পোকা-গুলি যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই থাকুক। আমাকে কয়েকটী ভাল পাতা দিয়া, একটী পোকে কাটা পাতার দিকে তাকাইয়া স্নেহের সহিত তাহা সরাইয়া রাখিলেন এবং আমাকে বলিলেন, উহা ঐদিকে থাকুক। কতটুক সময় পোকার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি পোকা-দিগকে শান্তনা করিতেছেন। পোকার উপর নাগমহাশয়ের দয়া দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিলাম, পোকের বাসা ভাঙ্গায় তাঁহার এমন হাসিমাখা মুখ মলিন হইয়াছিল। তখন আমি মনে মনে নাগমহাশয়কে বলিলাম, বাবা, আমি না জানিয়া তোমার জীবকে কষ্ট দিয়াছি। আমার দোষ ক্ষমা কর। জীব কি জীবের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিতে পারে? নাগমহাশয় আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন, আমার মনে হইল, তিনি আমার দোষ গ্রহণ করেন নাই।

একদিন নারায়ণগঞ্জ হইতে এক সাহেব শিকার করিতে দেওভোগ যায়। প্রাণঘাতী সাহেবকে দেখিয়া ওয়াক (একরকম পাখী) চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া নাগমহাশয় তাহাদের প্রতি স্নেহে বশীভূত হইয়া ঘরের বাহির হইলেন। বাড়ীর বাহিরে যাইয়া সেই সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের বাড়ীতে ওয়াক মারিবেন না। সাহেব পাশের [illegible]তে যাইয়া এক ওয়াক গুলিবিদ্ধ করিল। ওয়াকের কান্না

শুনিয়া, নাগমহাশয় সেই বাড়ী যাইয়া স্নেহের সহিত ওয়াকের নিকট দাঁড়াইলেন। ওয়াক নাগমহাশয়ের পানে চাহিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। তিনি ওয়াকের কষ্ট দেখিয়া, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া ঘাতককে বলিলেন, আমি আপনাকে ওয়াক মারিতে বারণ করিলাম, তথাপি আপনি তাহা শুনিলেন না, ওয়াক মারিলেন। সাহেব বলিল, আমি আপনার বাড়ীতে গুলি করি নাই। নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি জানেন, এ রাজ্য আমার। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, ঘাতক তাঁহার সম্মুখে বন্দুক রাখিয়া বলিল, আমি আর এই কাজ করিব না। নাগমহাশয় ওয়াকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ওয়াকের প্রাণ বাহির হইল। নাগ-মহাশয়ের স্নেহ দেখিয়া ঘাতকের জ্ঞান হইল। ধন্য নাগমহাশয়! ধন্য তাহার স্নেহ!! যাহা ব্যাধের হৃদয়েও জ্ঞান জন্মায়।

একদিন আমার পিতা দেওভোগ গিয়াছেন। মাঠাকুরাণী তাহাকে বলিলেনে, আজ আপনাদের সাধু কি এক কাজ করিলেন, শুনিয়াছেন কি? এই গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন লোককে তাহার বাড়ীতে বসিয়া, তাহার জুতা দ্বারা মারিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, পিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরভাইয়ের এমত ক্রোধ জন্মিল কেন? কখনও তাহার এমন রাগ দেখি নাই। মাঠাকুরাণী বলিলেন, সেই লোকটী পরমহংসদেবের নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া তিনি ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে অনেক মানা করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সে উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার পায়ের জুতা লইয়া তাহাকে মারিলেন ... না করিলেও চলিত। যখন তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল. [illegible]

আসিলেই হইত। এখন তাহারা দল বাধিয়াছে, তাঁহাকে মারিবে। তাহারা বলিতেছে, যাহার বাড়ী, যাহার জুতা, তাহাকে মারিয়া চলিয়া গেল, এ কেমন সাধু? তাহার এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে? উহাকে যেঁস্থানে পাইব, সেই স্থানেই মারিব। ঠাকুর (শ্বশুর) ভয় পাইয়াছেন। তিনি বলেন, ও তোমাকে মারিয়াছে, তুমি নালিশ কর, দোষী সাব্যস্ত হইলে, আপনিই শাস্তি পাইবে। তোমরা দল বাধিয়া একজনকে মারিবে, ইহা কি রকম কাজ? পুত্রকে বলিলেন, তুমি কলিকাতা চলিয়া যাও। পুত্র বলিলেন, আপনি কোন ভয় করিবেন না। কেহ আমাকে মারিতে পারিবে না।

ঠাকুরদাদা সশঙ্কিত হইয়া রহিলেন। নাগমহাশয় একাকী বাজারে যাইতে লাগিলেন। নাগমহাশয়ের এমনই মহিমা, তাঁহাকে মারা দূরে থাকুক, কেহ একটী কথাও তাঁহাকে বলিল না। যে মার খাইয়াছিল, সে নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া, নাগমহাশয়ের নিকট আসিলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন।

একদিন আমি স্বামীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলাম, দেওভোগ ত বেশ যাইতে পার, এখানে আসিলে পড়ার ক্ষতি হয়। স্বামী বলিলেন, যত নাগমহাশয়কে দেখিব, ততই লাভ। অতঃপর দেওভোগ যাইয়া নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, পার্ব্বতী এখানে আসিয়াছিল। প্রথমতঃ আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কবে আসিয়াছিলেন? তিনি এমন ভাবে হাসিতে হাসিতে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, অল্প দিন হইল, ইহাতে আমার তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে বাকি রহিল না।

লজ্জায় মাথা হেঁট করিলাম। তিনি আমার কথা লইয়া, আদর করিয়া আমাকে জব্দ করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, আপনি সাক্ষীস্বরূপ সব দেখিতেছেন, সকল শুনিতেছেন। জীব আপনাকে ভুলিয়া, মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে, সে আপনাকে না দেখিলে, কাহাকে দেখিবে? তিনি আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

একবার জগদ্ধাত্রীপূজার সময় নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাহার সহিত কথা বলিতেছি। এমন সময় দেখিলাম, তিনটী ৫।৬ বৎসরের শিশু প্রতিমা দেখিতে আসিতেছে। নাগ-মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া, তাহারা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিল। নাগমহাশয় অগ্রসর হইয়া যাহার মা মারা গিয়াছে, তাহাকে কোলে নিলেন। অন্য দুইটির সঙ্গে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাদের মনে কোন কষ্ট হইল না। যাহারা হাঁটিয়া গেল, তাহাদিগকেও কোলের ছেলেটির মত সুখী দেখা গেল—তিনটী সমান আনন্দ অনুভব করিল। নাগমহাশয়ের স্নেহ-দৃষ্টিতে এবং তাঁহার অমিয়মাখা হাসিতে ভুলিয়া যাহারা হাঁটিতেছিল, তাহারা কোলের ছেলের মত সুখ অনুভব করিল।

আমার পিতার বাড়ীতে অনেক কাল যাবত দুর্গা পূজা হয়। ১০৮ বেলপাতা লইয়া যজ্ঞ আরম্ভ হয়। প্রতিবৎসর ৫ পাতা বাড়াইয়া ১০০০ বেলপাতা হইলে, এক বার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হয়। যখন আমার ঠাকুরদাদা ছেলে মানুষ ছিলেন, সেই সময় একবার যজ্ঞ পুরণ হইয়াছিল। আমার ঠাকুর দাদা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার তিন পুরুষ পূর্ব্বে আর একবার যজ্ঞ পুরণ হইয়াছিল। একদিন নাগমহাশয় স্বামীকে বলিলেন, রাজকুমারদের বাড়ীর পূজা অনেক

কাল যাবত হইতেছে। তাঁহারা দুই জন বেলপাতার হিসাব ধরিয়া মীমাংসায় আসিলেন, মহাপ্রভু জন্মিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে এই পূজা হইতেছে। ইহার বাহিরে যাইতে পারিলেন না, কারণ বেলপাতার হিসাব আর পাওয়া গেল না। তিনি এই প্রতিমাকে চৌদ্দ পুরুষের মা বলিতেন। নাগমহাশয় একবার ঠাকুরদাদাকে চৌদ্দপুরুষের মাকে দেখিতে পাঠাইলেন। ঠাকুর দাদা মহাসুখে পঞ্চসার আসিলেন।

একদিন নাগমহাশয় রাবণের কথা বলিতে বলিতে অনেক হাসিলেন। তিনি বলিলেন, রাবণ দেবকন্যা, নাগকন্যাও নিল, অবশেষে স্বয়ং লক্ষ্মীকেও বাড়ীতে রাখিল। একদিন তাহার এক মন্ত্রি রাবণকে বুঝাইল, আপনি সীতাকে বশে আনিতে এত চেষ্টা করিতেছেন কেন? রামরূপ ধরিয়া তাহার কাছে গেলেইত হয়। অমনি রাবণ বলিল, যখন আমি রামরূপ চিন্তাকরি, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, পর বধূ সঙ্গে আর কত সুখ হইবে।

নাগমহাশয় মনের কথা জানিতে পারিতেন। তিনি সাক্ষাতে কিম্বা দূরের জিনিষ দেখিতে পাইতেন। যিনি মনে বসিয়া মন দেখিতে পারেন, তিনি দূরের সমস্ত জিনিষের কথা বলিবেন, ইহা আর অশ্চর্য্যের বিষয় কি! তিনি যে মনের কথা জানিতেন, তাহার সাক্ষ্য গিরিশবাবু দিয়াছেন। একদিন গিরিশবাবু নাগ-মহাশয়কে তাঁহার বাড়ীতে খাইতে বলিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ও নাগমহাশয় এক ঘরে খাইতে বসিলেন। তাঁহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন পর গিরিশবাবু তাঁহার পাতে কই মাছের বড় ডিম পাইলেন। তাহা দেখিয়া গিরিশবাবুর মনে হইল, এই

ডিম কোন মতে নাগমহাশয়কে খাওয়াইতে পারিলে কেমন সুখ হইত। এই কথা মনে হওয়া মাত্র, নাগমহাশয় বলিলেন, দিন্, প্রসাদ দিন্। গিরিশবাবু অমনি জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া নাগমহাশয়ের হাতে ডিম তুলিয়া দিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, বড় কৌশল করিয়াছেন, বড় কৌশল করিয়াছেন। তিনি ডিম খাইলেন। গিরিশবাবু অত্যন্ত সুখী হইলেন। গিরিশবাবু এই ঘটনা শরৎ-বাবুর নিকট বলিয়া কত হাসিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন নাগমহাশয় প্রসাদ দিন্ বলিয়া হাত পাতিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি করিয়া তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ডিম দি। পরে জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার হাতে ডিম দিলাম। পরমহংসদেব তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট দিয়াছেন, আর আমি দিলাম।

একদিন আমাদের কয়েকজন আত্মীয় নাগমহাশয়কে দেখিতে যান। নাগমহাশয়ের সহিত কোন কথা লইয়া তাহাদের তর্ক চলিতে লাগিল। তাহাদের ভিতর একজন বলিলেন, সংসারে সকলই সমান। নাগমহাশয় তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। যখন তিনি দেখিলেন সেই লোকটী কোন মতেই বুঝিবে না, একটী ছোট ছেলেকে দেখাইয়া বলিলেন, আপনি বলেন, সব সমান; আচ্ছা, এই ছেলেটীর গায়ের জামা আপনি গায় দিন, পরে আপনার কথা সত্য বলিয়া মানিব। সেই লোকটী চুপ করিয়া রহিলেন, এই কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সমস্ত তর্ক চুকিয়া গেল। নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন, হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কৈ কৈ।

একদিন নাগমহাশয় স্বামীকে বলিলেন, মুখের কথায় সংসার ছাড়া হয় না। ভগবান্‌কে না জানিতে পারিলে, কি করিয়া

জীব তাঁহার সংসার ছাড়িবে? যেমন জোঁক কোন অবলম্বন পাইলে, এক মুখ পূর্ব্ব অবলম্বন হইতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে রাখে এবং পূর্ব্ব অবলম্বন ছাড়িয়া দেয়, জীবও সেইরূপ ভগবান্‌কে পাইলে, তবে সংসার ছাড়িয়া তাঁহাতে মজিয়া থাকিতে পারে। জীবের কি দোষ? সে কি করিয়া মহামায়ার অনুগ্রহ বিনা, ভগবানের দয়া বিনা, মায়ার হাত এড়াইয়া ভগবানের চরণে পৌঁছিবে? সকল বিষয়েই তাঁহার দয়া সাপেক্ষ। তাঁহার দয়া ব্যতীরেকে জীব কোন মতে তাঁহাকে ধরিতে পারে না।

নাগমহাশয় কলিকাতা হইতে দেশে যাইয়া অবস্থান করার সময় যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে সত্যগোপাল আচার্য্য এক জন। ইঁনি সকলের আগে নাগ-মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া, তাঁহারা পদপ্রান্তে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার সুধামাখা ভগবৎগুণগান শুনিয়াছিলেন। তিনি সুমিষ্ট গান করিতে পারিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া লোক তাহার বশীভূত হইত। হরপ্রসন্নবাবু ও শরৎবাবু তাহার গান শুনিয়া তাহার সহিত থাকিতেন এবং কালক্রমে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার চরণে আশ্রয় লন। সত্য গোপাল নাগমহাশয়কে বেদাক্রাশ বলিতেন। তিনি জানিতেন, নাগমহাশয় বেদের ন্যায় সত্য এবং আকাশের ন্যায় মহান্। তিনি উচ্চৈঃস্বরে জয় গুরু বেদাকাশ বলিতেন এবং নাগমহাশয়ের গুণগান করিতেন। তিনি ও তারাকান্তবাবু এক সময়ে নাগমহাশয়ের নিকট যান। তারাকান্ত শাপগ্রস্ত হইয়া দেওভোগ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা জানি না, সত্যগোপাল কেন নাগমহাশয়ের সংসর্গ ছাড়িয়া ধর্ম্মগঞ্জে

এক আশ্রম করিলেন। ইহার ভিতর অবশ্যই কোন কারণ আছে, হয়ত সময়ে তাহা প্রকাশ হইবে।

নাগমহাশয়ের নিকট যাওয়ার অনেক পূর্ব্বে সত্যগোপাল তাঁহার কাছে আসিতেন। সত্যগোপাল ধর্ম্মগঞ্জ যাইয়া আশ্রম করার অনেক পরে আমরা নাগমহাশয়ের চরণপ্রান্তে বসিতে পারিয়া ছিলাম। আমরা নাগমহাশয়ের আশ্রয় পাইয়াছি পর, একদিন সত্যগোপাল নিজ ভক্তগণসমভিব্যাহারে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। নাগমহাশয়ের বাড়ী পরিষ্কার করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে বৃক্ষ-লতাদি যাহার যে ভাবে ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইত। কেহ তাহাদের পাতা পর্য্যন্ত ছিঁড়িতে পারিত না। পাতা শুষ্ক হইয়া ঝড়িয়া পড়িত। ফল পাকিয়া নীচে পড়িত। তাহাদের কি সুখের দিন ছিল। ঘাস এখানে সেখান হইত, কেহ তাহা নাশ করিতে পারিত না। পুরাণে বর্ণিত তাপসদের আশ্রমের মত নাগমহাশয় বাড়ীর শোভা ছিল। হিংসা তাহার বাড়ীর চতুঃসীমানায় আসিতে পারিত না। সত্য গোপালের ইচ্ছা হইয়াছিল, নাগমহাশয়ের বাড়ীতে অনেক ঘাস হইয়াছে, বাড়ীর চারিদিকে জঙ্গল হইয়াছে, একটু পরিষ্কার করিয়া দিবেন। তিনি স্বীয় ভক্তগণকে তাহা করিতে আদেশ দিলেন। ভক্তগণ ঘাস তুলিতে যাইবে, নাগমহাশয় অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদিগকে বিরত করিতে চাহিলেন। তাহারা তাঁহার কথা খেয়াল না করিয়া অগ্রসর হইতেছে, নাগমহাশয়ের চাঞ্চল্য আসিল, দয়ারসাগরে বান ডাকিল। তিনি বলিলেন, যখন আমার অহঙ্কার আছে, আমার বাড়ী বলিয়া অভিমান আছে, আমি আমার বাড়ীতে এইরূপ কাজ করিতে দিব না। যেদিন

আমি গাছের নীচে থাকিব, সমগ্র পৃথিবী আমার আবাস ভূমি হইবে, তখন এখানে যাহা তাহা হইতে পারিবে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। আজ আমি সংসারী, এই বাড়ী আমার, আমার ইচ্ছা ব্যতীত এই বাড়ীতে কোন কাজ হইতে পারিবে না নাগমহাশয়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া সত্যগোপাল নিজ ভক্তদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বৃক্ষলতাদি মনের আনন্দে বাহু তুলিয়া, নাগমহাশয়ের জয়ধ্বনি করিল, ঘাস তাঁহার চরণকমলে লাগিয়া নিজজীবনের সাফল্য লাভ করিতে লাগিল।

নাগমহাশয়কে সন্দেশ খাওয়াইতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল আমি স্বামীকে এই কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আনিলে যদি নাগমহাশয় খাইতেন, আমি সন্দেশ আনিয়া দিতে পারিতাম। আমার ভক্তিবিশ্বাস কিছুই নাই। আমার মনে হয়, তিনি আমার প্রদত্ত সন্দেশ খাইবেন না। আমি বলিলাম, কেন, তোমা হইতে কাহার ভক্তি বিশ্বাস বেশী? তিনি কাহাকে মন্ত্র দিয়া ও কাহার নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছেন? তিনি কাহাকে বলিয়াছেন তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মানি, যদি তিনি ভগবান্ নাই হন, তবে না হয় এক জীবন বৃথা গেল। যদি তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, অন্যের কি তাহা আছে? স্বামী বলিলেন, তুমি আমার হৃদয় জান না। তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, উহা আমার গুণে হয় নাই। তাঁহার নিজগুণে হইয়াছে। আমার এমন কোন গুণ নাই যে, নাগমহাশয় আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া মন্ত্র দিতে পারেন, কিম্বা নিজ পরিচয় দেন। তাঁহার অহৈতুক দয়া, তাই আমার মত

জীব তাঁহার কাছে যাইতে পারিয়াছে, তথাপি আমার ভয় হয়, যদি তিনি আমার দত্ত জিনিষ না খান। এক কাজ করা যাক, প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে দিলে, নাগমহাশয় নিশ্চয়ই খাইবেন। কালীপূজা আসিতেছে। কালীপূজায় ছানার সন্দেশ দিব। তুমি সেই সন্দেশ প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে দিও। ইহাই স্থির হইল। দুর্গাপূজার পর কুচিয়ামোড়া গিয়াছিলাম। কালীপূজার দিন দেওভোগ আসিলাম।

দেওভোগ যাইবার সময় স্বামী নারায়ণগঞ্জ হইতে ছানার ভাল সন্দেশ লইলেন। কালীপূজায় তাহা দেওয়া হইল। রাত্রে সকলের প্রসাদের সঙ্গে সন্দেশও মণ্ডপ ঘরে রহিল। পরদিন প্রাতে মাঠাকুরাণী সন্দেশগুলি বাহিরে রাখিয়া দিলেন। আমার মা বলিলেন, একি? আপনারা রাখুন। মাঠাকুরাণী কোন উত্তর দিলেন না। মুখ অতিশয় ভারি। মাসী মৃদুমন্দ হাসিলেন। মাঠাকুরাণীর এইভাব দেখিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় এই সন্দেশ খাইবেন না। সন্দেশ দিতে গেলে তিনি হয়ত বলিবেন, সন্দেশ কেন আনিলাম। এই ভয়ে সেই দিন আর নাগমহাশয়কে সন্দেশ দিলাম না। ভয়ত করিলাম, কিন্তু একবার ভাবিলাম না, তিনি আমাদিগকে কত স্নেহ করেন, তিনি আমাদিগকে এত ভালবাসেন, কৃপা করিয়া জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিলেন, আর তাঁহাকে সন্দেশ দিলে, তিনি ফিরাইয়া দিবেন? আরও তাঁহাকে কতবার খাওয়াইয়াছি, একবারও এই কথা মনে পড়িল না। কি করি? যখন মাঠাকুরাণী সন্দেশ বাহির করিয়া দিয়াছেন, কোনমতে বুঝিতে পারিলাম না, তিনি এই সন্দেশ নিবেন। পঞ্চসার

চলিয়া আসিলাম। স্বামী আমাদের সাথে আসিলেন। তখন তিনি ঢাকা কলেজে পড়েন। কয়েকদিন ছুটি ছিল। তিনি জানেন, আমি নাগমহাশয়কে সন্দেশ খাওয়াইয়াছি।

বাড়ীতে গিয়া যখন স্বামীকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম, তিনি আমার উপর বিরক্ত হইলেন। তিনি মাঠাকুরাণীকে বড় ভক্তি করিতেন। তাঁহার উপর তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল। স্বামী নাগমহাশয়ের পরই মাঠাকুরাণীকে মান্য করিতেন। তিনি বলিতেন, মাঠাকুরাণী সমস্ত জানিতে পারেন। মানবী কি নাগ মহাশয়ের সঙ্গিনী হইতে পারে? আমি মধ্যে মধ্যে বলিতাম, শ্রীকৃষ্ণ ৬০০০০ বিবাহ করিয়া ছিলেন, সবই ভগবতী ছিলেন না। স্বামী আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি সন্দেশ দিলে, মাঠাকুরণী ফিরাইতে পারিতেন না। কি করিব? আমি চুপ করিয়া রহিলাম। স্বামী সব জানিতেন না। তাঁহাকে সকল কথা বলিতে সাহস পাই নাই, কারণ মাঠাকুরাণীর দোষ বলিলে, তিনি আমাকেই দোষী বলিবেন। এই ভয়ে আমি বিশেষ কিছু বলি নাই। এতদিন নাগমহাশয় ছিলেন, মাঠাকুরাণী স্বামীর সহিত কথা বলেন নাই। স্বামী মনে করিতেন, তিনি মা'র সাথে কথা বলার যোগ্য নন, তাই মাঠাকুরাণী তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন না। এরকম বিশ্বাসে কি কোন কথা বলা যায়? স্বামীর মনে কষ্ট দেখিয়া, আমি স্থির করিলাম, সন্দেশ রাখিয়া দিব। জগদ্ধাত্রীপূজার দিন মাঠাকুরাণীকে না জানাইয়া তাহা নাগমহাশয়ের হাতে দিব। স্বামীকে এই কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, যদি তুমি তাঁহার হাতে সন্দেশ দিতে, তিনি না লইয়া পারিতেন না। আমি বলিলাম, মাঠাকুরাণী সন্দেশ

বাহির করিয়া দিলেন, আমি আর সাহস পাইলাম না। আমি সন্দেশ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। জগদ্ধাত্রীপূজার দিন নাগ-মহাশয়ের জন্য ৯ দিনের বাসি সন্দেশ নিয়া গেলাম।

নাগমহাশয় পূজার শেষ না হইলে খাইতেন না। সন্ধ্যার সময় পূজা শেষ হইল। সন্দেশ লইয়া প্রস্তুত রহিলাম। সেই দিন আমাদের পঞ্চসার ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। যজ্ঞান্তে তিনি আশীর্ব্বাদ নিয়াছেন, কিন্তু সন্দেশ দিবার অবসর পাইতেছি না; কারণ পূজক সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পূজা করিয়াছেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া, সকল খাদ্য দ্রব্য নিজে দেখিতেছেন, যেন কোন ত্রুটী না হয়, যেন তিনি সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হন। আমি দাড়াইয়া আছি, তিনি ছুটিয়া ছুটিয়া আমার কাছে আসেন, আবার পূজকের নিকট চলিয়া যান। পূজকের খাওয়া হইয়া গেলে পর নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, কিগো মা, কেন ডাকিয়াছ? আমি মনে মনে বলিলাম, ধরুন, আপনার ভক্তের সন্দেশ খান। প্রকাশ্যে বলিলাম, কালীপূজার দিন আপনাকে প্রসাদ দেই নাই, আপনি এই সন্দেশ খাইবেন? এই কথা বলা মাত্র তিনি হাত পাতিয়া সন্দেশ নিলেন এবং শিশুর মত তাহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, কেন মা, প্রসাদ নিয়া কোণে কোণে অমন ভাবে দাড়াইয়া রহিয়াছ? যখন তুমি আমাকে দিতে, তখনই আমি প্রসাদ নিতাম। নাগমহাশয় সন্দেশ খাইলেন। তাহার উপর তিনি আরও বলিলেন, যখন তুমি প্রসাদ দিতে, আমি নিতাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমার খুব সাহস হইল। ভবিষ্যতে প্রসাদ বলিয়া নাগমহাশয়কে

খাওয়াইতে পারিব। আর মাঠাকুরাণীর সাহায্য লাগিবে না। যখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া সন্দেশ লইয়া বলিলেন, আমি প্রসাদ দিলে, তিনি নিবেন, আর কি কোন কথা আছে? স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি সন্দেশ দিলে, নাগমহাশয় তাহা না নিয়া পারবেন না। তাঁহার এই কথা বিশ্বাস করিয়া, যদি আমি কালী-পূজার দিন নাগমহাশয়কে সন্দেশ দিতাম, মাঠাকুরাণীর ব্যবহার হেতু ৯ দিনের বাসি সন্দেশ তাঁহাকে খাওয়াইতে হইত না। যখন দেওভোগ হইতে সন্দেশগুলি ফিরাইয়া আনি, সেই সময় স্বামীর কথা একবার মনেও করিলাম না। আমি এভাবে অযত্ন করিয়াছি। একবার তাঁহাকে পঞ্চসারে নিয়া অনাহারে অনিদ্রায় রাখিলাম। আবার নাগমহাশয়ের বাড়ীতেই তাঁহার জন্য দেওয়া মাছ তাঁহাকে দিলাম না। যিনি মনের কথার উত্তর দিতেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া মাছখানা সড়াইয়া নিলাম। আমার মত নরাধমা পাষাণী কোথায় আছে। এমন যত্নের ধনকে এমন অযত্ন করিয়াছি।

নাগমহাশয়ের প্রসাদ বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা খাওয়াইতে পারিব শুনিয়া স্বামী অতিশয় সুখী হইলেন। তিনি মনে করিলেন, আগামী পূজার সময় নাগমহাশয়কে কিছু খাইতে দিবেন। স্বামী ধর্ম্ম বিষয়ে বড় কিছু বলিতেন না। যাহা করিবেন, তাহা মনে রাখিতেন। দুর্গা পূজার সময় ঢাকা হইতে সুন্দর দেখিয়া দুইটী কমলালেবু আনিলেন। তাহার বাসনা, দুর্গাপূজায় সেই লেবু দিয়া, নাগমহাশয়কে খাওয়াইবেন। পঞ্চসারে প্রথমপূজা দেখিয়া, বৈকাল বেলা আমরা দেওভোগ গেলাম। অষ্টমী পূজায়

সেই লেবু দেওয়া হইল। পূজার পর আমি কমলালেবু স্থানান্তরে রাখিয়া দিলাম, কারণ সন্ধি পূজা না হইলে নাগমহাশয় খাইবেন না। সেবার সন্ধিপূজা দিনে হয় নাই। আমার ইচ্ছা নাগমহাশয়কে কমলালেবু খাওয়াইয়া আমি খাইব। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, মা, তুমি এখনও খাও নাই? আমি বলিলাম, আমি সন্ধিপূজার উপবাস করিব। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, তোমাকে সহস্র কোটি ব্যবস্থা কে দিবে? আমি বলিলাম, আপনিও ত উপবাস করিবেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, পূজার জন্য এক জন উপবাসী থাকে। আমি মনে মনে বলিলাম, তুমি খাইলে, আমি খাইব। এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া নিল। আমি বসিয়া রহিলাম। কতক সময় পর নাগমহাশয় আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তিনি নটবরবাবুদের বাড়ীর প্রতিমা দেখিয়া আসিবেন। আমি কতকদূর তাহার পিছনে গেলাম। তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, তুমি স্নান কর নাই। তুমি তৈল মাখিয়া স্নানকর, আমি এখনই আসিব।

আমি বলিলাম, আপনি আমাকে অসুখের জন্য নারিকেল তৈল মাথায় দিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি স্নেহ করিয়া, মহা আপনের মত আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আজ একটু নারিকেল তৈল দেও, ঘরে তিল তৈল নাই। এমন ভাবে বলিলেন, সেই স্নেহ বর্ণনা করা যায় না। আমি সেই স্নেহে মোহিতা হইয়া আবার তাহার পশ্চাতে চলিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, মা, বাড়ী যাও, আমি এখনই আসিব। নাগমহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথামত কিছু

সরিয়া দাঁড়াইলাম। যে পর্য্যন্ত তাহাকে দেখা যায়, তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। অনেক দূর দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি ভাবিলাম, পথে জল কাদা, চারিদিকে ধান ক্ষেত, তিনি কি ব্যথায় বসিয়া পড়িলেন? অনেক সময় হইয়া গেল, নাগমহাশয়কে আর দেখা যায় না। এখন আমি কি করিব? তিনি আমাকে স্নান করিতে বলিলেন। যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, তাহা না করিয়া জল কাদার রাস্তা দিয়া, যদি আমি তাহাকে দেখিতে যাই এবং আমার কষ্ট দেখিয়া যদি তিনি আমার উপর রাগ করেন কিম্বা বিরক্ত হন, তখন আমার অবস্থা কি হইবে। কিন্তু নাগমহাশয়কে না দেখিয়া মন এত অস্থির হইল, তাহার জন্য না যাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভালরূপে পথ চিনি না। দূর হইতে নামহাশয়কে যেদিকে যাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই দিকে যাইতে লাগিলাম। অর্দ্ধেক পথ গেলেও নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না। একটী প্রাণীও সেই স্থানে নাই, তিনি কোন্ পথে গেলেন, তাহা জানি না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়া যে পথ দেখিলাম, সেই পথেই যাইতে লাগিলাম, কতকদূর যাইয়া নটবরবাবুদের বাড়ী দেখিলাম। সম্মুখে একটী পাট ক্ষেত এবং তাহার পাশ দিয়া পোষ্ট পিয়ন আসিতেছে। আমার মনে ভয় হইল। সরু রাস্তা, কোঁথায় যাই? সম্মুখে পিয়ন, পশ্চাতে দুর্গম পথ—উভয় সঙ্কট। অগ্রসর হইলে শীঘ্রই নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব। সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নাগমহাশয় আমাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়াছেন। ভয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার এমনই মহিমা, সরু

পথ, আমাকে দেখিয়া পিয়ন নতশিরে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলাম।

আমি নটবরবাবুদের বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় বৈঠকখানার এক কোণে বসিয়া আছেন। আমি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম। তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হইতেছে না, কারণ আমার কষ্ট দেখিয়া তিনি রাগ করিবেন। তিনি বলিবেন, হাঁটু জল ও কাদার ভিতর দিয়া কেন গেলাম। সুতরাং মণ্ডপঘরের পিছনের পথ ধরিয়া নটবরবাবুদের বাড়ীর মধ্যে গেলাম। যেস্থানে বসিলে তাঁহাকে দেখা যায়, আমি সেখানে বসিয়া রহিলাম। কতক সময় পর নাগমহাশয় উঠিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, যদি আমি এখন তাঁহার সঙ্গে না যাই, তিনি বাড়ী গিয়া আমাকে না দেখিলে, মানুষের মত খুঁজিতে বাহির হইবেন এবং তিনি চলিয়া গেলে আমি কোথায় বা থাকিব? কাজে কাজেই যখন তিনি প্রতিমা নমস্কার করিতে গেলেন, আমিও প্রতিমা নমস্কার করিয়া, তাঁহার কাছে দাঁড়াইলাম। নাগমহাশয় আমাকে দেখিয়া মুখখানা ঈষৎ মলিন করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিয়া এখানে এলে? আমি বলিলাম, আপনি আসিয়াছেন পর, যতদূর আপনাকে দেখা গেল তাকাইয়াছিলাম, অবশেষে আপনাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি মনে করিলাম, আপনি হঠাৎ কেন অদৃশ্য হইলেন? তবে কি জল ও কাদায় যাইতে যাইতে ব্যথা হওয়ায় বসিয়া পড়িলেন? এমন সময় নটবরবাবু আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, ও মনে করিয়াছিল, আমার ব্যথা হওয়ায় পথে পড়িয়া গিয়াছি, সেই জন্য একাকী আসিয়াছে। ইহা বলিয়াই,

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. তুমি কি গাঙ্গুলী-বাড়ী ও পলশাই-বাড়ীর প্রতিমা দেখিয়া যাইবে? আমি চুপ করিয়া রহিলাম। যখন তুমি আসিয়াছ, এই দুই বাড়ীর প্রতিমা দেখিয়া যাও বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া গাঙ্গুলী-বাড়ী ও পলশাই বাড়ীর প্রতিমা দেখিতে চলিলেন। গাঙ্গুলী-বাড়ীর প্রতিমা নমস্কার করিয়া আমি বাড়ীর ভিতর গেলাম, তিনি ভিতরবাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেলেন। আসার সময় হইলে তিনি আবার দরজার নিকট দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেই বাড়ীর লোকদের ভিতর, যিনি আমার পিতাকে চিনিতেন, তাহাকে বলিলেন, এই রাজকুমারের মেয়ে, যে তাঁহাকে চিনেন না, তাহাকে কহিলেন এই আমাদের মেয়ে। তিনি আমাকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। পথে আসিয়া, জল ও কাদা দেখিয়া, নাগমহাশয় বলিতে লাগিলেন, আমি এই দুর্গম রাস্তা দিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারিব না। যে পথে আসিয়াছ, সেই পথে যাও। আমি আগে আগে চলিলাম, তিনি আমার পিছনে আসিতে লাগিলেন। অৰ্দ্ধেক পথ আসিলে, জল হাঁটু পৰ্য্যন্ত হইল। মাথায় অতিশয় রৌদ্রের তাপ লাগায়, আমার শরীর ভাল বোধ হইতে লাগিল না। তিনি ত সমস্ত জানেন। আমার শরীর খারাপ বোধ করা মাত্র তিনি বলিলেন, আর সংসারে থাকিব না। সংসারে থাকিলে কেবল লোকের কষ্ট। পায় ঠাণ্ডা লাগায় ও মাথায় রৌদ্রের তাপ পড়ায় শরীর অস্থির করিল, এখন আমি কি করিব? আর এমন কাজ করিব না, আর কাহাকে কিছু বলিব না। আমি অতিশয় ভয় পাইলাম। নাগমহাশয় রাগ করিলেন এবং বলিলেন, সংসারে আর বেশি দিন থাকিব না,

এখন কি উপায়? মনে মনে বলিতে লাগিলাম, ভগবন্, আমি যেন অস্থির হইয়া না পড়ি। আমি অস্থির হইলে, তিনি এই জলে ও কাদায় গড়াগড়ি দিবেন। তাড়াতাড়ি চলিয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিলাম। তৎপর তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি করিয়া রাস্তা চিনিয়া গেলাম এবং যাওয়ার পূর্ব্বে বাড়ীতে কাহাকে বলিয়া গিয়াছি কি না। আমি বলিলাম, আপনি বাড়ীতে ছিলেন না, কাহাকে বলিয়া যাইব?

আমাকে জল ও কাদায় যাইতে দেখিয়া নাগমহাশয় চঞ্চল হইয়াছিলেন। বাটীতে আসিলে সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আমার বড় ভয় হইয়াছিল, তিনি বেশি দিন আর সংসারে থাকিবেন না। তখন আর কিছু বলিলাম না। তিনি যাওয়ার পূর্ব্বে আমাকে, স্নান করিতে বলিয়াছিলেন। বাড়ীতে আসিয়াই মাথায় তৈল দিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নান করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তিনি ত মনের কথা জানেন, এমন স্নেহদৃষ্টির সহিত আমার দিকে তাকাইলেন, যেন কিছু হয় নাই। আমিও তাঁহার স্নেহদৃষ্টির সহিত অমিয়মাখাহাসি দেখিয়া, সমস্ত ভুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমি স্নান করিয়াছি কি না, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নান করিয়াছি বলায়, তিনি স্নেহভরে বলিলেন, স্নান করিয়া শুধু মুখে থাকিতে নেই। তুমি একটু প্রসাদ মুখে দাও। আমি প্রসাদ খাইয়া আবার তাঁহার কাছে বসিলাম। তিনি তামাক খাইতেছেন এবং চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন, কাহার কিছু দরকার আছে কি না। এমন সময় তাহার এক বাল্যবন্ধু আসিলেন।

নাগমহাশয়ের বাল্য-বন্ধু তাঁহার পায়ের ধুলা লইবেন আশা

করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পায়ের নিকট হাত ফেলিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার বন্ধুর হাত ফেলার পূর্ব্বেই কাপড় দিয়া পা দুইখানি ঢাকিয়া, বামহাত কাপড়ের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হাতে হুঁকা ছিল। বন্ধুকে ধরিতে পারেন নাই। বন্ধু তাঁহার পা ছুঁইতে না পারিয়া, আপনিই একটু সড়িয়া বসিলেন। আমিও একটু সড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইঁনি কে? নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার বাল্য-বন্ধু। আমি এবার লজ্জায় পড়িলাম। তাঁহার কাছেই বসিয়া থাকিলাম। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, উনি ভাত খান না। ছাতু, দুগ্ধ, দধি, গুড় ইত্যাদি তাহাকে খাইতে দাও। তাঁহার কথা মত মাঠাকুরাণীকে বলিলাম। মাঠাকুরাণী সব দেখাইয়া দিলেন, আমি খাইতে দিলাম। নাগমহাশয় বসিয়া থাকিয়া সকল দেখিতেছেন, যেন কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়। তাঁহার বন্ধুকে খাইতে দিয়া আমি নাগ-মহাশয়ের নিকট বসিয়াছি, এমন সময় স্বামী তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। তিনি তাঁহারদিকে সস্নেহে তাকাইয়া আমাকে বলিলেন, পার্ব্বতী স্নান করিয়া আসিয়াছে, উহাকে খাইতে দাও। আমি তাঁহার খাওয়ার জন্য উঠানে আসন পাতিয়া রাখিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, উহাকে উঠানে খাইতে দিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বারান্দায় আপনার বন্ধুর উচ্ছিষ্ট রহিয়াছে, তাহা মুক্ত করি? তিনি বলিলেন, না, তুমি স্নান করিয়া আসিয়াছ, বসিয়া থাক। স্বামীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তিঁনি একটু চঞ্চল হইলেন এবং আমারদিকে তাকাইয়া বলিলেন, পার্ব্বতী অঞ্জলি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি কাহাকে

উচ্ছিষ্ট নিতে বলিব? সে সময়ে মাসী আসিয়া নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এই উচ্ছিষ্ট থালা ধুইতে পারেন কি না। নাগমহাশয় বলিলেন, হাঁ, ইনি আমাদের জাতীয়। তাঁহার ইচ্ছা হওয়া মাত্র উচ্ছিষ্ট থালা প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইল। তিনি স্বামীকে থাইতে যাইতে বলিলেন। স্বামী খাইতে বসিলেন। স্বামী খাইতে বসিলে আমাকে খাওয়ার দ্রব্য দিতে বলিলেন। কি সুখের দিন ছিল!

গিরিশবাবু বলিয়াছেন, ভক্তের উপর নাগমহাশয়ের মাতৃবৎ স্নেহ। আমার মনে হয়, তাঁহার স্নেহ মাতৃস্নেহকে পরাজয় করিয়াছে। মধ্যবয়সের সন্তান স্নান করিয়া গেলে, কাহার মা বলেন, শুধুমুখে থাকে না, কিছু খাও। পূজার বাড়ীতে বড় ছেলেকে উঠানে খাইতে দিলে, কাহার মা বলেন, উহাকে উঠানে খাইতে দিও না, ঘরে বসিতে দাও। হায়, কি করিয়া এমন স্নেহ ভুলিলাম? কেমনে এমন ভালবাসা ভুলিয়া, সংসারে শান্তিতে আছি? আমরা মানুষ নই, পাষাণ।

সন্ধিপূজা হইয়া গেল। নাগমহাশয় বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে কমলা লেবু প্রসাদ দি? তিনি প্রসাদ নিতে রাজি হইলেন। তাঁহাকে কমলা লেবু দিলাম। তিনি হাত পাতিয়া লইয়া খাইলেন এবং আমাকে একখণ্ড দিলেন। আমি তাহা মুখে দিয়া দেখিলাম, লেবু অতিশয় টক্। কি অদৃষ্ট! রাত্রে তাঁহাকে টক্ লেবু দিলাম! মানুষ এত টক্ লেবু খায় না। তিনি কিছু বলিলেন না। কি আর করি? পূজার পর বাড়ী আসিয়া স্বামীকে বলিলাম, সেবার ৯ দিনের বাসি সন্দেশ খাওয়াই-লাম, এবার রাত্রিকালে টক্ কমলা লেবু খাইতে দিলাম। স্বামী

তাহাতে কষ্ট পাইলেন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর না হইবার নয়। অবশেষে আমরা পরামর্শ করিলাম, ঢাকার আমির্ত্তি (জিলাপী) ভাল। কালীপূজার দিন আমির্ত্তি আনিয়া কালীপূজায় দিব এবং প্রসাদ বলিয়া নাগমহাশয়কে খাওয়াইব। স্বামী অত্যন্ত সুখী হইলেন।

স্বামী কালীপূজার দিন একসের আমির্ত্তি কিনিয়া, ঢাকা হইতে খালি পায় হাঁটিয়া রওনা হইলেন, কারণ ট্রেণে অনেক জাতীয় লোক একত্র বসে এবং জুতা পরিয়া কি করিয়া তাঁহার খাওয়ার জিনিষ আনিবেন। জুতা ছাড়িয়া হাটিয়া আসিতে স্বামীর সামান্য কষ্ট হইয়াছিল। দেহে সামান্য কষ্ট হইলেও তাঁহার মনে অপরিমিত সুখ হইয়াছিল। নাগমহায়য় আমির্ত্তি খাইবেন ভাবিয়া সমস্ত পথ চলিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহা নাগমহাশয়ের অসহ্য হইল। তিনি ত সমস্ত জানিতেন। স্বামী দেওভোগ গিয়া নাগ-মহাশকে নমস্কার করিলে, তিনি বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, আপনি অন্যায় করিয়াছেন, কেন আমাকে ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে নমস্কার করিলেন? অন্যায় কাজ করিতে নেই। যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা করিতে হয়। স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, দেখুন, ভীষ্মদেব পিতৃশ্রাদ্ধ বরিতে বসিলে, শান্তনু আসিয়া হাত পাতিয়া পিণ্ড চাহিয়া ছিলেন। ভীষ্মদেব বলিলেন, পিণ্ড হাতে দেওয়ার নিয়ম নাই। আমি কুশাসনে পিণ্ড দিব, আপনি তথা হইতে উঠাইয়া নিন্। স্বামী মনে মনে বলিলেন, ওসব কিছু নয়, এই যে জুতা ছাড়িয়া হাঁটিয়া ঢাকা হইতে আমির্ত্তি আনিয়াছি, ইহাই হইয়াছে মূল। আমি অনেকবার ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে আপনাকে নমস্কার করিয়াছি। এই কথা মনে মনে বলিয়া

তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অন্যবার আমরা দেওভোগ গেলে, তিনি আমার কাছে আসিতেন। এবার তিনি আর আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন না। আমি ভয় পাইয়া ভাবিতেছি, তিনি স্বামীকে হাঁটিয়া আসিতে বারণ করিয়াছিলেন। হাটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া নিজে ট্রেণের ভাড়া দিয়াছেন। থালিপায় হাঁটিয়া আমির্ত্তি আনায় কি তিনি বিরক্ত হইলেন ? যিনি আমরা আসিব বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকেন, আজ তিনি এপর্য্যন্ত একবারও আমার কাছে আসিলেন না। যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই আছেন। তাঁহার বাড়ীতে এতলোক একত্রিত হইয়াছে, আমিও তাঁহার কাছে যাইতে পারিতেছি না। যেস্থানে গেলে তাঁহাকে দেখা যায়, সে জায়গায় গিয়া দাঁড়াইব ভাবিয়া যাইতেছিলাম। পথে জল ছিল, আমি পড়িয়া গেলাম। অমনি তিনি আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, সংসারে কেবলই হুজুগ। নাগমহাশয় ধরিলে আমি অতিশয় আনন্দ পাইলাম এবং মনে মনে বলিলাম, কেন যে হুজুগ বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। সংসারে কেহ কম কষ্ট করে না। তোমার জন্য হাটিয়া আমির্ত্তি আনায় আর কত কষ্ট করিয়াছন ? যদি তুমি তাহা খাও, ইহা মহাতপস্যা হইবে। তিনি বলিলেন, যাহা দরকার, তাহা করিতে হয়। আমি আবার মনে মনে বলিলাম, আমার সংসারের দরকার চেয়ে এই দরকার অধিক। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। আমার মনে ভয় হইল, যদি তিনি আমির্ত্তি না খান।

কালীপূজায় আমির্ত্তি দিলাম। পূজা হইয়া গেল। নাগ-

মহাশয় আশীর্ব্বাদ নিতে গেলেন। আমি অবসর খুঁজিতেছি, কখন তাঁহার হাতে প্রসাদ দিতে পারিব। তিনিও ফাঁকে ফাঁকে থাকিতেছেন। একবার আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইতেছেন। আমি প্রসাদ লইয়া দিবার উদ্যোগ করিলে, তিনি সড়িয়া যান। সেদিন কোন মতেই তাঁহাকে প্রসাদ দিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে বলিলাম, যদি তুমি এই আমির্ত্তি না খাও, স্বামী অতিশয় কষ্ট পাইবেন।

যিনি কালীপূজা করিয়াছিলেন, তিনি নাগমহাশয়ের গুরুর ভাই। নাগমহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। কালীপূজার পরদিন প্রাতেঃ তিনি না খাইয়া চলিয়া যাইবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি কাল উপবাসী থাকিয়া পূজা করিয়াছেন, আজ না খাইয়া কি করিয়া যাইবেন? তিনি বলিলেন, আমি কোন মতেই আজ থাকিতে পারিব না। স্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সব কথা শুনিয়া, মনে মনে বলিলেন, কাল তুমি আমার আমির্ত্তি খাইলে না। এখন দেখ, যাহাকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করা যায়, সে না খাইলে মনে কেমন লাগে। নাগমহাশয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, তা কি করিব? আপনি আমার ইচ্ছায় আসেন নাই, আমার ইচ্ছায় যাইবেনও না। নাগমহাশয়ের উত্তর শুনিয়া স্বামী লজ্জিত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, কিছুতেই তোমার কষ্ট নাই। আমি অযথা ধর্ম্ম দেখিলাম। সকলই তোমার ইচ্ছা। কতক সময় পর নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, আমাকে অল্প প্রসাদ দাও। আমি আমির্ত্তি দিলাম। তিনি তাহা হাতে করিয়া নিয়া, স্বামীকে দেখাইয়া খাইলেন। স্বামী তাঁহাকে আমির্ত্তি খাইতে দেখিয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

আমরা সর্ব্বদা সময় দেখিয়াছি, নাগ মহাশয় মনের কথার উত্তর দিতেন। দূরে থাকিয়া আমরা যাহা করিয়াছি, তিনি সে কথাও বলিতেন। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে নাগমহাশয় আমাদিগকে সমান দেখিয়াছেন। এবার স্বামীর কষ্ট দেখিয়া, নাগমহাশয় আমাদের সাথে যে ভাব করিলেন, আমাদের সঙ্গে যে সব লোক গিয়াছিলেন, তাঁহারা অবাক্ হইলেন। কেহ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার জন্য হাঁটিয়া আমিত্তি আনা হইয়াছে, তাহা তিনি এখানে বসিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জন্য জীব একচুল কষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি জীবের জন্য দুঃখের সাগরে ভাসিতেন, তাহাদিগকে সুখে রাখিতে কত কষ্টই না করিতেন।

আমরা কোন দিন দেখিয়াছি, নাগমহাশয় বাজার করিয়া আসিয়াছেন। অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তিনি আবার বাজার করিতে চলিলেন, যেন কাহার কোন কষ্ট না হয়। কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বাজারে যাইতে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইত। পথে কোন স্থানে কাদা, কোন স্থানে জল থাকিত, তাহার উপর তাঁহার মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা রহিত। সেই পথে মানুষের চলিতেই কষ্ট হইত, আর নাগমহাশয় মাথায় বোঝা লইয়া হাঁটিতেন। এই পথ তাঁহাকে বার বার আসা যাওয়া করিতে হইত। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন ইহাতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই। মানুষ পরিশ্রম করিলে কতকসময় বিশ্রাম করে। নাগমহাশয়কে দেখিয়াছি, বোঝা নামাইয়া হাসিমুখে লোকের সেবা করিতেন। কাহাকে তামাক দিতেন, কাহাকে বাতাস করিতেন। যাহার যাহা

অভাব, তাহা এমনভাবে পূরণ করিতেন, যেন লোক মাথায় বোঝা আনিয়াছে এবং তিনি সুখে বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। হায়, জীব এত স্বার্থপর! কোন লোককেই নাগমহাশয়ের কষ্ট বুঝিতে দেখি নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নাগমহাশয় মাথা হইতে বোঝা নামাইয়া তামাক সাজিয়া দিতেছেন। কেহ বলে নাই, আপনি এই বাজার করিয়া আসিয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন। আমাদের এখন তামাকের দরকার নাই, আমাদের এখন বাতাসের দরকার নাই। জীবের নিজের সুখ হইলেই হইল। কিন্তু নাগমহাশয় ভাবিতেন, নিজের সুখ কিছু নয়, জীবের সুখ হইলেই হইল।

নাগমহাশয় না খাইয়া, না ঘুমাইয়া লোকের যত্ন করিয়াছেন। পূজার সময়ের ত কথাই নাই, অন্য সময়েও দেখিয়াছি, যেদিন সমস্ত দিন নানা মতের লোক গিয়াছে, সেদিন সমস্ত দিনেও তাঁহার আহার জোটে নাই। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কায়স্থ, কেহ বা নীচ জাতীয়। সকলেই নাগমহাশয়ের বাড়ীতে খাইত। নাগমহাশয় সকলের খাওয়ার সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন যেন খাইবার কোন ক্রুটী না হয়। সমস্ত লোকের খাওয়া হইলে তাঁহাদিগকে তামাক দিয়া, নাগমহাশয় খাইতেন। কোন দিন তিনি খাইয়া রান্নাঘরের বাহির হইলে সূর্য্যাস্ত হইত। রাত্রে আর তাঁহার খাওয়া হইত না। কোনদিন বিছানার অভাবে রাত্রে শুইতে পারেন নাই, সমস্ত রাত্র বসিয়া কাটাইয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে কখনও বিচলিত দেখি নাই, হাসিমুখে সমানভাবে সকলের সেবা করিয়াছেন। কখন কখন রাত্রে ২।৩টা বাজিয়া যাইত। তখনও কীর্ত্তন চলিত। নাগমহাশয় ঘরের এককোণে বসিয়া থাকিতেন। যখন তাঁহার

আঁখি মহাভাবে ঢুলু ঢুলু করিত, তিনি তামাক লইয়া খুঁটিনাটি করিতেন, কিম্বা বলিতেন, তামাক খাব, তামাক খাব। যেন তাঁহার সমাধি না হয়। মানুষ কি কখন এমন হয়? কেহ নাগমহাশয়ের মত আত্মগোপন করিতে পারেন নাই' যতই গোপনে থাকুন না কেন, কৃপাপশে ভক্তপাশে ধরা পড়িয়াছেন।

নাগমহাশয়ের আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের মত ছিল না। নাগমহাশয় ধর্ম্মকথা ব্যতীত বাজে কথা বলিতেন না। তাঁহার এমন শক্তি ছিল, তাঁহার সাক্ষাতে কোন লোক বাজে কথা বলিতে পারিত না। ভাল ও মন্দ, সকল রকম লোক নাগমহাশয়ের কাছে যাইত। কেহ ভাগবত পাঠ করিত, কেহ গান করিত, কেহ খোল বা করতাল বাজাইত, কেহ বা নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিত। কাহাকেও গল্প করিতে দেখি নাই। কোন কোন লোক বলিয়াছে, নাগমহাশয়কে দেখিলেই এক রকমভাব হইত, ভগবানের বিষয় ছাড়া অন্য কথা মুখে আসিত না। তাহা মনে উঠিলেও মুখ হইতে বাহির হইত না। কেন সে কথা চাপা পড়িত, তাহা বুঝিতে পারি না। যিনি অন্যায় কাজ করিলে শাসন করেন, লোক তাঁহার কাছে ভয় পায়। নাগমহাশয় সর্ব্বদা হাস্যমুখে কথা বলিতেন যেন তিনি সকলের আপন। তাঁহার কাছে কোন ভয় ছিল না। তবুও তাঁহার কাছে কেন বাজে কথা হয় নাই, তাহা জানি না। নাগমহাশয় কাহাকেও শাসন করিতেন না, তাঁহার এমন প্রভাব ছিল, তাঁহার কাছে মায়াপুরাণ পাঠ হইত না। যাঁহারা নাগমহাশয়কে দেখিয়াছেন, এখনও তাঁহারা বলেন, গান করিতে বসিয়া কাহার ঘুমে ধরিলে বলিত পারিত না, তাহার ঘুম পাইয়াছে। ক্ষুধা লাগিলে কেহ কহিতে পারিত

না, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভোর হইয়া গিয়াছে, অমনি কীর্ত্তন ছাড়িয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছি। অথচ নাগমহাশয় কাহাকে কিছু বলেন নাই। তিনি যেটুকু বলিয়াছেন, তাহা কেবল লোকের মঙ্গলের জন্য। তবু তাঁহার কাছে কোন লোক অন্যায় কাজ করিতে পারে নাই। তাঁহার পবিত্র বাতাসে সকলকে পবিত্র করিয়া রাখিত।

একবার বড়দিনের ছুটীতে স্বামী পঞ্চসার গিয়াছেন। ছুটী ফুরাইবার ৪।৫ দিন থাকিতে তিনি ঢাকা চলিয়া আসিবেন। সেবার তিনি বিএ পড়েন। বাড়ীতে থাকিলে পড়া ভাল হয় না। স্বামী বলিলেন, তিনি ঢাকা যাওয়ার সময় নাগমহাশয়কে দেখিয়া যাইবেন। আমিও তাঁহার সহিত দেওভোগ যাইতে চাহিলাম। স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সাথে দেওভোগ গেলে, কে আমাকে নিয়া আসিবে। তিনি বলিলেন, পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইযাছে, আর ক্ষতি করিতে পারিবেন না। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে দেওভোগ হইতে আনিতে পারিবেন কি না। পিতা বলিলেন, তাঁহাকে কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তিনি আমাদের সঙ্গে দেওভোগ যাইতে পারিবেন না। তবে ৪।৫ দিন পরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভায় যাইবেন, আসার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আমরা রওনা হইলাম যেন দেওভোগ গেলে শীতের সময় মাঠাকুরাণীর কোন কষ্ট না হয়। দেওভোগ যাইতে অনেক সময় লাগিল। রাত্রি ৯টার পর নাগমহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিলাম। নাগমহাশয় একখানা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। মাঠাকুরাণী সন্ধ্যা

করিতে বসিয়াছিলেন। নাগমহাশয় আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, এই শীতের মধ্যে রাত্রিতে আসিতে কত কষ্টই না হইয়াছে, পথে কত ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। স্বামী বলিলেন, আমাদের কোন কষ্টই হয় নাই। নাগমহাশয় বলিলেন, বেলা থাকিতে আসিলেই হইত। আমি বলিলাম, উনি কাল ঢাকা যাইবেন, তাই সন্ধ্যার পর রওনা হইলেন। তিনি আমাকে একখানা লেপ জড়াইয়া বসিতে বলিলেন। স্বামীর জন্য ভিন্ন বিছানা করিতে লাগিলেন যেন আমাদের কোন কষ্ট না হয়। স্বামী বলিলেন, কেন অযথা কষ্ট করিতেছেন। আমাদের এমন ঠাণ্ডা লাগে নাই যে এখনই গরম হইতে হইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, শীতের সময় এত রাত্রিতে মাঠের মধ্যদিয়া হাঁটিয়া আসিতে পারিলেন, আর আমি সামান্য বিছানা করিয়া দিতে পারিব না। স্বামী তাঁহার সঙ্গে বিছানা ধরিয়া, তাহা পাতিলেন এবং নাগমহাশয়ের নিকট বসিলেন।

নাগমহাশয় ধর্ম্মপুস্তক বন্ধ করিয়া স্বামীর সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। আমি ভাবিতেছিলাম, সামান্য রাত্রি হইয়াছে, যখন তিনি তাহাতেই বলিতেছেন, শীতে কষ্ট পাইলাম। আমরা খাইয়া আসিয়াছি, এই কথা কি করিয়া বলিব। তিনি সমস্তই জানেন, তথাপি সাধারণ মানুষের মত আবার কষ্ট প্রকাশ করিবেন। এমন সময় মাঠাকুরাণী সন্ধ্যা করিয়া উঠিলেন। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম, আমরা সন্ধ্যার সময় খাইয়া আসিয়াছি। কোন মতেই আবার খাইতে পারিব না। আপনি আমাদের জন্য রান্না করিবেন না। তাহা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, এত কষ্ট করা কেন? শীতের সময় আগুনের পাশে

বসিয়া, সামান্য চাউল সিদ্ধ করিতে কোন কষ্ট হইবে না। অল্প দুটী খাইবে। আমি বলিলাম, না, রাত্রিতে মাঠাকুরাণীর কষ্ট হইবে বলিয়াই আমরা খাইয়া আসিয়াছি। নাগমহাশয় স্নেহের সহিত আমাদিগের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার জন্য লোকের কেবল কষ্ট পাইতে হয়। আমি কোন মতেই রান্না করিতে দিলাম না।

শিবের কাজে জীবের হাত দেওয়া মহামূর্খতা। রান্না না করিতে দেওয়ার ফল হইল, নাগমহাশয় সামান্য মুড়ি খাইয়া রহিলেন। আমার পেট ভরা ছিল, কত আর খাইব। আমাকে নাগমহাশয়ের ভাত দিতে বলিলেন। আমি নাগমহাশয়ের জন্য রাঁধা ভাত খাইলাম। খাইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি মুড়ি খাইয়া আমাকে ভাত খাওয়াইলেন। মা ঠাকুরাণী রান্না ঘরে গেলেন, নাগমহাশয় খাইতে গেলেন। আমি কি করিয়া বলিব, তিনি রান্না ঘরে যাইয়া ভাত না খাইয়া মুড়ি খাইলেন। বড় ঘরে গিয়া আমাকে বলিলেন, পার্ব্বতী দুটী মুড়ি খাইবে। তুমি অল্প দুটী ভাত খাও। এখানে আসিয়া কিছু না খাইয়া থাকে না। আমরা জানিতাম, নাগমহাশয় না খাওয়াইয়া রাখিবেন না। সামান্য খাইতেই হইবে। আমি ভাত খাইতে বসিলাম। ভাত মুখে দিয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় ভাত খান নাই, মুড়ি খাইয়াছেন। যে পাত্রে মুড়ি খাইয়াছিলেন, তাহাতে দুটী মুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন অনুতাপ হইল। কি করিলাম? নাগমহাশয় ত বলিয়াছিলেন, শীতের সময় সামান্য চাউল সিদ্ধ করিতে কোন কষ্ট নাই। যদি আমি নিজেও রান্না করিতাম, নাগমহাশয় তাঁহার সামনের ভাত আমাকে খাইতে

দিতেন না। কেন তাঁহার কথার উপর হাত দিলাম? আমার কি সাধ্য নাগমহাশয়ের কথা ফেলি। নাগমহাশয় প্রকারান্তরে জানাইলেন, তিনি ভাত খাইতে গেলেন এবং পরে আমাকে খাইতে পাঠাইলেন। এভাব না করিয়া, যদি তিনি ভাত খান নাই বলিয়াও আমাকে কহিতেন, আমার সাধ্য ছিল না যে, সে ভাত না খাইয়া পারি। এই ভাবে শুধু তাঁহার দয়া প্রকাশ করিলেন। মা ঠাকুরাণী খাইতে বসিলেন। নাগমহাশয় ভাত খান নাই কেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। রাত্রে শুইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আমার জন্য নাগমহাশয় ভাত খাইলেন না।

নাগমহাশয় ও স্বামী এক ঘরে শুইলেন। আমি ও মাঠাকুরাণী এক ঘরে শুইলাম। নাগমহাশয় অতিশয় প্রত্যূষে উঠিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ বিছানা ত্যাগ করিত না। স্বামী নাগ-মহাশয়ের উঠার পূর্ব্বে বাহিরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। আশা, কতক্ষণে নাগমহাশয় উঠিবেন, তিনি তাঁহার হাসিমাখা মুখপদ্ম দেখিতে পাইবেন। নাগমহাশয় হাত মুখ ধুইয়া হুকার জল ফেলিতেছেন, সেই শব্দ শুনিয়া আমি উঠিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মুখ ধুইয়াছ? নাগমহাশয় হুকা ভরিয়া বড় ঘরের বারান্দায় গেলেন। আমি মুখে ধুইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। তিনি এক ছিলুম তামাক খাইতে খাইতে স্বামীকে শিবপুরাণ পাঠ করিতে বলিলেন। স্বামী শিবপুরাণ পড়িতে লাগিলেন। আমি তাহা শুনিতেছিলাম। নাগমহাশয় সময় সময় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাজারের বেলা হইল। নাগমহাশয় বাজার করার জন্য উঠিলেন। স্বামী শিব পুরাণ রাখিয়া দিলেন। আমি

নাগমহাশয়ের সহিত ঘরের বাহিরে আসিলাম। নাগমহাশয় মণ্ডপঘরের সিঁড়িতে আবার বসিলেন। আমি তাঁহার নিকট দাঁড়ইলাম। সে স্থানে রৌদ্র ছিল। আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইল। নাগমহাশয় অমনি বলিলেন, সকাল বেলার সূর্য্যের তাপ ভাল লাগে, কিন্তু শরীর খারাপ হয়। আমি সড়িয়া ছায়ায় দাঁড়াইলাম। নাগমহাশয়ের সেই স্নেহমাখা উপদেশ অনুসারে আজও শীতের দিনে সকাল বেলা রৌদ্রে দাঁড়াই না।

নাগমহাশয় বাজারে চলিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে কতক দূর গেলাম। তিনি ফিরিয়া তাকাইয়া আমাকে বলিলেন, মা, বাড়ী যাও। আমি এখনই আসিব। যতদূর পর্য্যন্ত নাগমহাশকে দেখা গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে দেখিলাম। তিনি অদৃশ্য হইলে, বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলাম, যে পথে নাগমহাশয় বাজারে গিয়াছেন, স্বামী সেই পথের দিকে চাহিয়া আছেন। স্বামীকে পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার মনে হইল, তুমি ঢাকা গেলে আমিও এইরূপ পথের দিকে তাকাইয়া থাকি। মনে কষ্ট হইল। স্বামীকে বলিলাম, আর চারিদিন ছুটী আছে, আবার বাড়ীতে ফিরিয়া চল। তিনি বলিলেন, দেওভোগ আসিয়া নাগমহাশয়ের কাছেও এভাবে সংসারের জ্বালাভোগ করিতেছ? অমি চুপ করিয়া সড়িয়া গিয়া, যে পথে নাগমহাশয় ফিরিয়া আসিবেন, সেই পথে দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে নাগ মহাশয় বাজার হইতে আসিলেন। তিনি আমাকে রাস্তায় দেখিয়া বলিলেন, অমন করিয়া কি দাঁড়াইতে হয়? নাগমহাশয় বাড়ীতে আসিয়া মাছ ও তরকারি মাটিতে রাখিলেন। আমি মাছ কাটিতে বসিলাম। তিনি আমার কাছে দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম,

আপনি বাজার করিয়া আসিয়াছেন, একটু বসুন। আবার এস্থানে দাঁড়াইলেন কেন? তিনি বলিলেন, দেখিও, হাতে যেন না লাগে। আমি আবার তাঁহাকে বসিতে বলিলাম। তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নাগমহাশয়কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার মনে হইল, তিনিত সব জানেন। তিনি যখন বাজারে ছিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তিনি তাহা শুনিয়াছেন। আজই বোধ হয় বাড়ীতে যাইতে হইবে।

আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, বাবা ৪।৫ দিনের মধ্যে এখানে আসিয়া আমাকে নিয়া যাইবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, কেন মা, এবাড়ীও তোমার, ও বাড়ীও তোমার। যেখানে ইচ্ছা, তুমি সেই স্থানে থাকিতে পার। যাওয়ার জন্য চিন্তা কি? আমি চুপ করিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার স্নেহ পিতা-মাতার শতস্নেহকে পরাজয় করে। আমি বারমাস তোমার বাড়ীতে থাকিলেও, তুমি আদর করিয়া আমাকে রাখিবে। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শীতের সময়। মাছি বিরক্ত করিতেছিল। দুই হাত মাছের আঁইস-মাখা। হাত নাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছি। মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। হাতে মাছের আইস ছিল, নাগমহাশয়কে মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি বালকের মত অমনি মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিলেন তাঁহাকে মাথায় কাপড় দিতে বলিয়াই মনে হইল —কি করিলাম? নাগমহাশয়কে কাজ করিতে বলিলাম? ইহা ভাবিতেছি, আবার মাথার কাপড় পড়িয়া গেল। কাপড় আমার মাথা হইতে পড়িতে না পড়িতে, তিনি মাথায় আবার কাপড় তুলিয়া দিলেন। নাগমহাশয় যখন কাপড় ধরিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে। আমি মনে

মনে বলিলাম, তুমি মনের আগে চলিতে পার, মাথার কাপড় পড়িতে দেখা বেশি কিছু নয়।

মাছ কাটার অল্প বাকি আছে, নাগমহাশয় স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন, আপনি আজ পঞ্চসার যাইতে পারেন? স্বামী বলিলেন, পঞ্চসার ঘুরিয়া গেল, পড়ার বড় ক্ষতি হইবে। নাগ-মহাশয় বলিলেন, আজ আপনি ঢাকা যাইবেন। আপনার জন্য উহার প্রাণ কেমন করিতেছে। আজ উহাকে পঞ্চসার লইয়া গেলে ভাল হয়। স্বামী নাগমহাশয়ের আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আজ যাইব, কাল ভোরে চলিয়া আসিব। কাল একাদশী। কাল তথায় থাকিলে, পরশ্ব নাখাইয়া আসিতে পারিব না। তাহা হইলে ২।৩ দিন পড়ার ক্ষতি হইবে। নাগমহাশয় বলিলেন, আপনি যে একাদশীর উপবাশ করেন. তাহা আমি জানি। আপনার যাহাতে সুবিধা হয়, করিবেন। স্বামী সেই দিম পঞ্চসার যাওয়া স্থির করিলেন। রান্না হইল। মা ঠাকুরাণী খাওয়ার জন্য আসন পাতিতে বলিলেন। নাগমহাশয়ের জন্য রান্না ঘরে এবং স্বামীর জন্য দক্ষিণের ঘরে আসন পাতিলাম। নাগমহাশয় স্বামীকে খাইতে যাওয়ার জন্য বলিলেন। স্বামী খাইতে বসিলেন। নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, উহাকে যত্ন করিয়া খাইতে দিও। যখন তিনি দেখিলেন, সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তিনি খাইতে বসিলেন। তিনি কি খাইতেন, তিনিই জানেন। অল্পসময় মধ্যে উঠিয়া আসিলেন। কোন দিন দেখিয়াছি, তিনি তেঁতুলে জল ঢালিয়া, এক মুষ্টি ভাত নিয়া মুন না মাখিয়া, খাইয়া উঠিতেন। ইহা খাইয়া সকল দিন রহিয়াছেন এবং

হাসিমুখে সকলের সেবা করিয়াছেন। জীব হইলে, ইহা খাইয়া শুইয়া থাকিতে হইত, দেহ উঠাইতে হইত না। নাগমহাশয় সকল কাজ করিয়াছেন, হাসিমুখে সকলের সাথে কথা কহিয়াছেন, মুহূর্ত্তের তরে কষ্ট অনুভব করেন নাই।

মা ঠাকুরাণী ও আমি খাইতে বসিলাম। মা ঠাকুরাণীর খাইতে অতিশয় দেরি হইত। আমার খাওয়া হইলে, তিনি বলিলেন, কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে, উঠিয়া যাও। মা ঠাকুরাণী উঠিতে বলিলে, আমি ভাবিলাম, যখন উঁনি উঠিতে বলিয়াছেন, উঠিয়া যাই। আজই চলিয়া যাইব, আর অধিক সময় এখানে থাকিতে পারিব না। যেসময় টুকু আছি, নাগমহাশয়ের নিকট থাকিব। আমি বারান্দায় যাইয়া নাগমহাশয়কে পাইলাম না। স্বামী তথায় বসিয়া ছিলেন। তাহাকে নাগমহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্বামী বলিলেন, তিনি বোধ হয় পায়খানায় গিয়াছেন। আমি পথে যাইয়া দাঁড়াইলাম। অনেক সময় পরে দেখিলাম, নাগমহাশয় মুখ ধুইয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বাড়ীতে আসিলাম। যেস্থানে স্বামী বসিয়াছিলেন, তিনি তথায় যাইয়া বসিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পড়া কি রকম হইতেছে? কোন্ কোন্ সময় ছেলে পড়াইতে হয়? স্বামী ছেলে পড়াইয়া কলেজে পড়িতেন। তিনি সকল কথার উত্তর দিলেন। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, উহার উপর ঠাকুরের দয়া আছে। সকলেই উহাকে ভালবাসে। আমি মনে মনে বলিলাম, তোমার দয়া থাকিলেই হয়। লোকের ভালবাসায় কি আসে যায়। বাড়ীতে আসিব, সন্ধ্যা হইল। নাগমহাশয় বলিলেন, ও তোমাকে লইয়া একাকী কি করিয়া

যাইবে? আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যাইব? আমি বলিলাম, শীতের সময় আপনার কষ্ট করিতে হইবে না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, আমি সঙ্গে যাইব?' স্বামী বলিলেন, সেই দিন রাত্রিতে আমি নিয়া আসিতে পারিলাম, আর আজ সন্ধ্যার সময় তাহা পারিব না? নাগমহাশয় বলিলেন, যখন আপনি নৌকা ভাড়া করিবেন, সে সময় খুকী কোথায় থাকিবে? স্বামী বলিলেন, আমি নদীর ঘাটে দাড়াইয়া নৌকা ভাড়া করিব। সে আমার কাছেই থাকিবে। আপনার যাওয়ার কোন দরকার নাই। নাগমহাশয় বালকের মত আমাকে বলিলেন, পার্ব্বতী আমাকে যাইতে বারণ করিতেছে। সে তোমাকে লইয়া যাইবে। নৌকা ভাড়া করা নাই। বীর পুরুষটা, কোন ভয় নাই।

আমরা আসিব মনে করিয়া উঠিলাম। নাগমহাশয় আমাদের সঙ্গে উঠিলেন। যতদিনই দেওভাগে থাকিতাম, আসার সময় নাগমহাশয় এত স্নেহ করিতেন, যেন বহুদিনের পর দেখা করিয়া আমরা বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। আমি এখন আসি বলিলেই তিনি স্নেহে গলিয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। আমরা পথে চলিয়া আসিতাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেন। অন্যান্যবার তিনি কতকদূর আসিলে, আমরা তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিতাম, তিনি যতদূর দেখা যাইত তাকাইয়া থাকিয়া বাড়ীতে আসিতেন। এবার আমরা যাইতে লাগিলাম, তিনি আমাদের সঙ্গে চলিলেন। স্বামী বলিলেন, শীতের সময় কেন কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের সাথে আসিতেছেন? আমি বলিলাম, আপনি বাটী যান। নাগমহাশয় কিছুই বলিতেছেন না, কেবল আমাদের প্রতি তাকাইতেছেন এবং আমাদের সাথে আসিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির

দেখা যাইতে লাগিল। তিনি মাঠের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, পার্ব্বতী বারণ করিয়াছে, আর যাইব না। আমি ফিরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। স্বামীও তাঁহার মুখ পানে তাকাইলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, এস মা। আমরা যাইতে যাইতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় মাঠে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। যতদূর দেখা গেল, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা জীব হইয়া ভগবান্‌কে মাঠে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। এমন স্নেহ কেহ কি করে? স্বামী নাগমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, আমাকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া নৌকাভাড়া করিবেন। নাগমহাশয়ের এমন মহিমা, আমরা নদীর পার ঘাটে দাঁড়াইয়াছি, একখানা নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল, যেন নাগমহাশয় আগের ভাগে নৌকা ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

আমাদের উপর নাগমহাশয়ের দয়ার শেষ নাই। তিনি আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যেমন ৫।৭ বৎসরের ছেলে ও মেয়েকে বিবাহ দিয়া, তাহাদের খেলা দেখিয়া জনক ও জননী স্নেহে আত্মহারা হন, সংসার ভুলিয়া যান, নাগমহাশয়ও তেমন আমাদিগকে দেখিয়া সুখী হইতেন। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, স্বামীর বয়স ২০ বৎসর। এক রাত্রিতে আমি ঘরের মধ্যে শুইয়াছিলাম, নাগমহাশয় ও স্বামী সেই ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। ভোরে উঠিয়া নাগমহাশয় বসিয়া আছেন। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া, উঠিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া নাগমহাশয়কে দেখিতেছি। স্বামী তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। নাগমহাশয়ের কাছে

যাইবার পূর্ব্বে একটী কথা লইয়া মতদ্বৈধ হইয়াছিল। আমি চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া, আবার নাগমহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলাম। স্বামী আমার ভাব দেখিয়া চুপি চুপি হাসিতে লাগিলেন। নাগমহাশয়ের সাক্ষাতে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। আমি অতিশয় জব্দ হইলাম। নাগমহাশয় সস্নেহে একবার স্বামীব দিকে চাহিলেন, আবার আমার দিকে তাকাইয়া জোরে হাসিয়া উঠিলেন। আমি লজ্জা পাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। স্বামী বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি নাগমহাশয়ের কাছে যাইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি হাসিলেন কেন? নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া আরও হাসিতে লাগিলেন। আমি লজ্জা পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন তামাকের জন্য নারিকেলের বাকল দ্বারা আগুন তৈয়ার করিতেছিলেন। তামাক খাইতে খাইতে স্নেহের সহিত আমাকে বলিলেন, দেখ না, কাঁচা বাকলে আগুন করায় হুঁকায় টান দিলেই কাশি আসে। তাঁহার স্নেহমাখা কথা শুনিয়া, স্নেহে বশীভূতা হইয়া, তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। নাগমহাশয়ের উপদেশ সকালবেলা সত্যযুগ, এসময় ভগবানে মন রাখিতে হয়। নাগমহাশয়কে সামনে পাইয়া স্বামী ও আমি মনদিয়া ভগবান্‌কে দেখিতে লাগিলাম। সত্য যুগ, পাখীগণ মনের আনন্দে নাগমহাশকে ঘেড়িয়া ডাকিতেছিল, তাহা শুনিয়া মর্ত্তলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে-ছিলাম। বেলা হইল। সকলেই ভগবান্‌কে ছাড়িয়া স্বস্বকাজে ব্যস্ত হইল। চারি পাঁচ দিন হইল দেওভোগে আসিয়াছি। আমরা বাড়ীতে আসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। স্বামীর

অনেক ছুটি আছে। তাঁহার ইচ্ছা একবারে কুচিয়ামোড়ার নৌকা ভাড়া করেন। আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, এই মাসে কুচিয়ামোড়া যাইতে হইবে। তিনি স্নেহের সহিত বলিলেন, চৈত্রমাসে যাইতে নেই। নাগমহাশয়ের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ছাড়িয়া পঞ্চসার আসিলাম।

একদিন আমার কাকা বিমলাবাবু ও আমি দেওভোগ গিয়াছি। আসিবার সময় আমার এক পিশতুতো ভগ্নিকে সঙ্গে আনিতে হইবে। দেওভোগ গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দিরের নিকট তাহাদের বাড়ী ছিল। রাত্রে তাহাকে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে নিয়া আসিতে পারা যায় না। সন্ধ্যার সময় আমরা রওনা হইলাম। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে কাকাকে বলিলেন, আপনি ভৌমিক বাড়ী গেলে, ও কোথায় থাকিবে? আমি সঙ্গে আসিব কি? কাকা বলিলেন শীতের সময় আমাদের সাথে যাইতে আপনার কষ্ট হইবে। জগবন্ধুবাবু আমাদের সাথে যাইবেন। খুকী তাঁহার সহিত থাকিবে। ভক্তবৎসল নাগমহাশয় ভক্তকে জানাইবার জন্য বলিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির যে দিঘির পাড়ে অবস্থিত, তাহার উত্তর পারে এক বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী থাকেন। তাহার নিকট খুকীকে রাখিয়া আপনি ভৌমিক বাড়ী যাইবেন। নাগমহাশয়ের কথা মত কাকা আমাকে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। আমি দরজার নিকট গিয়াছি, বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? আমি বলিলাম, আমি নাগমহাশয়ের ভাইয়ের মেয়ে। নাগমহাশয় আমাকে আপনার কাছে বসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবী আমার

দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি, নাগমহাশয় আমার কথা বলিয়াছেন? তাহা শুনিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় যে তাহাকে মনে করিয়াছেন, উহা তাহার বহুভাগ্য। বৈষ্ণবী বলিলেন, এস-মা, এস-মা লক্ষ্মী, ঘরে আসিয়া বস। আমি তাহার ঘরে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া নাগমহাশয়ের কথা বলিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বাজারে যাওয়ার সময় কোন কোন দিন তাহার সাথে দেখা করিয়া যাইতেন। নাগমহাশয়ের অনেক কথা বলিয়া আমাকে মিষ্টি খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম, নাগমহাশয় আমাকে খাইতে দিয়াছেন, আমি আর এখন খাইতে পারিব না। অবশেষে আমাকে একটী পান খাইতে বলিলেন। আমি পান হাতে নিলাম। এমন সময় আমার ভগ্নি আসিয়া আমাকে ডাকিলেন। বৈষ্ণবী আপন সন্তানের মত আমাকে লইয়া রাস্তায় পৌছাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবীকে দেখিয়া, আমার নাগমহাশয়ের মহিমা মনে পড়িতে লাগিল। তিনি গুপ্তভাবে কোথায় কাহাকে পরিচয় দিয়াছেন, কে জানে?

নাগমহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; তাই স্নেহের বশীভূত হইয়া আমাকে তাঁহার বৈষ্ণবী ভক্ত দেখাইলেন। গোপনে তাঁহার কত ভক্ত আছে; তাহাদের একজনকে দেখাইবার জন্য তিনি জগবন্ধুবাবুকে আমাদের সহিত যাইতে মানা করিলেন। বৈষ্ণবী নাগমহাশয়ের বিশেষ বিশ্বাসপাত্রী ছিলেন। নচেৎ নাগমহাশয় আমাকে বৈষ্ণববাড়ীতে বৈষ্ণবীর নিকট বসিয়া থাকিতে বলিতেন না। তিনি বিচার করিয়া কাজ করিতেন। যে কাজে দোষ আসিতে পারে, তিনি কখনও সেই কাজ

করিতে বলিতেন না। আমি না বুঝিয়া অনেক সময় যাহাতে নিন্দা করিতে পারে, সেই ভাবে চলিয়াছি। কোন বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না। নাগমহাশয় স্নেহের সহিত আমাকে বলিতেন, মা, যাহা হবার, তাহা হইবেই। তবু হুঁষ করিয়া কাজ করিতে হয়। মানুষ শব্দের অর্থ মান ও হুষ। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে এত সাবধানে রাখিতেন, কখনও অন্য বাড়ীতে শুইতে দিতেন না। দুর্গা পূজার সময়, তাঁহার বাড়ীতে কত লোক হইত। তাঁহার বাড়ীর নিকটে চৌধুরী বাড়ী ছিল। সেই বাড়াতে নাগমহাশয়ের বাড়ীর অনেক স্ত্রীলোক শুইতেন। আমি নাগমহাশয়ের বাড়ীতে শুইতাম। এমন কি, তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করিলে, যখন তিনি নিয়মানুসারে বড় ঘরে শুইতেন, তাঁহার ও মাঠাকুরাণীর বিছানা ঘরের এক পাশে হইত, আমার বিছানা অন্য পাশে করাইতেন। আমি সেই বিছানায় শুইতাম। যদি কোন সময় আমি একাকী দেওভোগ থাকিতাম, বড় ঘরে তিনি ও মাঠাকুরাণী এক বিছানায় শুইতেন, একটু দূরে অন্য বিছানায় আমি শুইতাম। যতদিন ঠাকুরদাদা জীবিত ছিলেন, তিনি স্বামী স্ত্রীকে একঘরে শুইতে দিতেন। অন্য লোকের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানি না। তিনি স্বামীর সঙ্গে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঠাকুরদাদার দেহাবসান হইলে, তিনি বলিলেন, বাপমহাশয় এই বাড়ী ভালবাসিতেন, আমি তাঁহার বাড়ী এমন পবিত্র রাখিব, যেন কোন মতে এই বাড়ীতে মৈথুন না হয়। স্বামী ও স্ত্রী এই বাড়ীতে একত্র শুইতে পারিবে না। যদি কখন স্বামী ও আমি দেওভোগে যাইতাম, সঙ্গে অন্য লোক থাকিত না, মাঠাকুরাণী ও আমি এক ঘরে শুইতাম, স্বামী ও নাগমহাশয় ভিন্ন ঘরে শুইতেন।

একদিন মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের সহিত কোন বিষয়ে বাদানু-বাদ করিয়া রান্না ঘরে একাকী শুইলেন। নাগমহাশয় ও স্বামী বড় ঘরের বারান্দায় শুইলেন, আমাকে বড় ঘরের মধ্যে শুইতে বলিলেন। যে নাগমহাশয় আমাকে এত যত্ন করিয়াছেন, তিনি অতিশয় বিশ্বাসিনী না হইলে বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আমাকে একাকী থাকিতে বলিতেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মেয়েরা যে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুড়িয়া বেড়ায়, নাগমহাশয় তাহা একবারেই পছন্দ করিতেন না। সারদাপিসী একবার গণকবাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় অতিশয় বিরক্তির সহিত স্বামীর নিকট অনেক কথা বলিলেন। স্বামী চিরদিনই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া ধর্ম্ম ও সংসারের বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। স্বামী কোনদিনও পাড়ায় বেড়ান ভাল বাসিতেন না। তাহা নাগমহাশয়ের নিকট শুনিয়া, তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে যতটা ব্যক্ত করিতে পারিলেন, তাহা বলিয়া আমাকে বলিলেন, ভগবান্‌কে বলিয়া দিতে হয় না, তিনি নিজেই জীবের কল্যাণের জন্য বিধি করিয়া যান। তোমাদের সংসারের কাজ করিয়া বাকি সময়টুকু ঘরে বসিয়া থাকিলে, দুইকুল বজায় থাকে। যে মেয়ে পাড়ায় ঘোড়ে, তাহার একুলও হয় না, ওকুলত তার নাই। পাড়ায় বেড়াইলে, দলে মিশিয়া কেবল ইয়ারকি দিয়া ঘুড়িতে ইচ্ছা করে। সংসারের কাজই নিয়ম মত করিতে পারে না, ধর্ম্মকর্ম্ম আর কখন করিবে? কাজ ঠিক মত না হইলে, সংসারে যন্ত্রণা আসিবে, নানা মত অশান্তি আপনিই আসিয়া জুটিবে। নাগমহাশয় জীবের মঙ্গলের জন্য বিরক্তি দেখা-ইলেন! জীবের উপর তাঁহার কত দয়া। যখন আমি ব্রহ্মা

বিষ্ণু শিবের মৌখিক কাজ দেখিয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি দয়া করিয়া আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের কাজ দেখিয়া আমার মনে হইত, তিনি যুবতী রমণীর সঙ্গে থাকিয়া, অনাবিলমনে জীবন-যাপন করিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার আর কোন ভুল নাই। তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাহা জানি না, তবে তিনি যে স্থানে ছিলেন, যদি কোথায়ও থাকিয়া থাকে, সেই স্থানে মৈথুন নাই। তিনি জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মভাব লইয়া আছেন। যদি জীব সেই স্থানে যায়, সেও ব্রহ্মভাবে মগ্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহার ব্রহ্মময় রূপ কিম্বা চিন্ময়রূপ অনুভব করে। আমার মনেরভাব নাগমহাশয় কার্য্যত দেখাইয়া গেলেন। পিতার নাম লইয়া, তাঁহার জন্মভূমি হইতে মৈথুন উঠাইয়া দিলেন। পিতা জীবিত থাকিতে কাহাকে কোন কথা বলেন নাই, স্ত্রীবিয়োগের পর পিতা উর্দ্ধরেতা হইয়া ছিলেন। দেবতারাও যখন জীবভাবে অভিভূত, তাঁহার পিতার সেইভাব থাকা আর অশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে স্থানে যে কাজ হইয়া থাকে, সেই স্থানে এমন কাজ হইতে কি দোষ আসিবে? নাগমহাশয় দয়া করিয়া দীনদয়ালের ঘরে আসিয়াছেন, যতদিন দীনদয়াল ছিলেন, দীনদয়ালের বাড়ী বলিয়া সকল কাজ হইতে দিলেন। দীনদয়ালের অভাবে নাগমহাশয়ের বাড়ী হইল। নাগমহাশয় যেমন, বাড়ীর বিধিও তেমন করিলেন। তাঁহার বিধি দেখিয়া আমার মনের সন্দেহ ঘুচিয়া গেল।

স্বামীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, স্বামী স্ত্রী একত্র থাকিলেই কি দোষ হইল? স্বামী বলিলেন, জীবের মনের বিশ্বাস কোথায়?

জীবের কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইলে, সুবিধা পাইলে, সে কখনও তাহা ছাড়িবে না। ভগবানেব সূক্ষ্ম বিচার। যদি তিনি কোন মহৎ লোককে একত্র শুইতে দেন, তাহাতে কোন দোষ না হইতে পারে, কিন্তু সংসারেব জীব তাহা বুঝিবে না। সেই মহৎ ব্যক্তিকে নিজেব সমান মনে করিবে, যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে। সুতরাং নাগমহাশয় বিধি করিলেন, এই বাড়ীতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে শুইতে পারিবে না। তিনি দয়া করিয়া জীবের নিকট আত্ম পরিচয় দিলেন। তাঁহাব কাজ স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে, আমি যে স্থানে আছি, তথায় মায়িক কাজ নাই। যদি কেহ আমাকে দেখিতে চাও, বাসনা ত্যাগ কর, মন পবিত্র কর, তবে আমাকে পাইবে। স্বামীর কথা শুনিয়া নাগমহাশয় নিয়মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, তাই তিনি অনেক সময় হাসিতেন ও বলিতেন, ও যাহা বলে ঠিক। আমি নির্ব্বোধ, তাঁহার নিয়মে যে মহান্ ভাব রহিয়াছে, একবারও ধারণা করিতে পারি নাই। স্বামী বলিলেন, তোমরা ভক্ত— ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিয়া ভুলিয়া থাক। আমি ভক্তিহীন, তজ্জন্য বিচার করিতে সুবিধা নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, কলসীতে জল ভরিতে গেলে, প্রথমে ভক্ ভক্ শব্দ হয়, কিন্তু কলসী পূর্ণ হইলে সাড়াশব্দ থাকে না। সেইরূপ তোমাদের ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়, কোন কথার কচ্‌কচি নাই। স্বামীর ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া, নাগমহাশয়ের স্থান কিরূপ তাহা মনে মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। নাগমহাশয়ের অনন্ত গুণ মনে পড়িতে লাগিল। নাগমহাশয় স্বামীর প্রায় সকল কথার প্রসংশা করি তেন। স্বামী ধর্ম্ম বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিতেন, তাহ

মধ্যে কোন কথা বুঝিতে না পারিলে, আমি নাগমহাশয়কে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, হাঁ, সে ঠিক বলিয়াছে।

নাগমহাশয় আমাদিগকে এত স্নেহ করিতেন যে, তাহার সীমা ছিল না। যদি কেহ আমাদের সামান্য নিন্দা করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিন আমি স্বামীর সাথে চলিয়া আসিব। দুই জন নাগমহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া আছি। সংসারের হিসাবে আমার লজ্জা বড় কম ছিল। নাগমহাশয় ত মনে বসিয়া মন দেখেন, তাঁহার সম্মুখে কি আর লজ্জা করিব? নাগমহাশয়ের নিকট কাহাকে লজ্জা করিতাম না। আমাদিগকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, এক বৈষ্ণবী নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? নাগমহাশয় স্নেহ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রসংশা করিয়া বৈষ্ণবীকে পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী সস্নেহে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবী যে ভাবে নাগমহাশয়ের সাথে কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় তাহার কত আপন। তিনি তাঁহার নিকট মনের কথা বলিয়া কত শান্তি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান, গৃহী-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, সকল লোকই নাগমহাশয়কে আপন মনে করিত, সকল লোকই একবাক্যে বলিত নাগমহাশয়ের মত হয় না।

নাগমহাশয় যে স্বামীকে স্নেহ করিতেন, তিনি তাহা গল্পছলে নাগমহাশয়কে বলিয়া ছিলেন। একদিন স্বামী ঢাকা হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অন্য লোক ছিল না। নাগমহাশয় বসিয়া আছেন। স্বামী প্রাণ ভরিয়া

তাঁহাকে দেখিতেছেন। নাগমহাশয় স্বামীকে একটী গল্প বলিতে কহিলেন। স্বামী বলিতে লাগিলেন, কোন এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, রাজা মন্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন। মন্ত্রী মনে প্রাণে রাজার সেবা করিতেন। রাজা খাইতে বসিলে, মন্ত্রী খাইয়া দেখিতেন, কেহ খাদ্য জিনিষে বিষ দিয়াছে কিনা। মন্ত্রী পরীক্ষা করিয়া দিলে পর রাজা খাইতেন। রাজা ঘুম যাইতেন, মন্ত্রী সমস্ত রাত্র অশিহস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, যেন কেহ রাজাকে বিনাশ করিতে না পারে। কোন কথা হইবে, মন্ত্রী যাইয়া তাহা বলিতেন, যাহাতে রাজার কোন দোষ না আসে। কালক্রমে মন্ত্রীর বিরাগ উপস্থিত হইল। তিনি সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া বনে চলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি ভগবানের জন্য পাগল হইয়া, এইভাবে রাত্রদিন তাঁহার চিন্তা করিতাম, তিনি অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিতেন, আমার ভবযন্ত্রণা শেষ হইত। মন্ত্রী মনে প্রাণে ভগবানের অনুকম্পা চাহিতে লাগিলেন। মন্ত্রী অনেক দিন হয় বনে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া, রাজা তাহাকে খুঁজিতে বনে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা বলিলেন, মন্ত্রী, দেশে ফিরিয়া চল। আর কতদিন এভাবে থাকিবে?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, আর দেশে যাইব না। আমি এখানে অতিশয় সুখে আছি। আমার রাজা বড় দয়ালু। যখন আমি আপনার নিকট ছিলাম, আপনি খাইতে বসিলে আপনার খাওয়ার পূর্ব্বে আপনার খাদ্য আমাকে খাইতে হইত। আমাকে দেখিতে হইত, আপনার খাদ্যে বিষ আছে কিনা। এখন আমি এমন রাজা পাইয়াছি,—আমি খাইব, রাজা দেখিতেছেন, তাহা আমার

খাওয়ার যোগ্য কিনা। আপনি শুইয়া থাকিতেন, আমি সারা রাত্রি খড়্গহস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, যেন কেহ আপনার প্রাণনাশ করিতে না পারে। এখন এমন রাজা পাইয়াছি, আমি ঘুমাইয়া থাকি, তিনি আমার পাহাড়া দেন। এমন দয়ালু রাজাকে ফেলিয়া কোন প্রাণ লইয়া দেশে যাইব।" নাগমহাশয় ইহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, চলুন, শুইয়া থাকি। স্বামী মনে মনে বলিলেন, এখন শোন আর যাহাই করুন। আপনি আমার রাজা। আজ সুবিধা পাইয়া প্রকাশ্যে বলিলাম।

নাগমহাশয়ের স্নেহাকর্ষণে জীব তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। পশুপক্ষী নাগমহাশয়ের বাড়ীতে থাকিত। সুবিধা পাইলে তাঁহার কাছে আসিত, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিত, যেন তিনি তাঁহাদের কত আপন। মানুষের তত সুবিধা হইত না। অনেক লোক এক সপ্তাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। মেয়েদের আরও অধিক সময় লাগিত। তাহারা এক মাসের পূর্ব্বে তাঁহার কাছে যাইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে বসিতে পারিত না। একবার ১১ দিন পূর্ব্বে দেওভোগ গিয়াছিলাম। এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, নাগমহাশয় কেমন হইয়া গিয়াছেন। জাগিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল না। আমার মন আরও উতলা হইয়া উঠিল। প্রবাদ আছে, কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া আবার ঘুমাইতে পারিল, সেই দুঃস্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। আর ঘুম না আসিলে, সেই স্বপ্ন দুঃখে পরিণত হয়। নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে রাত্র ভোর হইয়া গেল। পরদিন দেওভোগ যাইব মনে করিলাম। এমন লোক পাইতেছি না, যাহার সঙ্গে দেওভোগ যাইতে পারি। রবিবার হইলে পিতা বাড়ীতে

থাকিতেন। পিতা মুন্সীগঞ্জে আছেন। স্বামী ঢাকায় রহিয়াছেন। ভাইগুলি একেবারে ছোট। একজন পুরুষও বাড়ীতে নাই। পিতাকে খবর দিলে যদি তিনি আসিতে না পারেন, কিম্বা যদি তিনি বলেন, আমি রবিবার যাইব, আর দুই দিনেই বা কি বিশেষ ক্ষতি হইবে? আমি এইরূপ নানা রকম চিন্তা করিয়া, আমার এক পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমার সহিত দেওভোগ যাইতে পারেন কি না। তাহার বেশ বুদ্ধি ও সাহস আছে। তিনি বলিলেন, এই সেদিন দেওভোগ হইতে আসিয়াছ, এত তাড়াতাড়ি কেন? নাগমহাশয় আমাকে স্নেহ করিতেন, সেই সূত্রে সকলেই আমাকে একটু ভিন্ন মত ভালবাসিত। আমি বলিলাম, আমি কেন আজ যাইতে চাই. তাহা কাহাকে বলিব না। তবে আমি আজ দেওভোগ না যাইয়া পারিব না। আপনি আমার সহিত গেলে ভাল হয়। তিনি দেশের নৌকা ভাড়া করিলেন। বাড়ীর সকলেই দেওভোগ গেলেন।

নাগমহাশয় বারান্দার এক কোণে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা, এসেছ?" আমি বলিলাম, "আপনাকে যে সুস্থ দেখিতে পাইলাম, কত জনমের তপস্যার ফল। কল্য রাত্রিতে আমি কি দেখিলাম, মনের ব্যথা দূর করিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল না। ভোর হইলে মনে করিলাম, যে ভাবে হউক আজ দেওভোগ যাইব।" নাগমহাশয় তাহা শুনিয়া, আমরা শিশুকে লইয়া খেলা করিতে করিতে যেরূপ কথা বলি, তিনি সেই ভাবে হাসিতে হাসিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি দেখিয়াছি? আমি বলিলাম, "আপনি সমস্ত জানেন, আমি আর কি বলিব। যাহা

দেখিয়াছি, আমি তাহা মুখে আনিতে পারিব না।" আমি যতই বলি, আমি সেই কথা মুখে আনিতে পারিব না, তিনি ততই হাসিয়া বলেন, কি দেখিয়াছ? হঠাৎ আমার মনে হইল, তবে তিনি কি আমার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া, তাহা সত্যে পরিণত করিবেন। তিনি আমার পিসীর নিকট তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পিসী বলিলেন, খুকী যাহা তোমাকে বলিল না, তাহা কি আর আমাকে বলিয়াছে? প্রাতঃকালে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আমি তাহার সাথে দেওভোগ যাইতে পারি কিনা। তাহার কথামত আমি তাহার সঙ্গে আসিয়াছি। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মৃত্যু কি? কষ্টের শেষই মৃত্যু। কাল এমন ব্যথা হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইযাছি। ইহার শতাংশের এক অংশ ব্যথা হইলে জীবের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। পরমহংসদেব বলিতেন, ভগবান্ সম্বন্ধে যাহা দেখা যায়, সমস্তই সত্য। স্বপ্নে অন্য যাহা দেখা যায়, তাহা ঘুমের মধ্যে মনের চাঞ্চল্যের ফল। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বলিলাম, তুমি বসিয়া বসিয়া আমাকে মনে করিয়াছিলে, তাই আমি তোমার সেই অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি। এইরূপ দয়া করিয়া, যখন যে ভাবে থাক, আমাকে জানাইও। আমি যেন তোমার শেষ অবস্থা নাদেখি। নাগমহাশয় হাসিলেন। সময়ে দেখিলাম নাগমহাশয়কে মনে মনে যাহা বলিয়াছিলাম, তিনি তাহাই করিলেন। তৎপর মনে হইল, শেষ অবস্থায় যেন তোমাকে না দেখি, যদি এই কথা না বলিয়া— কহিতাম, যে তোমার আগে যেন মরিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত দিক রক্ষা হইত। সেই ভাব কি আমারমত জীবের হয়?

নাগমহাশয়ের ভাগিনেয় নরেন্দ্রচন্দ্র শিশু সময় হইতে তাঁহাকে ভালবসিত। নরেন্দ্রের ছয় মাস বয়স হইলে, আমার পিতা তাহার মুখে ভাত দিয়া, মামার ভাত খাওয়াইতে ভগ্নীসহ নরেন্দ্রকে দেওভোগ আনিলেন। তখন সে মাতার কোলে থাকিয়া একদৃষ্টিতে নাগমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিত। শিশুসময়ে মা যেখানে থাকিতেন, সেও সেইস্থানে থাকিত। বড় হইলে নাগমহাশয়ের পিছন ধরিল। সে প্রায় সর্ব্বদা দেওভোগ থাকিত। নাগমহাশয় যথায় যাইতেন, সেও তাঁহার সহিত তথায় যাইত। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গাঙ্গুলী নাগমহাশয়ের ভক্ত ছিলেন। তারাকান্ত বাবু ভক্তি দিয়া নাগমহাশয়কে বাঁধিয়াছিলেন। তিনি ভাবাবেশে নাগমহাশয়কে যেখানে সেখানে লইয়া যাইতেন। তারাকান্ত বাবু গান করিলে, নাগমহাশয়ের সমাধি হইত। নাগমহাশয় সমস্ত জানিতেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ হইতে রওনা হইয়া গান করিতে লাগিলে, নাগমহাশয় মহাভাবে উন্মাদের মত ঘরের বাহির হইতেন। নাগমহাশয়ের সেই অবস্থা দেখিলে, লোকে মনে করিত, তারাকান্তবাবু আসিতেছেন। তিনি দেওভোগে আসিয়া নাগমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিতেন এবং উভয়ে মহাভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। সামান্য জ্ঞান হইলে, তিনি নাগ-মহাশয়কে লইয়া জঙ্গলের ভিতর চলিয়া যাইতেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উভয়ই ভগবৎভাবে মত্ত থাকিতেন। কখন দুই তিন দিন এইভাবে কাটিত। নরেন্দ্র আড়ালে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া আসিত। কোন দিন কাঁটায় গড়াগড়ি দেওয়ায় তাঁহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইত। তাঁহাদের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া সে বিচলিত হইত এবং মাঠাকুরাণীর নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া সকল

কথা বলিত। *মাঠাকুরাণী কি করিবেন? ঘরে বসিয়া কাঁদিতেন। নরেন্দ্র নাগমহাশয়ের দেহে রক্ত দেখিয়া আর সুস্থ থাকিতে পারিত না, একবার দৌড়িয়া নাগমহাশযকে দেখিতে যাইত, আবার দৌড়িয়া বাড়ীতে আসিত। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যেন কেহ নাগমহাশকে বাড়ীতে লইয়া আসে। কে নাগমহাশকে আনিবে? তাঁহাদের নিকট যাইতে কাহারও সাহস হয নাই। নাগমহাশয়েব নিকট তাঁহার ভক্তের খেলা অপর ভক্তই দেখিতে পাইয়াছে।

একদিন নাগমহাশয় ঘরে শুইয়া তিনবার হরিবোল বলিয়া তারাকান্তবাবুকে বলিলেন, আমাকে বাহির করিয়া ফেল্‌রে। তারাকান্তবাবু তাঁহাকে বাহির কবিলেন না। অবশেষে নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, আর পারিলি না, আর পারিলি না, আর পারিলি না। ইহা বলিয়া তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। অনেক সময় চলিয়া গেল, তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেছেন না। ঠাকুরদাদা শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। মাঠাকুরাণী কাঁদিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বলিল, মামীমা, এ কি হইল? তারাকান্তবাবু মহাভাবে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দুই প্রহর পর নাগমহাশয়ের মন বহির্জগতে আসিল। মাঠাকুরাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব কি হইতেছে? আপনি কেন তিনবার হরিবোল বলিলেন? আবার তারাকান্তকে বাহির করিতে বলিলেন কেন? সে বাহির করিল না, তৎপর তাহাকে তিনবার বলিলেন, পারিলি না। তাহাই বা কেন করিলেন? আবার দুই প্রহর দম বন্ধ করিয়া কেন রহিলেন? নাগমহাশয় কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। মাঠাকুরাণী বার বার এই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নাগ

মহাশয় কোন মতেই কিছু বলিতে চাহিতেছেন না। অবশেষে ভক্তবৎসল ভগবান মাঠাকুরাণীর ভয় দেখিয়া বলিলেন, তিনবার হরিবোল বলিয়া উহাকে বাহির করিতে বলিয়াছিলাম! যদি সে তখন আমার কথামত আমাকে বাহির করিত, আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম। আমার শোকেও থাকিতে পারিত না, পাগল হইয়া যাইত। মাঠাকুরাণী বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ? তিনি ভয় পাইয়া, নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া, তারাকান্তবাবুকে অভিসম্পাত দিলেন, তুই নাগমহাশয়কে ভুলিয়া বিপথে যা। যদি আমি মনে প্রাণে তাঁহার সেবা করিয়া থাকি, আমার শাপ বিফল হইবে না। তারাকান্তবাবু আমার মত অভিশপ্ত হইয়া জীবনের ভার বহন করিতেছেন। সেই অবধি তিনি নাগমহাশয়ের নিকট যাওয়া বন্ধ করিলেন। সমস্ত মহাভাব ছুটিয়া গেল। পরে তিনি বারদির ব্রহ্মচারীর শিষ্য হইলেন। মাঠাকুরাণীর শাপের পূর্ণফল ফলিল।

নাগমহাশয়ের সেবা করিলে জীব শিব হন। শাপ দেওয়াত সামান্য কাজ। নাগমহাশয় দুঃখিত হইয়া, মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, তারাকান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না, তাই রক্ষা। তারাকান্ত শাপ দিলে, তোমার রক্ষার উপায় ছিল না। মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন। নাগমহাশয় ক্ষমা করিলেন। নাগমাশয়কে সুস্থ দেখিয়া ঠাকুরদাদা মৃতদেহে জীবন পাইলেন। নরেন্দ্র মামাকে বসিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া বসিয়া রহিল। মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তাঁহার জন্য রান্না করিতে গেলেন। তারাকান্তবাবুর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

নরেন্দ্র নাগমহাশয়কে অতিশয় ভালবাসিতেন। নাগমহাশয় বাজারে যাইতেন, নরেন্দ্রও তাঁহার সহিত বাজারে যাইত। নাগমহাশয় যত দিন বাড়ীতে থাকিতেন, ততদিন সে দেওভোগ ছাড়িয়া কোথায়ও যাইত না। নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে, সে নানাস্থানে ঘুরিয়া দিন কাটাইত। নাগমহাশয় বাড়ীতে গিয়াছেন শুনিয়া মুহূর্ত্তের তরেও সে অন্যত্র রহিত না। নাগমহাশয়ও তাহাকে এত ভালবাসিতেন, শেষ সময়ে তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কুক্ষণে নরেন্দ্র বিবাহ করিল। বিবাহের পর তাহার শ্বশুর তাহাকে পড়াইবার জন্য কাছার লইয়া গেল। পবিত্র দেহে পাপ স্পর্শ করিল। তাহার বিষম জ্বর হইল। প্লীহা ও লিবার লইয়া দেশে আসিল। শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। দেহত্যাগের এক মাস পূর্ব্বে নরেন্দ্র দেওভোগে গেল, নাগমহাশয়ের রাতুল চরণে শরণ লইল।

সারদাপিসী নরেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস অন্যত্র ছিলেন। একদিন নরেন্দ্রের প্রাণ নাগমহাশয়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। সে ব্যকুল হইয়া মাকে বলিল, আমাকে ঠাকুরমামার নিকট লইয়া চল। আমি তাঁহার কাছে গেলেই ভাল হইব। পিসী বলিলেন, এখানে ডাক্তার লাগাইয়াছি, তুমি রীতিমত ঔষধ খাইতেছ, সামান্য ভালও হইয়াছ। এখন এই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। নরেন্দ্র বলিল, আমি ঠাকুর-মামার কাছে গেলেই ভাল হইব। আমি তাঁহার কাছে না যাইয়া আর পারিব না। নরেন্দ্রের আগ্রহ দেখিয়া সারদাপিসী তাহাকে লইয়া দেওভোগ গেলেন। মৃত্যুর চারি, পাঁচ মাস

পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্র সংসারের লোকের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। কাহার কথা শুনিতে পারিত না। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। নাগমহাশয়কে দেখিয়াই তাহার যন্ত্রণা কমিয়া গেল। অনেক দিনের পর যাতনার হাত এড়াইয়া নরেন্দ্র নাগমহাশয়কে দেখিতে লাগিল। তাহার যাতনা একেবারেই চলিয়া গেল। নাগমহাশয় তাহার সাক্ষাতে না রহিলে, সে ছট্‌ফট্‌ করিত, নাগমহাশয়কে দেখিলেই আবার সুস্থ হইত।

একদিন আমার পিতা দেওভোগ গিয়াছেন, তিনি নরেন্দ্রের শয্যার নিকট যাইয়া দেখিলেন, নাগমহাশয় তাহাকে কি বলিতেছেন, আরও নিকটে যাইয়া শুনিলেন, নাগমহাশয় তাহাকে কহিতেছেন, মরিবি, তাতে ভয় কি? ঠিক হইয়া থাক্‌ না। নরেন্দ্র নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। নাগমহাশয় তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। পিতা দেখিলেন যেন নাগমহাশয় তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহার হৃদয়ের তাপ দূর করিতেছেন। তখন পিতা মনে মনে নাগমাশয়কে বলিলেন, তুমি যাহার সহায়, তাহার আবার মরণের ভয় কি? তিনি পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, বস। পিতা বলিলেন, আমি এখনই চলিয়া যাইব। নাগমহাশয় বলিলেন, কেন কষ্ট স্বীকার করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া আস। একদিনও থাক না। আসিয়াই আবার চলিয়া যাও। পিতা বলিলেন, আপনাকে দেখিতে আসি, দেখিয়া চলিয়া যাই।

পিতা বাড়ীতে আসিয়া আমাকে বলিলেন, নরেন্দ্রকে দেখিলে মনে হয়, সে ঠাকুরভাই ছাড়া অন্য কিছুই যেন জানে না। কতকদিন পরে শুনিলাম, নরেন্দ্র আর ইহ জগতে নাই। আমরা

সকলে নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলাম। তখনও পিসী তথায় ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নরেন্দ্রের মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছে? তাহার কি নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে। নাগমহাশয় বলিলেন, তাহার নির্ব্বাণ হয় নাই। যে দিন সে মরিবে, আমি আগের ভাগেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলান। একজ্বর ছাড়িয়া আসিতে লাগিল। একজ্বর ছাড়ার সময় মানুষ মরে। যদি সে দিন সে বাঁচে, সেই জ্বরে আর কোন ভয় থাকে না। আমি রাত্রিতে শুইলাম না। তাহার কাছেই বসিয়া রহিলাম। অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সকলে আমাকে শুইয়া থাকিতে বলিল। আমি শুইতে গেলাম। নরেন্দ্র আমাকে ডাকার জন্য সারদাকে বলিল। সারদা তাহাকে বলিল, তোমার মামা এই শুইতে গেলেন, এখন তাঁহাকে কি করিয়া ডাকিব? যখন নরেন্দ্র দেখিল, তাহার মা আমাকে ডাকিল না, সে নিজেই মামা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহার মাথার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। যে হাত সে পূর্ব্বে তুলিতে পারিত না, সে সেই হাত তুলিয়া আমার পা স্পর্শ করিল এবং নিজের কপালে স্থাপন করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ বাহির হইল। আমি তাহার নিকটে গেলেই সে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল।

আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার নির্ব্বাণ হইল না কেন? সে যে জীবের অসাধ্য কাজ করিল? এমন সুযোগ কাহার ঘটে? মৃত্যু সময় অসাড় হাত তুলিয়া ও পায় হাত দিয়া নমস্কার করিয়া, ও মুখের উপর বদ্ধদৃষ্টি রাখিয়া,

চিরবিদায় গ্রহণ করিল, তাহার নির্ব্বাণ হইল না? তবে কি জীবের নির্ব্বাণ হয় না? নাগমহাশয় বলিলেন, মা, নির্ব্বাণ বড় কঠিন জিনিষ। আমি তাঁহাকে মনে মনে বলিলাম, তোমার চিন্তা করিলে, জীব নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। তোমার রূপ যাহারা মনে রাখিতে পারে, তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিবে, তাহা আর বেশী কি? যাহারা তোমাকে মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের নিকট নির্ব্বাণ কঠিন হইতে পারে। উনি তোমার পার্ষদ ভক্ত, তাই তাহাক বাখিয়া দিলে। আমি তোমার রূপ চিন্তা করিব। যদি সকল সময় তোমার সমস্ত চেহারা মনে করিতে না পারি, তোমার একটা অঙ্গুলির চিন্তা করিব। নাগ-মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নির্ব্বাণ হইলেত কথাই নাই। তবে রমণী পতিগতপ্রাণ হইলে পতিলোকে যায়। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি কোন লোক চাহি না। তোমার একটী অঙ্গুলি চিন্তা করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিব। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নির্ব্বাণ হইলেত কোন কথাই নাই। কত জীবন গিয়াছে, তাহার তুলনায় ৬০।৭০ বৎসর চ'খের পলক। ভগবান্ হৃদয়ের জিনিষ। তাঁহাকে হৃদয়ে ডাকিলে, হৃদয়ে পাওয়া যায়। বাহিরে তাঁহার সন্ধান হয় না। কাহার মুখে শুনিয়াছ, কোথায় নৌকা করিয়া গেলে, তাঁহাকে পাওয়া যায়? আমি মনে মনে বলিলাম, দেওভোগে নৌকা করিয়া আসিলে, ভগবান্কে দেখা যায়। যখন তোমার চেহারা ভুলিয়া যাইব, এখানে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব। যদি তোমার সমস্ত চেহারা মনে না রাখিতে পারি, একটী অঙ্গুলি মনে রাখিব। নাগমহাশয় বলিলেন, তাঁহাকে হৃদয়ে পাওয়া যায়।

তিনি হৃদয়ে আছেন। তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে না পাইলে, বাহিরের দেখা কোন কাজের নয়। এই কথায় আমার ভয় হইল। আমার মনে হইল, তিনি বোধ হয় আর অনেকদিন দেওভোগে থাকিবেন না।

কয়েকদিন পর স্বামী পঞ্চসার গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। নাগমহাশয় যে বলিয়াছিলেন, নৌকা করিয়া কোথায় গেলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি হৃদয়ের জিনিষ, হৃদয়ে খুঁজিতে হয়, এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয় যে ভগবান্, ইহা সকলের নিকট বলিও না। যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হন, নিজগুণে ভক্তের নিকট ধরা দেন। অধিক লোক জানিলে, তিনি চলিয়া যান। স্বামীর কথা শুনিয়া নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িল। স্বামীকে বলিলাম, এই জন্য তিনি তোমার নিকট সমস্ত কথা বলিতে বলিয়াছেন। নরেন্দ্রের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হইতে পারে না। নাগমহাশয়ের ইচ্ছায় নরেন্দ্র তাঁহার ভক্ত হইয়া রহিল। ঐ পদযুগল স্পর্শ করিয়া, ও চরণধূলি মস্তকে দিয়া মরিলে, যদি নির্ব্বাণ না হয়, তবে কোন্ অবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে, তাহা জানি না। ভগবানের কৃপায় ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী হইতে পারে? যখন হরিদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যের মুখের দিকে চাহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার সুখে অভিভূত হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহার মৃতদেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কতই না নাচিয়াছিলেন। তাঁহার চরণধূলা শিরে ধারণ করিয়া যাত্রা করিলে কি আর ফিরিয়া আসিতে হয়?

স্বামী সুবিধা পাইলেই নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইতেন।

এক শনিবার তাঁহাকে দেখিতে দেওভোগ যাইতেন, অন্য শনিবার পঞ্চসার আসিতেন। কখন কখন পঞ্চসার হইতে ঢাকা যাওয়ার সময় একবার নাগমহাশয়কে দেখিয়া যাইতেন। প্রাতে পঞ্চসার হইতে রওনা হইয়া ৮ ঘটিকার সময় নারায়ণগঞ্জ পৌছিতেন। ১০টার সময় ঢাকার ট্রেণ ছাড়িত। স্বামী ভাবিতেন, বৃথা কেন দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকি, নাগমহাশয়কে একবার দেখিয়া আসি। তিনি দেওভোগ যাইতেন। নাগমহাশয় তাহাতে অতিশয় সুখী হইতেন। আধঘণ্টার বেশী তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। একদিন চলিয়া আসিতেছেন, নাগমহাশয়ের নিকট একটী লোক ছিলেন। তিনি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও এই এল, এখনই আবার চলিয়া গেল কেন? নাগমহাশয় বলিলেন, আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আজ কলেজ আছে, তাই তাড়াতাড়ি যাইতেছে।

নাগমহাশয়ের এমন শক্তি ছিল, তাঁহাকে দেখিলে মনের বাসনা পূর্ণ হইত, মনে শান্তি বিরাজ করিত। দেহ অসুস্থ থাকিলেও নাগমহাশয়ের পবিত্র বাতাসে অসুখের গতিরোধ হইয়া যাইত। একবার আমি ও আমার বড় ভগ্নী ৪।৫ দিন দেওভোগে ছিলাম। চৈত্র মাস। আমি মধ্যাহ্নে আহার করিয়া শুইয়া আছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বমি হইল। যখন আমি বমি করিতে ছিলাম, আমার ভগ্নী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনদা, তুমি বমি করিতেছে? আমি হাঁ বলিলে, তিনি নাগমহাশয়ের বড় ঘরে চলিয়া গেলেন। আমার বমির বেগ কমিয়া গেল। মুখ ধুইয়া আবার শুইয়া রহিলাম। বৈকালে কীর্ত্তন হইতেছিল। নাগ-মহাশয় বাহিরে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার কাছে

বসিলাম। তখনও বমির অল্প বেগ ছিল। পেটব্যাথা করিতেছে। নাগমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে অমন দেখা যায় কেন? আমি বলিলাম, তিনবার বমি করিয়াছি, আবার বমি হইবে। পেটও ব্যথা করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কখন্ বমি করিয়াছি। আমি বলিলাম, আমি ঘুমাইয়াছিলাম, জাগিয়া বমি করিলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, যদি খাইয়া বমি হইত, মনে করিতাম, মাছি কিম্বা চুল খাইয়া বমি হইয়াছে। এত পরে বমি হইল কেন? এতক্ষণ আমাকে বল নাই কেন? আমি বলিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, দিদি আপনাকে বলিয়াছেন। আমার ভগ্নী সেই স্থানে ছিলেন। তিনি বলিলেন তিনি তাহা জানিতেন না। আমি বলিলাম, তুমি আমাকে বমি করার সময় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি বমি করি কি না। আমি হাঁ বলায় তুমি বড় ঘরে চলিয়া গেলে। তোমার ভুল হইয়াছে। আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নাগমহাশয় কোন কথা বলিলেন না। একভাবে কথা চাপা দিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তুই ভগ্নীর অতিশয় ভাব দেখি। সেইজন্য তোমার কোন খোঁজ রাখি না। আমি মনে করি, তোমার কিছু হইলে, তোমার বড় ভগ্নী তাহা আমাকে বলিবে। কোথায় শোও, কখন ঘুমাও, আমি কিছুই দেখি না। নাগমহাশয় এই কথা বলিতেছেন, আমি পায়খানায় গেলাম। আমার অতিশয় পাতলা দাস্ত হইল। বড় ভগ্নী সঙ্গে গিয়াছিলেন, তিনি নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আমি যেন ঘাটে যাইয়া অধিক জল না ঘাটি। আমি পায়খানা হইতে আসিয়া ভগ্নীর আনিত জলে হাত মুখ ধুইলাম।

নাগমহাশয় কত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিছানা করা ছিল, তাহা ধরিয়া দেখিয়া, তাহার উপর আর একখানা তোষক পাতিয়া দিলেন। হাত পা যেন মাটিতে না পরে, তাহাও দেখিলেন। আমি সেই বিছানায় শুইলাম। নাগমহাশয় আমার কাছে বসিয়া রহিলেন। চুণে জল না থাকিলে জল দিয়া রাখিতে মাঠাকুরাণীকে বলিয়া, নিজেই চুণে জল দিলেন। আমি শুইয়া থাকিয়া নাগমহাশয়ের যত্ন দেখিতেছিলাম। তিনি জীবের জন্য কতই না করিয়াছেন! নাগমহাশয়ের এমনই মহিমা, তাঁহার পাতা বিছানায় শুইয়াই আমার পেটের ব্যথা, পেটে ডাক, বমি বমি একবারে কোথায় চলিয়া গেল, জানিতেও পারিলাম না। নাগমহাশয় আমার সামনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তাঁহার যত্ন দেখিয়া, সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া এত সুস্থ বোধ করিলাম যেন আমার কোন অসুখ হয় নাই। নাগমহাশয় আমাকে সুস্থ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। যেমন অন্য দিন সকাল বেলা ভগবানের কথা বলিতেন, সেই দিনও সেইরূপ বলিলেন।

নাগমহাশয় সময় সময় ভাবের ঘোরে বলিতেন, মাগো ভগবতী, মাগো আনন্দময়ী। তিনি আবার কখন বলিতেন, গুরুদেব শিব। তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত, ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত উক্ত এই সকল কথা শুনিলে, পাষণ্ডের মনও সময়ের তরে বিগলিত হইত। প্রাণের আবেগে বলার সময় নাগমহাশয়ের চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিত, যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি এই সব কথা বলিতেছেন। নাগমহাশয় মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে মায়ার লেশ মাত্র ছিল না। তিনি

প্রতিমুহূর্ত্তে জীবকে ভগবান্ স্মরণ করাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, জীব সুমস্তই ঠিক ঠিক করিতেছে, কেবল একটী মাত্র তাহার ভুল, সে মনে করে, সে সব করিতেছে। আমি হওয়ার আগেই সকল ঠিক হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের এত দয়া, আমি হওয়ার পূর্ব্বেই মাযের স্তনে দুগ্ধ দিয়া রাখিয়াছেন। শুধু একটু অহং জ্ঞানে জীবের এত দুর্গতি। যে পরমাত্মাস্বরূপ, তাহার এত কষ্ট কেন? অহংকার থাকায় আমিত্ব জ্ঞান আইসে, আমিত্ব জ্ঞান হইতে কর্ম্মের দায়িত্ব জন্মে। পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। নাগমহাশয়ের অমিয়মাখা উপদেশ শুনিলে, জড় পদার্থেরও জ্ঞান জন্মিত। তিনি পণ্ডিতকে পণ্ডিতের মত উপদেশ দিতেন, মূর্খকে সরল ভাষায় বুঝাইতেন। সকলেই নাগমহাশয়ের কথা বুঝিতে পারিত। একই সত্য নানা লোকের নিকট নানা ভাষায় বলিতেন, মূর্খ ও পণ্ডিত সমান ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। তিনি সকলকেই ভগবানের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, পোকার মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব আছে। সকলেই এক সময়ে ভগবানে লয় হইয়া যাইবে।

একদিন স্বামী ও আমি নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে অতিশয় অহংকার, তিনি স্বর্গের রাজা। এমন সময় তাঁহার সম্মুখ দিয়া একটী পিপিলিকা ভয়ে ভয়ে যাইতেছিল। ভগবান্ বিষ্ণু তাহা দেখিয়া হাসিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, আপনি হাসিলেন কেন? বিষ্ণু বলিলেন, এক সময় এই পিপিলিকা ইন্দ্রপুরীর রাজা ছিল। কৃতকর্ম্মের ফলে পিপিলিকা হইয়াছে। সকলেই কর্ম্মের অধীন। ইন্দ্রের অহংকার

চূর্ণ হইল। নাগমহাশয় স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এক দিন ইন্দ্র অহংকারের সহিত বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি ইন্দ্র-পুরীর রাজা, আমার উপযুক্ত এক পুরী তৈয়ার কর। এমন সময় লোমশমুনি ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। লোমশমুনিকে দেখিয়া ইন্দ্র মনের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি? আপনার আশ্রম কোথায়? মুনি বলিলেন, প্রভো, সকলে আমায় লোমশমুনি বলিয়া ডাকে। আমার আশ্রম নাই। আশ্রম করিয়াই বা লাভ কি? কতদিনই বা বাঁচিব? ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আয়ুঃকাল কত? মুনি উত্তর করিলেন, দ্বাদশটী ইন্দ্রের পতন হইলে, আমার বুকের একটী লোম পড়ে। এরূপে যখন আমার বক্ষের সমস্ত লোম পড়িয়া যাইবে, সেই সময় আমার মৃত্যু হইবে। ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তাহার অহংকার একবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমার মত দ্বাদশী ইন্দ্রের পতন হইলে, উঁহার একটী লোম পড়িবে এবং এইরূপে বক্ষের সমস্ত লোম পড়িয়া গেলে, তাহার মৃত্যু হইবে। ইহা জানিয়া সে বাড়ী ঘর তৈয়ার করিতেছে না, আর আমি নূতন করিয়া ইন্দ্রপুরী তৈয়ার করিতেছি।

নাগমহাশয় সময় সময় বলিতেন, কাম ছাড়িলেই রাম, রতি ছাড়িলেই সতী। আবার বলিতেন,

> যাহা রাম, তাহা নেহি কাম,
> যাহা কাম, তাহা নেহি রাম,
> দিবস রজনী নেহি এক ঠাম।
> আমল কমুকে করে ধ্যান,
> সংসারী হোকে বাতায় জ্ঞান,

সন্ন্যাসী হোকে কুটে ভগ,
এহি তিন কলিকা ঠক্।
হানিলাভে শোকাদিতে বশ না হইবে।
প্রাণী মাত্রে কায়মনবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিবে লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভোগিবে অনাসক্ত হৈয়া॥

একদিন আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কলি-কালে মনের পাপে পাপ নাই, ইহা কি সত্য? তিনি বলিলেন, মা, মনের একাগ্রতার জন্যই মুনি ঋষিগণ এত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। যদি ভগবানে মনের একাগ্রতা থাকে, তপস্যার দরকার কি? মনের একাগ্রতার জন্যই বহুকালব্যাপী উগ্রতপস্যা করা। মনত চঞ্চল। মন সব সময় বিষয় সকলে ঘোরে।

একদিন আমি নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। একটা কথা মনে উঠিতে লাগিল, মন কোন মতেই নাগমহাশয়ে থাকিতেছে না। তিনি আমার মনের ভাব দেখিয়া, আপনিই বলিলেন, মা, অভ্যাস। সামনে একটী আমগাছ ছিল, তিনি তাহা দেখাইয়া বলিলেন, মা, এই যে আমগাছ দেখিতেছ, আজ যদি আমি ইহাকে চালিতাগাছ বলি, কিছুতেই তুমি বিশ্বাস করিবে না; কারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে অভ্যাস করিয়া, মাথায় ছাপ পড়িয়া ঠিক হইয়াছে, এইটী আমগাছ। ইহা দেখিলেই মনে হইবে, এইটী আমগাছ। আম বলিয়া কোন একটী জিনিষ নাই শুধু চিনিবার জন্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে নাম দেওয়া হইয়াছে। অমন আকার ধরিলে আম, অমন আকার ধরিলে চালিতা। আকার দেখিলেই নাম মনে পড়িবে, নূতন নাম বিশ্বাস হইবে না।

সেইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মাথায় একটা ছাপ পড়িয়া যাইবে। তুমি যাহা ভাবিতে চাহিতেছ, তাহা আপনিই আসিয়া জুটিবে। এখন তোমার মনের যে অবস্থা, তাহা চলিয়া যাইবে।

এক সময় স্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল। আমরা যাহা অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এখন আমাদের মনে আসিয়া পড়িতেছে। একদিন নাগমহাশয় তাহাও বলিলেন। তিনি বলিলেন, ও (স্বামী) যে বলে অভ্যাসই আমাদের কর্ম্মের গোড়া, তাহা ঠিক। স্বামীর কথা মনে করাইয়া দিলে, আমি মনে মনে বলিলাম, পঞ্চসারে এক ঘরের কোণে বসিয়া স্বামী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি শুনিতে পাইয়াছ?

এক সময় একটী রমণী কোন বিষয়ে অনুতপ্ত-হইয়া নাগমহাশয়ের শরণাপন্না হইলেন। তিনি নাগমহাশয়কে সমস্ত কথা বলিলেন। একদা রাত্রিকালে নাগমহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন, সেই রমণী তাঁহাকে ধরিয়া কাঁদিতেছেন এবং বলিতেছেন, কি বিপদ, কি বিপদ! নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, বিপদ কিগো মা, বিপদই সম্পদ্। আমি সহস্র কোটি পাপ করিয়াছি, ব্রহ্মপদ লইব, কে ধরিবে? তিনি নাগমহাশয়ের অমিয়মাখাবাক্যে অকূল দুঃখসাগরে কূল পাইলেন। তিনি সেই অবধি নাগমহাশয়কে সাক্ষাৎ পতিতপাবন মনে করিয়া তাঁহার চরণতলে নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। বিপদে সম্পদে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। কোন সন্তান নাই। অনেক বয়সে একটী সন্তান হইয়া ৫।৬ বৎসর বাঁচিয়া ছিল। সন্তানটী মারা গেলে, নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া বলিলেন, ঠাকুর, তুমি আমার এতও করিলে?

সন্তানকে বাহির করিয়া আনিলে, তিনি উদ্দেশে নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া, মণ্ডপ ঘর ও তুলসীতলা নমস্কার করিয়া, যেস্থানে মৃত সন্তানকে লইয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে গিয়া বসিলেন। যাহারা তাহাকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল, তাহারা মনে করিয়াছিল, তিনি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িবেন। তাহার মুখ দেখিয়া মনে পড়িয়াছিল, সন্তানের শোকে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি এ দুরন্ত শোকের সময় নাগমহাশয়কে ভুলিলেন না। আকুল প্রাণে তাঁহাকে বলিলেন, ঠাকুর কি করিলে? ঠাকুর কি করিলে? নাগমহাশয়ের উপর বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চার্য্য বোধ করিতে হয়। যদি নাগমহাশয় নিকটে বসিয়া থাকিতেন, তবে মনে হইত, তিনি তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা দূর করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশে এমন বিষাদের সময় প্রাণ সঁপিয়া দেওয়া, তাঁহার কৃপা ভিন্ন হয় না।

কতক সময় পর আমার সহিত তাঁহার দেখা হয়। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে বলিলাম, নাগমহাশয় পিসীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এক জমীদারের একটী মাত্র ছেলে ছিল। আট বৎসর বয়সে সে মরিল। জমীদারের মনে অতিশয় দুঃখ হইল। অল্প সময় শোক করিয়া, সে বলিল, ছেলেটী মহাপাপী ছিল। আমার ঘরে আসিয়াছিল, মহা সুখ ভোগ করিত। তাহা না করিয়া, মরিয়া গেল। তাহার জন্য কেন কাঁদিব? সে শোক দূর করিয়া, ছেলের শবদেহ গঙ্গার পাড়ে সৎকার করিয়া, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। নাগমহাশয় আর একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। এক রাজার অনেক রাণী ছিল। এক রাণীর একটী ছেলে হইয়াছিল। রাণী তাহাকে সুস্থদেহে শোয়াইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল।

ঘরে যাইয়া শিশুকে মৃত দেখিয়া রাজার নিকট খবর দিল। রাজা ও রাণী শোকে অভিভূত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। নারদও অঙ্গিরা তাহাদের কষ্ট জানিতে পারিয়া অনেক সান্ত্বনা দিলেন, কিছুতেই তাহাদের শোক নিবারণ করিতে পরিলেন না। তৎপর তাঁহারা শিশুর আত্মা আনিয়া মৃতদেহে প্রবিষ্ট কবাইলেন। নারদ তাহাকে বলিলেন, তোমার পিতামাতা তোমার বিরহে কাতর হইয়া শোক করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে কেন ছাড়িয়া গেলে? শিশু তাহার ৫০।৬০ জীবনের কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সকলস্থানেই মাতা পিতা ছিলেন; তাহারাই বা কি করিয়া পর হইলেন এবং ইঁহারাই বা কেন আপন হইবেন? প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইহা বলিয়া, শিশু একদিকে চলিয়া গেল। তখন নারদ রাজা ও রাণীকে বলিলেন, তোমরা শিশুর কথা শুনিয়াছ। যখন সে তোমাদের আপন হইল না, তোমরাই বা কেন তাহার জন্য শোক করিবে? রাজা ও রাণীর শোক দূর হইল। নারদ ও অঙ্গিরা চলিয়া গেলন।

সেই রমণী নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি প্রত্যহ নাগমহাশয়ের পট পূজা করেন। নাগমহাশয়ের পূজা না করিয়া কোন জিনিষ খান না। তাঁহার পূজা করিয়া, তিনি অনেক শান্তিতে আছেন। যখন মনে কষ্ট হয়, নাগমহাশয়ের ছবি দেখেন। নাগমহাশয়কে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা মনে করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যখন নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছি, তিনিও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এক

দিন তিনি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অভক্ত কি ভক্ত হয় না? নাগমহাশয় বলিলেন, ভক্ত ও অভক্ত বলিয়া কোন ছাপ দেওয়া নাই। যে ভগবানকে ধরে, সেই ভক্ত।

একদিন নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, কুলোকের সঙ্গে মিশিতে হয় না, কুলোকের চিন্তা করা দোষ। তিনি বলিতেন, মেয়েদের ধর্ম্ম ঘরে বসিয়া হয়, কোথায়ও গিয়া তাহাদের ধর্ম্ম হয় না। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। মনের সকল সুখ-দুঃখ ভগবানকে মনে মনে বলিতে হয়। ভগবান্ আপন বলিয়া শুনিবেন। দোষ করিলে ভগবানেব নিকট ক্ষমা চাহিতে হয়, ভগবান্ আপন ভাবিয়া দোষ ক্ষমা করিবেন। ভগবান্ ভিন্ন জগতে কেহ প্রকৃত আপন নয়। কে কার স্বামী, কে কাহার স্ত্রী। কর্ম্মের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া জীব মিলিত হয়, আবার কর্ম্মের স্রোতে একদিকে কোথায় চলিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই যন্ত্রণার হাত এঁড়াইতে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। একজন লোক বলিয়া উঠিল, সেই রকম লোক কতজন আছে? নাগমহাশয় আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, কতজন দেখিয়া আমি কি করিব? আমি ভাল হইব, ভাল কর্ম্ম করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া যাইব। এই জগতে সুখী দেখিয়াছি, ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে। তিনি বলিয়াছেন, আমার জ্বালা নাই। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া, আমার মাঠাকুরাণীর কথা মনে পড়িল। আমি ভাবিয়া ছিলাম, তিনি নাগমহাশয়ের কাছে থাকেন, সর্ব্বদা নাগমহাশয়ের সেবা করেন, তাঁহার কি জ্বালা থাকিতে পারে? নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কেহ আমার নিকট বলিয়া যাইতে পারিবে না, তাহার জ্বালা নাই। সংসারের জ্বালায় দগ্ধ

হইয়া যাইতেছে। এক ঠাকুর বলিয়াছেন, তাঁহার কোন জালা নাই। তবে ভগবৎ কৃপা বিনা কেহ জালার হাত এঁড়াইয়া যাইতে পারে না। পথে পথে থাকিলে একদিন তাঁহার দয়া আসিয়া পড়ে। কেবল আলোচনা করিতে হয়। আলোচনা করিলেই তাঁহার কথা মনে পড়ে।

একদিন নাগমহাশয় স্বামীকে বলিয়া ছিলেন, দেখুন, সকল দিন খাটিলে সন্ধ্যার সময় জোর করিয়া পয়সা চাওয়া যায়। তখন বলা যায়, আমি সকল দিন খাটিয়াছি, আমাকে পয়সা দাও। সেইরূপ সারাজীবন ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে, জীবনের সন্ধ্যার সময় জোর করিয়া ভগবান্‌কে বলা যায়, তুমি দেখা দাও। যদি ছেলে পিতার নিকট সন্দেশ চায়, পিতা কখনও তাহাকে চিট্‌গুড় দিয়া ভুলান না। সেইরূপ যদি কেহ ভগবানের নিকট মুক্তি চায়, ভগবান্ কখনও তাহাকে মায়া দিয়া ভুলাইয়া রাখেন না। নাগ-মহাশয় সময় সময় বলিতেন, ভগবান্ দয়াবান, ভগবান্ দয়াবান। আবার বলিতেন, কর্ম্ম করিবার বেলায় আমি, উদ্ধার করিতে একজন। কষ্টদিতে অনেকেই পারে, ভগবান্ বিনা কেহ উদ্ধার করিতে পারেন না।

একদিন আমি স্বামীর সহিত নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি। নাগমহাশয় নিজের হাত খানা ধরিয়া বলিলেন, ইচ্ছা করিলে, এখনই আমি আমার হাত খানা কাটিয়া ফেলিতে পারি, মুহূর্ত্তমধ্যে জোরা লাগান ব্রহ্মার ছেলে পারেন কি না সন্দেহ। জীব সহজেই কুকর্ম্ম করিতে পারে, মাথা কুটিয়া ভাল কাজ করান যায় না। পদে পদে অপরাধ, ক্ষমা কর রঘুনাথ।

একদিন নাগমহাশয় ও আমি পথে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি।

নাগমহাশয় এক বৃক্ষকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহা কর্ম্মের দায় বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ও সময়ে মানুষ ছিল। যে যেমন কর্ম্ম করে, তাহাকে তেমন ফল ভোগ করিতে হয়। তখন আমার মনে হইল, আপনার কাছে বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাও সুখকর। কতজন্মের তপস্তার ফলে, আপনার বাড়ীতে বৃক্ষ হইয়া অবস্থান করিতেছে, আপনার পদরেণু শিরে ধারণ করিতেছে, আপনার হৃদয়-পূতকারী রূপ দেখিতেছে, আপনিও সর্ব্বদা স্নেহের সহিত উহাদিগকে দেখিতেছেন। কেহ উহাদিগকে কষ্ট দিতে পারিতেছে না। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছনে চলিলাম।

এক সময় আমার মনে হইয়াছিল, ভগবান্ এত দয়ালু, অথচ জীব কেন এত কষ্ট পায়? নাগমহাশয় বলিলেন,—

বিদ্যারূপে দিয়া জ্ঞান কা'কে কর পরিত্রাণ,
কা'কে অবিদ্যায় আবৃত করে মোহগর্ত্তে টেনে ফেল।

তিনি কখন বলিতেন, ফল ফলাচ্ছ কলা গাছে। কুমতি সুমতি উভয় মা ভগবতী। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। যখন নাগমহাশয় বলিতেন, কুমতি সুমতি উভয় মা ভগবতী, তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইত, তিনি যাহা কিছু দেখিতে পান, সকলই ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছেন। তিনি প্রতি ঘটে ভগবান্ দেখিতেছেন। তিনি বলিতেন, যত্র নারী, তত্র গৌরী। যত্র জীব, তত্র শিব। ভগবান্ সকলের মধ্যেই আছেন।

এক সময় একটী স্ত্রীলোক নাগমহাশয়ের জন্য পাগলিনী হইলেন। সকলেই নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইত, তিনিও সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন। তাঁহার মনের ভাব কেহ জানিত

না। নাগমহাশয় তাঁহাকে দেখিলেই ঘরের এক কোণে যাইয়া বসিতেন। তিনি দূর হইতে নাগমহাশয়কে দেখিতেন এবং হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া আমরা মনে করিতাম, তিনি নাগমহাশয়ের এক ভক্ত। তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কখন কখন দেখিয়াছি, তিনি নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেই, তাঁহার ছেলে-মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইত। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে বড় আসিতে দিত না। স্ত্রীলোকটীও সুবিধা পাওয়া মাত্র ছুটিয়া আসিতেন এবং নাগমহাশয়ের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি সময় সময় ঠাকুরদাদাকে বলিতেন, আপনার ছেলেকে কখন কৃষ্ণের মত, কখন স্বামীর মত দেখিতে পাই। ঠাকুর দাদা মাথা হেট করিতেন ও বলিতেন, তুমি বাড়ী যাও। স্ত্রীর সঙ্গেই দুর্গার মাতৃভাব। দুর্গা পশু-পক্ষীর যোনীকে মাতৃ-যোনীবৎ জ্ঞান করে। এই কথা বলিও না। তোমার পাপ হইবে। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ঠাকুরদাদার উপর ক্ষেপিয়া যাইতেন। তিনি সমস্ত দিন আপনমনে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে খাইতে বলিলে তিনি খাইতেন না, বাড়ীও যাইতেন না। সুতরাং সেই দিন নাগমহাশয় উপবাসী রহিয়াছেন। অতিথি না খাইলে তিনি জলগ্রহণও করিতেন না।

সেই রমণী কখন বলিতেন, তাঁহার গলার ভিতর জোঁক গিয়াছে কাক বসিয়া আছে এবং তাঁহার শ্বাসনালি ছিঁড়িয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেন। নাগমহাশয় চুপ করিয়া অন্যত্র বসিয়া থাকিতেন। স্ত্রীলোকটী সমস্ত দিন এই ভাবে ঠাকুরদাদার কাছে

বসিয়া রহিতেন এবং আপন মনে বকিতেন। নাগমহাশয়কে স্বামীভাবে চিন্তা করিতে করিতে বদ্ধপাগলিনী হইলেন। একদিন মাঠাকুরাণী অস্পৃশ্যা হইয়াছিলেন। নাগমহাশয়ের শোয়ার জন্ত মণ্ডপঘরে বিছানা করিয়া দিলেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গেই শুইয়া থাকিব। ভিন্ন ঘরে শুইলে ঐ স্ত্রীলোকটী আসিয়া আমাকে ধরিবে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, বর্ষাকাল। রাত্রিতে এত জল সাঁতার দিয়া সে কি ভাবে আসিবে? নাগমহাশয় বলিলেন, সে পাশের বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়া আছে, সময় হইলেই বাহির হইবে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আমি অশুচি, এ অবস্থায় আমি আপনাকে ছুঁইব না। আপনার ভয় কি? আপনি যে শিশু হইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন, এখনও সেই শিশুই আছেন। আমিও পাশের ঘরে রহিলাম। উহার এত সাহস হইবে না যে, সে আপনাকে ধরিবে। মাঠাকুরাণী অশুচি অবস্থায় কোন মতেই নাগমহাশয়ের সহিত এক বিছানায় শুইতে রাজি হইলেন না। নাগমহাশয় মণ্ডপ ঘরে শুইতে গেলেন। মাঠাকুরাণী রান্না ঘরে শুইলেন।

তাঁহারা শুইতে না শুইতেই সেই স্ত্রীলোকটী আসিয়া নাগমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, তুমি সন্তানকে কি ভাবে ধরিয়াছ? তুমি আমার মা। জয় সচ্চিদানন্দময়ী মা, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি জগতের নারীদিগকে সচ্চিদানন্দময়ী মা বলিয়া দেখিতেছি। এই যে আমার স্ত্রীকে দেখিতেছ, আমি ইহাকে দেখি যেন সচ্চিদানন্দময়ী মা আমাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। খাওয়ার সময় হইলে, সচ্চিদানন্দময়ী মা দয়া করিয়া আমাকে খাইতে দিতেছেন।

মা ভগবতী বিনা আমি আর কিছু জানি না। ইহা বলিয়া নাগমহাশয় তাঁহার পদ ধরিলেন। গোলমাল শুনিয়া মাঠাকুরাণী মণ্ডপ ঘরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, দুজনাই দুজনার পা ধরিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী নাগমহাশয়ের প্রতিবাসিনী ছিলেন। তিনি নাগমহাশয়ের ছোট ভগ্নির সমবয়সী। তিনি মাঠাকুরাণীকে বধূঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিতেন। মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে ছাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে বিস্তর গালাগালি দিলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আপনার লজ্জা নাই? আপনি কেমন ভদ্রলোকের মেয়ে? ৪।৫টী ছেলে-মেয়ে হইয়াছে, স্বামী জীবিত আছে, তবুও মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না? আপনি দেখিতেছেন, ইঁনি নিজের স্ত্রীর সহিত ভগবতী জ্ঞানে ব্যবহার করেন। ইহাকে নিকৃষ্ট ভাবে ধরিতে আপনার একবার ভয় হইল না? কুলে কালী দিতে সংসারে অন্যলোক পাইলেন না? সাধ কত, যিনি নিজের স্ত্রী সচ্চিদানন্দময়ী মা বলিতেছেন, তাঁহার পাশে শুইবেন? আমি এখনই আমার শ্বশুরকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব। মাঠাকুরাণীর ক্রোধ দেখিয়া এবং নাগমহাশয়ের নিকট নিরাশ হইয়া, তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরদাদা ঘরের বাহির হইয়া, নাগমহাশয়কে মা সচ্চিদানন্দময়ী বলিতে শুনিয়া, কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন, মেয়ের মাকে বলিব, ভাল ভাবে উহাকে না রাখিতে পারে, বাঁধিয়া রাখুক। সাপ লইয়া খেলা হইতেছে। নাগমহাশয় বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর আমাকে কত পরীক্ষা করিতেছেন। জয় রামকৃষ্ণ!

ঠাকুর দাদা আবার শুইয়া রহিলেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীর সহিত শুইলেন। এমন অবস্থা কে কোথায় দেখিয়াছে? নাগমহাশয় স্ত্রীকে সচ্চিদানন্দময়ীর মত দেখিতেন। অন্য রমণী তাঁহার সহিত পিচাশিনীর মত ব্যবহার করিলেও, তিনি তাঁহাকে ঘৃণা করিলেন না, সচ্চিদানন্দময়ী মা বলিলেন! এ কি জীবের সাধ্য? এক সময় নাগমহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, যখন চন্দন ও বিষ্টায় এক জ্ঞান হইবে, তখন প্রতি ঘটে ভগবান্ অনুভব করিতে পারিবে। স্ত্রীলোকটীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে হইল, ইনিই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন।

স্বামীকে এই কথা বলায়, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, আমি এখনই তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি কি আর মানুষ? সাক্ষাৎ দেবী। ভগবতী বিনা ভগবানের জন্য কেহ পাগলিনী হয় না। যে কোন ভাবে হউক, সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়িতে পারিলেই হইল। স্বামী ভাবে ভগবানে আসক্তি বেশী হয়। যে কোন ভাবেই হউক না কেন, যদি ভগবানে আসক্তি হয়, হৃদয়ের অন্যান্য বাসনা ভস্ম হইয়া যায়। জলন্ত আগুনে যাহাই ফেল না কেন, সকলই ভস্ম হইবে। জীবের কর্ম্ম যতই জঘন্য হউক না কেন, ব্রহ্মাগ্নির নিকট উহা অতি তুচ্ছ, মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হয়। ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছ। কামাতুরা রমণী কি কখনও ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা চরিতার্থ না করিয়া, তাহা ভুলিয়া থাকে? সে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিতে কি না করে? লজ্জা ভয় ভুলিয়া গিয়া, সদসৎ বিচার ছাড়িয়া দিয়া, সুপথ কুপথ না ভাবিয়া যে প্রকারে হউক, ভোগ করিতে পারিলেই জীবন সার্থক বোধ করে। তখন তাহার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না, যে কোন রূপে হউক, সেই বাসনা পূর্ণ

করিতে জীবন পণ করে। কামাতুরা রমণী কখনও পাগলিনী হয় না। পাগলিনীর মত কাজ করে—সদসৎ বিচার থাকে না বলিয়া, তাহাকে অন্যান্য লোক পাগলিনীহইয়াছে বলে, তাহাকে পাগলিনী বলে না। এই স্ত্রীলোকটী নাগমহাশয় হইতে কোন শারীরিক সুখ পাইলেন না। সংসারে অনেক লোক ছিল। পরে তাহাদের কাছেও যাইতে পারিতেন? তিনি সেইরূপ কোন চেষ্টা না করিয়া, নাগমহাশয়ের ভাব নিয়াই পাগলিনী হইলেন। কামভাবে নাগ-মহাশয়ের প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই আসক্তিতে সকল ভুলিয়া যাইয়া, নাগমহাশয়ের জন্য পাগলিনী হইয়া রহিয়াছেন। কৈ, নাগমহাশয়ের কোন ভক্তত সকল ভুলিয়া, তাঁহার জন্য পাগল হন নাই? তুমি তাঁহার ভক্ত হইয়া, এই স্ত্রীলোকে পাপিনী বলিতেছে? আমি পতিত হইয়া, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। সকল ভুলিয়া নাগমহাশয়ের জন্য পাগলিনী হওয়া মহা তপস্যার ফল। স্বামীর কথাগুলি শুনিয়া, তাঁহার নিকট লজ্জিতা হইলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, তুমি নাগমহাশয়ের প্রকৃত ভক্ত। তুমি নাগমহাশয়কে চিনিয়াছ। তুমি নাগমহাশয়ের গুণ অনুভব করিয়াছ। আমরা কেবল মুখে নাগমহাশয় নাগমহাশয় বলি। তিনি যে কি, তাহা একবারও ভাবি না। তাঁহার গুণ যে এত বড়, এক সময় তাহা চিন্তাও করি না। নাগমহাশয়কে ধরিলে যে কুভাব সুভাবে পরিণত হয়, তোমার কথায় আমার সেই জ্ঞান হইল। এতদিন আমি সেই স্ত্রীলোকের উপর বিরক্ত ছিলাম। আমি মনে করিতাম সে পাপিয়সী, সে অকারণ নাগমহাশয়কে অনেক কষ্ট দিয়াছে। তোমার কথায় আজ তাঁহার গুণ দেখিতে পাইলাম। স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমরা

ভক্ত, ভগবানের সামান্য কষ্ট দেখিলে, তোমাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগে। আমি পতিত, আমি জানি, যখন ভগবান্‌কে পতিত উদ্ধার করিতে হয়, তখন তিনি কতক পরিমাণে বেগ পান। জগামাধাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া, তাঁহাকে কলসির কাঁধার ঘা খাইতে হইয়াছিল। ইহা ভক্তদিগের নিকট ভাল লাগিবে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া, আমি বলিলাম, তোমার অহংকার করা উচিত নয়। নাগমহাশয় তোমার প্রশংসা করেন, তোমাকে স্নেহ করেন। তুমি কি করিয়া পতিত হইলে? তিনি হাসিতে হাসিতে তোমাকে বীর পুরুষটী বলেন, তোমার কথার বহু প্রসংশা করেন। আজ তাহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। তুমি ব্যতীত কেহ এই স্ত্রীলোকের ব্যবহারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারে নাই। আমরা সকলেই তাঁহার নিন্দা করিয়াছি। অগ্নিকুণ্ডে যে তৃণ কাষ্ঠ সকলই ভস্ম হইয়া যায়, একথা কেহ একবার চিন্তাও করিনাই। যখন স্বামী এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২১বৎসর ছিল। ১৭বৎসর বয়সে তিনি নাগমহাশয়কে প্রথম দর্শন করেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়াই ভাবিয়াছিলেন, উনি আমাদের মত মানুষ নন। নাগমহাশয় তাঁহাকে যেমন স্নেহ করিতেন, তেমন তাঁহার প্রশংসাও করিতেন। নাগমহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সময় আমার ও আমার পিতার নিকট হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বীরপুরুষটীর মত বসিয়া থাকে,

জনক রাজা ছিলেন ঋষি কিছুতে ছিল না ক্রটী।
একুল ওকুল দুকুল রেখে খেয়ে গেলেন দুধের বাটী॥

নাগমহাশয় প্রকৃতপক্ষে বিষ্ঠা ও চন্দন এক দেখিতে পারিয়াছেন। নাগমহাশয় ছাড়া এমন স্ত্রীলোককে কে না ঘৃণা

করিয়াছে? এই ঘটনা শুনিয়া গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন, নাগ-মহাশয়কে যে স্বামীভাবে ধরিয়াছিল, তিনি কি আর মানুষ? আমি তাহাকে এই স্থান হইতেই নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিলে কত জন তাঁহাকে ভগবান্‌ভাবে ধরিয়াছিল? যে ভাবে হউক তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই হয়। গোপীরা স্বামী ভাবে ধরিয়াই তাঁহাকে পাইয়াছিল। নাগমহাশয়ের নিলকঙ্ক চরিত্র কি সহজে ধরা যায়?

পাপ কাজে নাগমহাশয়ের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, কিন্তু তিনি পাপীকে কখন ঘৃণা করিতেন না। যদি কেহ পাপকাজ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইত, তিনি তাহাকেও আপন বলিয়া গ্রহণ করিতেন; সান্তনা দিতে বলিতেন, পাপ না জানিয়া পাপ করিলে, ভগবান তাহা ক্ষমা করেন। জানিয়া পাপ করিলে ভগবান্ কত কল্পে তাহার অব্যাহতি দেন, তাহা ঠিক নাই। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর যেন না হয়। অনুতাপে পাপের ক্ষয় হয়। 'অনুতাপ করিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে বলিতে হয়। ভগবান্ বিনা কেহ ক্ষমা করার নাই। অন্যায় কাজ করি আমি, উদ্ধার করেন তিনি। ভগবান্ বিনা এজগতে কেহ কাহার* আপন নয়। ভগবান্ সকলেরই আপন। পথে পথে থাকিতে হয়, এলো মেলো করিলে ধর্ম্ম হয় না। নাগমহাশয় মেয়ে পুরুষের মিশা মিশি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। নাগমহাশয় বলিতেন, পুরুষের নাচ দেখা যেমন, স্ত্রীলোকের নাটক যাত্রা দেখাও সেইরূপ দোষজনক। পুরুষের পক্ষে রমণী যেমন ধর্ম্মপথের কাঁটা, স্ত্রীলেকের পক্ষে পুরুষও তেমন নরকের পথ প্রদর্শক। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ঘরে বসিয়া হয়। কোথায় গিয়া তাহাদের

ধর্ম্ম হয় না। যে ভগবান্‌কে জানিতে পারে, তাহার কোন কথা নাই, যে ভগবান্‌কে জানে না, সে ঘরে বসিয়া পতিসেবা করিবে। পতি যাহা করিতে বলিবেন, তাহার তাহা করা উচিত। পতিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন কাজ করিবে না। যাহাতে পতি সুখী হন, সে কাজ করিবে। যাহাতে পতি মনে কষ্ট পান, কদাচ তেমন কাজ করিতে নেই। পতির মনে আঘাত দিয়া কোন কথা বলিবে না। যদি পতি কর্কশ কথা বলেন, তখন মনে করিবে, আমারই দোষ হইয়াছিল, তাই তিনি কড়া কথা বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। পতি স্ত্রীলোকের নারায়ণ। পুরুষ কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ করে, স্ত্রীলোকে ঘরে বসিয়া, পতিব্রতা ধর্ম্ম পালন করিয়া সেই ফল পাইতে পারে। নাগমহাশয় সকলকে উপদেশ দিতেন। যাহার যাহা উপযোগী, তাহাকে তাহা বলিতেন।

নাগমহাশয়ের খাওয়ার যত্ন দেখিয়া, কেহ মনে করিতে পারিত না, তিনি উহাকে ভাল বাসেন, আমাকে ভালবাসেন না। কেহ বলিতে পারিত না, নাগমহাশয় উহাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন, আমাকে নিকৃষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না। নাগমহাশয় সকলের সমান ছিলেন। তিনি বলিতেন, ভগবান্ সকলের সমান। নাগমহাশয় স্ত্রীলোককে কখন ঘৃণা করিতেন না। পুরুষকে পুরুষের উপযোগী উপদেশ দিতেন, স্ত্রীলোককে তাহার উপযোগী উপদেশ বলিতেন। নাগমহাশয় সকলকে পরমপুরুষ পরমাত্মা স্বরূপ দেখিতেন। যে উপায়ে পরমপুরুষকে জানা যায় তাহা সকলকে বলিতেন। পুরুষদেহ ধরিয়াছে বলিয়া যে তাঁহার আদর পাইবে এবং স্ত্রীদেহ ধারণ করিয়া যে তাঁহার অনাদর লাভ

করিবে, নাগমহাশয় তাহা কখন দেখান নাই। একদিন হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী ও আমি নাগমহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া আছি। নাগ-মহাশয় বলিলেন, কলিকালে মেয়েদের মুক্তি নাই। যে মুক্তি লাভ করিতে আশা করিবে, সে যেন পুরুষ হইয়া আসে। তাঁহার কথা শুনিয়া, আমার মনে হইল, হায় হায়, কেন স্ত্রীলোক হইলাম। নাগমহাশয়ের মত ভগবান্ আমাকে গ্রহণ করিলেন, আবার ছাড়িয়া দিবেন, মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। নাগ-মহাশয়কে কোন কথা না বলিয়া, বিষাদিতা হইয়া বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। তিনি ঘরে ছিলেন। আমাকে মলিনমুখে বসিতে দেখিয়া, আমার কাছে আসিলেন। সেখানে বিছানা ছিল। তিনি শুইলেন। আমি তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম, ভগবন্, তবে কি হইবে? নাগমহাশয় বলিলেন, যে পরমপুরুষকে জানে, সে মেয়ে নয়, পুরুষ। পরমাত্মা পরমপুরুষ। আত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। সে পরমপুরুষে মিশিয়া যায়। সাবিত্রী প্রভৃতিকে পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। যে পরমপুরুষকে জানে না, সে মেয়ে মানুষ। যাহার ধর্ম্ম আছে, সে পুরুষ, আর যাহার ধর্ম্ম নাই, সে মেয়ে লোক। সে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। *

নাগমহাশয়ের অমিয়-মাখা কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বলিলাম, তোমার কৃপায় যেন আমি সকল অবস্থায় তোমাকে মনে রাখিতে পারি। যদি নরকে থাকিলেও তুমি আমার মনে থাক, তাহা হইলে নরকেও আমি সুখ পাইব। আর বৈকুণ্ঠে থাকিয়াও যদিও তোমাকে মনে না রাখিতে পারি, সেই বৈকুণ্ঠও দুঃখের স্থান হইবে।" সেই সময় হরপ্রসন্নবাবু, স্বামী প্রভৃতি একটী গান

করিতেছিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবকে কি তাঁকে জান্‌তে পারে। নাগমহাশয় চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। গানের পদ শুনিয়া বলিলেন, শোন, ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তাঁকে জান্‌তে পারে। আমি বলিলাম, সে কি রকম? ব্রহ্মা বিষ্ণু কি করিয়া অচৈতন্য হইলেন? নাগমহাশয় বলিলেন, এখানে যেমন জ্বালা আছে, অভাব আছে, বৈকুণ্ঠেও সেইরূপ অভাব আছে। তখন আমি নাগমহাশয়ের কথায় বুঝিতে পারিলাম, পরমব্রহ্মে লয় না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই থাকে। নাগমহাশয় কখন বলিতেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তিনই জীব। তবে সাধারণ জীব ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবেব শরণ লইয়া মহাশিবে লয় হইয়া যায়। পরমব্রহ্মের কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, তিনি নির্গুণ, নির্লিপ্ত, অব্যয়, চিদানন্দ, সুধু অনুভবের জিনিষ। তাঁহাকে কে ধরিবে? জীব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে পূজা করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। ধর্ম্মপুস্তক, পুরনাদি যাহা দেখিতে পাও, সকলই সত্য। সকলই ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায় বলিয়া দেয়। এক সময় ভগবান্ বলিয়া ছিলেন, ভগবান্, ভক্ত, ভাগবত, তিনই এক, রূপ পৃথক। ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতি চিন্তা কবিলে, ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভাগবত পাঠকরিলেও ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভাগবতে ভগবানের গুণগরিমা লিখা আছে, তাহা পড়িলে ভগবানে মন যায়। ভক্তের সঙ্গ করিলে, ভক্তের মুখে ভগবানের মহিমা শুনিয়া, ভক্ত দেখিলেই সেই ভগবানের কথা মনে পড়ে। যে ভাবে হউক ভগবান্‌কে মনে করিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। সুতরাং দুইটাই ভগবানে পৌঁছিবাবার হেতু।

নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, একদিন শঙ্কর গৌরীকে বলিলেন,

দেখি, আমি সর্ব্বদা ভক্তের হৃদয়ে বাস করি। যে ভক্তকে ভাল বাসে, সে আমাকেই ভাল বাসে। যে ভক্তকে নিন্দা করে, সে আমাকেই নিন্দা করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ভক্ত চিনা যায়? নাগমহাশয় বলিলেন, সেই জন্য শাস্ত্র পাঠ দরকার। শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায়, কে ভগবৎভক্ত। তিনি আরও বলিলেন, কৌলগুরুরূপে ভগবানকে পাইলে, তাহার আর কিছু দরকার হয় না। কৌলগুরু না পাইলে, কুলগুরুর প্রয়োজন। কুলগুরুর মন্ত্র জপ করিয়া, একদিন কৌলগুরু লাভ করা যায়। কুলগুরু মন্ত্র দেয় কাণে, কৌলগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। কিন্তু কুলগুরু ত্যাগ করিয়া, যা-তা বিশ্বাস করিয়া, কৌলগুরু ধরিলে, বিপথগামী হইতে হয়। অনেকে ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইয়া, যাকে তাকে কৌলগুরু বিশ্বাস করিয়া, পরে কাঁদিয়া পথ দেখিতে পায় না। যাহা তাহার ছিল, তাহাও হারাইয়া বসে। ভাগবৎ পাঠ করিয়া, ভগবানে বিশ্বাস হইলে, কেহই বিপথগামী হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে যে আছে, সে সেই ধর্ম্মে থাকিলে মঙ্গল। কুলগুরু সকলের আছে, কৌলগুরু কদাচ কাহার ভাগ্যে ঘটে। বিধি আছে, কুলগুরুর মন্ত্র নিলে, এক সময় কৌলগুরু পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্ম পুস্তকে যাহা আছে, তাহা সমস্তই কি সত্য? নাগমহাশয় বলিলেন, হাঁ, সবই সত্য। আমি বলিলাম, বিষ্ণুপুরাণে আছে তারা সতী। চন্দ্র তারাকে হরণ করিয়া অনেক সময় তাহার নিকট রাখিয়া ছিলেন। সুতরাং তারা কি করিয়া সতী হইলেন? নাগমহাশয় বলিলেন, তারা অসতী হইয়াও ভগবানে প্রীতি থাকায় সতী হইয়াছে। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা,

মন্দোদরী অসতী হইয়াও, ভগবানে প্রীতি থাকায় সতীর শিরোমণি হইয়াছেন। ভগবান্ দেখিলেন, পঞ্চকন্যাকে ঘৃণা করিলে, তাঁহাকে ঘৃণা করা হয়, সেই জন্য ভগবান্ বিধি করিলেন, শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করিলে, ভগবানের কলঙ্ক মোচন হইবে। পঞ্চকন্যা কলঙ্ক অর্জ্জন করা সত্ত্বেও ভগবানে প্রীতি ছিল, তাই ভগবান্ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। নাগমহাশয় এই সব কথা বলিয়া বলিলেন, মা, ভগবান্ কলঙ্ক নিলেন সত্য, কিন্তু পঞ্চকন্যার খোঁটা যায় নাই, এখনও তাহাদের খোঁটা বর্ত্তমান আছে। কেহ কর্ম্মের দায় এড়াইতে পারে না। একবার পাপ করিলে, খোঁটা থাকিবেই। সতীত্ব তোমাদের রত্ন। তাহা একবার হারাইলে, লোকে তাহা বলিবেই।

আমি বলিলাম, দ্রৌপদী কি করিয়া অসতী হইলেন। পাঁচ জন পাণ্ডব তাহাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে ব[illegible] এক রমনীর পাঁচটী স্বামী থাকিলে, তাহাকে অসতী ব[illegible] এক পতিতে নিষ্ঠা থাকিলে সতী হয়। আমি বলিলাম, আ[illegible] করিয়াছিলাম, বিবাহ করায় পাঁচ জন স্বামী হইয়া ছিলেন। তিনি যে কর্ণকে স্বামী রূপে আকাঙ্খা করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অসতী। নাগমহাশয় বলিলেন, ভগবান্ কাহার অহংকার সহ্য করেন না। যাহারই অহঙ্কার হউক না কেন, তিনি তাহা চূর্ণ করিবেন। দ্রৌপদী মনের পাপে অসতী হন নাই। পাঁচটী স্বামী থাকা সত্বেও তাহার অহঙ্কার ছিল, তিনি সতী। তাহার অহঙ্কার নাশ করিবার জন্য ভগবান্ এই ব্যবস্থা করিলেন। ফল ছেড়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মনের কথা বলিলে ফল জোড়া লাগিবে। পঞ্চপাণ্ডব নিজদের মনের কথা

বলিলেন, ফল অনেক উঠিল। দ্রৌপদী কর্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষার কথা না বলায়, ফল নাবিয়া পড়িল। দ্রৌপদীকে সেই কথা বলিতে হইল। ফল বোঁটায় লাগিল।

নাগমহাশয় বলিলেন, মা, মন এক ভগবানে কি থাকে? মনে কখন কি হয়, কে জানে? মনের একাগ্রতা হইলেত সমস্তই হইয়া গেল। পরমহংসদেবের পার্ষদ ভক্তের মন ২২ ঘণ্টা ভগবানে থাকে, দুই ঘণ্টা ছুটি পাইয়া সে মন কোথায় চলিয়া যায়। স্বামী বলিলেন, ২২ ঘণ্টা ভগবানে মন থাকিলে ২ ঘণ্টার জন্য তাহাদের মন ঠিক থাকে না? নাগমহাশয় বলিলেন, না। একবারে মুক্ত না হইলে, মন ঠিক হয় না। আমি বলিলাম, ২২ ঘণ্টা ভগবানে মন রাখা সহজ কথা নয়। নাগমহাশয় বলিলেন, সকলই তাঁহার দয়া। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিলে ভগবানের দয়া হয়? নাগমহাশয় বলিলেন, পথে পথে থাকিতে হয়। কেবল ভগবানের আলোচনা করিতে হয়।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ
পূজামূলং গুরুপদম্
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্
মোক্ষমূলং গুরুকৃপা।

ধ্যান করিবে তাঁহার রূপ, পূজা করিবে তাঁহার পদযুগল, মন্ত্র তাঁহার বাক্য, মোক্ষ তাঁহার কৃপা।

সংসার বৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সংসাররূপ বৃক্ষ চড়িয়া, ঘোরনরকসাগরে পড়িতেছে এমন জীবকে যিনি কৃপা করিয়া ধরিয়া রাখেন, আমি সেই শ্রীগুরুকে

নমস্কার করি। যিনি আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আমার গুরু। আমি নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, হৃদয়ে অনুভব করিলাম যে, সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা আসিয়া আমাকে উপদেশ দিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমি সংসাররূপবৃক্ষ অরোহন করিয়া ঘোরনরকে পড়িতেছি, সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা যেন আমাকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। নাগমহাশয়ের মুক্তিদাতা মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহার সীমাবদ্ধদেহ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রূপ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তুমি জীব উদ্ধারের জন্য চিদানন্দরূপ ধারণ করিয়াছ। তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি অসীম হইয়াও জীব উদ্ধারের হেতু সসীম দেহ ধারণ করিয়াছ। তোমার রূপ দেখিয়া মনে হয়, যেন তুমি সংসার-সন্তপ্ত-জীবগণকে মুক্তিদান করিতে আসিয়াছ। তুমি আমাকে বলিলে, তিনি নরক হইতে উদ্ধার করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। আমি তোমাকেই নমস্কার করি। তুমি আমার গুরু। তুমি বিনা এ নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি বিনা কি কেহ ঠিক বুঝাইতে পারে?

অনেক সময় আমার মনে হইত, আমি কোন মন্ত্র জানি না, পূজা জানি না, কি করিয়া ভগবানের পূজা করিব? নাগমহাশয়-ত কখন মন্ত্র দিবেন না। আমি নাগমহাশয় ব্যতীত অন্য কাহার মন্ত্র গ্রহণ করিব না। নাগমহাশয় বিনা এ জগতে কাহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে না। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার নাম লইয়া, তাঁহার পূজা করিব। নাগমহাশয়ের নামই আমার মন্ত্র।

আজ তিনি উপদেশের ছলে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। তাই তিনি ভগবান্। অন্ধকারে অন্ধবিশ্বাস লইয়া ঘুড়িয়া মরি, তাই আমরা জীব। যে দিন নাগমহাশয় আমাকে মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি ও গুরুর বিষয় বুঝাইয়া দিলেন, সেই দিন হইতে মন্ত্রের অভাব হেতু আমার মনে যে একটা কষ্ট ছিল, তাহা দূর হইল।

আমার পিতার গুরু উপাধিধারী পণ্ডিত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি এত অল্প বয়সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ, তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিবে না? যে পর্য্যন্ত তুমি দীক্ষিতা না হইবে, ততদিন ভগবানেব ঘরে যাওয়ার অধিকারিণী নও। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া যে ভগবানের নিকট যাইতে চায়, সে ঠিকপথে যাইতে পারে না। আমি বলিলাম, কেন? ভগবানের কাছে সকলেই সমান। যে যে ভাবে তাঁহাকে ডাকে, তাহার কাছে ভগবান্ সেই ভাবেই আসেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, আমাকে বুঝাইলেন, শাস্ত্রে আছে—গুরু ভগবানের পথ দেখাইয়া দেন, তজ্জন্য লোক ভগবানের ঘরে যাইতে পারে। যেমন আমি তোমার পিতার গুরু, তোমার পিতার পূজা করিতেছি, কারণ এই পূজার আমিই অধিকারী। যদি অন্য কাহার বাড়ী গিয়া পূজা আরম্ভ করি, সেই বাড়ীর কর্ত্তা বলিবে, এই বেটা কোথা হইতে আসিয়া পূজা করিতে বসিল? সেই বাড়ীতে অনধিকারী বলিয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সে'রূপ দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া, যদি কেহ ভগবানের ঘরে যাইতে চেষ্টা করে, অনধিকারী বলিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আমার অতিশয় চিন্তা হইল। ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করা যাইতে পারে? নাগমহাশয়ত কিছুতেই মন্ত্র দিবেন না।

আমার এক পিসী নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, কুলগুরুর মন্ত্র নিলেই ত হইল। সে ত আরও ভাল কথা। আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম, নাগমহাশয় বিনা এ জগতে আর কাহার নিকট মন্ত্র নিব না এবং নাগমহশয়ও মন্ত্র দিবেন না, তাহা জানি।

স্বামীর সাথে দেখা হইলে, লোকে যাহা বলে, তাহা বলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, তুমি বড় মুর্খ। যে ঘরে যাওয়ার জন্য মন্ত্র নিতে বলা হইতেছে, তুমি সেই ঘর পার হইয়া ভগবান্‌কে দেখিতেছ। তোমার আবার মন্ত্রের দরকার কি? আমি বুঝিতে পারি না, তোমার এ ভ্রম কোথা হইতে আসিল। যদি কেহ কুলগুরু হইতে মন্ত্র নেওয়ার কথা বলে, তুমি কিছু বলিও না। সেই ভার আমার উপর রাখিও। স্বামীর কথা শুনিয়া মন অনেক শান্ত হইল, কিন্তু সম্পুর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না। নাগমহাশয় সমস্ত জানেন। তিনি দয়া করিয়া সব বুঝাইয়া দিলেন।

নাগমহাশয়ের কথার এমন প্রভাব ছিল, কোন বিষয়ে মনে দাগ লাগিলে, তাঁহার কথায় সেই দাগ উঠিয়া যাইত। একবার আমার এক পিসীর সূতিকাবায়ু হওয়ায় তিনি পাগলিনী হন। তাঁহার আরোগ্যের জন্য এক ফকির দেখান হয়। সেই ফকির বলিল, কালাপাহাড় নামে এক ভুত আছে, সে তাহাকে ধরিয়াছে। কালাপাহাড় ভুতের কথা মনে করিয়া, আমাদের এত ভয় হইল, দিনের বেলায় একাকী ঘাটে কি পথে যাইতে পারিতাম না। সেই সময় আমার একটা ভাই দেড় মাসে মারা গেল। ফকির বলিল, কালাপাহাড় তাহাকে নিয়া গেল। তাহা শুনিয়া ভয়ের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। এত ভয় হইয়াছিল, রাত্রিতে

প্রদীপ জালিয়া শুইয়া থাকিতে হইত। বাড়ীতে সকলেরই এক অবস্থা। পিতা এই সব দেখিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া দেওভোগ গেলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া, আমরা সকলে শান্ত হইলাম। মা আর কখনও শোক পান নাই। দেড়মাসের ছেলে মারা যাওয়ায় প্রথম শোকে একটু কাতর হইয়াছিলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার শোক অনেক কমিয়া গেল। নাগমহাশয় আমার পিতাকে বুঝাইলেন, পূর্ব্বজন্মে ঋণ করিয়া আসিলে, পুত্ররূপে সেই ঋণ শোধ করাইয়া চলিয়া যায়। পিতা বলিলেন, যে ঋণ আদায় করিতে আসিল, তাহার কি সুখ হইল? আসা যাওয়ার যন্ত্রণাত ভোগ করিতে হইল। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজকুমার, সংসারে আবার সুখ! আসা যাওয়ার যন্ত্রণা ত আছেই, তাহার উপর যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমন ভোগ করিতে হয়। বুদ্ধিমান ব্যাক্তি এই সমস্ত দেখিয়া ভগবানের শরণ লয় এবং কর্ম্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। নাগমহাশয়ের স্নেহে,অমিয় মাখা কথায়, পিতা অনেক শান্তিলাভ করিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভালবাসায় সব চিন্তার হাত এড়াইলাম। কেহ তাঁহাকে ভয়ের কথা বলিল না। তিনি সমস্ত জানিতেন। বাড়ী ফিরিয়া আসার সময়, নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন। ওসব জুজুর ভয়, ওসব কিছু নয়। ফকিরের কথা সত্য নয়, উহারা কতই না বলে। ইহা হইয়াছে ছেলে-মানুষকে ভয় দেখান। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার ভয় একবারে দূর হইল। বাড়ীতে আসিয়া, যে স্থানে দিনে যাইতে ভয় হইত, তথায় রাত্রিতেও একাকী যাইতে কোন শঙ্কা হইত না। যেমন ফিটকারী কিম্বা অন্য কোন শোধক দ্রব্য জলে দিলে, তাহা বিমল

হইয়া যায়, নাগমহাশয়ের কথায় মনের ময়লা সেইরূপ পরিষ্কার হইয়া গেল।*

নাগমহাশয় সাধুবেশধারী লোকদিগের উপর সামান্য বিরক্ত থাকিতেন। তিনি সময় সময় বলিতেন, লোক সাধুঁর বেশ ধারণ করিয়া, অনেক সময় অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করে। একদিন তিনি স্বামীকে বলিয়াছিলেন, অনেকে বলে, বারদীর ব্রহ্মচারী খুব ভাল লোক, সাধু, সর্ব্বজ্ঞ। তাহা শুনিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অনেক অপ্রীতিকব কথা বলিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, এ কি হইল? আমি আসিলাম সাধু দর্শন করিতে, লাভ লইল গালাগালি। তখন পবমহংসদেবের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে কোথায়ও সাধু দর্শন করিতে যাইতে হইবে না। যাহারা প্রকৃত সাধু, তাহারাই আমার নিকট আসিবেন। আমি যেমন তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত শাস্তি পাইয়াছি। তাহার এক শিষ্য আমাকে বলিয়াছিল, ব্রহ্মচারী তাহাদিগকে আহার ও বিহার করিতে উপদেশ দেন। আমি বলিলাম, আহার ও বিহারত পশুর ধর্ম্ম, কারণ তাহারা তাহা ছাড়া অন্য ধর্ম্ম জানে না। তাহা কি করিয়া মানবের ধর্ম্ম হইতে পারে? কোন একটা লোক পর-রমণীসংসর্গ করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হয় এবং ব্রহ্মচারীর নিকট সমস্ত কথা বলিয়া অত্যন্ত রোদন করে। তাহাতে ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, তুমি বৃথা কান্না করিতেছ কেন? নিজের পায়খানা ও অপরের পায়খানা একই স্থান, মলমূত্র ত্যাগ করিবার জায়গা বৈ ত নয়? তিনি এই প্রকার উপদেশ দিতেন।

শুনা যায়, নাগমহাশয় ব্রহ্মচারীকে দেখিতে যাওয়ায় সময় কতক মিষ্টান্ন সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহার রুক্ষ, জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্রহ্মচারী অপ্রতিভ হন এবং অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া, নাগমহাশয়ের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, তোর সাথে পয়সা আছে। ব্রহ্মচারী চারি-দিকের কথা বলিতে পারিতেন বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। নাগমহাশয় অস্বীকার করিলেন। ব্রহ্মচারী জিদ করিয়া বলিলেন, তোর কাপড়ে পয়সা বাঁধা আছে। নাগমহাশয় কাপড়খানা ছাড়িয়া দিলেন। কোথায়ও পয়সা পাওয়া গেল না। ব্রহ্মচারী কথঞ্চিত অপ্রস্তুত হইলেন। তাহার নিকটে কয়েকজন শিষ্য বসিয়াছিল। তিনি নাগমহাশয়ের আনীত মিষ্টান্ন নিকটবর্ত্তী এক ষাঁড়কে দেওয়ার জন্য এক শিষ্যকে বলিলেন। নাগমহাশয় বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কাহাকে কিছু বলিলেন না। নাগ-মহাশয় যে পরমহংসদেবের নিকট যান, তাহা জানিতে পারিয়া, ব্রহ্মচারী পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এবার অক্রোধ নাগমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল; তাঁহার ক্রোধ দেহবদ্ধ হইয়া ভৈরব বেশে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নাগমহাশয় তথায় দাঁড়াইলেন না, বেগে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আর কখন সাধু দর্শন করিতে কোথায়ও যাইতেন না।

আমাদের ভয়ের কথা শুনিয়া স্বামী বিদ্রূপ ছলে অনেক কথা বলিলেন। আমি বলিলাম নাগমহাশয়ের কথায় সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। তাহা না হইলে, কি করিয়া জানিব লোক এত মিথ্যা কথা বলে। আমাদের দেশে অনেকে ফকিরকে

ভাল বলে। স্বামী বলিলেন, সংসারের লোকের কথা শুনিতে নেই। তাহারা ভাল লোককে মন্দ বলে, আবার মন্দ লোককে ভাল বলে। দেখ না, নাগমহাশয় দেওভোগে আছেন, কতজন তাঁহার কাছে যায়? আর এই সব লোকের নিকট কত লোক যায়, তাহাদিগকে কত আদর করে। তাই গৌরাঙ্গদেব বলিতেন, কলিকালে বহু লোক কীর্ত্তন করিবে। নাচিয়া গাইয়া শেষে নরকে যাইবে। মনে ভগবদ্ভাব নাই, লোক দেখাইযা ভগবানের ভাব দেখাইবে, নানামত ব্যভিচার করিয়া, লোকের মাথা খাইবে। নাগমহাশয় বলিযাছেন, সংসাবে পবমহংসদেবের ভক্ত ছাড়া ভাল সন্ন্যাসী বড় বিরল। যদি ফকির আব আসে, তুমি ইহাব কাছে যাইও না। সর্ব্বদা নাগমহাশয়ের কথা মনে রাখিয়া কাজ করিও। আমি তোমাকে বেশী কি বলিব? তোমার চেয়ে তাঁহার বিষয় অধিক জানি না। নাগমহাশয় এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, যে স্বামী স্ত্রীকে শাসন না করে, সে স্বামীর যোগ্য নয়, আর পিতা পুত্রকে শাসন না করিলে পিতা নামের অযোগ্য। তোমার সংসারের জ্ঞান বড় কম। সকল সময় নাগমহাশয় সামনে থাকেন না, সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিয়াও পারিবে না। সংসারের অনেক বিষয় আমাকেই বলিতে হইবে। নাগমহাশয়ের কথা মনে রাখিয়া সর্ব্বদা কাজ করিও। অনেকেই মন্দ করিতে পারে, ভগবান্ বিনা কেহ ভাল করিতে পারে না। নাগমহাশয় দয়া করিয়া সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল করিবেন। তিনি মেয়েদের হুজুক ভালবাসেন না। একদিন তাঁহার ভগ্নী গণকবাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া, আমার কাছে নিজের ভগ্নীর নিন্দা করিলেন।

নাগমহাশয় সারদাপিসীর বড় প্রসংশা করিতেন। তিনি বলিতেন, স্বামী সারদাকে দেখিতে পারে না, তবু সে কি করিয়া স্বামীর নিকট থাকিবে, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করে। স্বামী বড় ভাল মানুষ ছিল না, অন্যত্র পড়িয়া থাকিত, কিন্তু সারদা একদিনও তাহাকে একটী কর্কশ কথা বলে নাই। স্বামীর প্রতি এমন ভক্তি ছিল, সে কখনও তাহার উপর বিরক্ত হয় নাই। সে তাহার শত অবহেলা হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে। একদিন নাগমহাশয় তাঁহার ভগ্নিপতিকে বলিয়াছিলেন, আপনাব বয়স ৫০ বৎসর হইল, এখনও আপনার জ্ঞান হইল না। আপনি একবারও ভাবেন না, পরে আপনার কি গতি হইবে। ভগ্নিপতি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি এমন ভাব দেখাইলেন, যেন নাগমহাশয় ছেলে মানুষ, তাঁহার কথা শুনার যোগ্য নয। নাগমহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার ভগ্নীও কোন কথা বলিলেন না। সারদাপিসীর মত লোক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রধান গুণ, তিনি কখনও পরের দোষ দেখেন না। স্বামীকে অবহেলা কবিতে দেখিলে, স্ত্রী কত কথা বলে, কত ঝগডা করে, কিন্তু সাবদাপিসী কখনও তাহার সহিত ঝগড়া করেন নাই। নাগমহাশয় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমবা শুনিয়াছি, তাঁহার শ্বশ্রু ও ননদিনী তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছেন। তিনি একদিনের জন্যও তাহাদের নিন্দা করেন নাই। তাঁহাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কবিলে, তিনি অনিচ্ছার সহিত দুই একটী কথা বলিতেন। সকল লোক একবাক্যে বলিয়াছে, সারদার মত সহ্য গুণ লোকের হব না। স্বামী যাহা ইচ্ছা হইয়াছে তাহা করিয়াছে, তিনি তাহাকে দেখিলেই সুখী। শ্বশ্রু ও ননদিনী

তাঁহাকে কি কষ্ট না দিয়াছে, তিনি একবারও তাহা মুখে আনেন না। তিনি তাঁহার মাতার গুণ পাইয়াছেন।

শুনা যায়, নাগমহাশয়ের পিসীমা সময় সময় পাগলিনীর মত কাজ করিতেন। তিনি ও তাঁহার মাতা কলহ করিয়া সারাদিন খাইতেন না, নাগমহাশয়ের মাতা তাঁহাদের ভাত বাধিয়া সমস্ত দিন বসিযা থাকিতেন। শ্বশ্রূ ও ননদিনী ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে খাইতে বলেন নাই, তিনি নিজেও খাওয়ার কথা বলিতে লজ্জা পাইয়াছেন। সুতরাং সেদিন তাঁহারও খাওয়া হয় নাই। তাঁহাদের রাগ পড়িলে, তাঁহাকে খাইতে বলিতেন এবং তিনি খাইতেন। তজ্জন্য সময় সময় শ্বশ্রূর ও ননদিনীর অনেক গালি খাইতেন। তাঁহারা বলিতেন, রান্না ভিন্ন হইয়াছে, তোমার ভাত তুমি লইয়া খাইবে, তাহাতে এত লজ্জা কেন? তোমার সংসার, তোমার বাড়ী, তোমাব ঘর, তোমার ছেলে মেয়ে লইয়া তুমি খাইবে, ইহাতে আবার জিজ্ঞাসা কেন? এখন তুমি ছোট বৌ নও যে তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত কথা বলিলে কি হইবে? নাগমহাশয়ের মাতা কখনও শ্বশ্রূ ও ননদিনীকে না বলিয়া খাইতেন না। তাঁহাদিগকে না বলিয়া সময় সময় ছেলে ও মেয়েকে খাইতে দিতেও লজ্জা বোধ কবিতেন। তাঁহার স্বভাব এমন সুন্দর ছিল। তিনি সকল দিন কাজ করিতেন, মুখে একটী কথাও ছিল না। দেওভোগের লোক তাঁহাকে কত ধন্যবাদ দিত। তাহারা বলিত, মা ও মেয়ে ঝগড়া করে, বৌটীর মুখে একটী কথাও নাই। সে সর্ব্বদা সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। কখনও তাহাকে কোন বিষয়ে বিরক্ত দেখা যায় না। কাহাকেও কটু কথা বলে না। সারদাপিসীকে এত শান্ত

দেখি নাই, তবে খাওয়া সম্বন্ধে মাতার মত ছিলেন। যখন আমরা নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছি, সারদাপিসীকে সময় সময় দেওভোগে দেখিয়াছি। তিনি ভোরে উঠিয়া, নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া থাকিতেন। নাগমহাশয় বাজারে গেলে, সারদাপিসী সংসারের সামান্য কাজ করিতেন। বাজার হইতে মাছ ও তরকারি আনা হইলে, তাহা কাঁটিয়া দিতেন। তিনি অনেক সময় বসিয়া সন্ধ্যা করিতেন। বেলা ১।১॥০টার সময় তাঁহার সন্ধ্যা শেষ হইত। তখনও তিনি খাইতে যাইতেন না। যাহারা নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইত, তাহাদের খাওয়া হইলে এবং নাগমহাশয় খাইলে পর তিনি খাইতে বসিতেন। তাহাও সকল সময় হইয়া উঠিত না। খাওয়া নিয়া বড়ই বিরক্ত করিতেন। মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, ছোট সময় হইতেই ভাই ও ভগ্নী খাইতে জানে না। ভাল জিনিষ ত খাইবেই না, ভাত খাইবে—তাহারও যেন সময় হয় না। যদি কখন ঘরে কোন ভাল জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়, কেহ আর তাহা খায় না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তখন তাহারা সেই জিনিষ খাইতে বসিবে। সারদাপিসী নাগমহাশয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কোন ভাল খাইবার জিনিষ পাইলে, নিজের সন্তানের মত নাগমহাশয়কে আদর করিয়া দিতেন। নাগমহাশয় যে সকল মায়িক সুখ ত্যাগ করিয়ছেন, তজ্জন্য তিনি বড়ই দুঃখিতা ছিলেন। লোকের নিকট বলিতেন, আমার ভাই সকল সুখ ছাড়িয়াছেন। তিনি লোকের মত খাইতে বসেন, কিন্তু কোন জিনিষ বড় খান না। সুখাদ্যত তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া যায় না, ভাতের নীচে ঢাকিয়া দিলে, তাহা হইতে সামান্য খাইয়া, অবশিষ্ট রাখিয়া দেন।

নাগমহাশয়ের উপর সারদাপিসীর হৃদয়ের অতিশয় টান ছিল।

যখন নরেন্দ্র মারা যায়, সে নাগমহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। সারদাপিসী ছেলের সেই অবস্থার সময়ও কাঁদিয়া বলিলেন, ঠাকুরভাই, ও এই ভাবে তাকাইয়া রহিল কেন? নাগমহাশয় বলিলেন, ও তোর তৈল নুনের বোঝা বহিতে আসে নাই। কি ছিল, কোথায় গেল? উহার মত যাইতে পারিবি কি? তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, এ ত আমার পুত্র ছিল না, শত্রু ছিল। শত্রু যাওয়ার সময় ঠাকুরভাইয়ের দিকে এই ভাবে তাকাইয়া রহিল। এখন ভাই একবৎসর ভাল থকেন, ভাই আমার বাঁচিয়া থাকেন, তবেই যথেষ্ট। পুত্রের মৃত্যু সময়েও তিনি পুত্রশোক ভুলিয়া ভাইয়ের মঙ্গল চিন্তা করিয়া, ভাইকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ঠাকুরভাই, যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, আপনি সরিয়া দাঁড়ান। নাগমহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ও যে সুখে গেল, উহার সুখ মনে করিয়া, তুমি সুখী হও। উহার মত ভাগ্য কতজনের হয়। সংসারে কেহ কাহার নয়। সকলকেই এক দিন সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। উহাকে ভুলিয়া, ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ কর। তিনি তোমাকে সুখ দিবেন। নাগমহাশয় তাঁহার ভগ্নীকে কাঁদিতে দিতেন না। যখন তিনি কাঁদিতেন, নাগমহাশয় ভগবান্ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন।

নরেন্দ্রের মৃত্যুর পর আমরা দেওভোগে গেলে, সারদাপিসী কাঁদিয়া উঠিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভগবান্ ইহকালের সুখ দেখেন না, পরকাল দেখেন। পরমহংসদেবের বাটীতে রঘুবীরের পূজা হইত। তাঁহার এক ভাইয়ের মেয়ে রঘুবীরের সেবা করিতেন।

মেয়ের বিবাহ হইল। পরমহংসদের দেখিলেন, মেয়ে স্বামীর বাড়ী গেলে, ভাল ভাবে রঘুবীবের সেবা হইবে না। তিনি কালীকে বলিলেন, মা, উহাকে বিধবা করিয়া দে, সে বাড়ীতে থাকিযা রঘুবীরের সেবা করিবে। জামাই ওলাউঠা হইয়া মরিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহাকে রঘুবীরের পূজার জন্য রাখিয়া ছিলেন। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া সারদাপিসা শান্তি পাইলেন। তিনি সময়োপযোগী কথা বলিয়া জীবকে সান্ত্বনা দিতেন। নাগ-মহাশয়কে দেখিলেও হৃদয়ের জ্বালা অনেক প্রশমিত হইত। যে হৃদয় পুত্রশোক ভুলিয়া নাগমহাশয়ের মঙ্গল কামনা করিল, নাগমহাশয়ের কাছে তাহাতে আর কত জ্বালা থাকিবে? ছোট-কাল হইতে নাগমহাশয়ের উপব সারদাপিসীর হৃদয়ের টান ছিল, তাই সংসারেব সুখে ও দুঃখে অভিভূতা হন নাই। তাঁহার খাওয়া ও পরার বড় খেয়াল ছিল না।

---

# শেষ।

নাগমহাশয়ের নিকট যাহারা গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমার মত পাষাণী কেহ ছিলেন না। তিনি আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া কোলে নিলেন। কোলে নেওয়া সত্বেও আমি তাঁহাকে চিনিলাম না, একবার নাগমহাশয়ের বিষয় চিন্তা করিলাম না। যত দিন তিনি আমাদের সাথে ছিলেন, একদিনও ভাবি নাই কি করিলে তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব। তিনি দয়া করিয়া সকল বিষয়েই আমাকে হুস্ করিয়া দিয়াছেন। যে বৎসর তিনি শেষ দুর্গাপূজা করিলেন, প্রথম পূজার রাত্রিতে আমরা তাঁহার বাটীতে গেলাম। তখন তিনি শুইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি উঠিলেন। স্বামী তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারা দাড়াইয়া অল্প সময় কথা বলিলেন। নাগমহাশয় স্বামীকে বসিতে বলিলেন। স্বামী দক্ষিণের ঘরে বসিতে গেলেন। নাগমহাশয় আমার কাছে আসিলেন, স্নেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, ভাল আছ ত? আমি ভাল আছি বলিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। মুখখানা একটু স্ফীত দেখা যাইতেছিল। নাগমহাশয় বলিলেন, হাড় মাসের খাঁচা, আর কতদিন থাকিবে। তাহা শুনিয়া আমার কি যে হইল, বলিতে পারি না; কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কোন কথাও ভাবিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, আপনি শুইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিলেন কেন? আবার শুইয়া থাকুন। নাগমহাশয় বলিলেন, তুমি দুটী খাও গিয়া। আমি

বলিলাম, আসার সময় খাইয়া আসিয়াছি, এখন আর খাইব না। তিনি বলিলেন; অল্প দুটী খাইতে হইবে। আমি আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে গেলাম। মাসী বলিলেন, আজ নাগমহাশয় খান নাই। দেখ্‌ত, তুই বলিয়া খাওয়াইতে পারিস্‌ কিনা? আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, আপনি খাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, না, না, আমি রাত্রিতে খাব না। আমি বলিলাম, পূজার দিন, অল্প দুটী খান। নাগমহাশয় বলিলেন, না, রাত্রিতে খাওয়া সহ্য হইবে না। তাঁহার কথায় আমি বুঝিলাম, রাত্রিতে খাইলে, তাঁহার অসুখ বাড়িবে। আমি চুপ করিলাম, আর কোন কথা বলিলাম না। তিনি মাসীকে বলিলেন, উহাকে দুটী খাইতে দিন্। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, নাগমহাশয় একটু সড়িয়া গেলেন। আমি বলিলাম, মাসীমা, আমি আসার সময় খাইয়া আসিয়াছি, আমাব একবারে খাওয়ায় প্রবৃত্তি নাই। আমি এখন খাইব না।

আমি প্রতিমা দেখিতে মণ্ডপঘরে গেলাম। নাগমহাশয় আবার দেখিতে আসিলেন, আমি খাইতে বসিয়াছি কি না। তিনি রান্নাঘরের সিঁড়ির নিকট গেলে, মাসী বলিলেন, সে খাইবে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি মণ্ডপঘরে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছি, আমার মনে হইল, কেহ পিছন হইতে আমার কাপড়ের আচল ধরিয়া টানিতেছে। আমি ফিরিয়া তাকাইলাম। ছোট মেয়ে খাইতে না চাহিলে, মা যেমন জোর করিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে নেন, সেইরূপ নাগমহাশয় মণ্ডপঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া, আমার আচল ধরিয়া টানিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি বলিলেন, মা অল্প দুটী খাবে। আমি বলিলাম, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া আসিলেন কেন?

আমার ক্ষুধা নাই। কাপড় ধরিয়া টানায় আমার মনে ভয় হইয়াছিল। ফিরিয়া নাগমহাশককে দেখিয়া বড় সুখ হইল। তিনি স্নেহের সহিত আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মা, ভয় কি? আমি মনে মনে বলিলাম, আপনা হইতে ভয় কি? এমন সৌভাগ্য কাহার হইবে যে, সে আপনার স্নেহ লাভ করিতে পারিবে। আমার উপর আপনার অসীম দয়া, তাই আপনি মাতার মত সস্নেহে আমার আচল ধরিয়াছিলেন। দেবতাগণ আপনাকে ধরিতে ব্যস্ত, আপনি তাহাদিগকে না ধরিয়া জীবকে ধরিলেন—তাহা কেবল আপনার গুণ। কাহার সাধ্য নাগমহাশয়ের কথা ফেলে। তিনি আমাকে খাওয়াইয়া শুইতে গেলেন। আমি পাষাণী, তাই নাগমহাশযের এমত স্নেহ ভুলিয়া, সংসারে মজিয়া আছি। কিম্বা আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন। যদি তিনি প্রস্তরখণ্ডকে এমন স্নেহ করিতেন, তাহাতেও দাগ লাগিত, কিন্তু আমার রক্তমাংসের দেহ, আমার হৃদয়ে কোন দাগ লাগিল না।

নাগমহাশয় আমাকে সকল অবস্থায় স্নেহ করিতেন। সামান্য একটু ধর্ম্মের কথা বলিলে, তিনি তাহার প্রকাণ্ড ব্যাখ্যা করিয়া সুখী হইতেন। আমার ইচ্ছা হইল, অষ্টমী পূজার কাজ করিব। রজস্বলা হইয়া চারি রাত্রি গিয়াছে। স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয় এঅবস্থায় কোন পূজার কাজ করিতে দেন না। তিনি দুর্গাপূজা করেন, দুর্গাপূজার কাজ করিতে হইলে, একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। চারি রাত্রি পর স্নান করিয়া পূজার কাজ করা বৈধ নয়, তবে তোমার ভক্তির উপর আমি হাত দিতে চাহি না। নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা বলিবেন, তাহা করিও।

আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি স্নান করিয়া পূজার কাজ করি গিয়া ? তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কথা বলিতে বলিতে আমাকে লইয়া বড় ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আমি কোন সময় তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তখনই তাহার উত্তর দিতেন। পূজার কাজের কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিলাম, নাগমহাশয়ত সব জানেন, পাঁচ রাত্রে স্নান না করিয়া পূজার কাজ করিতে দিবেন না। এই কথা মনে হইলে, তিনি বলিলেন, যাহারা শাস্ত্র দেখিয়া কাজ করে, তাহারাই ধন্য। মা তুমি ধন্য, যে হেতু শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইয়াছে। আমি বলিলাম, ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিযাছি, পাঁচ রাত্রির পূর্ব্বে পূজার কাজ করিতে পারা যায় না, তবে আপনার কাছে সকলই পবিত্র। আপনাকে স্পর্শ করিলে কি আর অপবিত্রতা থাকে! তাই পূজার কাজ করিতে চাহিয়া ছিলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, কেন, আমি রোজ তাঁহার কাজ করিব। কেবল দুই দিন পূজার কাজ করিয়া কি বসিয়া থাকিব ? আমি রোজ তাঁহার পূজার কাজ করিব। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অমঙ্গল হয় না। আমি নাগমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া, তাঁহার তদানিন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া, মনে হইল, তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে তাঁহার পূজার কাজ করিতে দিবেন। নাগমহাশয় আর কিছু বলিলেন না। আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমাকে কোন এক পূজা করিতে দিবেন, পাঁচ রাত্রি না গেলে পূজার কাজ করা বৈধ নয়। আমি হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলাম, আপনি সময় সময় বলেন, আপনি কিছু জানেন না, আপনি কিছু নন। আমি কেবল

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, স্নান করিয়া পূজার কাজ করিব কি? আপনি কোন উত্তর না দিয়া এই সমস্ত কথা বলিলেন। নাগমহাশয় হাসিলেন। আমি বলিলাম, আপনি সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে সকল দেখিতে পান, সব জানিতে পারেন। আপনার কৃপায় আমরা তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

বাজারের বেলা হইল। নাগমহাশয় বাজার করিতে উঠিলেন এবং কোন্ কোন্ জিনিস আনিতে হইবে, তাহা মাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগমহাশয় বাজারে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, মা, বাজার হইতে আসি? তিনি বাজারে গেলেন। আমি মাঠাকুরাণীকে বলিলাম, আমি পূজার কাজ করিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, তুমি ৬৪ বাতি, ৬৪ পান ও ৬৪ পুরো শুপারি গণিয়া রাখ। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় বলিয়াছেন, আমি রোজ তাঁহার কাজ করিব, অথচ পাঁচ রাত্রির পূর্ব্বে পূজার কাজ করার বিধি দিলেন না। নাগমহাশয় ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন, আমার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। সবই পূজার কাজ, একটী করিলেই হইল। পূজার কাছে বাতি দেওয়া, পান শুপারি দেওয়া, সকলই পূজার কাজ। নাগমহাশয়ের মুখ হইতে কখন মিথ্যা কথা বাহির হয় না। তিনি আমার জন্য এমন ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে আমাকে রোজ পূজার কাজ করিতে হইবে। মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি করিয়া রোজ তাঁহার পূজার কাজ করা যায়। জানি না কেন, তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না। নাগমহাশয়

বাজার হইতে আসিলেন, আমি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। এবিষয়ে আর কোন কথাই হইল না। আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম সন্ধিপূজার বাতি, পান ও শুপারি গণিয়া সাজাইয়া দিব? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দাও। তাঁহাকে দেখিয়া মনের আনন্দে সন্ধিপূজার কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ হইয়া গেল। মাঠাকুরাণী বলিলেন, যজ্ঞের জন্য বেল-পাতা বাছিয়া দাও। আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যজ্ঞের জন্য বেল-পাতা বাছিয়া দিব কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহা দাও। তাঁহার কথায় বুঝিলাম, পাঁচ রাত্রির পূর্ব্বে জল ছাড়া সকল জিনিষ পূজায় দেওয়া যায়। যজ্ঞের পাতা বাছিতে বসিলাম। ১০৮টী বেলপাতা খুঁজিয়া পাই না। একটী পাতা লইয়া নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এরকম পাতা কি যজ্ঞে দেওয়া যায়? তিনি বলিলেন, তুমি যাও, আমি আসিতেছি। তিনি আসিয়া আমাকে পাতা দেখাইয়া বলিলেন, তাম্রবর্ণের পাতা যজ্ঞে দিতে নাই। যে পাতায় পোকা থাকে, সেই পাতার পোকা ফেলিও না। পোকা সমেত পাতা সড়াইয়া রাখিও। অন্যপাতা হইতে যজ্ঞের পাতা বাছিয়া দিও। তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন যেন কোন জীব কষ্ট না পায়। আমি যজ্ঞের পাতা না পাইয়া, পোকার বাসা ফেলিয়া দিয়া, পাতা লইয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। তখনও তিনি বলিলেন, তুমি যাও, আমি যাইতেছি। নাগমহাশয় আমাকে বলিয়া দিলেন, পাতার পোকা ফেলিও না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, পোকার বাসা ভাঙ্গিলে পোকার কষ্ট হইবে, তাই দয়াময় দয়া করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন, তাহাদের আর কোন ভয় নাই। তাহা না হইলে নাগমহাশয়ের উঠিয়া আসার

কোন দরকার ছিল না। যদি তিনি বলিয়া দিতেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত।

নাগমহাশয় আমাকে কখন কর্কশ কথা বলেন নাই। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন মুখ মলিন করিয়া আমার সাথে কথা বলেন নাই। নাগ-মহাশয় ও আমি পথে দাড়াইয়া কথা বলিতেছি। তিনি হঠাৎ মুখ মলিন করিয়া বলিতেছেন, ও কি করিতেছ? ও কি করিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা পিপিলিকার দল দেখাইয়া, আমাকে বলিলেন, পায়ের নীচে পিপিলিকা পড়িয়াছে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি পিপিলিকার কষ্ট সহিতে পারিতেছেন না। আমি সড়িয়া দাঁড়াইলাম। তিনি তাহাদের দিকে তাকাইয়া আমাকে বলিলেন, এই দেখ মা, উহাদের কি কষ্ট হইয়াছে, ভয়ে দল ভাঙ্গিয়া কে কোথায় পালাইবে, তাহার পথ পাইতেছে না। আমি মনে মনে বলিলাম, তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, যে ভাবে চলিলে জীবের কষ্ট না হয়, সেই ভাবে চল। জীব কি কখন তোমার মত বিচার করিয়া চলিতে পারে? বেল-পাতার পোকা ও পিপিলিকার প্রতি দয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। কি করিব, যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহা ত আর না করা হইবে না। মনে মনে নাগমহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাহিলাম। দয়াময়, তোমার নিকট সকলই সমান। আমি না জানিয়া দোষ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। নাগমহাশয় মন জানেন। আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, এই লও, যজ্ঞের পাতা নিয়া দাও। এমন ভাবে বলিলেন, আমি তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমার দোষ গ্রহণ করেন নাই। আমি মনের আনন্দে যজ্ঞের পাতা ধুইয়া

আনিলাম। মহাষ্টমী নাগমহাশয়ের কাজে মহাসুখে চলিয়া গেল।

বৈকাল বেলায় হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী ও নাগমহাশয়ের শালিব জামাতা আদিত্যবাবু নটবরবাবুদের বাড়ীতে প্রতিমা দেখিতে যাইবেন। হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাদের সহিত প্রতিমা দেখিতে যাইব কিনা। আমি বলিলাম, আমি নাগমহাশযকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। আমি নাগমহাশযকে জিজ্ঞাসা কবিলাম। তিনি বলিলেন, না, তুমি যাইও না। ভাঙ্গা নৌকায যদি জল উঠে, মাঠের মধ্যে নৌকা ডুবিয়া যাইবে। পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহার সঙ্গে না থাকিলে, সে নৌকা ডুবাইযা দিত। চারিদিকে ধান ক্ষেত, সাঁতার দিয়া উঠিবার জো নাই। আমি নৌকার জল না ফেলিয়া দিলে, ও কি মুস্কিলে পড়িত। আমি বলিলাম, আমি আপনার চেয়ে কি তাঁহাকে অধিক বিশ্বাস করি? আমি নাগমহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া আছি, হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী আমার অপেক্ষা কবিতে ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমার ভাব দেখিযাই বুঝিতে পারিলেন, নাগমহাশয় আমাকে যাইতে মানা করিতেছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি আজ যাইব না। তখন আমি বলিলাম, না যাওয়াই ভাল। নাগমহাশয় আমাকে যাইতে বারণ করিলেন। ভাঙ্গা নৌকার কথা বলিলাম না। তাঁহার দয়া স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, আমার উপর তোমার এত দয়া। অন্যে ভাঙ্গা নৌকায় যাইবে, তাহাতে ভাল মন্দ কিছু বলেন না। আমাকে বারণ করিয়াও আবার ভাঙ্গা নৌকায় যে বিপদ হইতেছিল, তাহাও

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে। আমার প্রতি তোমার দয়ার সীমা নাই। আমি কখন খাইব. কখন শুইব, কখন উঠিব, সমস্ত জিজ্ঞাসা কর। ভাল ঘুম হইল কিনা, ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইলাম কি না, তাহার অনুসন্ধান কর। যদি বলিয়াছি, মুখ ধুইয়াছি, অমনি হাসিয়া বলিয়াছ, এখন সত্যযুগ, সকলেই মনের আনন্দে ভগবানকে স্মরণ করিতেছে। এখন অন্য কথা মনে আনিতে নাই। ভগবানকে মনে রাখিতে হয়। আমি তোমার কথা শুনিয়া, তোমার কৃপায়, তোমাকে দেখি. আর তুমিই যে আমার ভগবান্, তাহা মনে করি। নাগমহাশয়কে দেখিতে দেখিতে মনে মনে এই সব কথা বলিলাম।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া বসিলাম। তিনি তামাক খাইতেছিলেন। আমি বলিলাম, আজ আমি পূজার কাজ করিতে পারিব। আপনি বাজারে গেলে, আমি স্নান করিয়া পূজার কাজ করিতে যাইব। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মা, যাহারা শাস্ত্র মানিয়া কাজ করে, তাহারাই ধন্য। কতক সময় পর তিনি বাজার করিতে উঠিলেন। আমি স্নান করিয়া পূজার কাজ করিতে গেলাম। নাগমহাশয় বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন, গোয়ালা দধি দিয়া গিয়াছে। নাগমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দধি দিয়াছে? মাঠাকুরাণী বলিলেন, তাহা ঘরে রাখিয়া গিয়াছে। আপনি যাইয়া দেখুন। উপরের দধি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কেবল জল দেখাইতেছে। সেদিন নাগমহাশয়ের বাড়ীতে বহুলোক খাইবে। নাগমহাশয় দধি দেখিয়া বলিলেন, এখন কি করি? তৈয়ার করিয়া ভাল দধি দিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু গোয়ালা অতিশয় খারাপ জিনিষ

দিয়াছে। কেবল জলই দেখা যাইতেছে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, যখন আপনি জিনিষ আনেন, নগদ টাকা দেন। এবার তাহাকে আগারি টাকা দিতে বারণ করিলাম, আপনি শুনিলেন না। সে টাকা পাইয়া খারাপ জিনিষ দিয়াছে। নাগমহাশয় বলিলেন, পূজার বাজার। দুগ্ধের দাম বেশী। গরীবলোক দেখিয়া কষ্ট পাই, তাই আগারি টাকা চাহিলে না দিয়া পারি না। মাঠাকুরাণী বলিলেন, যত টাকা আগারি চায়, আপনি তত টাকাই দিয়া ফেলেন। তাহার এরূপ করা কখনই উচিত হয় নাই। নাগমহাশয় বলিলেন, এখনও গোয়ালার নিকট অনেক টাকা পাওনা আছে। গরীব লোক দেখিলে বড় কষ্ট হয়। নাগমহাশয়ের পুরোহিত বলিলেন, গরীবকে একখানি টিনের ঘর করিয়া দিলেই হয়। তাহা হইলে গরীবের আরও সুখ হয়। লোকের কি আর ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে? অন্য লোকের বাড়ীতে জিনিষ দিয়া, কতদিন ঘুড়িয়া, টাকা আদায় করিতে পারে না, সেই স্থানেও খারাপ জিনিষ দিতে সাহস করে না। আর তুমি জিনিষের দাম আগারি দেও এবং তাহার কাছে তোমার প্রাপ্য টাকাও আছে, তবুও সে এমন কাজ করে? তোমার দয়া দেখিয়া, সে খারাপ জিনিষ দেয়। সে জানে, তুমি তাহাকে কিছু বলিবে না। সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি কেবল পরের সুবিধা দেখিবেন, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের ভাল করিবেন। আপনাকে ভয় করিবে কেন? মাঠাকুরাণী বলিলেন, আমি এই গোয়াল হইতে আর কোন জিনিষ নিব না। আপনি যে টাকা পান, তাহা সে খাইবে। নাগমহাশয়ের এত দয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া

তিনি বলিলেন, পূজার বাজার। দুগ্ধের দাম বড় বাড়িয়াছে। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আপনি আগেই দাম দিয়াছেন, দুগ্ধের দাম বেশী কিম্বা কমে আসে যায় কি? নাগমহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। পুরোহিত বলিলেন, দুর্গা চিরকালই এইরূপ করিল। মাঠাকুরাণী চুপ করিলেন। পুরোহিত নাগমহাশকে বড় ভালবাসিতেন। অনেক সময় নাগমহাশয় তাঁহার কথা রাখিতেন, প্রসাদ নেও বলিলে, নাগমহাশয় অমনি হাত পাতিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি পূজাশেষ হইলেই বলিতেন, দুর্গা, আশীর্ব্বাদ লও। নাগমহাশয় আশীর্ব্বাদ লইতে যাইতেন। আশীর্ব্বাদ দেওয়া হইলে বলিতেন, দুর্গা, প্রসাদ লও। নাগমহাশয়কে প্রসাদ দিয়া আপনি খাইতে বসিতেন এবং বলিতেন, দুর্গা, আমি খাইতে বসিয়াছি, তুমি খাইতে যাও। পুরোহিতের কথানুযায়ী নাগমহাশয় খাইতে যাইতেন।

নবমী পূজা শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত নাগমহাশয়কে প্রথমে প্রসাদ দিলেন। নাগমহাশয়কে খাইতে দেখিয়া, সারদ পিসীর মেয়ে তাঁহাকে প্রসাদ দিতে গেলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, অত দিও না, অল্প প্রসাদ দাও। সারদাপিসী সামনে ছিলেন। তিনি বলিলেন, সে সন্দেশ খানা আপনার হাতে দিবে বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছে, সন্দেশ খানা নিন্। নাগমহাশয় হাত পাতিয়া সন্দেশ খানা লইলেন। তৎপর সারদাপিসী বলিলেন, ঠাকুর ভাই, আমি আপনার হাতে একখানা সন্দেশ দিব। নাগমহাশয় তাহা হাত পাতিয়া লইলেন। সেই নবমী তিথিতে নাগমহাশয় অনেকের বাসনা পূর্ণ করিলেন। মাঠাকুরাণী সর্ব্বদা তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তিনি ও তাঁহার হাতে প্রসাদ দিলেন।

নাগমহাশয় আমাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। সকলেই এজনমের মত দুর্গাপূজার সময় নাগমহাশয়কে দেখিয়া, নাগমহাশয়ের সঙ্গে পূজার আনন্দ অনুভব করিল। শুধু এই পাষাণী কিছু বুঝিল না।

আমার পিতা নবমী পূজার দিন নৌকা পাঠাইবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল। নাগমহাশয় আমাকে স্নেহ করেন, পূজার সময় তাঁহার কাছে চলিয়া আসি, পিতা কিছু বলিতে পারেন না। পিতা-মাতা আমাদের সুখে সুখী হইয়া, তাঁহার নিকট আসিতে বলেন। তাঁহারা মনে করেন, আমরা নাগমহাশয়ের সন্তান। নাগমহাশয় সুখী থাকিলে, সব দিকেই মঙ্গল। আমার বাপের বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয়। দুর্গাপূজার সময় আমরা বাড়ীতে না থাকায়, মা ও বাবার মন খালি বোধ হইত, অথচ তাঁহারা কিছু বলিতে পারিতেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা আমরা পঞ্চসার থাকি। ২টার সময় নৌকা পাঠাইয়া দিলেন। নৌকা দেখিয়া নাগমহাশয় কেমন হইয়া গেলেন। তিনিত সব জানিতেন। আমি যে আর পরের পূজায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, এ নবমী যে আমার কাল নবমী হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বালকের ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কেন নৌকা পাঠাইল? আমি বলিলাম, দশমী দিন আমাদিগকে নিদ্রাকলসী ঘরে নিতে হইবে। এবার মা বাবার সাথে তাহা নিতে পারিবেন না। সস্ত্রীক না হইয়া এই কাজ করা যায় না। পুরুষ ঘটী নেয়, স্ত্রী কলসী কাঁকে করিয়া মণ্ডপ ঘর হইতে শোয়ার ঘরে যায়। নাগ-মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

নবমীপূজা হইয়া গিয়াছে। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, মা, তুমি খাইতে যাও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি

খাবেন না? তিনি মাঠাকুরাণীকে কি বলিলেন। মাঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন, তাঁহার আসন পাতিয়া দাও। আমি মহানন্দে নাগমহাশয়ের বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলাম। মাঠাকুরাণী বলিলেন, তাঁহাকে খাইতে দাও। আমি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাকে খাইতে দিতে গেলাম। আমাকে ভাত লইয়া যাইতে দেখিয়া নাগমহাশয় আমার সঙ্গে আসিয়া আসনে বসিলেন। তাঁহার সামনে ভাতের থালা রাখিলাম। তিনি খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি এত অল্প খাওয়ার জিনিষ হাতে তুলিয়া মুখে দিতেছেন, যদি কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখে, সে মনে করিবে, নাগমহাশয়ের খাওয়ার প্রবৃত্তি নাই। খাওয়ার জিনিষ সামনে দেওয়া হইয়াছে, তাই দুটি হাতে করিয়া মুখে দিতেছেন। খাওয়ার প্রবৃত্তি থাকিলে, লোক যেমন আগ্রহের সহিত খায়, তাঁহাকে কখনও সেইরূপ আগ্রহের সহিত খাইতে দেখি নাই। নাগমহাশয়কে সেইরূপ খাইতে দেখিয়া, আমি মনে করিতে-ছিলাম, তিনি কি খান, সমস্তই ত পড়িয়া রহিল? এমন সময় তিনি বলিলেন, মা, আমাকে দেওয়া হইয়াছে, তুমি খাইতে যাও। আমি খাইতে যাইব। তখন সকল লোক খাইতে বসিয়াছে। নাগমহাশয় আমাকে বলিলেন, আহার ও মৈথুন গোপনীয় কাজ। আমি বলিলাম, কি করিয়া গোপনে আহার করা যায়? অনেক সময় লোকের সাথে বসিয়া খাইতে হয়। নাগমহাশয় বলিলেন, আহার গোপনে করিতে হয়। সেই দিন তাঁহার বাড়ীতে অনেক লোক খাইতেছে। পুরুষের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ উঠানে বসিয়া খাইতেছে। আমি

ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া গোপনে খাইতে পারিব। আমি রান্না ঘরে গেলাম। যিনি রান্না করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, সকলের খাওয়া হইয়া গেল, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, ঘরের ঐ কোণে খাওয়ার স্থান করিয়া লও। আমি এখানে বসিয়া তোমাকে দিতে পারিব। যিনি বাহিরে ভাত দিতে-ছিলেন, তিনি বাহিরের স্ত্রীলোকদিগকে দধি ও ক্ষির দিতে গেলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িল। ভগবন্, তুমি আমার জন্য সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলে। তোমার মুখ হইতে কি কখন বাজে কথা বাহির হইতে পারে? আমি ঘরের কোণে বসিয়া গোপনে খাইলাম এবং নাগমহাশয় কথার মাধুর্য্য অনুভব করিলাম।

মন সুস্থ নয়। সেদিন ফিরিয়া আসিতে হইবে। নাগমহাশয়ের সেদিনকার স্নেহ মনে করিয়া প্রাণ আকুল হয়, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। হা ভগবন্, কি করিলাম? তুমি সকল কাজেই প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছিলে, তুমি আর বেশীদিন আমাদের সাথে বাস করিবে না, কিন্তু আমি কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি জানিতাম সেই নবমী আমার কাল নবমী হইবে, তবে কে নবমী দিন তোমাকে ছাড়িয়া আসিত? আমার জন্য দেবীর নিদ্রাকলসী ঘরে নেওয়া বাকী রহিত না। শুনিয়াছি যখন আমার বাপের বাড়ীতে মেয়ে ছিল না, তখনও দেবীর পূজা হইয়াছে। বাবা দুর্গাচরণ, তোমার স্নেহ মনে করিয়া, পিতামাতা আমাকে অপরিমিত স্নেহ করিতেন। নৌকা ফিরিয়া দিলে তাঁহারা কষ্ট পাইতেন সত্য। যদি জানিতে পারিতাম, এ জীবনে পূজার সময়

তোমার সহিত এই শেষ দেখা, তবে তোমার স্নেহ ফেলিয়া কোন অবস্থায়ও চলিয়া আসিতাম না। বাবা, তোমার সেই স্নেহমূর্ত্তি এখনও আমার চক্ষে ভাসিতেছে। কি করি? কোথায় গেলে তোমাকে আবার পাইব? তুমি পাষাণীর উপযুক্ত সাজা দিয়াছ। আমরা পাষাণ বলিয়া, সেই দিন তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিলাম। অন্য যে কোন জীব তোমাকে এভাবে ছাড়িয়া আসিতে পারিত না।

সকল সময়েই ত আমরা গিয়াছি ও আসিয়াছি। সেদিন নাগমহাশয়ের ভিন্নমত ভাব দেখিলাম। আমি খাইয়া তাঁহার কাছে গিয়াছি, তিনি আমাকে বলিলেন, এত অল্প সময়ে কি খাইয়া উঠিলে? আমি বলিলাম, আমি ত আপনার মত খুঁটী করিয়া মুখে দেই না। অল্প সময়ে অনেক খাইয়াছি। নাগমহাশয় বলিলেন, আমি কত সময় বসিয়া খাই। তিনি আঁচাইতে গেলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। তিনি মুখখানা মলিন করিয়া বলিলেন, দশমী দিন বৈকালে গেলে বিজয়া ( ভাষান ) দেখিয়া যাওয়া যায়। অনেক লোক নৌকা ভাড়া করিয়া দশরা দেখিতে আসে। আমি বলিলাম, যদি আপনি বলেন, আমরা কাল সকালে যাইতে পারি। নাগমহাশয় বলিলেন, অনেকে নৌকা ভাড়া করিয়া দশরা দেখিতে যায়, তাই বলি, কাল গেলে হয় না? আমি বলিলাম, প্রতিমা ঘরে থাকিতে নিদ্রা কলসি বড় ঘরে নিতে হয়। নাগমহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা চলিয়া আসিব বলিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে রহিলেন। সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। মাঝি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, কখন যাইবেন? স্বামী বলিলেন, এখনই যাইব। তিনি নাগমহাশয়কে নমস্কার করিলেন। নাগমহাশয়

তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, আপনি উঁহাকে কষ্ট দিবেন না। নাগমহাশয়ের ভাব দেখিয়া উঁহার মনে হইল, তিনি আর বেশীদিন থাকিবেন না। যেমন মৃত্যু সময় মা কোলের শিশুকে যাহাকে সাক্ষাতে পান, তাহার হাতে হৃদয়ের ধনকে দিয়া যান, যেন শিশুর কোন কষ্ট না হয়, সেইরূপ নাগমহাশয়ের অতিশয় আদরের মেয়ে আমার হাতে দিয়া, সংসারে রাখিয়া যাইতেছেন, যেন তাহার কোন অযত্ন না হয়। নাগমহাশয় স্বামীর হাতে আমাকে দিয়া আমার কাছে আসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি ভিন্ন মত দেখিলাম। তিনি এমনভাবে তাকাইলেন যেন আমি অনেক দূরদেশে যাইতেছি। আমি পাগলী, তাহা কি বুঝিতে পারিলাম না। নাগমহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলাম।

নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, ঐ কাপড়খানা উঁহাকে দাও। মাঠাকুরাণী আমাকে একখানা কাপড় দিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, এ কাপড়খানা পরবে। আমার মনে হইল, নাগমহাশয়ের অর্থের অভাব। তিনি কোন লোক হইতে কিছু নেন না। এ কাপড়খানা মাঠাকুরাণীকে দিব। নাগমহাশয়ের কথা রাখিব, ইহা একবার পরিব। আমি নাগমহাশয়কে বলিলাম, আপনি একটু সরিয়া যান, আমি কাপড় ছাড়িব। তিনি সরিয়া গেলেন। কাপড়খানা একবার পরিয়া, মাঠাকুরাণীকে তাহা দিলাম। মাঠাকুরাণী নিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, একখানা কাপড় দিয়াছেন, তাহা আবার ফিরাইয়া দিতেছ? আমি কাপড় নিলে তিনি তিরস্কার করিবেন। আমি বলিলাম, আমার মা আপনাকে একখানা কাপড় দিয়াছেন, আপনি ইহা পরুন"। মাঠাকুরাণী বলিলেন, এখন আমার কাপড়

পরিবার সমন্ধ নাই। আমি তাহা তোমার মাকে দিলাম। আমি বলিলাম, মা বলিয়া দিয়াছেন, বউনদিদিকে এই কাপড়খানা পরাইয়া আসিবা। মাঠাকুরাণী বলিলেন, না, এখন না। আমি বলিলাম, এখনই ত সময় আছে। আমি কাপড় ধরি, আপনি পরুন। আমার মার কাপড়খানা মাঠাকুরাণীকে জোর করিয়া পরাইয়া দিলাম। নাগমহাশয় যে কাপড়খানা দিয়াছিলেন, তাহা মাঠাকুরাণীকে দেখাইয়া ছুড়িয়া রাখিলাম এবং বলিলাম, তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, আমি আপনাকে দিলাম। তিনি না দিলে আমি কোথায় পাইব? নাগমহাশয় আবার আসিয়া কাপড় দিবেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিলাম। পথে নাগমহাশয়কে দেখিলাম। তিনি স্বামীর সহিত কথা বলিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, মা, ও কাপড়খানা পরিলে না? নাগমহাশয় সব জানেন, বালকের মত স্বামীকে বলিলেন, আপনাকে পারিলাম না, উহাকে একখানা কাপড় দিয়াছি, ও নিল না। স্বামী মনে মনে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার অপার দয়া। আপনার নিকট কাপড় চাহি নাই। আপনি কেন কাপড়ের কথা বলেন। নাগমহাশয়ের সেদিনকার ভাব দেখিয়া, সকলেই মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

নাগমহাশয় স্বামীর হাত ধরায়, স্বামী সকলই বুঝিতে পারিলেন। পাষাণীর জন্য চলিয়া আসিলেন। নাগমহাশয় নৌকা পর্য্যন্ত আসিলেন। একবার বলিলেন, দুগ্ধ না দিলে, আমাকে বাজারে যাইতে হইবে। স্বামী বলিলেন, দুগ্ধ এখনই দিবে, আপনি কেন অযথা কষ্ট স্বীকার করিবেন? নাগমহাশয় বোধ

হয় আমাদের সাথে বাজার পর্য্যন্ত আসিতেন, আমরা তাহা বুঝিলাম না। নাগমহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মা, লক্ষ্মীনারায়ণের মত থাকিও। ভগবানে মন রাখিও। সংসারে কিসের ভয়? তিনি আপন ভাবিয়া সমস্ত বলিয়াছিলেন, আমি পাষাণী কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। যতদূর দেখা গেল, তাঁহাকে দেখিলাম। তিনি ডাকিয়া ডাকিয়া কত কথা বলিলেন। অদৃশ্য হইলে স্বামী বলিলেন, বোধ হয় তিনি আর বেশী দিন থাকিবেন না। আসার সময় আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, উহাকে কষ্ট দিবেন না। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি আমাদের সহিত আর অধিক দিন খেলা করিবেন না। আমি বলিলাম, তিনি আমার জন্য অনেক সময় অনেক কাজ করেন, অনেক সময় বলেন, আমি ত ভাবি ক্ষেপা চণ্ডী কখন কি করিয়া বসে। এসব তাঁহার দয়া, অপাত্রে অহৈতুক স্নেহ। স্বামী বলিলেন, হইতে পারে ইহার অন্য কোন কারণ আছে, কিন্তু আমার মনে যাহা হইয়াছিল, তাহা বলিলাম।

নাগমহাশয় কি ভাবেন, জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যদি স্বামীর কথা শুনিয়া দেওভোগ ফিরিয়া যাইতাম, পূজার কয়েকটী দিন তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্বামী সব বুঝিতে পারিয়াও পাষাণীর সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। আর ত জীবনে পূজার সময় নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না। বাবা, তুমি সমস্ত জানাইয়া দিলে, আমি পাষাণী, তাই কিছু

বুঝিতে পারিলাম না। এই নবমী আমার কাল নবমী হইল। বাবা, তোমার স্নেহ আমার ভাল লাগিল না। আমি পাপিনী, পাপসংসার আমার ভাল লাগিল। তোমার স্নেহ তোমার সঙ্গে চলিল। এখন সেই পিতা, সেই মাতা, সেই দুর্গাপূজার সকলই আছে, কেবল তুমি নাই। কৈ বাবা, তুমিত এখন আসিয়া সামনে দাঁড়াও না, পিতা-মাতা তোমার সময়ের মত আমার অভাব অনুভব করে না। যেমন তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিফল বেশ পাইয়াছি। জীব হইয়া যেমন তোমায় অবহেলা করিয়াছি, এখন তাহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতেছি। নবমীদিন যে ভাবে তোমাকে ছাড়িয়া আসিলাম, আমি নরাধম, আমার হৃদয় পাষাণ, পশু পক্ষীও তোমাকে সেইভাবে ছাড়িয়া আসিতে পারিত না। তুমি আমাকে ভালবাসিতে, তজ্জন্য স্বামী আমার মনের দিকে চাহিয়া তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। যখন তুমি তাঁহার হাতে ধরিয়াছিলে, তখনই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিলে কি হইবে, পাষাণীর সাথে থাকিয়া কেহ সুখ পাইতে পারে না, কষ্টই তাহার লাভ।

আমি স্বামীর কথা শুনিয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। স্বামীকে বলিলাম, তিনি সব সময়েই আমাকে স্নেহ করেন, এবার নাগমহাশয়ের স্নেহ ভিন্ন মত দেখিলাম। নৌকা পুকুরের ঘাটে দেখিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খাইতে দিয়া নিজে খাইতে বসিলাম। আসিব মনে করিয়া অধিক খাইতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি সামান্য খাইয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি ও আমি বঁড় ঘরে বসিয়া কথা

বলিতেছি, মাঠাকুরাণী বলিলেন, তুমি দধি খাও নাই। তাহা খাইয়া যাও। নাগমহাশয় বলিলেন, কেন দধি খায় নাই? মাঠাকুরাণী বলিলেন, ও রান্না ঘরে যে খাইতে বসিয়াছিল, আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। নাগমহাশয় বলিলেন, এখন দাও। আমি বলিলাম, অল্প দিবেন, আমার পেট ভরা। মাঠাকুরাণী দধি দিলেন। আমি তাহা খাইয়া, মুখ ধুইতে পুকুরের ঘাটে যাইয়া, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতেছি। দেখিলাম, নাগমহাশয় আমার পিছনে যাইয়া পথে দাড়াইয়া আছেন। মহাভাবে তাহার চক্ষু দুইটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে। স্নেহমাখা দৃষ্টি দ্বারা আমার হৃদয় টানিয়া নিতেছেন। আমরা যে সেইদিন চলিয়া আসিব, তাহা যেন একটা জঘন্য কাজ হইতেছে। নাগমহাশয় আমাদিগকে বারণ করিতেছেন না, কিন্তু আমরা না আসিলে ভাল হইত। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন আসিলেন? তিনি বলিলেন, তোমাদিগকে সুখে দেখিলেই আমি সুখী। আমি মনে মনে বলিলাম, দেখা দিয়া আমাকে সুখী করিতে আসিয়াছ? আমি যেন মন দিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারি। তুমি আমাকে তোমার চিন্তা করিতে বলিয়াছ। নাগমহাশয় তাকাইয়া রহিলেন। আমাকে সঙ্গে করিয়া বড় ঘরে আসিলেন। জানি না, আজ নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া আসিয়া কি ভীষণ কাজ করিলাম। এবার তাঁহার আর একটী কাজ দেখিলাম। সরলা দিদি একটা সন্দেশ দিলেন, নাগমহাশয় তাহা হাত পাতিয়া লইলেন। পিসী আর একটী সন্দেশ দিলেন। বিনা আপত্তিতে তাহাও গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে প্রসাদ বলিয়া একটী সন্দেশ দেওয়া যায় না। স্বামী

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, ভগ্ন হৃদয় লইয়া বসিয়া রহিলেন। কতক সময় পর তিনি বলিলেন, কপালে কি আছে, তাহা কে জানে? তিনি সরলাকে বড় প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, উঁহার বড় শুদ্ধ স্বভাব। নাগমহাশয়ের উপর তাহার ভক্তি আছে বলিয়াই তিনি তাহার এত প্রশংসা করিয়াছেন। ভগবান ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এখন তিনি কতকদিন থাকিয়া যান, তবেই হয়। আমি বলিলাম, তাঁহার কথা অনেক লোকের নিকট বলিও না।

নাগমহাশয়ের কথা এভাবে বলিতেছি, নৌকা আমাদের পুকুরের ঘাটে লাগিল। পিতামাতা সকলেই নাগমহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, তাঁহাকে ভালই দেখিলাম। জানি না কেন, তাঁহার ভাব ভিন্নমত দেখিতে পাইলাম। পিতা বলিলেন, জ্যেঠামহাশয়ের অভাবে যে তিনি বেশীদিন সংসারে থাকেন, আমার বোধ হয় না। সকলেই বলে, এখন জীবের জন্য যে কয়েক দিন ইচ্ছা হয়, তিনি থাকিবেন। তোমরা ভক্ত, তোমরা বুঝিতে পার। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বইন-দিদিকে যে কাপড়খানা দিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে পরাইতে পারিয়াছিলে কি? আমি বলিলাম. তিনি তোমার কাপড় পরিয়া-ছেন। নাগমহাশয় আমাকে একখানা কাপড় দিয়াছিলেন, আমি তাহাও মাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছি। পিতামাতা তাহা শুনিয়া বলিলেন, ভালই করিয়াছ। তাঁহার দয়া থাকিলেই হয়। তাঁহা-দিগকে সকল কথা বলিলাম না। নাগমহাশয় যে স্বামীর হাত ধরিয়াছিলেন, তাহা গোপন করিলাম। সেই কথা কেবল স্বামীর ও আমার মনে রহিল। মন যেন কেমন করিতে লাগিল। মা

আমাকে খাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, আমি আজ আর খাইব না। তিনি অতিশয় যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আজ আর ক্ষুধা হইবে না। এখন আমি শুইয়া থাকিব। নাগমহাশয়ের স্নেহমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া আমার কিছুই ভাল লাগিল না। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে উত্তরের ঘরে দুর্গাপূজা হয়, আমাদের বাড়ীতেও উত্তরের ঘরে দুর্গাপূজা হয়। নাগমহাশয়ের বাড়ার প্রতিমা লাল, আমাদের এখানেও লাল প্রতিমা। মণ্ডপের দিকে তাকাইলে মনে হয় নাগমহাশয়ের বাড়ীতেই আছি। সবই দেখিতে পাইতেছি, কেবল নাগমহাশয়কে দেখি না। মনে হইতে লাগিল, নাগমহাশয় এদিক হইতে আসিতেছেন, অন্যদিক হইতে আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি আর বসিলাম না। প্রতিমা নমস্কার করিয়া শুইয়া রহিলাম। নাগমহাশয়ের সমস্ত গুণ মনে পড়িতে লাগিল। আসার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া সময়মত ঘুমাইতে পার না, পারিলে নৌকায় একটু ঘুমাইও, শরীর সুস্থ হইবে। নাগমহাশয় আমার এত যত্ন করিতেন, প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাকে সুখী করিতে চাহিতেন, আমার কষ্ট হইবে বলিয়া উদ্বিগ্ন থাকিতেন।

শুইয়া থাকিয়া নাগমহাশয়ের স্নেহ মনে করিতেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ীতে আরত্রিক আরম্ভ হইল। ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমার মনে হইল যেন আমি দেওভোগে আছি, ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে যেন নাগমহাশয়ের কথা শুনিতেছি। আমার মনে হইতে লাগিল যেন নাগমহাশয় পূর্ব্বের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, উঠিয়া গেলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আবার ভাবিলাম, তিনি

মণ্ডপঘরের সামনে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছেন। আমার মন দেওভোগে বিচরণ করিতেছে, হেম ও আমার বড় ভগ্নী আসিয়া বলিলেন, এক বৎসরের জন্য এই নবমী তিথি শেষ হইল, আরত্রিক দেখিবে না? উঠ, আর দেরি করিও না। আমার বড় কষ্ট হইল। তাহারা আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। আমার মনে হইল, কোথায় দেওভোগ এবং দেহধারী দয়া, আমার দুর্গা-চরণ! উঠিয়া গেলে ত আর নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব না। তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যাইয়া আরত্রিক দেখ, আমি এখন যাইব না। তাহারা বলিল, পূজার সময় ত দেওভোগে সুখে ছিলে। অন্যবার প্রথম পূজা দেখিয়া যাও, দশমীর পর দিন আস। এবার কোন বিশেষ কাজের জন্য আসিতে হইয়াছে। আগামী বৎসর পূজার সব দিন তথায় থাকিতে পারিবে। তোমার এত কষ্ট কি? তুমি মনে করিলেই জ্যেঠামহাশকে সকল স্থানে দেখিতে পাও। এখানে যে দুর্গা প্রতিমা, দেও-ভোগেও সেই দুর্গা প্রতিমা। আমার জ্বালা কেহ বুঝিল না। তাহাদের অনেক অনুরোধে উঠিয়া প্রতিমা দেখিতে গেলাম। অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। কতক সময় পর স্বামী আসিয়া বলিলেন, আমি আরত্রিক দেখিয়া আসিলাম, তুমি দেখিলে না? আমি বলিলাম, আমিও গিয়াছিলাম, অল্প সময় তাহা দেখিয়া চলিয়া আসিয়াছি। মনে হইয়াছিল, আমি যেন দেওভোগে আছি। আরত্রিকের বাদ্য শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমি নাগমহাশয়ের কাছে আছি, তিনি যেন কাঁশর বাজাইতে-ছিলেন এবং দেবীর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। বাদ্য যেন তাঁহার কথার মত শুনা যাইতেছিল। স্বামী বলিলেন,

হাঁ, ঘুমের ঘোরে আমারও মনে হইতেছিল যেন আমি দেও-ভোগে আছি। জাগিয়াও ধারণা হইতেছিল যেন তিনি কথা কহিতেছেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছেন, বাহিরে গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি বাহিরে যাইয়া দেখিতে পাইলাম, দেবীর আরত্রিক হইতেছে, ঢাক বাজিতেছে, কাঁশর বাজাইতেছে, মণ্ডপের দিকে তাকাইয়া দেওভোগের প্রতিমার মত লাল প্রতিমা দেখিলাম; সবই দেখিতে পাইলাম, কিন্তু নাগমহাশয়কে কোথায় ও পাইলাম না।

আমি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাঙ্গা নৌকা লইয়া কি হইয়াছিল? তুমি কি রমক বিপদে পড়িয়াছিলে? স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয় নটবরবাবুদের বাড়াতে প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে না দেখিয়া আমার আর ভাল লাগিল না। প্রতিমা দেখার উপলক্ষ করিয়া, একটী নৌকা লইয়া চলিলাম। যাওয়ার সময় বেশ গেলাম। আসার সময় কতক দূর আসিয়াছি পর, নৌকায় এত জল উঠিতে লাগিল, জল ফেলিয়া কিছুই কমাইতে পারিতেছি না। যে জল উঠাইয়া ফেলি, তাহার অনেক গুণ অধিক জল উঠিতে লাগিল। নাগমহাশয় অন্য নৌকায় ছিলেন। আমার তরী ডুবু ডুবু, এমন সময় তিনি আমার নৌকায় আসিলেন। অল্প সময় মধ্যে তিনি নৌকার জল ফেলিয়া, তাহা আবার ভাসাইলেন। তিনি এ ভাবে জল ফেলিলেন, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার নৌকা ভাসাইয়া দিয়া, নাগমহাশয় তাঁহার নিজের নৌকায় গেলেন এবং আমার আগে আগে চলিলেন, আমি ভাঙ্গা নৌকায় পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলাম। একবার নৌকা এমন ভাবে

চালাইলাম, নৌকার অগ্রভাগ তাঁহার পায় লাগিয়া গেল। নাগমহাশয় ফিরিয়া তাকাইয়া বলিলেন, আপনি আগে আগে চলুন। তাহাতে আমার মনে বড়ই সুখ হইল। তিনি দেখাইলেন, যখন আমি আমার জীবনতরী অর্দ্ধপথে ডুবাইতে বসিব, যখন আমি আমার কর্ম্মের বোঝা ফেলিতে ফেলিতে অশক্ত হইয়া হতশ্বাস হইব, কিন্তু মুর্খতাহেতু তাঁহার দিকে তাকাইব না, কিম্বা কাতর প্রাণে তাঁহার আশ্রয় চাহিব না, নাগমহাশয় নিজগুণে দয়া করিয়া আমার ভগ্ন ডুবন্ত তরীতে আসিবেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া আমার স্তুপীকৃত কর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া তাহা ভাসাইবেন। তিনি আরও দেখাইলেন, আমাকে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাস নাই। তিনি পথ দেখাইয়া দিলেও আমি কি করিয়া বসি, তাহা ঠিক নাই, তাই আমার দয়াল ঠাকুর আমার পিছনে রহিলেন। আমি যেখানেই যাই না কেন, তিনি আমার পিছনে থাকিবেন, আমি কোন অবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া আপন মনে একদিকে চলিয়া যাইতে পারিব না। এমন ঠাকুর কি কখন হয়? এমন দেহবদ্ধদয়া কি অন্যত্র সম্ভবে? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে ভাঙ্গা নৌকায় যাইতে বারণ করিলেন, আবার বলিলেন, উহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি সঙ্গে না থাকিলে, আজ কি মুস্কিলে পড়িত। সকলই তাঁহার দয়া, সমস্তই তাঁহার অহৈতুক কৃপা। আমরা মনস্থ করিলাম, আর পূজার সময় নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া আসিব না। বিধাতা পরের পূজায় আর নাগমহাশকে দেখিতে দিলেন না। মনের দুঃখ মনেই রহিল। এই নবমী আমাদের কাল নবমী হইল।

নাগমহাশয় ভাঙ্গা নৌকার জল ফেলিয়া স্বামীকে যেমন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যদি কেহ বিপদে

পড়িয়া নাগমহাশয়ের স্মরণাপন্ন হইত, স্বামীর মত সেও বিপদ-সাগরের পার পাইত। দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরিশাল জিলায় তাঁহার বাটী ছিল। তিনি কোন কারণে বাটী হইতে চলিয়া আসেন। কাহাকেও তাহার কারণ বলেন নাই। লেখাপড়ায় বেশ আগ্রহ ছিল। কতকদিন মুন্সীগঞ্জ থাকিয়া, পরের বান্না করিয়া পড়া চালাইয়াছিলেন। তৎপর যোগাব কবিয়া বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েন। ঢাকায় পড়ার সময় স্বামীর সহিত তাহার ভাব হয়। স্বামীকে অনেক কথা বলিয়া কহিলেন, দেখুন, জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। শরীরে অন্য ব্যাধি হইলে ভাবিতাম না। পায় গোদ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সকলে আমাকে গোদা বলিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। স্বামী বলিলেন, ভগবান্ সকলের কর্ত্তা। ভগবান্ ব্যাধি দিলে কি করিবেন? ভগবান্‌কে বলুন, তাঁহার ইচ্ছায় তাহা ভাল হইয়া যাইতে পারে। তিনি স্বামীর কাছে অনেক কাঁদিলেন। স্বামার মনে অতিশয় কষ্ট হইল। তিনি নাগমহাশয়ের অনেক দয়ার কথা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, নাগমহাশয় মনের কথা জানিতে পারেন। আপনি যে ১৫ বৎসর বয়সে বাড়ী ছাড়িয়া, নিজে যোগাব করিয়া বি, এ, পড়িতেছেন, বিবাহ করেন নাই, আপনাকে দেখিলে নাগমহাশয় সুখী হইবেন। দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, আপনি আমাকে আগামী শনিবারে লইয়া চলুন। স্বামী তাহা করিলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস হইল। মুখে কিছু বলিলেন না, মনে মনে সমস্ত দুঃখ নাগমহাশয়কে জানাইলেন। তিনি দীনবন্ধুবাবুকে স্নেহ করিতেন, বিবাহ করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রশংসা

করিতেন। নাগমহাশয়ের স্নেহে দীনবন্ধুবাবুর ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বামীর সঙ্গে কোন কোন শনিবার দেওভোগে যাইতেন। কয়েকদিন দেওভোগে আসিলে তাঁহার পায়ের উপর যাহা স্ফীত ছিল, তাহা কমিয়া গেল। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন।

নাগমহাশয় যে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন, তাহা অনেকেই অনুভব করিত। তিনি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারিতেন না। দুর সম্পর্কে আমার এক খুল্লতাত বিমলাবাবু যখন নাগমহাশয়কে প্রথম দেখিতে যান, তিনি বাড়ী না চিনিয়া তাঁহার বাড়ী ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নাগমহাশয় পথে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার পূর্ব্বে বিমলাবাবু কখনও নাগমহাশয়কে দেখেন নাই, কিম্বা তাঁহার বাড়াতে যান নাই। তাঁহার মহিমা শোনা ছিল, তাঁহার চেহারা কি রকম তাহা জানা ছিল। নাগমহাশয়কে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নারায়ণ বলিয়া মনে হইল। নাগমহাশয়ের বাড়ী ফেলিয়া যাইতেছিলেন, নাগমহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া পথে দাঁড়াইলেন দেখিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিল, তিনি সমস্ত জানিতে পারেন। তিনি অনেক সময় নাগমহাশয়ের রূপ চিন্তা করিতেন, সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তিনি সকল পথ নাগমহাশয়ের কথা ভাবিতেন এবং সেইদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া আহ্লাদিত হইতেন। একদিন নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এবং হরপ্রসন্ন সন্দেশের থালা হাতে নিয়া আসেন। বিমলাবাবু নাগমহাশয়ের পদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতে সাহস পাইতেন না। তাহার মনে বড় কষ্ট

ছিল, তিনি তাঁহার পা ছুইতে পারিলেন না। একদিন ভক্ত-বৎসল নাগমহাশয় তাহাকে বলিলেন, শনিবার আসিবেন, কত কি দেখিতে পাইবেন। নাগমহাশয় বলিয়াছেন, বিমলাবাবু মহা-আনন্দে দেওভোগে গেলেন। সমাগত সকল লোক মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। নাগমহাশয় হাতে তুরি দিতে দিতে সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহাব পাদু'খানি বিমলাববুর দিকে পড়িল এবং তাহাব গায় লাগিল। বিমলাবাবু মনের আনন্দে আকাঙ্ক্ষা পুরাইয়া তাঁহার চরণযুগল ধবিলেন। নটববাবু ও অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইয়া নাগমহাশয়কে ধরিতে লাগিলেন। কতক সময় পর নাগমহাশয় প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভক্তগণ মনের আনন্দে আবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

আমরা নাগমহাশয়েব সমাধি দেখি নাই। তাঁহার দেহে অস্বাভাবিক কিছু দেখি নাই। তাঁহাব চক্ষের জ্যোতি অলৌকিক ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সকলেই তাহা দেখিয়াছে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেনেব শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ পুঁথিতে নাগমহাশয়ের চক্ষের জ্যোতির কথা লেখা আছে। নটবরবাবু বলেন, একদিন তিনি তাঁহার পদযুগল কমনীয় অরুণবাগে রঞ্জিত দেখিয়াছেন এবং আর একদিন নাগমহাশয়কে সমাধিসাগরে নিমজ্জিত দেখিয়াছিলেন। নটবরবাবু বলিয়াছেন, একদিন সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় বলিলেন, তিনি সন্ধ্যা কবিবেন। হাত মুখ ধোত করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। সমাধি হইল, এক ঘণ্টার উপর তাঁহার বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না। নটববাবু নাগ-মহাশয়ের কৃপা পাইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী নাগমহাশয়ের বাড়ীব নিকটে ছিল। অনেক সময় নাগ-

মহাশয়কে দেখিতে পাইয়াছেন। আমরা নাগমহাশয়ের অলৌকিক কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই নাই। তিনি যাহার নিকট যে ভাবে ইচ্ছা হইত দেখা দিতেন। তিনি বলিতেন, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটী গাছের পাতাও পড়ে না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে। এক দিন রাত্রিতে স্বামী নাগমহাশয়ের কাছে বসিয়া আছেন। তিনি দেখিলেন, নাগমহাশয়ের দুইটী চক্ষু হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে। তাঁহার নয়নের তারকা বাতির মত জ্বলিতেছে। একদিন সন্ধ্যার পর আমি নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি। তিনি কথা বলিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার কথা বন্ধ হইল। আমি নাগমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার দুইটী চক্ষু হইতে তৈলের বাতির শিখার মত জ্যোতি বাহির হইতেছে। কতক সময় পরে একজন লোক আলো হাতে করিয়া তথায় আসিল। নাগমহাশয় আবার কথা বলিতে লাগিলেন। চক্ষের জ্যোতি আর দেখিতে পাইলাম না। নাগমহাশয়ের চক্ষের জ্যোতি যে ভিন্ন মত ছিল, অনেকেই তাহা বলিয়াছে। একদিন আমার মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের চক্ষের মণি যেন তারার মত দেখা যায়। তাঁহার চক্ষের জ্যোতি দেখিয়া, আমি বুঝিতে পারিলাম, মা অতিরঞ্জিত কথা বলেন নাই। মা নাগমহাশয়ের চক্ষের জ্যোতির কথা আমাকে বলায়, আমি মনে করিয়াছিলাম, নাগমহাশয় কখন ভোজ বাজি দেখান না। মা কি বলিলেন? মাকে কোন কথা বলিলাম না। তাঁহার কথায় আমার সন্দেহ জন্মিল। আমি নাগমহাশয়ের চক্ষের জ্যোতি দেখিয়াছি পর, স্বামী ও সেইরূপ বলিলেন। তখন মার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

নাগমহাশয়ের দেহে আর কোন অলৌকিক দৃশ্য দেখি নাই, তবে তিনি সাধারণ লোক হইতে পৃথক ছিলেন। উপবাস করিলে লোকের মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। নাগমহাশয় কত উপবাস করিয়াছেন, কোন দিনও তাঁহার মুখে দুর্গন্ধ পাই নাই। উপবাসী লোক কথা বলিলে, তাহার নিকটবর্ত্তী লোক দুর্গন্ধ পায়, কিন্তু নাগমহাশয়ের গায় একটা সুগন্ধ ছিল। যাহারা তামাক খায়, তাহারা তামাক না খাইলে, তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয়, নাগমহাশয় অসুখের সময় তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কখনও তাঁহার নিকট কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় নাই। যাহারা আমাশয় রোগ ভোগে, তাহাদের শরীর হইতে একপ্রকার খারাপ গন্ধ বাহির হয় এবং তিনি শেষ অবস্থায় যে ভাবে ছিলেন, অন্যলোক হইলে, তাঁহার নিকটে ঘেঁষা যাইত না। কিন্তু দুর্গন্ধ দূরে থাকুক, নাগমহাশয়ের দেহ হইতে একটা সুগন্ধ আসিত। তাঁহার শরীরে সর্ব্বদা একটা সুগন্ধ লাগিয়াই থাকিত, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছে।

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শরৎবাবু দেওভোগে ছিলেন। নাগমহাশয় উপবাসী আছেন। শরৎবাবু ভাবাবেশে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, আমার গায় দুর্গন্ধ আছে, সড়িয়া যান। শরৎবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এই দুর্গন্ধের ভিতর একটা সুগন্ধ আছে, কেন সড়িব? তিনি নাগমহাশয়কে ধরিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে শরৎবাবু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, দেবীর পূজা হইতেছে, তাহা দেখুন। শরৎবাবু জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দিকে তাকাইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কাকে রেখে কাকে দেখি, কে বেশী সুন্দর।

নাগমহাশয় মৃদু-মন্দ হাসিতে লাগিলেন। শরৎবাবু নাগমহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা হইতে নাগ-মহাশয়কে অধিক সুন্দর অনুভব করিয়া, অন্য স্থান হইতে চক্ষু উঠাইয়া আনিয়া তাঁহাতেই ন্যস্ত করিলেন। শরৎবাবুর কাজ দেখিয়া সকলেই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিল। শরৎবাবু নাগমহাশয়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত। আমি ছোট সময় শরৎবাবুকে একবার দেওভোগে দেখিয়াছিলাম।

আমার এক পিসতুতো ভগ্নীর স্বামী মরিলে, তিনি নাগ-মহাশয়কে দেখিতে যান। যেমন বিধবা কন্যা পিতাকে দেখিয়া কাঁদে, সেইরূপ তিনি নাগমহাশয়েব কাছে কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, মা, কাঁদ কেন? চারি যুগেই এই ভাবে আসা যাওয়া হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, স্বামীর জন্য ভাল ভাবে থাকিয়া, স্বামীর চিন্তা করিয়া, পতিলোকে যাওয়া যায়। এ বেশে পতিব্রতা ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মামা, সকলই আপনার ইচ্ছা। যখন সংসার সাজা'ন হইয়াছে, সকল মত দৃশ্যই দরকার। ছোট সময় যখন আমরা খেলা করিতাম, একটা পুতুলকে রাণী ও একটাকে দাসী বানাইতাম। আপনিও সেইরূপ কাহাকে কোলে লইয়া, সুখী করিয়া, লক্ষ্মীর মত স্বামীর সহিত রাখিয়াছেন, আবার কাহাকে অশেষ দুর্গতিতে ফেলিয়াছেন। ভগবান্ সমস্ত লইয়া সংসার সাজান। নাগমহাশয় বলিলেন, মা, শ্রেষ্ঠ কথাই বলিয়াছ। যাহার গর্ভধারিণী ভাল, তাহার বুদ্ধির ভ্রংশ হয় না। একদিন নাগমহাশয় ইহাকে বলিয়াছিলেন, শেফালিকা ফুল ভাল। শেফালিকা ফুলে ভগবান্ সুখী হন। সমস্ত ফুল গাছের কষ্ট

জন্মাইয়া ছিঁড়িয়া আনিতে হয়, শেফালিকা আপনিই ঝড়িয়া পড়ে।

আমি দুর্গাপূজার সময় নাগমহাশয়কে যে ভাবে ছাড়িয়া আসিলাম, অন্য কেহ এই ভাবে আসিতে পারিত না। কালী-পূজার সময় দেওভোগে যাইয়া দেখিলাম, নাগমহাশয়ের অসুখ হইয়াছে। সকল দিন পায়খানায় যাইতেছেন। তাঁহার আমাশয় হইয়াছে। মুখখানা ঈষৎ ফুলিয়াছে। পা দুইখানি ভারি হইয়াছে। এই শরীর লইয়া জল কাদার মধ্য দিয়া বাজার করেন। মা ঠাকুরাণী বলিলেন, এমত অসুখ লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করেন কিছু বলিলে তাহা শোনেন না। যদি কার্ত্তিক মাসে বুড়ো মানুষের শোঁত হয়, সে আর বেশীদিন এই সংসারে থাকে না। মাঠাকুরাণী ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। জল কাদায় বাজারে গিয়াছেনই, দুর্গাপূজার পর আর ঘরের ভিতর শোন নাই। খোলা মণ্ডপঘরে শুইয়া রহিয়াছেন। মাঠাকুরাণীকে কাছে শুইতে দিতেন না। একদিন তিনি এই অসুখের সময় নাগমহাশয়কে বলিলেন, আপনি খোলা ঘরে ঠাণ্ডায় শুইয়া থাকিবেন, আর আমি সুস্থ শরীর লইয়া এই স্থানে শুইতে পারিব না, আমার কি হইবে? নাগমহাশয় বলিলেন, তাহা হইবে না, তুমি ঘরে শুইবে। মাঠাকুরাণী বসিয়া রহিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার ভগ্নীকে ডাকিলেন। পিসীমা তাঁহাদের নিকটে গেলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, দেখ, আমি উহাকে ঘরে যাইয়া শুইয়া থাকিতে বলিলাম, সে গেল না। পিসীমা বলিলেন, কোনদিনও ত আপনি এই ভাবে থাকেন নাই। আপনার অসুখ, আপনি খোলাঘরে এভাবে থাকিবেন

কেন? দিনের বেলায় অসুস্থ শরীরে জলকাদায় রোজ বাজার করিবেন? কোন কথা বলিতে সাহস পাই না। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেও কার্ত্তিক মাসের হিম বেড়ার ভিতর দিয়া ঘরে যায়; আর আপনি খোলা মণ্ডপঘরে সারারাত থাকিবেন। আপনার অসুখ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভাল মানুষেরও এই হিম সহ্য হয় না। ভগ্নীর কথায় কোন কাজ হইল না। ভগ্নী মনে কষ্ট পাইয়া মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, কোন দিনও ঠাকুরভাইয়ের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কাজ হয় নাই। আপনিই ঘরে গিয়া শোন। মাঠাকুরাণী নিরুপায় হইয়া ঘরে শুইলেন। পিসীমা মনের কষ্টে ভাইয়ের নিকট বসিয়া রহিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন, সংসার কতদিনের জন্য? সংসারে কেহ কাহারও নয়। সংসার ভুলিয়া, ভগবানে মন দে, মঙ্গল হইবে। নাগমহাশয়ের ভাব দেখিয়া পিসীমা সকল বুঝিতে পারিলেন। চুপে চুপে কাঁদিতে লাগিলেন। লোক কোন অবস্থায়ও নাগমহাশয়ের দেহের সুখ ও দুঃখ বুঝিতে পারে নাই। কি করিয়াই বা পারিবে? তাঁহার সুখ দুঃখ ছিল না; তাঁহার দেহাত্মবোধ ছিল না। কতকগুলি কাজ দেখিয়া পিসীমা বুঝিতে পারিলেন, নাগমহাশয় আর বেশীদিন এই সংসারে থাকিবেন না।

আমি এই সমস্ত কথা শুনিয়া পিসীমাকে বলিলাম, তিনি যে অসুস্থদেহে খোলা মণ্ডপঘরে শুইয়া থাকেন, আপনি তাহা বারণ করিতে পারেন নাই? মাঠাকুরাণীত বলেন, তিনি তাঁহার কথা একেবারে শোনেন না। পিসীমা বলিলেন, ঠাকুরভাইকে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। তিনি বধূঠাকুরাণীর

সহিত কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। তবে কেন যে ঘরে শোন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বলিলাম, তিনি কেন যে অন্ন আমাশয়ে ভুগিতে ভুগিতে রোজ বাজার করিতেছেন, তাঁহার কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। কল্য রাত্রিতে আমি দেখিলাম, কালীপূজা হইতেছে, তিনি কাঁশর বাজাইয়া হিমের মধ্যে আম গাছের নীচে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন। আমি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলাম, আপনি হিমের মধ্যে গাছের নীচে বসিয়া ঘুমাইতেছেন? তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, না। আমি বলিলাম, ঘরে যাইয়া বসুন। তিনি বলিলেন, এখন ঘরে যাইব না। পূজা শেষ হইলে যাইব। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট হইল। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়া বাহিরে গাছের নীচে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার ঘরে কত বিছানা আছে। কত লোক গিয়াছে, সকলেই ঘরের ভিতর বিছানায় বসিয়াছে। কি করি? উপায় নাই। তাঁহার ইচ্ছার উপর হাত নাই। আমি নিরুপায় হইয়া, বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ছিল, আবার যদি তাঁহার চক্ষু মুদিত দেখি, একবার জোড় করিয়া বলিব, আপনি এই ভাবে গাছের নীচে বসিয়া ঘুমাইতে পারিবেন না, ঘরে চলুন। তাঁহার এমন ইচ্ছা, যতক্ষণ আমি তাকাইয়া ছিলাম, তিনি আর চক্ষু মুদিলেন না।

পূজা হইল। সমাগত সকল লোক খাইয়া শুইয়া রহিলেন। তৎপর নাগমহাশয় মণ্ডপঘরের বারান্দায় শুইলেন। পর দিন দেখিতে পাইলাম দুই চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। আমি কিছু বুঝিতে পারি-

জান না। মনে করিলাম, হিমে বসিয়া থাকায় তাঁহার জর হইয়াছে, তাহা লইয়া জলকাদায় বাজার করেন ; সুতরাং মুখ খানা ও পা দুখানি ঈষৎ ফুলিয়াছে। ঠাণ্ডার সময় চলিয়া গেলেই তিনি ভাল হইবেন। আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নাগমহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলাম। আমার পিতা বলিলেন, আপনার জ্বর আমাশার রোগ হইয়াছে, আপনি ঠাণ্ডা লাগান কেন ? নাগমহাশয় বলিলেন, তা কিছু নয়। সামান্য অসুখ। পিতা বলিলেন, আপনার পা দুখানা ও মুখ খানি ফুলিয়াছে, কি করিয়া সামান্য অসুখ মনে করিব ? নাগমহাশয় বলিলেন,'ও সামান্য। পিতা আর কিছু বলিলেন না, মনে বুঝিতে পারিলেন, তিনি আর বেশী দিন থাকিবেন না। নাগমহাশয়ের ভাব দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল, কেবল আমি পাষাণী বুঝিলাম না। মনে করিলাম, ঠাণ্ডা শেষ হইলেই নাগমহাশয় ভাল হইবেন। হৃদয়ে তাঁহার জন্য একটু কষ্ট হইল না। একবার চিন্তা হইল, যদি তিনি লীলা সম্বরণ করেন, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে ! আবার ভাবিলাম, তিনি জীবের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা তাহা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার সুখ নাই, দুখঃও নাই, কেবল লোক দেখান অসুখ। তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়াও মনের আনন্দে চলিয়া আসিলাম। একবার নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম না, লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কিনা। আসার সময় তাঁহাকে বলিলাম, আসি। নাগমহাশয় বলিলেন, না খাইয়া যাইবে কেন ? পিতা বলিলেন, এইদিন তাঁহার কি এক বিশেষ কাজ ছিল, না গেলে চলিবে না। নাগমহাশয় বলিলেন, সংসারে জীবের কেবল নানা মত বন্ধন। আমি মনে মনে বলিলাম, আপনার এত ভোগ হইল কেন ? নাগমহাশয় বলিলেন, প্রাক্তন

ভোগ। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও নাগমহাশয়ের মুখে এমন কথা শুনি নাই। তিনি প্রকারান্তরে আমাকে জানাইয়া দিলেন, প্রাক্তন ভোগ আছে, তাই মনের আনন্দে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছি। অন্যান্যবার আসার সময় তিনি সঙ্গে আসিয়া পথে দাঁড়াইতেন, এবারও সেই ভাবে দাঁরাইলেন এবং যতদূর দেখা গেল, তিনি তাকাইয়া রহিলেন। আমি পাষাণী তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। হায় হায়, যিনি দেবতারও আরাধ্য, তাঁহাকে কিভাবে অবহেলা করিয়াছি। পিতা সমস্ত বুঝিয়াছিলেন, কার্য্যের গতিকে চলিয়া আসিলেন।

কতক দিন পরে এক দিন পিতা নাগমহাশয়কে দেখিতে গেলেন। সে সময় তাঁহার অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। পায়ে শোঁথ নামিয়াছে, মুখ খানাও অনেক ফুলিয়াছে, আহার একেবারেই নাই। যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিন হিঞ্চাসিদ্ধ একমুঠা ভাত খান, অন্যদিন কিছুই খান না। তাহার উপর ৮।১০ বার পায়খানায় যাওয়া আছে। এত অসুস্থ শরীর লইয়াও একটু বিশ্রাম করেন না। তিনি রীতিমত বাজারে যাইতেছেন, লোক গেলে তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া দিতেছেন, সমস্ত কাজ করিতেছেন। এবার তাঁহার ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পূর্ব্বেও ভগবানের কথা বলিতেন, তবে লোকের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাদের খাওয়ার জন্য যত্ন করিতেন। এখন সেই সকল কিছু নাই, ভগবানের কথা বলিতেছেন। যাহার ইচ্ছা খাইয়া আসে, যাহার ইচ্ছা হয়, না খাইয়া থাকে; আগের মত কোন কথা বলেন না। সময় সময় বলেন, এই সংসারে কেন আসিয়াছিলাম? কত জনের বা উপকার করিয়া গেলাম? বদ্ধ জীব কি হইবে?

বলাতে কি আর কাজ হয়? পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। একটা অজ্ঞান জীবের এত ছিদ্দত। একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল। এই ভাব দেখিয়া পিতা মাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর ভাইয়ের এভাব কতদিন যাবত হইয়াছে? মাঠাকুরাণী বলিলেন, কালী পূজার পর আর আহার নিদ্রা নাই, লজ্জা সরম নাই। আমাশয় রোগ ভুগিতেছেন। হরপ্রসন্ন গোবিন্দভোগ চাউল আনিয়া দিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনার পেটে অসুখ। পেটের পক্ষে গোবিন্দভোগ চাউল ভাল। আপনাকে তাহা রান্না করিয়া দি? এই কথা বলা মাত্র, তিনি পরার কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া হরকামিনী ও নবদিনীর কাছে গিয়া বলিলেন, আমার কিছু নাই, আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব এবং গাছের নীচে থাকিব। তাহারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহাদিগকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে দেখিয়া, উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় চলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আজ হইতে ভিক্ষা করিয়া খাইব। এমন সময় ননদিনী বলিল, আপনি আসুন, আপনার খাওয়ার জিনিষ আমি দিব। অল্প সময় গাছের নীচে বসিয়া থাকিয়া বাড়ীতে আসিলেন। ঘরে যে চাউল ছিল, তাহা রান্না করিয়া দিলে, সেই ভাত খাইলেন এবং বলিলেন, আমার থাকিতে, আমি পরের জিনিষ কেন খাইব? যখন কিছু না থাকিবে, তখন ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, গাছের নীচে থাকিব। পিতা সব কথা শুনিয়া, নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া বসিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, সুখের হাট শীঘ্রই ভাঙ্গিবে, তখন কি উপায় হইবে? আসিবার সময় নাগমহাশয়কে বলিলেন,

আমাকে নিয়া দেখাইবেন। নাগমহাশয় ভাব দেখিয়া, বিষাদিত মনে বাড়ী আসিলেন।

পিতা আমাকে নাগমহাশয়ের অনেক কথা বলিলেন, কোন কোন কথা গোপন করিলেন। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জ্যেঠা মহাশয়কে পূর্ব্বের চেয়ে ভাল দেখিলেন কি? পিতা মলিন মুখে বলিলেন, দুই দিন পর আমার ছুটি আছে, সেই সময় তোমাকে লইয়া দেখাইয়া আনিব। আমি ভাবিলাম পিতার মুখ এত কাল হইল কেন? অনেক সময় নাগমহাশয়ের অসুখ হয়, আবার তিনি ভাল হন। দুই দিন পরে গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইব, দুই দিন কোন মতে চলিয়া যাইবে। দুই দিন পর পিতা বলিলেন, মাগো, বাড়ী হইতে খাইয়া দেওভোগ যাইব। না খাইয়া গেলে ঠাকুর ভাই অসুস্থ শরীর লইয়া বাজারে যাইবেন। তোমরা যতক্ষণ ইচ্ছা ঠাকুরভাইকে দেখিও, না খাইয়া গেলে, খাওয়া দাওয়া করিতে অনেক সময় যায়। পিতার কথা মত আমরা মধ্যাহ্ন আহার করিয়া দেওভোগ গেলাম। তখন নাগমহাশয় একখানা ছেঁড়া মাদুরে বারান্দার এক কোণে বসিয়া আছেন। মুখখানা অনেক ফুলিয়াছে, পা দুখানা বেশ ভার হইয়াছে। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, একি? নাগমহাশয় বলিলেন, কিছু না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, কলিকাল, লিজই সিংহ হইয়া ঘারে কামড় দেয়। সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। সংসারে কত পাপ আছে। যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাকিয়া যাইও। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া, বিষাদিত মনে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম কি উপায় হইবে?

তিনি বলিলেন, আই তোমাকে বলি মা, অভ্যাস করিতে করিতে একদিন হইয়া পড়িবে। নাগমহাশয় আমাকে মনে মনে তাঁহার চিন্তা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, তাঁহাকে মনে রাখিলেই তাঁহার শ্রীচরণ পাইব। নাগ মহাশয়ের বাক্য বেদবাক্য স্বরূপ, তাহা কথনও মিথ্যা হইবে না। তিনি আমাকে বর দিলেন, আমার চিন্তা কি? আমি তাঁহাকে পাইব। আমার এমন আনন্দ হইল যে, তথন নাগমহাশয়ের শারীরিক অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, একবার পূজার সময় নাগমহাশয়ের এমন আমাশয় হইয়াছিল। সেই কথা তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে ৫০ বার পায়খানায় গিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি ভাল হইলেন। এবারও সেইরূপ ভাল হইবেন। লোকে ভুল বুঝিতেছে। নাগ মহাশয়ের রাতুল চরণ লাভ করিব, তিনি এই বর দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া আসিব মনে করিয়া উঠিয়াছি, তিনি রুগ্নদেহ লইয়া পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে উঠিলেন। মনে করিলাম, জীবের কর্ম্ম লইয়া তাঁহার এত ভোগ, আর পায় হাত দিয়া নমস্কার করিব না। নাগমহাশয় ত সমস্ত জানেন, দয়া করিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। আমি মাটিতে পড়িয়া নমস্কার করিলাম। নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমরা চলিয়া আসিলাম। প্রতিদিন নাগ মহাশয়ের অসুথ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। থাওয়াত পূর্ব্বেই ছিল না, অবশেষে হিঞ্চার রস ঔষধ বলিয়া থাইতে লাগিলেন। কোনদিন এক মুঠো ভাত থাইতেন, অন্যদিন বার্লীর মণ্ড থাইতেন। এই অবস্থায়ও ঘরে মল মূত্র ত্যাগ করিতেন না। রাত্রিকালে শয্যা

ত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিয়া বাহ্যি ও প্রস্রাব করিতেন। মাঠাকুরাণী মনে কষ্ট পাইয়া বলিতেন, আমি থাকিতে আপনি এত কষ্ট করিবেন কেন ? নাগমহাশয় বলিতেন, আমি আমার জন্য কাহাকেও কষ্ট করিতে দিব না। যখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মল মূত্র ত্যাগ করিতে বাহিরে গিয়াছেন, মাঠাকুরাণী কাঁদিতে থাকিতেন, কিছু করিবার জো ছিল না। মাঠাকুরাণী অনেকদিন কাঁদিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহিরে যাওয়া বন্ধ হইল না। যেদিন অবসন্ন শরীরে শয্যাশায়ী হইলেন, সেই দিনও ভোরের সময় বারান্দায় মল ত্যাগ করিয়া, নিজ হাতে তাহা ফেলিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণী ইহা দেখিয়া, কপালে চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, আপনি আমার সামনে মল ফেলিবেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। নাগমহাশয় মল ফেলিয়া দিয়া, হাত পা ধুইয়া, বিছানায় শুইলেন এবং মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, এস, কত সেবা করিবে, কর। সেইদিন হইতে মাঠাকুরাণী তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিয়াছেন, ইচ্ছামত সেবা করিয়াছেন, মল মূত্র হাতে করিয়া ফেলিয়াছেন।

নাগমহাশয় আর উঠিলেন না, হাতে ধরিয়া কোন জিনিষ মুখে দিতেন না, আমরা এই সব কিছু জানি না। সেবার স্বামীর পরীক্ষা ছিল। তিনি বেশী যাইতেন না। ইহার দুই দিন পরে স্বামী আর মনোযোগের সহিত পড়িতে পারেন না। পড়া ফেলিয়া রাখিয়া নাগমহাশয়ের নিকট চলিয়া গেলেন। দেওভোগ যাইয়া দেখিতে পাইলেন, বারান্দার এক কোণে চারিদিক ঘেরিয়া নাগমহাশয় শুইয়া আছেন। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই তাঁহার মন হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এখানে

আসিলে নাগমহাশয়কে বসা দেখিতাম, তিনি হাসিয়া কাছে আসিতেন। আজ আসিয়াছি, নাগ মহাশয় কাছে আসিলেন না। তিনি কোথায় তাহা দেখিতেও পাই না। স্বামী দুঃখিত অন্তঃকরণে বারান্দার অপর কোণে বসিয়া রহিলেন। নাগমহাশয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কোন কোন লোক প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে সমস্ত লোক নাগমহাশয়ের নিকট আসিত না, তাহাদের মধ্যে একজন স্বামীকে বলিল, কথা বলিতে নাগমহাশয়ের কষ্ট হয়। আমরা তাঁহার নিকট যাই না। স্বামীর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি ধীর স্থির। কখনও বেশী কথা বলেন না। এখনত বিষম সময় উপস্থিত। নাগমহাশয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে বোধ হয় জনমের মত হারাইতে বসিলাম, নচেৎ তিনি এভাবে শুইয়া রহিলেন কেন? কোন লোক কাটা ঘায় নুন দিল। কি করিবেন? ভক্তের হৃদয় ভগবান্ টানিয়াছিলেন। স্বামী বিষণ্ণ মনে সেই বারান্দার এক কোণে বসিয়া রহিলেন। লোকে চলিয়া গেলে পর তিনি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কথা বলিতে কষ্ট হয়? নাগ মহাশয় স্বাভাবিক স্বরে উত্তর করিলেন, না; আপনি কেমন আছেন? সকল ভাল আছে ত? অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়াও তাঁহার দয়া দেখিয়া স্বামীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ২।১টী কথা বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন।

স্বামী সকল দিন নাগমহাশয়ের নিকট থাকিয়া ক্লিষ্ট মনে পঞ্চসার আসিলেন। আমাকে সমস্ত কথা বলিলেন। আমাদের যে সুখের খেলা শেষ হইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

পরদিন আমাকে লইয়া দেওভোগ গেলেন। নাগমহাশয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মনে করিলাম, হায়, হায়, কোথায় আসিলাম? লোক বোধ হয় ঠিক বুঝিয়াছিল, আমি কি পাষাণী, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি দেওভোগ আসিলে যাঁহার পিছনে পিছনে থাকিতাম, যিনি আমাকে দেখিলে হাসিতে হাসিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তিনি একবার তাকাইয়াও দেখিতেছেন না, দ্বারবন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন। মাঠাকুরাণীব বান্ধব বিনা কেহ নাগমহাশয়কে দেখিতে পায় না। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। নাগমহাশয় ভাল থাকিলে, যে স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছি, সেই সকল স্থানে ঘুড়িতে লাগিলাম। আমার বড ভগ্নি আমার সাথে ছিলেন। তিনি আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া আমার সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন, আমি কি করি। মনের দুঃখে আমাকে বলিতে লাগিলেন, কি করিবে? দেখ, তিনি ভাল হন কি না। তাহা হইলে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দুই ভগ্নি দুঃখিত মনে বাহিরে বাহিরে ঘুড়িতে লাগিলাম। ভগ্নি মাসীব সহিত সংসারেব কাজ করিতে লাগিলেন। শরৎবাবু আসিয়াছেন। সময় সময় নাগমহাশয়কে ধরিয়া দেখিয়া মলিন মুখে বাহির হইয়া আসেন।

শরৎবাবু স্বামীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বামীকে ডাকিয়া সামনে নিতেন। শরৎবাবু তাঁহাকে নাগমহাশয়ের ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শরৎবাবু দেওভোগ যাওয়ায় অন্যান্য লোকের প্রাধান্য রহিল না। স্বামীর কোন অসুবিধা থাকিল না। নাগমহাশয় চলিয়া যাইবেন, ভক্তগণ সকলেই বিষাদিত, সকলেই মনে করিতেছেন, আর কি নাগ

মহাশয়কে বসা দেখিব? দিন একভাবে চলিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সকল দিন গেল, নাগমহাশয় একবার আসিয়া দেখা দিলেন না, একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না, মা, খাইয়াছ কিনা। যখন তিনি ভাল ছিলেন, কতবার দেখা দিয়াছেন, স্নেহ করিয়া কত কথা বলিয়াছেন। স্নানের সময় হইলে তিনি বলিতেন, মা, স্নান করিয়াছ? খাওয়ার সময় হইলে বলিতেন, মা, খাইযা এস। যদি কখন আমাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেন, তিনি বলিতেন, মা, ঘরে যাও। আজ আমি যে কোণে কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তিনি একবারও বলিলেন না, মা, ঘরে যাও। আজ স্নান না করিয়া রহিলাম, তিনি একবারও বলিলেন না, মা, স্নান কর। আজ খাওবার সময় চলিয়া গেল, তিনি বলিলেন না, মা, খাইলে না? নাগমহাশয় কত দিনে উঠিয়া বসিবেন, আমি কত দিনে আবার নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইব। সমস্তই ঠিক রহিয়াছে, কেবল নাগমহাশয় শুইয়া আছেন। যে দিকে তাকাই, সেই দিক যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। যখন তিনি সুস্থদেহে ছিলেন, তখন আমি কেবল তাঁহার কাছে থাকিতাম। যখন নাগমহাশয় বাজারে যাইতেন, আমি একবার বাড়ীতে যাইতাম, আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতাম, ভাবিতাম তিনি কখন আসিবেন। আজ আর সেই আশা নাই।

যখন নাগমহাশয় শুইয়া থাকিতেন, মাঠাকুরাণীর আদরের সন্তানগণ সকলেই একবার নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইয়াছেন। আমি একবারও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম না। তাঁহাকে কি আর বসা দেখিব? নাগ মহাশয় বাজারে গেলে সময় ফুরাইত না, আজ সকল দিন গেল, সেই নাগমহাশয়কে না দেখিয়া কি

করিয়া রহিলাম? নাগমহাশয় আমাদিগকে স্নেহ করিতেন, মাঠাকুরাণীর তাহা সহ্য হইত না। কেন যে আমাদের উপর তাঁহার বিজাতীয় হিংসা ছিল, তাহা জানি না। তিনি সময় সময় নাগমহাশয়কে বলিতেন, যে আমার আত্মীয়কে ভালবাসে না, আমি তাঁহার আত্মীয়কে ভালবাসিব না। কখন কখন শুনিয়াছি, নাগমহাশয়ের মাসীর মেয়েকে একবারে স্নেহ করিতেন না। যখন নাগমহাশয় বাড়ীতে দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা হইত কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কাজ আসিত, মাসী নাগমহাশয়ের বাড়াতে থাকিতে পারিতেন। অন্যসময় তিনি থাকিলে, নাগমহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। মাতাঠাকুরাণী এই কথা বলিয়া লোকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানি না। কাহার মনে কি আছে, ভগবান্ জানেন। তবে আমি যত দিন দেওভোগ গিয়াছি, কাজের সময় মাসীকে নাগমহাশয়ের বাটীতে দেখিয়াছি, অন্য সময় বড় দেখি নাই। ৮বৎসর আমি নাগমহাশয়ের নিকট গিয়াছি। ৮বৎসরের মধ্যে একদিনও মাসীকে নাগমহাশয়ের কাছে যাইতে দেখি নাই, একটী কথাও নাগমহাশয়কে বলিতে শুনি নাই। কাজের সময় ছাড়া আসিলে, মাসীকে নাগ-মহাশয়ের নিকট যাইতে দেখি নাই, কথা বলিতে শুনি নাই। তাঁহাকে মা ঠাকুরাণীর নিকট দেখিয়াছি। তিনি ভগ্নীকে বলিয়া চলিয়া যাইতেন। যাওয়ার সময় নাগমহাশয়কে কিছু বলেন নাই। কেন যে এই ভাব দেখিয়াছি, তাহা জানি না। যে নাগমহাশয় প্রাণঘাতী বিষধর সর্পকে স্নেহ করিতেন, সর্পও নাগ-মহাশয়ের আদেশ অনুসারে নিজপথে চলিয়া যাইত, সেই নাগ মহাশয়কে কে কি ভাবে দেখিয়াছেন, নাগমহাশয় জানেন, আর

যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। যাহা হউক, রাবণ সীতা হরণ করিল, সেই পাপে বালী মরিল। আমিও সেইরূপ বিপাকে পড়িয়া জীবনে মরিলাম। মাঠাকুরাণী সময় বুঝিয়া বাদ সাধিলেন।

সকল দিন চলিয়া গেল। একবারও নাগমহাশয়কে চক্ষে দেখিলাম না। রাত্র হইল। মাসী মেয়ে ও নাতি লইয়া অন্য বাড়ী শুইতে গেলেন। মাঠাকুরাণী ছেলেদিগকে লইয়া নাগ-মহাশয়ের কাছে রহিলেন। নাগমহাশয় বারান্দায় শুইয়াছেন, ছেলেরা ঘরে শুইলেন। যখন নাগমহাশয়কে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে দেখিয়া ঘরে থাকেন। শরৎবাবু সময় সময় গান ও স্তব পাঠ করেন। স্বামী বারান্দার এক কোণে রাহলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, আমরা নাগমহাশয়কে হারাইতে বসিয়াছি। আমার বড় ভগ্নী ও আমি বিষণ্ণ মনে রান্নাঘরে শুইলাম। বাহিরে একটা শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া মনে হইল, যখন নাগমহাশয় ভাল ছিলেন, রাত্র হইলে খোঁজ নিতেন, আমি কোথায়। মা-ঠাকুরাণী ছেলেদিগর সঙ্গে ঘরে রহিলেন, বারান্দাব দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কতক সময় পব আবার একটা শব্দ হইল, সকলেই শুনিতে পাইল। তখন মাঠাকুরাণী আমাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোথায়। নাগমহাশয় বারান্দায় আছেন। ঘরে গেলে নাগমহাশয়ের নিকটে যাইব মনে করিয়া, মাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া, আমি উঠিলাম এবং ঘরের মধ্যে গিয়া, যে দিকে নাগমহাশয় শুইয়া আছেন, সেই দিকের বেড়া ঘেসিয়া বসিলাম। বড় ভগ্নী আমার সামনে বসিলেন। শরৎবাবু কখন পরমহংসদেবের কথা, কখন স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, স্বামীজী বিবাহ একবারে পছন্দ

করেন না। কোন কোন লোককে বলিয়াছেন, যদি একবারে বিবাহ না করিয়া না পারিস্, তাহা হইলে ৬ মাস সংসার ছাড়িয়া, ব্রহ্মচারীর মত থাকিয়া, ভগবানের নাম করিস্। স্বামী তথায় ছিলেন। তখন তাঁহার মন সংসার ছাড়া ছিল। ইহা শুনিয়া আমার মনে ভয় হইল। নাগমহাশয় স্নেহ করিয়া তাঁহাকে সংসারে রাখিয়াছিলেন, তিনি যে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন, ঠিক নাই। আমার মনে এই কথা হওয়া মাত্র, নাগমহাশয় বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিলেন, সকলেই ত আর স্বামী বিবেকানন্দ নয়। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, এখনও তোমার আমার উপর এত দয়া আছে? মনে ভয় হওয়া মাত্র, এই কথা বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলে? যদি স্বামী কখন সংসার ছাড়িতে চান, তখন তাঁহাকে এই কথা বলিব। উঠিয়া আসিয়া তোমার নিকট বসায়, তোমার স্নেহমাখা কথা শুনিতে পাইলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, সকল অবস্থায়ই ভগবানের দয়া হইতে পারে। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিলেন। আমি ক্ষুণ্ণমনে নাগমহাশয়ের বেড়া ঘেঁসিয়া বসিয়া আছি। সকলেই ঘুমাইল।

মা ঠাকুরাণী আমাকে ও আমার ভগ্নীকে বলিলেন, রান্নাঘরের দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া শুইয়া থাক। আমরা নাগমহাশয়ের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। রান্নাঘরে শুইলাম। শুইয়া থাকিয়া নাগমহাশয়ের যত দয়া মনে করিতে লাগিলাম। মনে হইল, নাগমহাশয় মানব দেহ ধারণ করিলেও মুহূর্ত্তের তরে তাঁহার ভুল দেখা যায় নাই। দেহ ছাড়িতে মনস্থ করিয়া শুইয়া আছেন, এসময়ও মনে কথা হওয়া মাত্র উত্তর দিয়া

আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। কাহার সাথে ৮ বৎসর খেলা করিলাম? মনে মনে নাগমহাশয়কে বলিতে লাগিলাম, দয়াময়, তোমাকে কি উঠিয়া আবার হাঁটিতে দেখিব? আবার কি বসিয়া, স্নেহমাখা কথা বলিয়া, আমাকে উপদেশ দিবে? আমি পাষাণী কি আবার তোমার কাছে বসিয়া, তোমার অমিয়-মাখা কথা শুনিতে পাইব? বাবা, যদি তুমি উঠিয়া বস, ভাল কথা। নচেৎ আমি কি তোমাকে মনে রাখিতে পারিব? আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমার কাছে তোমার এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা তোমাকে মনে করিয়া দিবে। একবার তোমার দুইটা চুল নিয়া বাক্সে রাখিয়াছিলাম, ভোরে ও সন্ধ্যার সময় বাক্স হইতে খুলিয়া লইয়া নমস্কার করিতাম, আবার রাখিয়া দিতাম। তোমার ভক্ত বাড়ীতে গিয়া, বাক্স খুলিয়া, না জানিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন। আমি কিছুই জানিলাম না। স্বামী চুল দেখিতে পাইলেন না সত্য, ছোট বাক্সটী খুলিয়াই মনে কি একটা ভাব পড়িয়াছিল। তিনি তাকে তাকে রহিলেন, দেখিবেন, আমি খালি বাক্স নিয়া কি করি। আমি সন্ধ্যার সময় বাক্সটী নমস্কার করিলাম, স্বামী দাড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কি আছে? আমি বলিলাম নাগ মহাশয়ের মাথার দুইটী চুল আছে, তুমি নমস্কার কর। স্বামী নমস্কার করিলেন, কিছু বলিলেন না। ঢাকা আসিবার সময় বলিলেন, তিনি তাঁহার চুল ফেলিয়া দিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবে ফেলা হইয়াছে? তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, কবে দেওভোগ যাইব, কতদিনে নাগমহাশয়কে দেখিব; গেলেই কি চুল পাইব? কাপড়ে চুল দেখিলে অমনি

আনিতে পারিব। অন্যায় কাজ করিয়াছেন, স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। আমার মনের কষ্ট দেখিয়া বলিলেন, আবার যাইয়া চুল লইয়া আসিও। অনেক বার আসিয়াছি, জানি না কেন তোমার চুল নেওয়া হয় নাই। দয়াময়, আমার মত জীব কি তোমার চুল রাখিতে পারে? এখনত তোমার ভক্তগণ আমাকে তোমার নিকট যাইতে দিবে না। আমি কি উপায়ে তোমার চিহ্ন রাখিব? তোমার চিহ্ন না থাকিলে, আমার মন তোমাকে ভুলিয়া যাইবে। নাগমহাশয়কে মনে মনে এইরূপ বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি হইবে? নাগমহাশয় কি সত্যসত্যই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন?

রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। শরৎবাবু ও মোক্ষদাবাবু স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া প্রাণ অস্থির হইল। দিন রাত্র চলিয়া গেল, নাগমহাশয় একবার উঠিয়া বসিলেন না। আমার এমন জন্মজন্মান্তরের পাপ ছিল, তাঁহাকে শোওয়া অবস্থায় একবার দেখিতে পাইলাম না। নাগমহাশয় সুস্থ না হইলে যে দেখিতে পাইব, এরূপ ভরসা নাই। আমার মনে হইতে লাগিল, পিতঃ, ভাল থাকিতে কত স্নেহ, কত যত্ন করিতে, এখন তোমার সেই স্নেহ, সেই যত্ন কোথায়? পিতঃ, তুমি কত দিনে ভাল হইয়া আবার পূর্ব্বের মত হাঁটিয়া বেড়াইবে? তবেত আমার মত জীব তোমাকে দেখিতে পাইবে? ভোর হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দার যে দিকে নাগমহাশয় শুইয়া আছেন, সেই দিকের ঘরের পিড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময় মা-ঠাকুরাণী রাবান্দার দরজা খুলিলেন। হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী ও মাঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদিগকে

হাসিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, নাগমহাশয় বোধ হয় পূর্ব্বের চেয়ে আজ ভাল আছেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে হিঞ্চার রস আনিতে বলিয়াছিলেন। হিঞ্চার রস লইয়া যাইতে দেড়ি দেখিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, বেলা হইল, উহা ভোরে খাওয়ার নিয়ম। মাঠাকুরাণী নাতি লইয়া আমোদ করিতেছিলেন, নাগ মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি দৌড়িয়া তাঁহার নিকট গেলেন, নাগ-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, রস তৈয়ার হইয়াছে কি? মাঠাকুরাণী বলিলেন, এখনই তাহা লইয়া আসিতেছি। নাগমহাশয় বলিলেন, এতক্ষণ কি করিতেছিলে? নাগমহাশয়ের কথা শুনিতে পাইয়া আমার মনে বড় আশা হইল, তিনি আবার ভাল হইয়া বাহিরে আসিবেন এবং মদৃশ প্রাণীর প্রাণ শীতল করিবেন। তিনি যেস্থানে শুইয়াছিলেন, আমি ঘরের সেইদিকেই রহিলাম। মা-ঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের বিছানা রৌদ্রে রাখিয়া আসিলেন। আমি নাগমহাশয়ের চুলের আশায় বিছানা দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার এমন দয়া, পথে দাঁড়াইয়া বিছানার দিকে চাহিয়াছি, নাগমহাশয়ের শরীরের কাপড়ে একটী দাড়ি লাগিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া, নাগমহাশয়ের দয়া স্মরণ করিয়া, দাড়িটী তুলিয়া লইয়া, কাপড়ের অাঁচলে বাধিয়া রাখিলাম। চুল পাইলে যেরূপ সুখ হইত, দাড়ি পাইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইলাম। দাড়িটী দেখিয়া মনে করিলাম, বাবা, তোমার চিহ্ন চাহিয়াছিলাম, তুমি অতিশয় ভাল চিহ্ন দিলে। তোমার চুল ও লোকের চুলে সামান্য তফাৎ মনে হইত, দাড়িটাতে শ্বেত জবার আভা আছে। উহা তোমার রূপ মনে করিয়া দেয় এবং তোমার অমিয়মাখা মুখ পদ্ম হৃদয়ে জাগরূক করে। তোমার

অভাবে যে তোমার দাড়িটী দেখিবে সে তোমার বর্ণ অনুভব করিতে পারিবে। আমার উপর তোমার অসীম দয়া। দয়াময় আমি তোমার কোনরূপ সেবা করিতে পারিলাম না, সংসারের ভাবনা ভাবিয়া তোমাকে কষ্ট দিয়াছি। তুমি সমস্ত অবস্থায় আমার উপর সদয় ছিলে। রুগ্নশয্যায় শুইয়াও আমার মনের কথার উত্তর দিলে, মনের বাসনা পূর্ণ করিলে। তোমাব দয়ায় তোমাকে পুনর্ব্বার বসিতে দেখিব। দাড়িটী পাইয়া, অতিশয় সুখী হইয়া বড় ঘরে যাইয়া বসিলাম।

নাগমহাশয়কে ঘেরিয়া রাখা হইয়াছে। কষ্ট হইবে বলিয়া কেহ তাঁর কাছে যায় না। তবে সময় সময় নাগমহাশয়ের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া আসেন। যাহারা মাঠাকুরাণীব স্নেহের সন্তান, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পারেন, অন্যে তাহা মনেও করিতে পারে না। আমি বসিয়া রহিলাম। কেহ দরজা খুলিলে, আমি একবার তাঁহাকে দেখিব। আমাব অদৃষ্টানুসারে তখন কেহ দরজা খুলিল না। আমি রান্না ঘরে গেলাম। মাঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন, তুমি থাকিবে যে, তিনি বলেন, হরপ্রসন্নের বধূ কেন আসিল? খুকী কেন আসিল? তাহা শুনিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি এত স্নেহ করিতেন, আজ তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন। আমি মনে করিলাম, আমি এই বাড়ীতে থাকিলে, বোধ হয় তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে। আমি চলিয়া যাইব। মনে কষ্ট পাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের ঘেরার দরজা খুলিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিব ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বড় ঘরের বারান্দায় গেলাম। তথায় যাইয়া দেখিতে পাইলাম, ঘরের

মধ্যে না গেলে তাঁহাকে দেখা যায় না। মাঠাকুরাণী দরজার সামনে বসিয়াছেন। নাগমহাশয়ের পথ্যের বাটিগুলি পথে রাখিয়া দিয়া, আমাকে ঘরে যাইতে দেখিয়া, মাঠাকুরাণী বলিলেন, ঘরে যাইও না, তাঁহার খাওয়ার জিনিষে পা লাগিবে। নাগমহাশয়কে দেখিব, মনে মানিল না। যেস্থানে গেলে নাগমহাশয়কে দেখা যায়, উতলা হইয়া সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। মাঠাকুরাণী বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, বলিলাম পা লাগিবে, তুমি তাহা শুনিলে না। আমি বলিলাম, না, পা লাগিবে না। মাঠাকুরাণী সক্রোধে বলিলেন, উহা রাস্তায় রহিয়াছে, পা লাগে নাই? মাঠাকুবাণীর কর্কশ কথা শুনিয়া, নাগমহাশয় বলিলেন, এমত করিতে নেই। আমি এত খাইতে পারিব না। মাঠাকুরাণী তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। দরজায় একটু ফাঁক ছিল, আমি তাহার মধ্য দিয়া নাগমহাশয়কে দেখিতেছিলাম। নাগমহাশয়ের মুখখানা দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি চিদানন্দঘন, তাই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখ। অসুখ হইলে লোকের কষ্ট হয়, তাঁহার মুখ হইতে হাসি ছুটিয়া পড়িতেছে। নাগমহাশয় চিত হইয়া শুইয়া ছিলেন। আমি মুখখানাই দেখিতে পাইয়াছিলাম। মাঠারাকুণী তাকাইয়া দেখিলেন, আমি ফাঁকের মধ্য দিয়া নাগমহাশয়কে দেখিতেছি, অমনি তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণীর মনোবাসনা পূর্ণ হইল। আমি আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বসিয়া রহিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত নাগমহাশয়ের জ্যোতির্ম্ময় মুখপদ্ম দেখিয়াছিলাম। এই জন্মের মত নাগমহাশয়কে দেখিলাম। কতটুক সময় মনের কষ্টে নিজের অদৃষ্ট দেখিয়া স্বামীকে বলিলাম, আমি আজই

চলিয়া যাইব। স্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নাগমহাশয় আর উঠিয়া বসিবেন না। হৃদয়ের ভাব তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক মলিন হইয়াছিল। যখন আমি আমার যাওয়ার কথা তাঁহাকে বলিলাম, তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, অবাক্ হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আবার তাঁহাকে তাহা বলায় তিনি বলিলেন, কি বলিতেছ? তৃতীয় বার সেই কথা বলায়, তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া, আমার মনে হইল, এইজন্যই নাগমহাশয় আমাকে ক্ষেপাচণ্ডী বলিয়াছেন। আমার কথনই হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। স্বামী আর কোন কথা বলার পূর্ব্বে আমি বলিলাম, আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া, তুমি কল্য প্রাতে চলিয়া আসিও। আমার ভাব দেখিয়া, স্বামীর মুখ আরও মলিন হইয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, আমি মানুষের কাজ করিতেছি না। তিনি কিছু বলিলেন না। নাগমহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বোধ হয় আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, তাই বাড়ীতে যাইতে চাহিতেছি। স্বামী ইহা মনে করিয়া সন্ধ্যার সময় জনমের মত আমাকে নাগমহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া আসিবেন। তিনি আমার আসিবার কারণ জানিতেন না। তিনি মাঠাকুরাণীকে বড় ভক্তি করিতেন। সেই ভয়ে আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিলাম না। তাহা শুনিলে, স্বামী নিশ্চয় বলিতেন, যে নাগমহাশয় তোমাকে এত স্নেহ করিতেন, যখন তিনি তোমাকে বলিলেন, তুমি এলে কেন, তুমি অবশ্যই কোন গুরুতর দোষ করিয়াছ। স্বামীকে ভয় করিলাম সত্য, একবার বিচার করিলাম না, তিনি নাগমহাশয় হইতে মাঠাকুরাণীকে

বেশী ভক্তি করেন না, নাগমহাশয়ের কথা হইতে মাঠাকুরাণীর কথা বেশী বিশ্বাস করেন না। নাগমহাশয় যাঁহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, উঁহাকে কষ্ট দিবেন না, যিনি নাগমহাশয়ের উপর জীবনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনুভব করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার ইষ্ট হইবে, নাগমহাশয় আপনিই তাহা করিবেন, যাঁহার এমন অটুট বিশ্বাস, তিনি কি মাঠাকুরাণীর কথায় আমাকে কষ্ট দিতে পারিতেন? আমার কর্ম্মানুযায়ী বুদ্ধি হইল। স্বামীকে কোন কথাই বলিলাম না, রুগ্ন শয্যায় শুইয়া যে নাগমহাশয় স্নেহ করিলেন, তাহাও একবার বিচার করিলাম না। শেষ অবস্থায়, আমার উপর নাগমহাশয়ের কম স্নেহ দেখিলাম না।

নাগমহাশয় শুইয়াছিলেন, মনের কষ্টে বারান্দা ঠেশ দিয়া বসিয়া আছি। মাঠাকুরাণী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, কাল বৈকালেও খাস্ নাই। আজ সকলে খাইল, তুই খাইলি না। মাছগুলি পড়িয়া রহিল, কেটে দে। নাগমহাশয় তাহা শুনিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন, কি, ও খায় নাই? আমি মনে মনে বলিলাম, স্বামী না খাইলে, আমি খাইব না। নাগমহাশয় বলিলেন, পাইলাম থালে, দিলাম গালে, পাপ-পুণ্য নাই কোন কালে। এখনই খাও।

দেওভোগ হইতে চলিয়া আসিবার সময় আমি মনের কষ্টে বড় ঘরে যাইয়া, যেখানে নাগমহাশয় শুইয়া আছেন, সেই স্থানের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। লোকের ভয়ে নাগমহাশয়কে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। নাগমহাশয় আপনিই পূর্ব্বের মত বলিলেন, ধর্ম্মে যেন মন থাকে, স্বামীর প্রতি যেন ভক্তি থাকে।

আমি মনে মনে বলিলাম, যখন তুমি নিজগুণে বলিলে, ধর্ম্মে যেন মন থাকে, তোমার কৃপায় আমার মন তোমাতে নিশ্চয়ই থাকিবে তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার কর্ম্ম। তুমি বলিলে, স্বামীর প্রতি যেন ভক্তি থাকে, তোমার আশীর্ব্বাদ বৃথা হইবে না। নাগমহাশয়কে মনে মনে ইহা বলিয়া নিদারুণ ব্যথা লইয়া, জীবনের তরে নাগমহাশয় হইতে বিদায় লইলাম—অভিমান ভরে চলিয়া আসিলাম। নাগমহাশয় পাঁচটী কথা আমাকে বলিলেন। যাহারা তাঁহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদিগকে এত কথা বলিয়াছেন কিনা জানিনা। আমি ততক্ষণ ছিলাম, তাঁহাকে কথা বলিতে বড় শুনি নাই। আমাকে নিকটে দেখিয়া, তিনি নিজগুণে ডাকিয়া ডাকিয়া কথা কহিয়াছেন। আমার এমনই প্রাক্তন ভোগ, নাগমহাশয়ের এত স্নেহ দেখিয়াও, মাঠাকুরাণীর কথা সত্য বলিয়া ভাবিয়া, অভিমানে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় যখন নাগমহাশয় বলিলেন, ধর্ম্মে যেন মন থাকে, স্বামীতে যেন ভক্তি থাকে, তখন যদি একবার বিচার করিতাম, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাকে এই ভাবে ফেলিয়া আসিতে পারিতাম না। আমি তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছি। অথচ আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। আমার প্রতি তাঁহার অপরিমিত দয়া ছিল, তথাপি আমি তাঁহার কথা একবার ভাবি নাই।

ছোট সময় নাগমহাশয়কে মনে রাখিয়াছি। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, কাহার অন্তরে শিশুকালে ধর্ম্মভাব উদয় হয়? ধর্ম্মনামে নাগমহাশয় আমার হৃদয়ে থাকেন। যে নাগমহাশয় দেহ ছাড়িয়া আমার হৃদয়ে থাকিবেন, তিনি কি বলিতে পারেন,

খুকী আসিল কেন? এখন মনে করি, যখন তিনি বলিলেন, স্বামীর প্রতি যেন ভক্তি থাকে, তখন যদি মন খুলিয়া স্বামীকে সকল কথা বলিতাম, স্বামী অবশ্যই আমাকে বুঝাইয়া দিতেন, নাগমহাশয় এই কথা বলিতে পারেন না। নিজেও বুঝিলাম না, যিনি আমার মঙ্গল করিবেন, তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। নিজের কপাল লইয়া নিজে চলিয়া আসিলাম, একবার মনে করিলাম না, কি করিতেছি। যদি নাগমহাশয়ের স্নেহ স্মরণ করিয়া মনে করিতাম, স্বামীর হাতে আমাকে দিয়া গেলেন, একবার তাঁহাকে বলি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় অবশিষ্ট দিন কয়েকটী নাগমহাশয়ের নিকট রাখিতেন। যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নাগমহাশয় তেমন ফল দিলেন। জানি না, কোন্ মনে বিশ্বাস করিলাম, নাগমহাশয় আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন। কয়েকটাদিন থাকিলে বেশী কিছু দেখিতাম না। আমার মনে এই কষ্ট রহিল, আমি নাগমহাশয়কে কি রকম বিশ্বাস করিলাম। অভিমানই জীবের যত দুর্গতির মূল। আসিবার সময় স্বামীর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

আমার বড় ভগ্নী স্বামীকে বলিলেন, আপনিও ত নাগমহাশয়ের ভক্ত, আপনি কখন কাহাকে কিছু বলেন না। আমি চলিয়া আসিব মনে করিয়া, বড় ঘরে দাঁড়াইয়া, নাগমহাশয়কে বলিয়া ছিলাম, এখন আসি গিয়া? তিনি বলিলেন, এস মা। এখন যাহার যাহার কর্ম্ম সে সে দেখিয়া করিবে। এই কথা শুনিয়া, মাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, তাঁর কথা বলিতে কষ্ট হয়, কে ওখানে গেল? হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী যাইয়া বলিলেন, এখানে লোক থাকিতে নিষেধ করিতেছেন। হরপ্রসন্নবাবু

আসিয়া বলিলেন, তোমরা তাঁহার কাছে যাও কেন? দেখ না, আমরা যে অন্তস্থানে থাকি। আমি বলিলাম, আমি তাঁহার নিকট যাই নাই। ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এখন চলিয়া যাইব, তাই তাঁহাকে বলিয়া চলিলাম। আমার কি এত বড় কপাল যে, আমি তাঁহার কাছে যাই। তিনি বিনদাকে এত ভালবাসিতেন, সেও একবার তাঁহার কাছে যাইতে পারে নাই। তাহার কথা শুনিয়া স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখুন। এই সব দেখিতে হয় না, ভাবিতেও হয় না। ভগবান্ সকলেব সমান, যে যেমন কৰ্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল ভোগ কবিবে। ভগবান্ কাহার অহংকার সহ্য করেন না। নাগমহাশয়েব চিন্তা করুন, মঙ্গল হইবে। স্বামীর কথায় ভগ্নীর মনেব কষ্ট দূর হইল। আমাকে বাড়ীতে বাখিয়া, পরদিন ভোরে স্বামী নাগমহাশয়ের নিকট চলিয়া গেলেন।

যে দিন আমরা দেওভোগ হইতে আসিলাম, সেই দিন আমার পিতা নাগমহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। পিতা নাগমহাশয়কে দেখিতে যাইবেন, অন্তের তাহা ইচ্ছা নয়। শরৎ-বাবু ভিন্ন সকলেই মুখ গম্ভীর করিল। পিতা মনে করিলেন, যখন আসিয়াছি, তাঁহাকে দেখিয়া যাইব। পিতা নাগমহাশয়ের কাছে গেলেন। নাগমহাশয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া অনেক সময় তাঁহাকে দেখিলেন। ইহার মধ্যে জগদ্বন্ধু ভৌমিক নাগমহাশয়ের থাকার স্থানের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। পিতা মনে করিলেন, আর দেখা হয় কি না হয়, মনের মত দেখিয়া লই। নাগমহাশয় বলিলেন, এখনই যাইবে? পিতা বলিলেন, হাঁ। আপনার

শরীরে ব্যথা আছে? নাগমহাশয় বলিলেন, শরীরের কোথায় কি আছে, তাঁহা জানি না। তুমি কি এখনই যাইবে? পিতা কহিলেন, আপনি কথা বলিবেন না, আমি আপনাকে একটু দেখি। নাগমহাশয় আর কিছু বলিলেন না। পিতা আমাকে বলিলেন, ঠাকুরভাই আমাকে দেখিয়া কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলেন না। জগবন্ধু ভৌমিকে প্রভৃতির ভাব যেন আমি তাঁহাকে না দেখিলেই ভাল। আমি ঠাকুরভাইকে সদয় দেখিয়া, কতক সময় তাঁহার পানে চাহিয়া, ঢাকা চলিয়া গেলাম। আসার সময় ঠাকুরভাই বলিলেন, এখনই যাইবে? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এস। স্বামী চলিয়া গিয়াছেন। মন অস্থির হইতে লাগিল। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। নাগমহাশয় স্বামীকে টানিয়া নিয়াছেন, তিনি কি করিয়া অন্য স্থানে থাকিবেন? কয়েক দিন নাগমহাশয়ের নিকটই রহিলেন।

নাগমহাশয় শরৎবাবুকে বলিলেন, পঞ্জিকা দেখুন। একটী ভাল দিন বাহির করুন। শরৎবাবু পরের দশমী তিথি ভাল দিন বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, তবে ঐ দিন আমি যাত্রা করিব। শরৎবাবু তাহা শুনিয়া মাথায় হাত দিলেন। তিনি জানিতেন না, নাগমহাশয় চলিয়া যাওয়ার দিন ধার্য্য করিবেন। তিনি সাশ্রুনয়নে বসিয়া রহিলেন।

স্বামী বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। নাগমহাশয় বলিতেছেন, বেত কাটিতেই আসিয়াছিলাম, বেত কাটিয়া গেলাম; পরের দায় জীবন দিলাম। পরের বেত কাটিতে গিয়া শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিলাম। তাহা শুনিয়া স্বামী মনে বড় কষ্ট

পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, ভগবান্ কেন এই সংসারে আসেন? সংসারে আসিয়া অশেষ পষ্ট সহিয়া যান। ভগবান্ জীব উদ্ধার করিতে আসেন। এ সংসারে না আসিয়াও ত জীব উদ্ধার করিতে পারেন। অথথা এই সংসারে আসিয়া, জীবের কর্ম্মের বোঝা মাথায় নিয়া, জীবের মত তাহার কর্ম্মভোগ করেন। নাগমহাশয়ের ত কোন কষ্ট দেখি নাই, কোন অবস্থায়ই তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারিত না। তবে তাঁহার শরীরে অনেক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তাহা শুধু জীবের কর্ম্মগ্রহণের ফল। আবার তিনি মনে করিলেন, তাহা শুধু তাঁহার দয়া। তিনি আমাকে জানাইতেছেন, তিনি ভগবান্, পরের দুঃখের বোঝা মাথায় নিতে আসিয়াছেন।

চারিদিন চলিয়া গেল, স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন না। আমার মনে হইতে লাগিল, কি হইল? একদিন স্বামী নাগমহাশয়ের জন্য ঔষধ নিতে নারায়ণগঞ্জ গিয়াছিলেন। একটা জানা লোককে বলিয়া দিলেন, পঞ্চসার যাইয়া বলিও, যদি নাগমহাশকে দেখিতে ইচ্ছা থাকে, অনতিবিলম্বে চলিয়া আসিবে। সেই লোকটা সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিয়া এই কথা বলিল। আমি মনে করিলাম, পরদিন প্রাতঃকালে দেওভোগ যাইব। স্বামী পরদিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নাগমহাশয় কেমন আছেন? তিনি বলিলেন, তিনি একটু ভাল আছেন। সকল দিন গেল। সন্ধ্যা হইয়াছে। স্বামী বলিলেন, আমার প্রাণ যেন কেমন করে। আমি এখনই দেওভোগ যাইব। আমি যতই অন্যকথা বলি, স্বামী ততই অস্থির হইতে লাগিলেন। কিছুতেই অন্যকথা শুনিতে চান না। তাঁহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল।

এমন উতলা হইয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, তিনি আমাকে একবার বলিলেন না, তুমি যাইবে কি? আমি এমন পাষাণী, স্বামীকে উতলা দেখিয়াও তাঁহার সঙ্গে আসিলাম না। স্বামী চলিয়া আসিলে, আমি একটা জড় পদার্থের মত রহিলাম। স্বামী বলিয়াছিলেন, যখন তিনি দেওভোগ হইতে আসিবেন, নাগমহাশয়কে বলিলেন, বাবা! এখন আমি আসি? নাগমহাশয় বলিলেন, যেমন ইচ্ছা। আমি তাহা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, স্বামীকে আসিতে দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাঁহার হৃদয় টানিয়াছেন, তাই স্বামী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। স্বামী দেওভোগ যাইয়া দেখিতে পাইলেন, নাগমহাশয় পূর্ব্বের মত নাই। তাহা দেখিয়া স্বামীর মন বড় অস্থির হইল।

মাঠাকুরাণী স্বামীর সাথে কথা বলিতেন না। সুতরাং মাঠকুরাণী নাগমহাশয়ের নিকট থাকায় তিনি নাগমহাশয়ের নিকট যাইতে পারিতেছেন না। দূর হইতে উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি অনেক হইল। মাঠাকুরাণী, শরৎবাবু, জগবন্ধু ভৌমিক নাগমহাশয়ের নিকট আছেন। মাঠকুরাণী স্বামীকে নাগমহাশয়ের কাছে যাইতে বলিলেন। নাগমহাশয় বলিতে লাগিলেন, বাঁচাও, বাচাও। শেষে বলিলেন, আমাকে রাখ, আমাকে রাখ,। স্বামী ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার কত দয়া। জীব আব তাঁহাকে চক্ষে দেখিবে না, যাহার সৌভাগ্য আছে, তিনি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিবেন। তাই তিনি জীবকে বলিতেছেন, বাঁচাও, বাঁচাও; আবার বলিতেছেন, আমাকে রাখ, জীব তুমি আমার কাছে আস, নিজকে বাচাও। জীব কি করিয়া নিজকে বাঁচাইবে? তজ্জন্য তিনি বলিলেন, আমাকে রাখ।

যদি নিজকে বাঁচাইতে চাও, আমাকে রাখ। আমাকে না রাখিলে, তুমি বাঁচিবে না।

জীবন-ধারণ অনেক রকম আছে। কুকর্ম্ম করিয়াও ত লোক বাঁচে। সেই রকম জীবন ধারণ হইতে মরা অনেক ভাল,সুতরাং যদি প্রকৃত পক্ষে বাঁচিতে চাও, আমাকে রাখ। একুল ওকুল দুকুল রক্ষা পাইবে। নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া স্বামীর সুখ ও দুঃখ সমান হইল। দুঃখের বিষয় আজ নাগমহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। যাঁহাকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক একবার দেখিতে পাইতাম, আজ তিনি আমাদের চক্ষের আড়ালে চলিলেন। এখন তাঁহার অহৈতুক কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাকে আর দেখা যাইবে না। মাদৃশ সংসারের জীবের জন্য তিনি অদৃশ্য হইতেছেন। এত দুঃখের ভিতর সুখের বিষয় নাগমহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে ও আমাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। বাঁচাইয়া রাখিতে বলায়, নিজকে বাঁচাইয়া নাগমহাশয়কে রাখিতে বলিতেছেন। নাগমহাশয় উপহাস ছলেও মিথ্যা কথা বলিতেন না। তাঁহার বাক্য অনুসারে, ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না তিনি নিজ গুণে দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ে থাকিবেন। স্বামী নাগমহাশয়ের কথা প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও নাগমহাশয়ের ভুল দেখা যায় নাই। তিনি মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমাকে রাখিতে পার। কতটুক সময় পর বলিলেন, মুখের কথায় হয় না গো, মনটী চাই। নাগমহাশয়ের কথায় স্বামীর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। সকল কাজ মুখের কথায় হয়, মন না দিলে ভগবান্‌কে রাখা যায় না। মাঠাকুরাণী বলিলেন, 'আমার সাবিত্রীর বর আছে, আমি স্বামী বাঁচাইতে

পারিব। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, এত শক্ত হইও না। স্বামী এক মনে তাঁহার কথা শুনিতেছেন এবং নিরাশ হৃদয়ে নাগমহাশয়কে দেখিতেছেন।

রাত্র ভোর হইয়া আসিতেছে। নাগমহাশয় ধীরে ধীরে সমাধি মগ্ন হইলেন। এমন সময় নাগমহাশয়ের শ্বশুর বাটী হইতে কি এক ঔষধ আনিতে স্বামীকে বলা হইল। স্বামী দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী সমাধি দেখিয়া গিয়াছিলেন, ঐ সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হইল। সকলেই শেষ কথা বুঝিতে পারিলেন। সকলেই নাগমহাশয়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন। স্বামীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল,। এক মনে নাগমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দৈবাৎ তাঁহার পা শ্রীঅঙ্গে লাগিল। তিনি নাগমহাশয়কে নমস্কার করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, বাবা, আমার পাপ হউক ক্ষতি নাই, তোমার পা স্পর্শ করিয়া আর তোমার কর্ম্ম বাড়াইব না। জীবের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই তোমার দেহের এত ভোগ। আমার কর্ম্ম লইয়া আমি থাকিব, তোমাকে স্পর্শ করিতে দিব না। সকলে নাগমহাশয়কে নমস্কার করিলেন, স্বামী চুপ করিয়া তাঁহার শয্যায় বসিয়া রহিলেন। সামান্য বেলা হইল। মাঠাকুরাণী বলিলেন, তিনি গৃহী ছিলেন, সকল কাজ গৃহীর মত করিয়া গেলেন। এখন গৃহীর মত আমাদের সকল কাজ করা উচিত। মাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া স্বামীর এক ভাব হইল, নিজে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যখন নাগমহাশয়কে বাহিরে আনা হইল, কে ধরিয়াছিল, তিনি কিছুই জানেন না। কতক সময় পর দেখিতে পাইলেন, তিনি নাগমহাশয়ের পা কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। চিরবাঞ্ছিত চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

নাগমহাশয়কে দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, বাবা, কি ভাবে শুইয়া রহিলে? আমরা কি লইয়া বসিয়া রহিলাম! তোমাকে এই অবস্থায় দেখিয়াও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল না। কি ভাবে শুইয়া রহিলে? বাবা, আর কি তোমার অমিয়মাখা কথা শুনিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব? আর কি তোমার স্নেহমাখা মধুর হাসি দেখিতে পাইব? আর কি তোমার সুশীতল পদতলে বসিয়া সংসারের জ্বালা ভুলিয়া যাইব? আর কি তোমার হৃদয়গ্রাহী ভ্রুভঙ্গি দেখিয়া ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে পারিব? এই কি জীবনে তোমার শেষ চরণস্পর্শ? বাবা তুমি এক সময় বলিয়াছিলে, যেখানকার জল সেই স্থানে গড়ায়, তাই কি তোমাকে এই অবস্থায় দেখিয়াও দেহে প্রাণ রহিল? যেখানকার জল সেই স্থানে গড়াইবে! হায়, হায়, বাবা, কি দুঃখ লইয়া বসিয়াছি? এ সময় ভক্তের হৃদয়ের ব্যথা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। বেলা দুপ্রহর পর্যান্ত স্বামী চিরবাঞ্ছিত চরণকমল কোলে রাখিয়া, নাগমহাশয়ের অন্তিম স্নেহ, অনন্ত দয়া, অসীম গুণ মনে করিয়া অধীর হইতে লাগিলেন। মাঠাকুরাণী আলুলায়িত কেশে তাঁহার রাতুল চরণে শিরস্পর্শ করিতে লাগিলেন। শরৎ বাবু জ্ঞানী, চুপ করিয়া হৃদয়ের ব্যাথা হৃদয়ে পোষণ করিলেন। নাগমহাশয়ের দেবপূজিত মূর্ত্তি রাখার জন্য, ফটোগ্রাফার আনিতে নারায়ণগঞ্জে লোক পাঠাইলেন। প্রায় চারি ঘটিকার সময় ফটোগ্রাফার আসিল। নাগমহাশয়ের ছবি উঠান হইল। সকলে জোড় হাত করিয়া নাগ মহাশয়ের নিকট বসিলেন, স্বামীর হৃদয়ে তখনও ব্যাথা লাগিয়াছিল, তিনি তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ে নিদারুণ ব্যাথা।

বাবা, তোমাকে কি ভাবে রাখিতেছি? হায়, হায়, কি হইল? হতাশ হইয়া নাগমহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নাগমহাশয়ের কাছে কি ভাবে থাকিতে হইবে, তাহার খেয়াল নাই। নাগমহাশয়ের পাশে স্বামীর ছবি তাহা তাহা বলিয়া দিতেছে।

শেষসংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ দেওভোগে গেলেন। তখন তিনি ঢাকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এমন মহাপুরুষের দেহত্যাগ সহজে বুঝিতে পারিবে না। বার ঘণ্টার পূর্ব্বে সংকার করিও না। যখন দেখিবে পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি ধরিয়া নাড়া দিলে মাথা নড়ে, তখন জানিবে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সকল দিন সমাধি রহিল। সন্ধ্যার অল্প পর অঙ্গুলি ধরিয়া নাড়া দেওয়া হইল, অমনি মাথা নড়িয়া উঠিল। ভক্তবৃন্দের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। হায়, হায়, আজ কি হইল? আজ পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হইল। বাবা দুর্গাচরণ, যাঁহারা তোমার কাছে যাইয়া মহাভাগ্যবান ছিলেন, আজ তাঁহারা অভাগা হইলেন। বসুমতি তোমার পদধূলি লইয়া মহাআনন্দিতা ছিলেন, মহাপুণ্যবতী বলিয়া, মহাভাগ্যবতী বলিয়া গরীয়সী ছিলেন, আজ সেই বসুমতী অভাগিনী হইয়া শ্মশানে পরিণত হইলেন। আজ আর সৌভাগ্য-ভরে মহীয়সী রহিলেন না। মহাসৌভাগ্যবতী এক মুহূর্ত্তে অভাগিনী হইলেন। মহাভাগ্যবান ভক্তগণ এক মুহূর্ত্তে অভাগা হইলেন। বাবা দুর্গাচরণ এক মুহূর্ত্তে সকলের হৃদয় দমিয়া দিলেন। হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল! যাঁহারা মহাভাগ্যবাণ ছিলেন, তাঁহারা অভাগা হইয়া সময়োচিত কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কি সর্ব্বনাশ হইল! নাগমহাশয়কে আর দেখিবার

উপায় রহিল না। যাঁহার পদস্পর্শ করিয়া বসুমতি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী মনে করিতেন, তাহার বক্ষে চিতা সজ্জিত হইল। নাগমহাশয়কে শ্মশানক্ষেত্রে নেওয়া হইল। স্বামী সকলের সহিত শ্মশানে গেলেন। ভক্তগণ হাত ভরিয়া সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্র লইয়া, নাগমহাশয়ের দেবতাপূজিত চরণকমলে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। স্বামীর তখন বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না। পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি নাগমহাশয়ের রাতুল চরণের নিকট স্থান পাইয়াছেন এবং সকলে তাহার মাথার উপর দিয়া পুষ্প বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিতেছেন। নাগমহাশয়ের চরণে দিবেন বলিয়া দিনের বেলায় তুলসীপাতার মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাহার চরণে পরাইয়া দিলেন এবং তাড়াতাড়ি জামার বুতাম খুলিয়া তাঁহার ভবভয়হরণ, আরাধ্য, সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ চরণযগল হৃদয়োপরি স্থাপন করিলেন। তাহার পর কি হইল তিনি জানেন না। সংজ্ঞালাভ করিলে, তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি গাইতেছেন, "তুমি যুগে যুগে অবতর ধরাভার বিনাশিতে।" এই এক পদই গান করিতে শুনিলেন। তাকাইয়া দেখিলেন, তিনি নাগমহাশয়ের একখানা চরণ ধরিয়া বসিয়া আছেন, সকল লোক হাতে গণ্ডস্থল রাখিয়া একটু দূরে বসিয়া আছে। চারিদিকে তীব্র আলো। এত আলোর ভিতরে লোকদিগকে হীনপ্রভ দেখিলেন; তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, যেন কোন এক পাতলা আবরণে তাহারা আবৃত। এই সব দেখিয়া তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অবশেষে বুঝিলেন, কোথায় কি লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া নাগমহাশয়কে ছাড়িয়া চলিয়া

আসিলেন। লোকগণ ধরাধরি করিয়া নাগমহাশয়কে শ্মশানে চড়াইল। হরি হরি, সকল শেষ হইয়া গেল। ১৩০৬ সালের ১৩ই পৌষ বুধবার দশমী তিথীতে ৫৩ বৎসর বয়সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, নাগমহাশয় সোণার অঙ্গে ছাই মাখিলেন।

স্বামী নাগমহাশয়ের পা ছাড়িয়া দিয়া যে বিছানায় নাগমহাশয় অন্তিমশয্যা করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। লোক নাগমহাশয়কে লইয়া গিয়া যে এমন নির্দ্দয় কাজ করিল, তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন, সকল শেষ হইয়া গিয়াছে, নাগমহাশয়ের কোন চিহ্ন নাই। হৃদয়ে বিষম আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়, হায়, লোক কি নির্দ্দয়, কেমন নির্ম্মম! যিনি লোকের সহিত কথা বলিতে সর্ব্বদা হাসিতেন, যাঁহার স্নেহে বিষধর সর্প হিংসা ভুলিয়া যাইত, আজ সেই নাগমহাশয়কে কি করিয়া দৃষ্টির বাহির করা হইল? বাবা, আমার মনে হইয়াছিল, এই যজ্ঞে এই দেহ আহুতি দিব, কি হইয়া পড়িয়া রহিলাম, কিছু জানিতে পারিলাম না। বাবা, আর কাহার মুখ তাকাইয়া রহিব! তুমি তোমার চিহ্ন লোপ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে! আর এ জীবন রাখিয়া কি প্রয়োজন? কিন্তু তাঁহার জন্য কি আর জীব প্রাণ দিতে পারে? তবে তাঁহার মহাভাব স্পর্শ করিয়া, সময়ের জন্য সমস্ত ভুলিয়া, স্বামী কয়েকদিন তাঁহার ভাবেই ছিলেন, সংসারের কোন বিষয়ে মন ছিল না; এমন কি কোন সময় চিন্তা করিয়া নাম বলিতে হইয়াছিল।

---

# তৎপর।

নাগমহাশয় চলিয়া গেলেন। পরদিন স্বামী সারদানন্দ দেওভোগে গেলেন। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর কি দেখিবেন? শরৎবাবু ও স্বামী ৩।৪ দিন দেওভোগে ছিলেন। ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া শ্মশান দেখিলেন। তৃতীয় দিবস আমার পিতা তথায় গেলেন। পথে শরৎবাবুর সাথে দেখা হইয়াছিল। তিনি পিতাকে বলিলেন, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে। আপনার জামাতা বাড়ীতে আছে, বাড়ীতে যান। পিতার শিরে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। তিনি নাগমহাশয়কে অতিশয় অসুস্থ দেখিয়া মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। তিনি তাহা মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জীবনে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব, ঠাকুরভাইকে ত আর দেখিতে পাইব না। ঠাকুরভাই, আপনি এই পাপীকে ছাড়িয়া কোথায় গেলেন? সেই দিন জীবনের মত আপনাকে দেখিয়া আসিলাম। ভক্তের জোর আছে, ভক্ত চাহিলে আপনি তাঁহাকে দেখা দিবেন। আমার মত সংসারদগ্ধ জীব আপনাকে একবারে হারাইল। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনার স্নেহ মাখা কথা শুনিয়া, আপনার চিরশান্তিময় মুখ দেখিয়া, সব ভুলিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি। এখন আর কাহার কাছে যাইব? কে সান্ত্বনা করিবে! আমি এমত হতভাগ্য, শেষ সময় নিকটে থাকিয়া, আপনাকে দেখিতে পাইলাম না। আপনি আমাকে জ্ঞাতিভাই বলিয়া, নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন; শেষ সময়

আপনার জাতির কাজ করিতে পারিলাম না। আমার মত সংসারগত জীব আপনাকে ছুইতে পারে না। তাই আমাকে সড়াইয়া দিলেন। যে দিকে তাকাই সকলই দেখিতে পাই, সুধু আপনাকে দেখি না। ঠাকুর ভাই, সমস্ত দিক শূন্যময় বোধ হইতেছে। আমি সংসারক্লিষ্ট জীব কোথায় যাইব? কে আমাকে আপনার মত সান্ত্বনা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবে? সংসারের জীব সংসারে দগ্ধ হইয়া থাকিতেই হইবে। আপনি যে এত শীঘ্র সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই; তাই আপনাকে ছাড়িয়া মফঃস্বলে গিয়াছিলাম। দেব! আমাকে কি মনে রাখিবেন? অন্তে কি ঐ রাঙ্গা চরণ পাইব? পিতার মনে নানা মত কথা উঠিতে লাগিল। তিনি স্বামীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কবে যাইবে? স্বামী বলিলেন, শরৎবাবু যে কয়েক দিন আছেন, তাঁহার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়াছি। এদিকে মাঠাকুরাণী কি ভাবে থাকিবেন, তাহাও দেখিতে হইবে। পিতা বলিলেন, তুমি আজ আমার সঙ্গে চল। আমি বুঝিতে পারি না, মেয়েকে কি ভাবে এই কথা বলিব। সে ইহা শুনিলে কি করিবে, তাহা জানি না। তুমি চল, আমার কোন বুদ্ধি জুটিতেছে না। যদি তুমি থাকিতে না পার, কাল চলিয়া আসিবে। পিতা মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, আমি পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহি। আমি জানি না মেয়েকে কি বলিব; ইহা বলিলে, সে কি করিবে। পার্ব্বতী সামনে থাকিলে ভাল হয়। মেয়ে ঠাকুরভাইকে যে ভাবে দেখিত, এই কথা শুনিলে সে কি করে ঠিক নাই। মা ঠাকুরাণী কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীকে বলিলেন, উহাকে লইয়া আসিবেন। হা অদৃষ্ট, মাঠাকুরাণী আমাকে

শ্মশান দেখিতে ডাকিলেন। বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইতে পারে ?

স্বামী আমাকে পঞ্চসারে রাখিয়া গিয়াছেন অবধি পথের দিকে তাকাইয়া আছি। তিনি কখন আসিবেন, কখন নাগমহাশয়ের ভাল খবর পাইব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইতেছি। পিতা দেওভোগ গিয়াছেন, আজ তিনি নিশ্চয় আসিয়া বলিবেন, নাগমহাশয় কি রকম আছেন। সকল দিন পথের পানে চাহিয়া আছি। সন্ধ্যার পর স্বামী ও পিতা আসিলেন। আমি একটা জড় পদার্থের মত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পিতা কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। বিরক্তির সহিত পিতাকে বলিলাম, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন, কাটিলেও মিথ্যা কথা বলিবে না, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, নাগমহাশয় কেমন আছেন। তখন স্বামী নাগমহাশয়ের ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। জড়ের মত তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। স্বামী ধ্যান করিয়া উঠিয়া, আমাকে অতিশয় আদর করিয়া ধরিয়া শুইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কেমন আছেন ? আগে বল, তিনি উঠিয়া বসিতে পারেন কি ? স্বামী বলিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে এখন দৌড়াইতে পারেন। তাহা শুনিয়া, আমার বুঝিবার আর কিছু বাকি রহিল না। স্বামীকে বলিলাম, একবার শেষ করিয়া রাখিয়া আসিলে ? তুমি তাঁহার সাক্ষাত থাকিতেও আমি ইহার কিছু জানিতে পারিলাম না। স্বামী আমাকে আর উঠিতে দিলেন না। আমি বলিলাম, তুমি আমাকে ছাড়, আমি দেখিয়া আসি, তিনি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলেন।

স্বামী বলিলেন, পাগলের মত কাজ করো না। আমি বলিলাম, যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া না দেও, আমি বাবাকে ডাকিব। দেখিব তুমি এ অবস্থায় কি করিয়া ধরিয়া রাখিতে পার। আমি পিতাকে ডাকিলাম। স্বামী তাঁহাকে ঘরে যাইতে বারণ করিলেন। তখন আমার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বাবা, তুমি কোথায় গেলে? আমি এই প্রাণ আর রাখিব না। তোমার অভাব সহ্য করিতে পারিব না। পাপ পূণ্য মানিব নাই। যে ভাবে হউক এদেহ নাশ করিব। বাবা, তুমি কোথায় গেলে? আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। হৃদয় ভার বোধ হইতে লাগিল। তখন স্বামী বলিতে লাগিলেন, যিনি ঘামাচির সামান্য কষ্ট পাইব বলিয়া, স্নেহের সহিত ঔষধ বলিয়া দিতেন, যিনি ১৫ দিন অতীত হইলে ডাকিয়া নিতেন, লোকের নিকট বলিতেন, কৈ পার্ব্বতী আসে না, যিনি মলিন মুখ দেখিলে, হাসিয়া অমৃতমাখা কথা বলিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করিতেন, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন অগ্নিতে গাত্রদাহ হইলে কেহ দেখিবে না। যদি আমরা তাঁহাকে ভালবাসিতে জানিতাম, তাহা হইলে তিনি ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতাম। এখন যেমন কর্ম্ম তাহা ভোগ করিতে রহিলাম। যদি তাঁহার প্রতি আমাদের একচুল মন থাকিত, তিনি কখন আমাদিগকে এই ভাবে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন না। তাঁহার দয়া মনে করিয়া দেখ, তিনি কখন এমন নির্দ্দয় হইতে পারিতেন না। তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। অসীম দয়া ছিল বলিয়া, তিনি আমার মত জীবকে স্নেহ করিয়াছিলেন। আমি পাষাণ হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিয়া স্থির

রহিলাম। আর কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব? তাঁহাকে জীবনের মত ছাড়িয়া আসিলাম।

স্বামীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, তোমরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ। সমাধি হইলেও ২৪ দিন দেহে জীবন থাকে। ২৪দিন না দেখিয়া কি করিয়া এমন সর্ব্বনাশ করিলে? তখন স্বামী সকল কথা বলিলেন। যখন বৃদ্ধ অঙ্গুলী ধরিয়া নাড়া দিলে মাথা নড়িয়া উঠিল, তখন সব শেষ হইল। আমি পাষাণ, তাই তিনি এসময় আমাকে তাঁহার সাক্ষাতে রাখিলেন। তুমি কখনও তাঁহার এ অবস্থা দেখিতে পারিতে না। তিনি তাঁহার স্নেহের মেয়েকে স্নেহ করিয়া সরাইয়া রাখিলেন। এদৃশ্য কি তোমার মত ভক্ত দেখিতে পারে? যখন তিনি এই সংসারে ছিলেন, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার সুখ দেখিয়াছেন। চলিয়া যাওয়ার সময়ও তাহা দেখিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কি এই পাগল ঠিক থাকিতে পারে? এ সময় কে এই পাগলকে ধরিয়া রাখিবে? তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার উপর দয়া প্রকাশ করিয়া গেলেন। তিনি নিজগুণে আমাকে স্নেহ করিয়াছেন। আমার হৃদয় পাষাণ নির্ম্মিত, তাই তাঁহার অন্তিম শয্যা দেখিতে পারিলাম। তাহা দেখার নয়। তোমার হৃদয় কি তাহা করিতে পারে? তাঁহার ব্যবস্থার উপর কেহ হাত দিতে পারে না।

আমি বলিাম, তুমি আমার হৃদয় জান না। যদি ভগবানের মত আমার হৃদয় জানিতে পারিতে, দেখিতে পাইতে আমি কি পাষাণী, তোমার মুখে এই নিদারুণ বাণী শুনিতে পাইলাম, হৃদয়ে একটু দাগ লাগে নাই। হায়, হায়, বাবা দুর্গাচরণ, এই পাষাণীর জন্য কি তুমি সংসার ছাড়িলে? আমি অনেক সময় তোমাকে

অনেক জ্বালা দিয়াছি, অনেক সময় তোমাকে অকারণ অনেক কষ্ট দিয়াছি। বাবা দুর্গাচরণ, আমরা গেলে, সময় মত তোমার খাওয়া হয় নাই, সময় মত তুমি শুইতে পার নাই, ইচ্ছা হইলেও আমার জন্য বসিতে পার নাই। তুমি শান্ত হইয়াও, অশান্তের মত ঘুরিয়াছ। একবার বাজার করিয়া আবার বাজার করিয়াছ। তুমি বাজার হইতে আসিয়া, মাঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়াছ, তিনি কি বলিবেন। দোষ না করিয়াও, তুমি দোষীর মত তাকাইয়া রহিয়াছ। দেখিয়াছ মাঠাকুরাণী রাগ করিয়াছেন কি না। মাঠাকুরাণীর রাগ দেখিয়াও, আমরা মনে কষ্ট পাইব বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছ, কোন কথা বল নাই। যখন তুমি শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সুখী করিতে পার নাই, এখন তিনি তোমাকে কর্কশ কথা বলিয়াছেন, তুমি আমাদের জন্য তাঁহার উপর রাগ করিয়া, আমাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছ। আমরা যেন তোমাকে দেখিয়া, তোমার স্নেহে সব ভুলিয়া যাই। আমাদিগকে সুখী দেখিয়া, তুমি আমাদের সঙ্গে সুখী হইয়া রহিয়াছে। বাবা দুর্গাচরণ, আমরা স্বার্থপর জীব, নিজের স্বার্থ ই দেখিয়াছি একদিনের তরেও তোমার সুখ দেখি নাই। তুমি পৃথিবীর চেয়ে অধিক সহ্য করিয়াছ, আর বোধ হয় আমাদের তাপ সহ্য করিতে ইচ্ছা হইল না। সেই জন্য কি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে? হায়, হায়, তোমার অভাব শুনিলাম, এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল না। তুমি কি সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া গেলে? কোথায় যাইব, কোথায় গেলে তোমাকে দেখিতে পাইব? বাবা দুর্গাচরণ, স্বপ্নে দেখাইয়া, তোমার কাছে লইয়া গেলে, হাসিতে হাসিতে অনেকবার বলিলে, কি দেখিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আমি

মুখে এই কথা বলিতে পারিব না। আমি যেন আপনার ও অবস্থা না দেখি। তখন তুমি হাসিয়া বলিয়াছিলে, ভগবান্ সম্বন্ধে স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা সত্য, অন্য স্বপ্ন কল্পনা মাত্র। তোমার কথা শুনিয়া, অতিশয় সুখী হইয়া বলিয়াছিলাম, আমি যেন আপনার ও অবস্থা দেখি না। বাবা দুর্গাচরণ, তখন তুমি হাসিয়া বলিয়াছিলে ভগবান্ হৃদয়ের জিনিষ, তাঁহাকে হৃদয়ে পাওয়া যায়। তখন আমার জ্ঞান হইল না যে, তুমি এই সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাই আমাকে বলিয়াছিলে, কোন স্থানে নৌকা করিয়া গেলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। তোমার ওঅবস্থা দেখিব না মনে করিয়া সুখী হইলাম, তুমি সময়োপযোগী উপদেশ দিলে। আমার একবারও মনে হইল না, যদি আমার অসাক্ষাতে ঐ অবস্থা হয়, আমি দেখিব না সত্য, কিন্তু শুনিতে পাইবে। তখন ত তোমার অভাবে এই জগতে থাকিতে হইবে। আমি কি করিয়া তোমাকে হৃদয়ে খুঁজিব। তখন যদি এইরূপ বুদ্ধি হইত, দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন কথা বলিয়া যাইতে, সেই কথায় আজ তোমার অভাব শুনিতে হইত না। আমি কিছু বুঝিলাম না, তুমিত সকল বলিয়াছিলে। বাবা, তুমি বলিয়াছিলে, তাঁহাকে হৃদয়ে খুজিতে হয়, জীবের কি সাধ্য যে তোমাকে হৃদয়ে খুজিবে? কত সময় হইল, শুনিতে পাইয়াছি, তুমি বলিয়া গিয়াছ; কৈ হৃদয়েত তোমাকে খুঁজিলাম না। হৃদয় খুঁজিলে, তুমি হৃদয়ে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিতে না। বাবা, তুমি স্নেহে বশীভূত হইয়া বলিয়াছিলে, তাঁহাকে হৃদয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি কি তোমার তেমন ভক্ত? যদি আমি সেইরূপ ভক্ত হইতাম, এই সময় মধ্যে তোমাকে হৃদয়ে দেখিতে পাইতাম। আমি পাষণী, নচেৎ কি

করিয়া তোমার অভাব শুনিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলাম? তুমি যে উপায় বলিয়া দিয়াছিলে, সেই উপায়ে তোমাকে হৃদয়ে পর্য্যন্ত খুঁজিতেছি না। স্বামী বলিলেন, আমি তোমার এই অবস্থা দেখিতে পারিতাম না। তোমার স্নেহহেতু স্বামী আমাকে তোমার স্নেহের উপযুক্ত ভক্ত মনে করিয়াছেন। তুমি এবার বাঘ ভাল্লুকের মধ্যে আসিয়াছিলে। একটী মেয়ে তোমার উপযুক্ত ভক্ত ছিল। শিলাপিলা-রূপে তোমাকে পাইয়া, তোমার শিলাপিলারূপ না দেখিয়া, ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না তোমাকে না দেখিলে, সে এমনভাবে খুঁজিত, তুমি শিলাপিলারূপে তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিতে না। তোমাকে পিলাপিলারূপে দেখিয়া, হৃদয়ে রাখিত, সে তোমাকে হৃদয়ে খুজিতে পারিত। বাবা, তোমাকে হৃদয়ে খোঁজা কি আমার মত পাষাণীর কাজ। যে তোমার শিলাপিলারূপ পাষাণমূর্ত্তি দেখিয়া তোমাকে এত ভালবাসিয়াছে, যদি সে তোমার এরূপ দেখিতে পাইত, তোমার এমত স্নেহ লাভ করিত, মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়ে খুঁজিয়া তোমাকে দেখিয়া, তোমার সঙ্গে চলিয়া যাইত। তোমার অভাব শুনিয়া, দেহ ভার বহন করিত না। হায়, হায়, কি হইল? এত অল্প সময়ে সব শেষ করিয়া ছাড়িয়া গেলে! বাবা তুমি আমায় বলিয়াছ, ক্ষেপাচণ্ডি কখন কি করিয়া বসে, আমি তাহা ভাবি। এখন তোমার সেই ভালবাসা কোথায় রহিল? এখন কে তোমার ক্ষেপাচণ্ডীকে দেখিবে? বাবা, কি করিব? কোথায় যাইব? কে তোমাকে দেখাইয়া বলিবে, এখনও তুমি যাও নাই। হায়, হায়, তোমার অভাবে কি করিয়া সংসারে থাকিব? এক মাস তোমাকে দেখিতে না গেলে, মনে হইত, কতদিন হইল তোমার অমিয়মাখা মুখকমল দেখিতেছি না। এখন যে কত মাস

কেন, কত বৎসর তোমাকে না দেখিয়া থাকিব, তাহার অবধি নাই। কি সর্ব্বনাশ হইল। তোমার দেখা এখন আর সীমার মধ্যে রহিল না। বাবা, আমি জীব, জীবের মত হাবুডুবু খাইতেছি, কুল দেখিতে পাইতেছি না। এত স্নেহ করিয়া, কি করিয়া একবারে অসীমের মধ্যে চলিয়া গেলে ?

স্বামী মনের কথা বুঝিলেন না। মুখ হই'ত একটা শব্দ বাহির হইল। তিনি বলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে নেই। ভগবান্ হৃদয়ের জিনিষ, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখ। চিৎকার করিয়া কাঁদিলে, হৃদয়ের ভাব বাহির হইয়া যায়। আমি চুপ করিলাম। স্বামী মনে মনে কি বুঝিলেন, সকল রাত আমাকে উঠিতে দিলেন না। একবারে ধরিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, তিনি তোমাকে বলিয়া ছিলেন, মৃত্যুআকজ্ঞা পাপ। নাগমহাশয় আত্মহত্যা বড় ঘৃণা করিতেন। এজগতে আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি, এমন কোন কাজ করিও না, যাহাতে তিনি পরজগতে ঘৃণা করিয়া চরণপাশে স্থান না দেন। আমি বলিলাম, কি করিব, স্থির করিতে পারি না। যিনি এত স্নেহ করিতেন, একদিনের তরেও তাঁহার কষ্ট বুঝি নাই। গোপনে ভাল ছিলেন, আমরা দেওভোগ যাইয়া তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি। আমার মনে হয়, তাঁহাকে ত্যক্ত করিয়াছি বলিয়া তিনি এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন। আমরা ত্যক্ত না করিলে, বোধ হয় তিনি আর কতক দিন থাকিতেন। স্বামী বলিলেন, সকলই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে কাজ করিয়া যাও, অন্তে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, পথে পথে থাকিলে, একদিন তাঁহার দয়া হয়, এলো মেলো করিতে হয় না। নাগ-

মহাশয় তোমাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার কথামত কাজ কর, তাঁহাকে পাইবে। তোমার চিন্তা কি? আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। স্বামীর কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সকল রাত্র কি রকম লাগিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভোরে উঠিয়া বাহিরে গেলাম। যেদিকে তাকাই, সেই দিক যেন বলিয়া দিতেছে, নাগমহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আকাশের দিকে তাকাইলাম, মনে হইল, তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া আকাশ কাঁদিতেছে। বৃক্ষলতাদি বলিয়া দিতেছে, তিনি কোথায় গেলেন। পশুপক্ষীর রব শুনিয়া মনে হইতে লাগিল,তাহারা অভাব অনুভব করিয়া আকুল প্রাণে চারি দিকে চাহিতেছে। সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিতে দেখিয়া আমার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। আমি বাগানে যাইয়া কাঁদিতে ছিলাম, স্বামী শব্দ পাইয়া, ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিও না, হৃদয়ের ভাব বাহির হইয়া যাইবে। তাঁহাকে মনে রাখিতে হয়। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিলাম, তুমি ৬মাস পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলে, পৃথিবীতে কি একটা বিশেষ অমঙ্গল হইবে। আকাশের দিকে তাকাইলে তোমার মনে হইত, চন্দ্র-সূর্য্য যেন কাঁদিতেছে— সূর্য্যের প্রভা আর তেমন নাই, চন্দ্রের সৌন্দর্য্য কমিয়া গিয়াছে। আজ বাহিরে আসিয়া তাহা অনুভব করিলাম। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখিতে পাই, সকলই যেন তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে। যখন তিনি ছিলেন, যদি তোমার এই কথা তাঁহাকে বলিতাম, তবে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতাম। হায়, হায়, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এখনও মনে হয়, আমি দেওভোগ গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, শান্ত হও। দেওভোগ

গেলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। ঐ চন্দ্রবদন আর আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবে না। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ে খুঁজিতে হয়। স্বামী আমার ভাব গতিক দেখিয়া, তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখিলেন। স্বামীর ভুল বিশ্বাস ছিল, আমি তাঁহার অভাবে মরিব। জীব কি কখন তাঁহাব জন্য প্রাণ দিতে পারে!

আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নারাযণ কুমার তখন হইয়াছিল। ২৫ দিন পর নাগমহাশয় চলিয়া গেলেন। মাতা তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন নাই। চলিয়া যাইবার সমযেও তিনি আমাকে আতুর ঘরে রাখিয়া গেলেন না। হা ঠাকুর, তুমি চলিয়া গেলে? এমন ঠাকুর আর হইবে না। আমার বড় ভগ্নী আমাকে সান্ত্বনা করিয়া, মাথায তৈল দিলেন। ঘরের বাহির হইতে কেমন বোধ হইতে লাগিল। কাহাকে কিছু বলিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বিছানাব নিকট ভাত আনিয়া দিলেন। স্বামী অনেক বলিয়া আমাকে খাওয়াইলেন। জীব কি আর তাঁহার জন্য না খাইয়া পারে! যখন দুগ্ধ পান করিতে বলিলেন, তখন আর সহ্য হইল না। আমি বলিলাম, মনে করিয়াছিলাম, নাগমহাশয় দুগ্ধ খাইলে, আমি তাহা খাইব। স্বামী বলিলেন, তিনি দেহ ধরিয়া থাকিলে ভিন্ন কথা ছিল, এখন না খাইয়া পারিবে না। অনেক পীড়া-পীড়ি করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইলেন। দুগ্ধ খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিলাম, আমার উপর তাঁহার এত দয়া ছিল, যেদিন জনমের মত তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম, সেই দিন তিনি আমাকে শুনাইয়া দুই ঝিনুক দুগ্ধ চাহিয়া খাইলেন। যদি তিনি আমাকে জানাইয়া দুই ঝিনুক দুগ্ধ না খাইতেন,

আজ আমার অনুতাপের সীমা থাকিত না। আমি তাঁহার অসুখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলে, মাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, তাঁহার অসুখ, দুধ দিলে তিনি খান। খরচের অভাবে সকল দিন তাঁহাকে দুধ দেওয়া যায় না। আমি এই কথা পিতাকে বলিলাম। পিতা মাঠাকুরাণীকে পাঁচটী টাকা দিতে গেলেন, তিনি তাহা নিলেন না। পিতা ও আমি মনে কষ্ট পাইয়া চলিয়া আসিলাম। কোন উপায় নাই, কারণ নাগ-মহাশয় কাহার হইতে কিছু গ্রহণ করেন না। মাঠাকুরাণী টাকা লইলেন না। আর কাহাকে টাকা দিব? তখন মনে মনে বলিলাম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার জিনিষ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, আর তোমার দুগ্ধ খাইতে পয়সা হয় না। যখন তুমি দুগ্ধ খাও না, আমিও আর তাহা খাইব না। এই দেড় মাস হয় দুগ্ধ খাই না। তুমি ভিন্ন এই কথা কাহাকেও বলি নাই। মাতা ও ভগ্নী কি মনে করেন জানি না। কি ভাবিয়া তোমার কাছে আমাকে দুগ্ধ দিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। দুগ্ধ খাইয়া মনে হইল, এই জন্য নাগমহাশয় শুইয়া শুইয়া আমাকে জানাইয়া, দুই ঝিনুক দুগ্ধ খাইয়াছিলেন। স্বামী বলিলেন, তাঁহার দয়ার কি শেষ আছে? আমরা পাষাণ, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে কি তাঁহাকে ভুলিয়া এই ভাবে থাকিতে পারিতাম। স্বামীর কথা শুনিয়া, আবার তাঁহার গুণ, তাঁহার অপরিমিত স্নেহ মনে পড়িতে লাগিল। বাবা, এত স্নেহ করিয়া, কি করিয়া ফেলিয়া গেলে? যাইবার সময় একবার এই জীবের কথা মনে করিলে না? জ্বালাময় সংসার ছাড়িয়া, তোমার সুখময় স্থানে চলিয়া গেলে। যখন তুমি

ছিলে, একদিনও ভাবিতে পারি নাই, তুমি এমন কাজ করিতে পারিবে। হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই রহিল। আব কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

বিকাল বেলা স্বামী মাঠাকুরাণীর জন্য ফল আনিতে গেলেন। আমি বড় ঘরে গেলাম। পিতা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাগো, দুই দিনে তোমার চক্ষু ও মুখ কি হইয়া গেল? ভগবান্ ভক্তের নিকট হইতে কখন যাইতে পারেন না। যখন তোমরা মনে কর, তাঁহাকে দেখিতে পাও। কষ্ট হইল আমাদের। আমি বলিলাম, বাবা, নাগমহাশয়ের জন্য কি জীব প্রাণ দিতে পারে? পিতা চুপ করিয়া মলিন মুখে বসিয়া রহিলেন। স্বামী ফল লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, তিনি পরদিন দেওভোগ যাইবেন। তাহা শুনিয়া আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। মনে হইল, কি দেখিতে দেওভোগ যাইবে? স্বামী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কি যেন বলিবেন, আমার ভাব দেখিয়া বলিতে সাহস পাইতেছেন না। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, তোমার সাথে কথা বলিয়াছেন কি? স্বামী বলিলেন, যখন নাগমহাশয় বলিলেন, বাঁচাও বাঁচাও, রাখ রাখ, আমি সব বুঝিতে পারিয়া পরদার নিকট নিরাশ হইয়া বসিয়াছিলাম। মাঠাকুরাণী তাহা দেখিতে পাইয়া, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মধ্যে আসুন। এই কথা শুনিয়া, আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাবা, এখন তুমি কোথায়? মা তোমার সন্তানের সাথে কথা বলিয়াছেন, আদর করিয়া তোমার সামনে লইয়া গিয়াছেন। তুমি কতমধুর বচন বলিয়াও মাকে শান্ত করিতে পার নাই। স্বামী বলি-

লেন, সকলই তাঁহার দয়া। অন্য সময় দূরে বসিয়া মনে করিয়াছি, এক সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইব। সেইদিন যখন নাগ মহাশয় বলিলেন, বাচাও, বাচাও, রাখ, রাখ, আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদিগকে দয়া করিয়া ইহা বলিয়া যাইতেছেন। যতদিন তিনি রহিলেন, সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সমভাবে দয়া করিয়াছেন। আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার সময় ও বিশেষ করিয়া হুষ করিয়া দিতে বলিলেন, নিজকে বাঁচাইয়া আমাকে রাখ। সেই সময় প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর দূরে থাকিতে পারিলাম না। মা না ডাকিলে কি যে করিতাম, জানিনা। তিনি আমাকে দয়া করিয়া সব সময় সকল অবস্থায় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। যেদিন তোমাকে লইয়া দেওভোগ হইতে আসি, সেই রাত্রে তিনি শরৎবাবুকে তীর্থের নাম করিতে বলিয়াছিলেন। শরৎ বাবু তীর্থের নাম করিতে লাগিলেন, তিনি তাহা যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া বর্ণনা করিলেন, ইহাই কেবল শুনিতে পারি নাই। তাহা ছাড়া তিনি সকল দিন দয়া করিয়া তাঁহার কাছে রাখিয়াছিলেন।

স্বামী হঠাৎ বলিলেন, মা তোমাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া আমার দম ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাবা দুর্গাচরণ, এখন তুমি কোথায়? যে আমি দেওভোগ গেলে, তোমাকে মাঠাকুরাণীর কাল মুখ দেখিতে হইত, কর্কশ কথা শুনিতে হইত, আজ সেই মা আমাকে তোমা ছাড়া দেওভোগ কেমন দেখায়, তাহা দেখিতে যাইতে বলিয়াছেন। বাবা! তুমি এখন কোথায়? স্নেহের পার্ব্বতীর আদর-যত্ন করার জন্য শত খোসামুদি করিয়াছ, কিছুতেই তোমার মনের মত মাকে করিতে

পার নাই। তোমার স্নেহ পাওয়ায় তোমার সন্তানের কোন কষ্ট হয় নাই, সন্তানের উপর তোমার এমনই স্নেহ ছিল। মা তোমার মত স্নেহ করিলে, সন্তান কতই না সুখ অনুভব করিত। মা স্নেহটুকু করেন নাই বলিয়া, সদানন্দ হইয়াও অনেক সময় নিরানন্দ হইতে। বাবা, তোমার যত্নের কোন ক্রুটী ছিল না, মা যত্ন করেন না বলিয়া তোমার দুঃখ হইত। তোমার অভাবে মা তোমার সন্তানের যত্ন করিলেন, তাঁহার সহিত কথাও বলিলেন; আমাকেও যাইতে বলিলেন। এখন তুমি কোথায়?"' বাবা, এখন আমি কি দেখিতে দেওভোগ যাইব? স্বামী আমার ভাব দেখিবা হৃদয়ে অতিশয় কষ্ট পাইলেন। তিনি মনে করিলেন, দেওভোগ গেলে যাঁহার পিছনে থাকিত, এখন কোন মুখে বলিব তাঁহার শ্মশান দেখিতে চল। আমার পাষাণ হৃদয় সব সহ্য করিতে পারে, ও কি তাঁহার শ্মশান দেখিয়া ঠিক থাকিতে পারিবে? তিনি হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন, উহাকে কষ্ট দিবেন না, এসময় উহাকে দেওভোগ লইয়া যাওয়া প্রাণে মারা। মা আমার পাষাণ হৃদয় দেখিয়া, বোধ হয় আমাকে এমন নির্দ্দয় কাজ করিতে বলিলেন। যিনি বাজারে গেলে, পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, এমন ভক্তকে কি করিয়া শ্মশান দেখাইব। তবে যখন সংসারে রহিল, একদিন শ্মশান দেখিতে হইবেই। এখন গেলে যদি মার কাজ হয়, এখন যাওয়াই বরং ভাল।

স্বামী এইরূপ আক্ষেপ করিয়া আমাকে তাহা বলিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, তাঁহার দুইটী চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতেছে। ভাবে বলিয়া দিতেছে, তোমাকে কি দেখাইতে দেওভোগ নিয়া যাইব। তিনি বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই জানি,

এখন তোমাকে দেওভোগ যাইতে বলিলে, তুমি কষ্ট পাইবে। কি করি? নাগমহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অনেক দিন এই সংসারে থাকিতে হইবে। যদি আমাদের সুকৃতি থাকিত, আমরা তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে পরিতাম। যখন তাহা হইল না, এখন বুঝিতে হইবে, আমাদেব অনেক ভোগ করিতে হইবে। যখন তাঁহার অভাবে জীবন রহিল, সংসারে অনেক প্রাক্তন ভোগ আছে। এখন আর তিনি নাই যে, যাহা ইচ্ছা হইবে; তাহা করিতে পারিব। এখন আমাদিগকে প্রত্যেকটী কাজ বিচার করিয়া করিতে হইবে। যখন তাঁহার অভাবেও এজগতে রহিলাম, একদিন দেওভোগ যাইতে হইবে। মা আমাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, চল। নাগমহাশয় চলিয়া গেলেন, একদিনের তরেও তাঁহার কোন সেবা করিতে পারিলাম না। মা রহিলেন, সামান্য সেবা কবিতে পারিলে বহুভাগ্য মনে কবিব। তোমাকে বেশী কি বলিব? আমি তোমার চেয়ে তাঁহাকে বেশী জানি না। মা তাঁহার চিহ্ন রহিলেন। মার সেবা করিলেই তাঁহার সেবা হইবে। স্বামীর কথা শুনিয়া দেওভোগ যাইতে রাজি হইলাম সত্য, মনে আগুন জ্বলিতে লাগিল। আগে দেওভোগ যাওয়ার কথা হইলে, মনের আনন্দহেতু সময় ফুরাইতে চাহিত না। এখন দেওভোগ যাইতে মনের আনন্দ দূরের কথা, হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হয়। স্বামীর মনে নিদারুণ ব্যথা, আমাকে কি দেখাইতে দেওভোগ নিবেন। আমাব মনেও অসহনীয় জ্বালা, আমি কি দেখিতে তথায় যাইব।

সেই রাত্রিতে আর খাওয়া হইল না। উভয়ই মনের দুঃখে শুইয়া রহিলাম। পিতা, মাতা, ভগ্নিগণ অনেক অনুরোধ করিলেন,

খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। পিতা স্বামীকে বলিলেন, দেওভোগ ত লইয়া চলিলে, সাবধানে থাকিও। রাত্র ভোর হইল। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বাবা দুর্গাচরণ, যে দেওভোগে হাসিয়া যাইতাম, আজ সেই দেওভোগে কাঁদিয়া যাহতে হইল। আমি যে কি পাষাণী, তাহা অন্যে জানিল না। পিতা ও মাতা মনে করিলেন, নাগ-মহাশয়কে দেওভেগে না দেখিয়া, আমি না জানি কি করিয়া বসি। পিতা স্বামীকে অনেক সাবধান করিয়া দিলেন। আমরা রওনা হইলাম। পথে মনে করিতে লাগিলাম, দেওভোগ যাইযা দেখিতাম, নাগমহাশয় বারান্দায় বসিযা থাকিতেন। আমাকে দেখিলে হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিতেন। আজও বোধ হয় তাঁহাকে সেইরূপ বারান্দায বসা দেখিতে পাইব। বাড়ীর নিকট যাইয়া কি ভাব হইল, বলিতে পারি না। বাড়ী গেলাম, লক্ষ্য রহিল, নাগমহাশয় যেস্থানে বসিয়া থাকিতেন। দূর হইতে সেই স্থান দেখিলাম। বারান্দা পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি নাই। মাঠাকুরাণী আমাকে দেখিয়া কাঁদিযা কাঁদিয়া বলিলেন, মাগো, কি দেখিতে আসিলি? এ পোড়া মুখ আর দেখাইব না। যেখানে তিনি বসা থাকিতেন, আমি সেইস্থানে পড়িয়া রহিলাম। আমি বলিলাম, মাগো, এখানে না তিনি বসিযা থাকিতেন? এখন তিনি কোথায় গেলেন? আমি কাহার কাছে আসিলাম?

আমার সঙ্গে আমার এক পিসী ছিলেন। তিনি আমাকে ধরিয়া রহিলেন। নাগমহাশয়ের চিহ্ন মনে করিয়া মা ঠাকুরাণীকে জড়াইয়া ধরিলাম। মাঠাকুরাণী বলিলেন, এ পোড়া মুখ আর দেখাইব না। আমার শব্দ পাইয়া, মাসী কাঁদিয়া 'উঠিলেন।' বাবাগো, তোমার পঞ্চসারের খুকী আসিয়াছে, তুমি কোথায়?

তাঁহার কান্না শুনিয়া আমার প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, মাসী মা তিনি কি বাজারে গিয়াছেন? আমি আসিলে ত তিনি কোন স্থানে থাকিতেন না। তিনি আমাকে ফেলিয়া শুধু বাজারে যাইতেন। আমি পথে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, হাসিতে হাসিতে বলিতেন, মা, এ ভাবে কেন দাঁড়াইয়াছ? এত সময় হইল আমি আসিয়াছি, কাঁদিতেছি, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না, মা, তুমি কাঁদ কেন? আগে পথে দেখিলে, তিনি বলিতেন, মা, তুমি এখানে কেন? বাড়ীতে এস। যদি আমি আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে না দেখিতাম, মনে করিতাম, তিনি বাজারে গিয়াছেন। মাসী মা বলিলেন, তোর জ্যেঠা ওখানে শুইয়া আছেন। মনের কি গতি হইল, উৰ্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, তাঁহার কোন চিহ্ন নাই। কতকটা স্থান বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহা দেখিয়া বলিলাম, বাবা, তুমি এখানে শুইয়া রহিয়াছ? পাপিনীর তাপে বোধ হয় ঠাণ্ডা মাটিতে শয্যা পাতিয়া শুইয়া আছ? কি দেখিতে আসিলাম। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি উঠিয়া এই পাপিনীকে দেখা দাও! বাবা, আমি কোন স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলে, তুমি সকলকে ফেলিয়া আমাকে খুঁজিতে যাইতে। যে পর্য্যন্ত আমি বাড়ীতে জানিতাম না, তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিতে। আজ আমি একাকী তোমার জন্ত ভয়ঙ্কর স্থানে বসিয়া আছি, একবারও ত আসিয়া সামনে দাঁড়াইলে না। তোমার এত আদরের হইয়া, তোমার এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে হইল? বাবা, যখন তুমি আদর করিয়াছ, তোমার স্নেহমাখা হাসি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তোমার এই আদর চিরকালই থাকিবে। সমস্ত

আশা ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বনাশ করিয়া, কোথায় চলিয়া গেল, কিছু জানিতে পারিলাম না। বাবা, এক সময় তুমি বলিয়াছিলে, মা, যাঁহার নাশ নাই তাঁহাকে ধরিতে হয়; দুইদিন পর আসিয়া দেখিবে, এই দেহ পুড়িয়া গিয়াছে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ছাই পড়িয়া রহিয়াছে। তখন আমি তোমার স্নেহে ভুলিয়া তোমার কথার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতাম না। সত্যময়, তোমার কথা বেদবাক্য। বাবা, তুমি এমন করিয়া লুকাইলে, কেহ দেখিতে পাইল না। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি কোথায় গেলে? একবার দেখা দেও। দূরে দাড়াইয়া দেখিব, আর তাপ দিব না। তোমার গায় আর তাপ লাগিবে না। শ্মশানে যাইয়া প্রাণ যে কিরূপ হইল, বসিয়া রহিলাম। মুখ ঘুরাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম, স্বামী মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। জানিনা তিনি কি বলিতে চাহিয়া ছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ঢাকা হইতে আসিলেন। সকলেই তাঁহার নিকট গেলেন। নাগ মহাশয়কে না দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই নাগমহাশয়ের কথা মনে করিয়া দেয়। আমি দেওভোগ গেলে, সব সময় তাঁহার পিছনে থাকিতাম। আমার মনে হইতে লাগিল, নাগমহাশয় যেন আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। এক স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইলাম, অসুখের সময় নাগমহাশয় যে থুথু ফেলিয়া ছিলেন, একটী নারিকেলের খোলে তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বাবা, আমার দেখার জন্য থুথু রাখিয়া গিয়াছ? মহা প্রসাদ বলিয়া খাইব মনে করিয়া ধরিতে গেলাম। কি এক ভাব হইল, থুথু দেখিয়া তাঁহার অনন্ত গুণ

মনে পড়িল। লক্ষ করিয়া দেখিলাম, সাধারণ লোকের থুথু হইতে ইহার বর্ণ ভিন্ন ছিল, যেন ইহা হইতে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই জ্যোতি নাগমহাশয়ের শরীরের আভা মনে করিয়া দিতেছে। জ্যোতিতে মোহিত হইয়া রহিলাম। কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, তাহা আর মুখে তুলিয়া দেওয়া হইল না।

কতক্ষণ থুথু দেখিয়া, অন্য স্থানে যাইয়া দেখিলাম, একটা মাটির ঘটে নাগমহাশয়ের মল পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাণ আরও কাঁদিয়া উঠিল। বাবা, তুমি যে মল ত্যাগ করিয়াছ, তাহাও পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল তোমার দেহ নাই। বাবা দুর্গাচরণ, কোথায় গেলে তোমাকে দেখিতে পাইব? আমি আর ত থাকিতে পারি না। তোমার সব পড়িয়া রহিয়াছে, সুধু তুমি নাই। তৎপর পাগলের মত, যে পথ দিয়া তিনি নটবরবাবুদের বাড়ী যাইতেন, সেই পথে চলিয়া গিয়া, একটা ছাড়া বাড়ীতে দাড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, বাবা দুর্গাচরণ, একবার দেখা দেও। আমি পথে দাড়াইয়া থাকিলে, তুমিত বলিতে, এভাবে দাঁড়াইয়া কেন? বাড়ীতে যাও। একাকা ছাড়া বাড়াতে দাড়াইয়া আছি, একবার আসিয়া বারণ করিয়া যাও। বাবা, তোমাকে না দেখিয়া, তোমার বাড়ীতে আর থাকিতে পারিলাম না। তোমার সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই পথ, সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল তুমি নাই। তুমি যে একখানা ছেঁড়া চটে বসিতে, তাহাও পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি যে তামাক খাইতে সেই হুঁকাটী পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার তামাকের বাটিতে তামাক আছে, একবার আসিয়া চটে বসিয়া, হুঁকাটাতে তামাক খাও। বাবা, যে দিকে তাকাই সর্ব্বত্র তোমার চিহ্ন দেখিতে পাই, সুধু তোমাকে দেখিতে পাইনা। বাবা,

তোমাকে দেখিব মনে করিয়া, সকল জায়গায় তোমাকে খুঁজিয়াছি, কোথায়ও তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি যে আমগাছটার নীচে বসিয়া তামাক খাইতে, সেই গাছের নীচে কতবার গেলাম, যথায় তুমি বসিয়া থাকিতে, সেই স্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, শূন্য স্থান পড়িয়া রহিয়াছে,—তুমি নাই। মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি বোধ হয় বাজার করিতে গিয়াছ, আসিয়া আমাকে ডাকিবে, কতটুক সময় ওভাবে থাকিয়া, যে পথে বাজারে যাইতে সেই পথে তাকাইয়া দেখিলাম, তুমি আসিতেছ কি না। হায়, হায়, কত বুদ্ধি করিলাম, কোন বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে দেখিতে পাইলাম না! কি করি! আর ত তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। বাবা, তুমি আমাকে এত ভালবাসিতে, এত স্নেহ করিতে এখন কি করিয়া এভাবে রহিলে? তুমি কখন আমার মলিন মুখ দেখিতে পারিতে না, এখন আমার চক্ষের জল দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় না? হায়, হায়, তুমি এই ভাবে ভুলিয়া রহিলে! আমি এমন পাষাণী ছিলাম, তোমার এমন স্নেহেও হৃদয়ে সংসারের জ্বালা আসিত। একবার তোমার সন্তান ঢাকা চলিয়া গেলেন, আমি মলিন মুখে বসিয়া ছিলাম, তুমি সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বলিলে, আমাকে প্রবোধ দিয়া কহিলে, কলেজ ছুটি হইলে আসিবে। সংসারের জ্বালা দূর করিতে কাছে আসিয়াছিলে, এখন যে তোমার জন্য কাঁদিতেছি, তাহা দেখিয়া তোমার কি এক বারও দয়া হয় না? বাবা, আর পারিনা, যেখানে দাঁড়াইয়া তুমি আমার সাথে কথা বলিতে, সকল স্থান দেখিয়া আসিলাম, তোমাকে কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। বাবা, যেদিকে তাকাই মনে হয়

যেন সকলেই তোমার অভাবে কাঁদিতেছে, সকলেই আমার মত তোমাকে খুঁজিতেছে, কেহই তোমাকে পাইতেছে না। বল দেখি বাবা, কোন্ পথে গেলে তোমাকে পাইব? তুমি এত স্নেহ করিয়া কি করিয়া লুকাইলে; জীবনে কি আর সত্যই তোমাকে দেখিব না? যখন বুঝিতে পারিলাম, এ ভাবে খুঁজিলে তাঁহাকে পাইব না, তখন কি এক অবস্থা হইল, দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, বাবা, কোথা হইতে একবার দেখা দাও, আমি তোমাকে ধরিব না, দূর হইতে একবার মাত্র দেখিব। তখন দেখিলাম, তিনি যেন আমার কষ্ট দেখিয়া, মুখখানা মলিন করিয়া চক্ষুদ্বারা আমাকে বাড়ীতে আসিতে বলিলেন এবং হৃদয়ে খুঁজিতে বলিলেন। কোথায় যে তাঁহাকে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মনে হয় যেন তাঁহাকে চক্ষুর সামনে শূন্যে দেখিলাম। আমি তাঁহাকে ওভাবে দেখিয়া বাড়ীতে আসিলাম।

ভ্রান্তমন লইয়া আবার বারান্দারদিকে তাকাইলাম, বিশ্বাস তথায় নাগমহাশয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিব। বারান্দা সেই ভাবেই পড়িয়া আছে, তাঁহাকে হারাইয়া কাঁদিতেছে। অনেক সময় তিনি রান্নাঘরেরর নিকট দাঁড়াইয়া আমার সাথে কথা বলিতেন, দেখিব আশা করিয়া রান্নাঘরের দিকে তাকাইলাম, সেই রান্নাঘর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তিনি নাই। হায়, কি হইল! সত্য সত্যই তাঁহাকে জনমের মত হারাইলাম? স্নানের সময় আসিল, মনে হইল, বাবা, আজ এত সময় হলো আসিয়াছি, একবার আসিয়া বলিলে না, মা তুমি স্নান করিয়াছ কি? আমার উপর তোমার দয়ার শেষ ছিল না। তুমি আমাকে এত স্নেহ করিতে, ঘুম হইতে উঠা আরম্ভ করিয়া, পুনরায় শোয়া পর্য্যন্ত আমার খোঁজ করিতে

সকল কাজেই ভগবান্‌কে মনে করিতে বলিতে। মুখ ধুইয়া তোমার নিকট গেলে, তুমি বলিতে, এখন সত্যযুগ ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হয়। এই অমিয়মাখা কথাটী বলিয়া তুমি বসিয়া থাকিতে, আমি তোমাকে দেখিতাম। সকাল বেলা এইভাবে যাইত। স্নানের সময় স্নান করিতে বলিতে, খাওয়ার সময় খাইতে যাইতে বলিতে, সন্ধ্যা হইলে আমি কোথায় রহিয়াছি, তাহা দেখিতে। এখন সেই স্নেহের কি হইল? আজ সকল দিন চলিয়া গেল সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, একবারও জিজ্ঞাসা করিলে না। মাঠাকুরাণী সময় মত স্নান করিতে, খাইতে বলিলেন, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে, আমাকে ফাঁপর করিতে লাগিল। যেখানে তিনি বসিয়া থাকিতেন, সেইস্থানে বসিয়া গাছ-গুলির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। গাছের শব্দ শুনিয়া, মনে হইল, তাহারাও তাঁহাকে হারাইয়া কাঁদিতেছে। আমিও তাঁহাকে হারাইয়া কাঁদিতেছি!

আমার গলা দিয়া রক্ত পড়িল। গলা দিয়া রক্ত পড়া মাত্র নাগমহাশয় সৈন্ধব নুনের জল খাইতে বলিয়াছিলেন। রক্ত দেখিয়া মনে হইল, বাবা দুর্গাচরণ, তুমি পাষাণীর দেহের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা কেন করিয়াছিলে? এ দেহ হইতে কি হইবে? তুমি যাহাকে এত দয়া করিতে, সে তোমার অভাবে প্রাণ রাখিল! দয়াময়, কেন যে এ পাষাণীর প্রতি তোমার এত দয়া ছিল, জানি না। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি যাহাকে শিলাপিলারূপে দেখা দিয়াছিলে, সে তোমার দয়ার উপযুক্ত পাত্রী ছিল। সে শিলাপিলার পাষাণরূপ না দেখিয়া, এমন ভাবে খুঁজিত, তুমি তাহাকে দেখা না দিয়া পারিতে না। আর আমি তোমার এমন দয়ার মূর্ত্তি খুঁজিয়া বাহির

করিতে পারিলাম না। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, তোমাকে হৃদয়ে খুঁজিতে হয়। তুমি আমার হৃদয়ে আছ, আমি মোহে এমন অন্ধ হইয়াছি, তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তোমার কথা অবহেলা করিয়া, বাহিরে খুঁজিতেছি। আমি তোমার যেমন স্নেহ পাইয়াছি, যেমন মধুমাখা কথা শুনিয়াছি, যদি পাষাণও তোমার এখন স্নেহ পাইত, সে সমস্ত ভুলিয়া তোমাকে হৃদয়ে খুঁজিয়া বাহির করিত। আমার রক্ত-মাংসের পিণ্ড কখনও বিদীর্ণ হইবে না। বাবা দুর্গাচরণ, এমন হৃদয়শূন্য জীবে কেন তোমার অসীম স্নেহ ছিল, জানি না! তোমার বাড়ীর গাছগুলি আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসে। উহারা সুধু তোমার বাতাস পাইয়া সুখ অনুভব করিয়াছিল। তোমার স্নেহমাখা কথা শুনে নাই। তোমার পরমব্রহ্মরূপ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তোমার বাতাস পাইয়া, তাহারা তোমাকে এত ভালবাসিত। আমি তোমার স্নেহ পাইয়া, অমিয় মাখা কথা শুনিয়া, তোমাকে স্পর্শ করিয়া কি হইয়া রহিলাম? হায়, হায়, সত্য সত্যই কি তোমাকে এই জগতে হারাইলাম! আমি এখনও আশে পাশে তাকাইয়া থাকি, এই বোধ হয় তুমি আসিলে। বাবা দুর্গাচরণ, এত স্নেহ দেখাইয়া এই ভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে! তোমার ত সব জানা ছিল। তুমি কেন এই নিকৃষ্ট জীবকে স্নেহ করিয়াছিলে? আবার জনমের মত অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেলে! মাঠাকুরাণীকে বলিলাম, আমাকে একটু সৈন্ধব লুণ দিন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গলা চিরিয়া রক্ত পড়িল কি? আমি বলিলাম, হাঁ। মাঠাকুরাণী তাহা শুনিয়া দুঃখিতা হইলেন। আমি অন্যদিকে চলিয়া গেলাম। যদি নাগমহাশয় দেখিতেন, আমার

গলা দিয়া রক্ত পড়িলে মাঠাকুরাণী দুঃখিতা হইয়াছেন, তিনি কত সুখী হইতেন।

রাত্রি আসিল। মাঠাকুরাণী বড় ঘরে শোয়ার জন্য বিছানা করিলেন, কারণ নাগমহাশয় আমাকে কখনও অন্য বাড়ীতে শুইতে দিতেন না। মাঠাকুরাণীর বিছানা একটু দূরে করিলেন। আমি দুই বিছানা একত্র করিলাম। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আমার বিছানার সহিত তোমার বিছানা লাগাইও না। আমি কিছু বুঝিলাম না। হরপ্রসন্নবাবু বারান্দায় ছিলেন। তিনি বলিলেন, যখন মা মাঁনা করিতেছেন, মানিতে হয়। তখন আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম। হরপ্রসন্নবাবু স্বামীকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, আমার মনে হইল, যিনি আমার ইষ্ট ব্যতিরেকে অন্য জানিতেন না, তিনি আমার অনিষ্ট করিবেন না। মনের কথা মনে রহিল। সকল রাত নাগমহাশয়ের গুণগ্রাম মনে পড়িতে লাগিল। বাবা, কোথায় আসিলাম! দেওভোগ আসিয়াও তোমাকে একবার দেখিলাম না। দিন রাত্রি চলিয়া যাইতেছে। একটু ঘুম আসে, আবার জাগিয়া উঠি। রাত্রি ভোর হইল। আবার তাঁহার কথা মনে পড়িল, তাঁহার নিয়ম হৃদয়ে জাগিল। তাঁহার নিয়ম মনে করিয়া মাঠাকুরাণীর নিকট বসিলাম। আশা ছিল, নাগমহাশয়ের কথা শুনিব। মাঠাকুরাণী কতকগুলি কুলোকের নাম করিয়া, তাহাদের দোষের কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া আমার মনে বিষম আঘাত লাগিল। মনে মনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলাম, বাবা দুর্গাচরণ, কি শুনাইতেছ? সকাল বেলা তোমার কাছে বসিলে মনে একটা বাজে কথা

উঠিলে, অমনি বলিয়া দিতে, এখন সত্য যুগ, অন্য কথা মনে আনিতে নেই, ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে হয়। মনের কথা দূরে গেল, মাঠাকুরাণী নিজেই জঘন্য কথা বলিতেছেন। বাবা, তুমি চলিয়া যাওয়ার পর এখনও ১০ দিন হয় নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, মাঠাকুরাণী তোমার জন্য ব্যাকুলা হইয়া ভোরের সময় কাঁদিবেন। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হরপ্রসন্নবাবু ঘরের বারান্দায় শুইয়া ছিলেন। তিনি 'জয় গুরু' বলিয়া উঠিলেন। তখন মাঠাকুরাণী বলিলেন, সকালে কি করিতেছি? তাহা শুনিয়া আমার মন বড় বিরক্ত হইল। কোথায় মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের নিয়ম অটুট ভাবে পালিবেন, তাহা না করিয়া তিনি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন। যেখানে ভোরেই তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ হয়, সেই স্থানে থাকিয়া কি লাভ? কাহাকেও কোন কথা বলিলাম না। মন কি রকম হইয়াগেল। বেলা হইল। নাগমহাশয়কে মনে করিয়া সকল বাড়ী ঘুড়িতে লাগিলাম। কোন স্থানেই তাঁহার দেখা পাইলাল না। স্বামীর কথা মনে হইল। তিনি বলিয়াছিলেন নিজ নিজ কর্ম্ম লইয়া রহিলাম। বিনা সাধনে নাগমহাশয়কে এ জীবনে আর পাইব না। স্বামী বলিলেন, তিনি সেই দিন বৈকালে ঢাকা যাইবেন, তাহা শুনিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল, কিছু বলিলাম না। তিনি মাঠাকুরাণীকে অতিশয় ভক্তি করেন। স্বামীর কথা আমি মাঠাকুরাণীকে তাঁহার চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া ছিলাম। সকালে উঠিয়াই মাঠাকুরাণী তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন দেখিয়া মন একবারে কেমন হইয়া গেল। তখন স্বামীকেই তাঁহার চিহ্ন মনে হইতে লাগিল। নাগমহাশয় স্বামীকে বড় ভাল বাসিতেন। স্বামী তাঁহাকে আপন বলিয়া ভাবিতেন।

তিনি সাধ্যমত নাগমহাশয়ের নিয়ম পালন করিতেন। মনের গতিক দেখিয়া তিনি সাহায্য করিলেন। গলা দিয়া অনেক রক্ত পড়িতে লাগিল, বুকে ব্যথা হইল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া, স্বামী আমাকে দেওভোগ রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। মা-ঠাকুরাণী আমার অসুখ দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন, আজ উহাকে নিয়া যান, ভাল হইলে কাজের সময় নিয়া আসিবেন।

মাঠাকুরাণীর আদেশ পাইয়া, স্বামী আমাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। আসার সময় বাড়ীরদিকে ফিরিয়া তাকাইয়া স্বামীকে বলিলাম, দেখ, অন্য দিন তুমি ও আমি চলিয়া আসিতে থাকিলে, যত দূর দেখা যাইত, নাগমহাশয় তাকাইয়া থাকিতেন। আজ তিনি কোথায়? তুমি আমাকে লইয়া একাকী ষ্টেশনে আসিলে, তিনি সঙ্গে আসিতে চাহিতেন। আজ সঙ্গে আসা দূরের কথা, একবার তাকাইয়াও দেখিলেন না। স্বামী মলিন মুখে সকল কথা শুনিলেন, কোন কথা বলিলেন না। রাত্রে পঞ্চসার আসিলাম। স্বামী বলিলেন, পরীক্ষা সামনে, এখন পড়িতে হইবে। যাহা হইবার হইয়া গেল। আমি মাঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, তিনি ভাল কাজ করিলে সুখী হইতেন, অন্যায় করিলে দুঃখিত হইয়া তাহা হইতে বিরত করিতেন। যখন তিনি ছাড়িয়া গেলেন, এখন সকল দিক দেখিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার জন্য কাহার প্রাণ গেল না। এখনও যতটুকু তাঁহার কথা বলি, কেবল নিজের সুখের জন্য। সংসারের জীব সংসারের কাজ করিতেই হইবে। তিনি বলিয়াছেন, গলায় ঢোল পড়িয়াছে, বাজাইলেই সিদ্ধি। স্বামী মনের

ভাব কিছুই বুঝিলেন না। এই কথায় তাঁহার অভাব বুঝিলেন। স্বামী দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন, সংসারের কাজের জন্যই রাখিয়া গেলেন। ১৫ দিন গেলে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, একবার দেওভোগ যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার অমৃতোপম কথা শুনিয়া, তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া আসিতাম। দেওভোগ না যাইয়া যদি সংসার লইয়া মজিয়া থাকিতাম, তিনি নিজে ডাকিয়া নিতেন। এখন আর কে ডাকিয়া নিবে? যত কাল জীবিত থাকিব, সংসারের বোঝা টানিতে হইবে, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ত? এখন আর কেহ দেখার নাই, নিজে বুঝিয়া কাজ করিয়া চলিবে। তাঁহার গুণ বলিয়া সুখে দুঃখে রাত কাটিয়া গেল।

সকালে চলিয়া আসিবার সময় স্বামী বিষণ্ণমনে কি বলিবেন মনে করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, কাল মুখ করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আর কি বাকি আছে? তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার ভাব দেখিয়া স্বামী বলিলেন, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে সকলেই মনে করিয়াছি, তিনি গেলে কি ভাবে থাকিব? এখন সেই ভাব কাহারও নাই। তবে জানিবা, তোমার বন্ধনের কারণ আমি, আমার বন্ধনের কারণ তুমি। আমি তাঁহার দেহের এক অংশ আনিয়াছি, এই লও। তুমি পূজা করিও। বড় যতনের জিনিষ, যতনে রাখিও, দেখিও তাঁহার যেন অযত্ন না হয়। ইহা দেখিয়া তোমার প্রাণে সুখ হইবে না। আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, তজ্জন্য ভগবান্ আমাদ্বারা এই সব কাজ করাইলেন। নাগ-

মহাশয়ের শরীরের অংশ দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মনে হইল, বাবা, তোমার সোণার দেহ কে এমন করিল? আর তুমি কিরূপে আমার কাছে আসিলে? স্বামী বলিলেন, দেখিও, পূজা করিয়া অতিশয় সাবধানে রাখিয়া দিও; ফুল, বেলপাতার সঙ্গে রাখিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোথায় রাখিব? স্বামীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কতক সময় পরে বলিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাকে কোথায় রাখিবে? তাঁহাকে হৃদয়কন্দরে রাখ। নয়নজলে চরণযুগল ধোয়াইও, কেশদামে তাহা মুছাইয়া দিও। প্রাণ ভরিয়া ভক্তিকুসুমাঞ্জলি দিও এবং নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিও। ইহাই তাঁহার উপযুক্ত। যদি তাহা না পার, একটী নূতন কৌটা আন, আমি তাহাতে রাখিয়া দিব। আমার একটা নূতন কৌটা ছিল। স্বামী তাহাতে নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ রাখিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, তিনি থাক্‌তে কৌটাটী সুন্দর দেখিয়া কিনিয়াছিলাম, তখন স্বপ্নেও মনে করিতে পারিয়াছিলাম না, এই কৌটা এই কাজে লাগিবে। সোণার দেহ কি হইয়া গেল!

স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয় তোমাকে বলিয়া গিয়াছেন, আমি রোজ তাঁহার পূজা করিব, তাই তিনি এইরূপে তোমার কাছে আসিলেন। তুমি এখন রোজ তাঁহার পূজা কর। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। তিনি এইরূপে তোমাকে দেখিবেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি ভাবি ক্ষেপাচণ্ডী কখন কি করিয়া বসে। তিনি তোমাকে এত স্নেহ করিতেন। তিনি দেখিলেন, তিনি আর থাকিতে পারেন না, কে ক্ষেপাচণ্ডীকে দেখিবে? সুতরাং তিনি ক্ষেপাচণ্ডীকে শান্ত রাখার জন্য

পূজার বিধি করিয়া এই রূপে আসিলেন। স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলাম, যখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি রোজ তাঁহার পূজা করিব, রোজ পূজার কাজ করিব, এক দিন পূজার কাজ করিয়া কি বসিয়া থাকিব, তখনই আমি বুঝিতে পারিয়া ছিলাম, আমি রোজ তাঁহার পূজার কাজ করিতে পারিব। কি ভাবে যে তাহা করিব, ইহা জানিতাম না। চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হইতে পারে, তথাপি তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। স্বামী বলিলেন, তাঁহার কথা অনুসারে তোমার পূজা আসিল। তাঁহার কথা রাখ। তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য, স্নেহের সহিত তোমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ঘরে বসিয়া তাঁহার পূজা কর, তাহা দেখিয়া তিনি সুখী হইবেন। স্বামীর কথা শুনিয়া, নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ হাতে নিলাম। স্বামী বলিলেন, ইহাকে স্পর্শ করিয়া কোন অসার চিন্তা করিও না।

নাগমহাশয় চলিয়া গেলেন পর স্বামীর মন কেমন হইয়া গেল। যখন তিনি ছিলেন, স্বামী দেওভোগ হইতে আসিয়া ২।৩ দিন স্নান করিতেন না, কারণ নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় দিয়াছেন, স্নান করিলে তাহা ধুইয়া যাইবে। ২।৩ দিন পর স্নান করিতেন এবং ভাবিতেন, আবার দেওভোগ যাইয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় দিব। ৭।৮ দিন হইল নাগমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, স্বামী তাঁহার চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, মস্তকে রাখিয়াছেন, এ জনমের মত আর ত তাহা পাইবেন না। ইহা ভাবিয়া তিনি স্নান করেন না। আমিও খেয়াল করিয়া কিছু দেখি নাই। যখন আমার হাতে নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ দিয়া, আমার সাথে কথা বলিতেছেন, আমি দেখিতে পাইলাম,

তাঁহার মাথার চুলগুলি অতিশয় রুক্ষ হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কতদিন স্নান কর না? স্বামী বলিতে লাগিলেন, ও পদধূলি আর কি পাইব? স্নান করিলেই ত উহা ধুইয়া যাইবে। যতদিন স্নান না করিলে চলে, ততদিন স্নান করিব না। শরীর সুস্থ রাখার জন্য স্নানের প্রয়োজন, যদি তাহা না করিলে কোনরূপ অসুবিধা বোধ না হয়, তবে স্নান করার দরকার কি? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যরক্ষা পরমধর্ম্ম। দেহে জ্বালা থাকিলে, ভগবানে মন যায় না। দেহে জ্বালা থাকিলে, সমাধি হয় না। যাহাতে দেহ ভাল থাকে, সেই ভাবে থাকিতে হয়। তোমাকে নাগমহাশয়ের কথা বেশী কি বলিব? তুমি আমার চেয়ে তাঁহাকে কম জান না।

স্বামী মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি ভাবিতেছেন, স্নান করিলে পদধূলি ধুইয়া যাইবে, যদি পদধূলি ধুইয়া যায়, তবে দেহ কি সুস্থ থাকিবে? যখন তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার সাথে মন গেল না, তখন এমন কি আর তাঁহাতে থাকিবে? আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলাম, তুমি আমাকে বলিয়াছ, তোমার বন্ধনের কারণ আমি, আমার বন্ধনের কারণ তুমি। যখন তাঁহার নিয়মবদ্ধ হইয়া রহিলাম, তাঁহার নিয়মানুসারে সকল কাজই করিতে হইবে। নাগমহাশয় বলিয়াছেন, পথে পথে থাকিতে হয়, এলোমেলো করিতে হয় না। এখন যদি তুমি স্নান না করিয়া শরীর অসুস্থ কর, তাহা তোমার ঠিক কাজ হইবে না। স্বামী বলিলেন, আমি কোন অসুবিধা বোধ করি না। আমি বলিলাম, তাঁহার পদধূলি মাথায় রাখিয়া অনুভব করিতেছ, তাই অসুবিধা

বোধ হইতেছে না। যতদিন তাঁহার পদধুলি মস্তকে থাকিবে, ততদিন কোন কষ্ট অনুভব করিবে না। সকল সময় মন আর এমন ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে না, কয়েক দিনের ভিতর বি, এ, পরীক্ষা দিবে, পড়িতে যাইতেছে। পড়ার সময় কোন মতেই তাঁহাতে এভাবে মন থাকিবে না। লোকের সঙ্গে মিশিবে, এভাব রহিবে না। একবার স্নান ছাড়িয়া দিলে, ইচ্ছা করিলেও সহজে তাহা করিতে পারিবে না। হঠাৎ অসুস্থ হইবে। আমার কথা শুনিয়া, স্বামী কতক সময় চিন্তা করিলেন। অবশেষে তিনি স্নান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি স্নান করিয়া, মুখ কাল করিয়া বলিলেন, এতদিন মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার পদধূলি আমার মস্তকে আছে, দেবতার আরাধ্য পদ আমার হৃদয়ে আছে, আজ হইতে সেইটুকুও শেষ হইয়া গেল। আর কি পদধূলি পাইব? যখন তিনি ছিলেন, দেওভোগ হইতে আসিয়া ২।৩ দিন স্নান করি নাই, ভয় ছিল পদধূলি ধুইয়া যাইবে। যেদিন স্নান করিতাম, মনে হইত, আর কয়েকদিন পর দেওভোগ গিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় ও কপালে মাখিব। আজ কি মনে করিব?

আমি বলিলাম, তুমি দেবতার আরাধ্য চরণযুগল হৃদয়কমলে ধারণ করিয়াছিলে। ওচরণ স্পর্শ করিয়া ধূলি পড়িয়া যায়, যাহার অদৃষ্ট ভাল, সে তাহা অবনতশিরে ধারণ করিয়া জীবন সফল করে। ঐ পদ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া ধূলির এত মাহাত্ম্য। তোমার দেহ তাঁহার পধুলির মত হইয়া রহিয়াছে। দেবতা যে চরণ ধ্যানে পায় না, তুমি সেই চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ, ঐ বক্ষই তাঁহার পদধূলির সমান। কত ধূলি ত পড়িয়া আছে, কে তাহার আদর করে? ও চরণ স্পর্শ করিলে দেবগণও আদর

করেন। ভগবানের চরণ হৃদয়ে ধারণ করায় তোমার দেহ তাঁহার পদধূলি হইয়া রহিল। আমাদের পাপদেহধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামী বলিলেন, যে চরণ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহা এখনও অনুভব করিতেছি। আমার মনে হয়, তাঁহার পা দুখানা আমার হৃদয়ে আছে। স্নান করিলে কাপড়ের ও মাথার ধূলি ধুইয়া যাইবে, এই মনে হইতেছে।

যখন নাগমহাশয় আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন স্বামী প্রাতে উঠিয়া নিয়মমত তাঁহার ধ্যান করিতেন, তাঁহার নাম জপ করিতেন। তৎপর একটা গান করিতেন, বুকে ও কপালে তাঁহার নাম লিখিতেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন পর, পূর্ব্বের মত সকালে ও সন্ধ্যায় নাগমহাশয়ের ধ্যান করেন, একটা গান করেন, বুকে হাত বুলাইয়া কপালে মাখেন এবং তাহার নাম লিখেন। একদিন আমি তাঁহাকে বুকে হাত বুলাইয়া কপালে মাখিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি করিতেছ? স্বামী বলিলেন, এই বক্ষে নাগমহাশয় পা দিয়াছিলেন। এখনও সেই পদযুগল বক্ষে বিরাজ করিতেছে। তাহা হইতে ধূলি আনিয়া কপালে মাখি। তৎপর তাঁহার নাম লিখি। একদিন আমি নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার কি করা উচিত? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, গান করিতে হয়। আমি বলিলাম, সকল দিনই গান করিব? তিনি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্রাতে একটা গান করিবেন। তিনি তোমাকে অনেক করিতে বলিয়াছেন, আমাকে সুধু প্রাতে একটা গান করিতে বলিলেন। তিনি জানিতেন, আমি কি অপদার্থ। আমি সকল দিন তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিব না। সাধন ভজনে মন যাইবে না। আমার

ভক্তিহীন হৃদয়, বিশ্বাসহীন মন। তাই নিজের মান নিজে রাখিলেন। সকল দিনের মধ্যে একটা গান করিতে বলিলেন। এই জন্যই তিনি ভগবান্ ছিলেন। জীবের কাজে ভুল হয়, শিবের কাজে কি কখন ভুল আছে? আজ পর্য্যন্ত স্বামী বুকে হাত বুলাইয়া কপালে পদধূলি মাখেন, পরে তাঁহার নাম লিখেন। তাহা দেখিলে আমার মনে হয়, এখনও যেন স্বামী অনুভব করিতেছেন, তাঁহার মোক্ষদ চরণ তাঁহার বক্ষে বিদ্যমান্ আছে। নাগমহাশয় স্বামীকে সকলের তোলা মাখন বলিয়াছেন। নাগমহাশয় যে কে, স্বামী তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একটী মহৎগুণ, তিনি কখনও নাগমহাশয়কে কোন বিষয়ে কষ্ট দেন নাই। সকল সময় নাগমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, নাগমহাশয় আপনিই তাহা করিবেন। কোন কথা বলিয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দেন নাই, সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে, সকল সময় তাঁহার দিকে তাকাইয়া কাজ করিতেন। যে কাজ অন্যায মনে করিতেন, যে কাজ নাগমহাশয় বিরক্ত হইবেন ভাবিতেন, প্রাণান্তেও সেই কাজ করিতেন না। তাহার প্রমাণ, যখন আমি কুচিয়ামোড়া হইতে চলিয়া আসিলাম, আমাকে কর্কশ কথা বলিলে, তিনি মনে কষ্ট পাইবেন, সেই জন্য আমাকে একটী কথাও বলিলেন না। স্বামী ভিন্ন আমরা প্রায় সকলেই নাগমহাশয়কে অনেক কষ্ট দিয়াছি।

নাগমহাশয় ছাড়া স্বামীর কিছু ছিল না। যখন তিনি দেওভোগে আসিতেন, একমনে নাগমহাশয়কে দেখিতেন। তাঁহাকে—

কোন কথা বলিতেন না। যদি কোন বাসনা হইত, মনে মনে নাগমহাশয়কে বলিতেন। অন্তর্য্যামী নাগমহাশয় তাহা জানিয়া পূর্ণ করিতেন। নাগমহাশয় স্বামীর উপর বড় সুখী ছিলেন। সময় সময় হরপ্রসন্নবাবুকে বলিতেন, পার্ব্বতী ছেলেটী বড় শান্ত। ভগবানের সুখ দুঃখ নাই সত্য, তিনি জীবের অনন্ত দোষ ক্ষমা করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পান, জাব সীমা অতিক্রম করিতেছে, তাহাকে একবার দুষ্ করিয়া দেন। আমার কোন গুণ ছিল না। নাগমহাশয় নিজগুণে আমাকে এত স্নেহ করিয়াছেন। যে তাহা দেখিয়াছে, সেই হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, আমার উপর নাগমহাশয়ের অসীম স্নেহ প্রকাশ পাইত। আমি হৃদয়হীন জীব, স্নেহ পাইয়া মনে করিতাম, এই সুখে চিরদিন যাইবে। একবারও নাগমহাশয়ের দিকে তাকাই নাই। যাহা ইচ্ছা হইত, অবিচারিত চিত্তে তাহা করিয়াছি। এমন কি, যে নাগমহাশয় নিজে দুঃখ পাইয়া, আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মাঠাকুরাণীর এক কথায় সেই নাগমহাশয়ের উপর অভিমান করিয়া চলিয়া আসিলাম। একবার চিন্তা করিলাম না, আর কি তাঁহাকে দেখিব? যিনি স্নেহ করিয়া নিজগুণে আমাকে কোলে নিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিতে পারেন না। নাগমহাশয় জীবের কর্ম্ম ও অভিমান দেখিয়া জনমের মত আমাকে সড়াইয়া দিলেন। যিনি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া, জীবনের ভার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, নাগমহাশয় যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে সামনে রাখিয়াছিলেন। এমন কি, শেষ দিন আমার নিকট হইতে অস্থির করিয়া লইয়া গেলেন।' আমি পড়িয়া রহিলাম।' ইহার কারণ আর কিছু নয়, নাগমহাশয় তাঁহার প্রকৃত সন্তানকে টানিয়া

নিলেন। নিকৃষ্ট অভিমানী জীবকে সড়াইয়া দিলেন। ভগবান সমস্ত সহ্য করেন, অভিমান সহেন না।

স্বামীর কাজ দেখিয়া, মাঠাকুরাণীও বলিলেন, আপনি জন্মজন্মান্তরে পুত্র ছিলেন, পুত্রের কাজ করিলেন। নাগমহাশয় মাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, মেয়ে হইলেও এই, জামাই হইলেও এই। তুমি কাঁদ কেন? পরের পুত্রে পুত্রবতী ভাগ্যবতী যশোদা। যখন মাঠাকুরাণী কাঁদিয়া নাগমহাশয়েব কথা বলিলেন, তাহা শুনিযা, স্বামার সমস্ত গুণ মনে পড়িল। তিনি চলিয়া গেলেন পর, স্বামীর এমন হইয়া ছিলেন, কাহাকে কিছু বলিতেন না। কোন দিনও তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলেন নাই। আমি স্বামীকে দেখিযা, তাঁহার কাছে থাকিযা অনুভব করিয়াছি, নাগমহাশয় ছাড়িয়া গেলে তাঁহার হৃদয় হইতে যেন সব চলিয়া গিয়াছিল। থাকিতে হইবে থাকিতেন, খাইতে হইবে খাইতেন, পড়িতে হইবে পড়িতেন। মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদা নাগমহাশয়েব অভাব অনুভব করিতেন। রাত্রে শুইয়া থাকিতেন, কখন ঘুমাইতেন, কখন নাগমহাশয়কে চিন্তা করিযা অধীর হইতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইত, তিনি কি করিয়া নাগমহাশয়ের নিকট যাইতে পারিবেন, সেই চেষ্টা করিতেছেন। আমি পাষাণী, নাগমহাশয়ের এত স্নেহ পাইয়াও, তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলাম। স্বামী আমাদের মত লোক দেখাইয়া কখনও নাগমহাশয়কে ভক্তি করিতেন না, অথচ ভালবাসিতেন। নাগমহাশয় থাকিতেও যেমন তাঁহার মন ও মুখ এক ছিল, তিনি চলিয়া গেলেও তাহা সেইরূপ রহিল। শেষনবমীপূজার দিন গোয়ালা নাগমহাশয়ের বাটীতে খারাপ দধি দিয়াছিল, নাগমহাশয় ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার সময় সেই গোয়ালার

জিনিষ দিতে স্বামীর মনে আঘাত লাগিল। মাঠাকুরাণী অন্য গোয়ালা হইতে দধি লইলেন। স্বামী বিক্রমপুর হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া গোয়ালা সহ ক্ষীর নিয়া গেলেন। হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা। মনের বেদনা মনে রাখিয়া, নিয়মমত নাগমহাশয়ের সকল কাজ নিজে দেখিয়া করিলেন। তখন তিনি বিএ পড়েন, নিজের টাকা ছিল না। আমার মাতাকে বলিলেন, আপনার হাতে টাকা থাকিলে এখন আমাকে দেন, পরে পাইবেন। মাতা বলিলেন, টাকা পরে দিতে না পারিলেই বা কি? সংসারে পিতা মাতার শ্রাদ্ধে লোকে কত করে, কে এমন কার্য্য করিতে পারিবে? স্বামী মাতার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, সাধ্যমত মাঠাকুরাণীকে ফল ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়াছিলেন। ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার সময় ক্ষীর ও সামান্য টাকা মা ঠাকুরাণীকে দিয়া সংসারের হিসাবে জনমের মত নাগমহাশয়ের কাজ শেষ করিয়া রাখিলেন। নাগমহাশয়ের কাজ শেষ হইয়া গেল, স্বামীর মনে হইল, এই কয়েক দিন তাঁহার কাজের উপলক্ষ করিয়া, নানা কাজ করিয়াছি, আজ তাহাও শেষ হইয়া গেল। এখন নিজের কর্ম্ম লইয়া সংসারের জীব সংসারে রহিব।

নাগমহাশয় গিয়াছেন পর মাঠাকুরাণী কোন কাজের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে যাইয়া স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সাথে দেখা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা আপনাকে দেখিয়া নাগমহাশয়ের অভাব সহ্য করিতে পারিব না। আপনি সরু লাল পেড়ে কাপড় পড়িবেন, হাতে সোনার বালা দিবেন। মাঠাকুরাণী তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিলেন। কলিকাতা হইতে দেশে যাইয়া, সোনার বালা তৈয়ার করাইয়া

আনিলেন। নাগমহাশয়ের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার পর, তাঁহার সমাধি স্থানে নাগমহাশয়ের ফটোর পায় বালা রাখিয়া, নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া, সমাগত সকল ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালা কি হাতে দিব? যাহার যাহা মত ছিল, তিনি তাহা বলিলেন। হরপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, যদি বালা হাতে দাও, চির কাল হাতে রাখিতে হইবে। ও এই বলে, সে তাবলে বলিয়া দুই দিন এই ভাবে, চারি দিন অন্য ভাবে থাকিতে পারিবে না। মাঠাকুরাণী বলিলেন, আমিও সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কি বলিস্? আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামী একটু বিরক্ত হইলেন এবং আমার দিকে তাকাইলেন। আমি মাঠাকুরাণীকে বলিলাম, আপনি যাহা ভাল বোধ করেন, তাহা করুন। মা ঠাকুরাণী স্বামীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তিনি বলিলেন, দিলে ভালই হয়। মাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের ফটো নমস্কার করিয়া হাতে বালা পরিলেন। লাল পেড়ে কাপড় পরিধান করিলেন। হরপ্রসন্নবাবু ভক্তিভরে মা-ঠাকুরাণীকে বলিলেন, মা, তুই বাবাকে রাখিলি। স্বামী মাকে কিছু বলিলেন না, আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন, মাঠাকুরাণী বালা পরায় তাঁহার অত্যন্ত সুখ হইযাছে। মাঠাকুরাণীকে দেখিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, এখন তাহাকে দেখিলে মনে হয়, নাগমহাশয় জীবিত আছেন। আমি বলিলাম, যতটুকু সময়ের জন্য? তিনি বলিলেন, মুহূর্ত্তের তরেও চক্ষুর তৃপ্তি হইবে। তুমি বোধহয় এই জন্য চুপ করিয়া ছিলে? আমি বলিলাম, হা। আমার মনে হইয়াছিল, আপনার হাতে বালা দেখিলে কি মান করিতে পারিব, তিমি

আছেন? ইহা ভাবিয়া উত্তর দিলাম, আপনার যাহা ভাল বোধহয়, তাহা করুন। স্বামী বলিলেন, তোমার মত ভক্তের মনে কি করিয়া এমন ভাব হইল, বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে মাকে দেখিলেই নাগমহাশয়ের অভাব মনে হইত, এখন একটু ভাল হইল? স্বামীর ভক্তি দেখিয়া, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। নাগমহাশয় চলিয়া গেলে, স্বামীর হৃদয়ে কেমন একটা ভাব হইয়াছিল। যখন আমার কাছে থাকিতেন, মন খুলিয়া নাগমহাশয়ের কথা বলিতেন। আমার কাছে সব সময় থাকিতে পারিতেন না। অনেক সময়ই অন্যস্থানে থাকিতেন। যখন পড়িতে বসিতেন, নাগমহাশয়ের ফটো বুকে ঝুলাইয়া রাখিতেন, বুকে লইয়া শুইতেন। যদি কখন কোন কারণে ফটো বুকে রাখিতে পারিতেন না, তিনি অনুভব করিতেন, বুকের মধ্যে অতিশয় জ্বালা হইয়াছে। তাঁহার ফটো ধারণ করিলেই হৃদয় ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। যতদিন পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবেই থাকিতেন। পড়া শেষ হইলে, যখন কাজ পাইয়া, আমাকে লইয়া গেলেন, আবার মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নাগমহাশয়ের শেষ অবস্থায় স্বামী শরৎবাবুকে কয়েকদিন দেওভোগে দেখিয়াছিলেন। তখন সকলেই বিষাদিত মনে থাকিতেন। তাঁহার সাথে নাগমহাশয়ের কোন কথা হয় নাই, সকলেই নাগমহাশয়ের অসুখের কথা চিন্তা করিতেন। শরৎবাবু স্বামীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বামী নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, শরৎবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া সামনে রাখিতেন। তিনি যেমন মহান্, তাঁহার সকল কাজই তেমন উদার ছিল। কাহারও প্রতি তাঁহার দ্বেষ ছিল না। তিনি মনে করিতেন, নাগ-

মহাশয় সকলেরই সমান। নাগমহাশয় কাহার আপন, কাহার পর নন। নাগমহাশয় যাহাকে দয়া করিয়াছেন, তিনিই শরৎবাবুর আপন। শরৎবাবুর ভাবগুলি দেখিলে, নাগমহাশয়ের উপযুক্ত ভক্ত বলিয়া মনে হয়। নাগমহাশয়ের কথা তাঁহার মত কেহ জানে না। নাগমহাশয়ের জীবনী বাহির করিয়া জগতে অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

যখন নাগমহাশয় আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন শরৎবাবুর সঙ্গে আমার কোন কথা হয় নাই। কলিকাতা আসিয়াছি পর, অনেক দিন তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে। তিনি নাগমহাশয়ের জীবনী লিখার সময় তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। একদিন বলিলেন, তিনি নাগমহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাঁহার জীবনের কয়েকটী ঘটনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্য যতটা লোক ধরিতে পারিবে, তিনি ততটা লিখিয়া যাইবেন। যাহার ভিতর ভগবৎ ভাব আছে, সে পড়িয়াই তাহা ধরিতে পারিবে। শরৎবাবুর এই কয়েকটী কথা বেদের ন্যায় সত্য। নাগমহাশয়ের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, সাধারণ লোক তাহা আগ্রহের সহিত পড়িবে, নাগমহাশয়ের দেব চরিত্র দেখিয়া অবাক্ হইবে। আর যিনি নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ কিম্বা ভগবান্ বলিয়া মানেন, তিনিও অবাক্ হইয়া শরৎবাবুকে ধন্যবাদ দিবেন। তিনি সব কথা লিখিয়া গেলেন, কাহার নিকট উপহাসাস্পদ হইলেন না। সকলেই আগ্রহের সহিত নাগমহাশয়ের পুতচরিত্র গ্রহণ করিলেন। ইহা না হইবে কেন? যিনি নাগমহাশয়ের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন, তিনি কি আর সাধারণ মানুষ? যদি তিনি নাগমহাশয়ের বিষয় জগতকে না বুঝাইতে পারেন, তবে আর কে পারিবে?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই জীবনী পাঠ করিয়া যিনি নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ কিম্বা ভগবান্ বলিয়া জানেন, যিনি দেখিতে পাইবেন, জীবনীতে সেইভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং যিনি তাঁহাকে সাধু বলিয়া ভাবেন, তিনিও তাঁহার দেবচরিত্রের মাধুর্য্য অনুভব করিবেন। সকলেই সুখী হইয়া এই জীবনী পাঠ করিতেছেন। ধন্য নাগমহাশয়! ধন্য তাঁহার ভক্ত!

নাগমহাশয়ের জীবনী লিখিয়া ছাপাইবার পূর্ব্বে শরৎবাবু ইহার কতক অংশ আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। স্বামী বলিলেন, দাদা, তাঁহার জীবনী এইভাবে লিখিলেন? শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বল কি ভাবে লিখিব। সুরেশবাবু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, যেভাবে লিখিলে ভাল হয়, আপনি বলুন। স্বামী বলিলেন, আমি কি বলিব? শরৎবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি পণ্ডিত বলিয়া যাই, তোমরা বসিয়া শুনিতে থাক। স্বামী চুপ করিলেন। তখন আমরা বেলুড় মঠে যাইতেছিলাম। নৌকায় মাঠাকুরাণী, আমার পিতা-মাতাপ্রভৃতি অনেক লোক ছিলেন। আমি লজ্জা পাইয়া কিছু বলিলাম না। বাড়িতে আসিয়া শরৎবাবুকে একখানা চিঠি লিখিলাম। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলাম, নাগমহাশয় ভগবান ছিলেন। ভগবান্ স্বীকার করিয়া তাঁহার বিষয় লিখা যায় কি না। তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা মায়ের জাতি, কিছু বুঝিতে পার না। জগত যে ভাবে নাগমহাশয়কে ধরিতে পারিবে, আমি সেই ভাবেই লিখিয়া যাইব। তবে যাহার ভিতর ভগবৎভাব আছে, সে পড়িলেই তাহা ধরিতে পারিবে। জীবনী বাহির হইলে, স্বামী তাহা পড়িয়া বলিলেন, নাগমহাশয়ের জীবনী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেকটী চিত্র

বলিয়া দিতেছে, নাগমহাশয় ভগবান্, কিন্তু ভাষা তাহা বলিতেছে না। এমন কৌশলে লেখা হইয়াছে, যিনি নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া জানেন, তিনি এই পুস্তক পড়িলে, নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া ভগবৎভাব অনুভব করিবেন। যে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া না মানে, সে ইহা পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিবে, মানুষ কি এমন থাকে? এমন আদর্শ লোক কখন দেখি নাই। নাগমহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, শরৎবাবু যে বলিয়াছিলেন, আমি পণ্ডিত বলিয়া যাই, তোমরা বসিয়া শোন, এই কথাটী সত্য। জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, তিনি কি ভাবে নাগমহাশয়কে অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানা আমার এত ভাল লাগে, যতই পাঠ করি, ততই নাগমহাশয়ের ভাব অনুভব করিতে পারি। আজকাল অনেকেই অনেককে মহাত্মা বলিয়া লেখে। শরৎবাবু সেই ভাবে কিছু লেখেন নাই। এমন সুন্দর ভাষা, কেবল 'নাগমহাশয়' লিখিয়া যে যেমন, তাহাকে সেই ভাবে বুঝাইয়াছেন। উপরে যে সাধু নাগমহাশয় লিখিয়াছেন, তাহার এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। যখন শরৎবাবু নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া লিখিবেন না, সাধু শব্দ প্রয়োগ করায় নাগমহাশয় অন্য হইতে পৃথক হইলেন। তিনি নাগমহাশয়ের ভক্ত, মহাজ্ঞানী। কাহার সাধ্য তাঁহার কাজে ভুল দেখায়? স্বামীর কথা শুনিয়া নাগমহাশয়ের জীবনী পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম, শরৎবাবু প্রকারান্তরে নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া লিখিয়াছেন, আমি না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি কেমন সুন্দর ভাবে নাগমহাশয়কে বুঝাইলেন।

শরৎবাবুর স্ত্রী নাগমহাশয়কে ভক্তি করেন। একদিন আমি

তাঁহার বিষয় নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, মেয়েটী বড় ধন্যা। যেমন হাঁড়ি, তেমন সরা। নাগমহাশয় যাঁহার সাক্ষী দিয়াছেন, তাঁহার কথা আর বেশী কি বলিব? শরৎবাবুর স্ত্রী বড় শান্তস্বভাবা। শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাঁহাকে যেখানে রাখিতেন, তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিতে হইত, ইচ্ছা হইলেও দেওভোগ গিয়া নাগমহাশয়কে দেখিতে পারিতেন না। নাগমহাশয় তাঁহার মন জানিয়া, নিজগুণে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি শরৎবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শরৎবাবুর স্ত্রী রান্না করিয়া মনের আনন্দে নাগমহাশয়কে খাইতে দিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি এত সুখী হইয়াছিলেন যে, এখনও তাঁহার সেই কথা জাজ্বল্যমান মনে রহিয়াছে। অল্প কয়েকদিন হয়, আমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নাগমহাশয় আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আমি রান্না করিলাম, তিনি খাইলেন। ইহা শুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি নাগমহাশয়কে খাওয়াইয়া যে সুখ পাইয়াছিলেন, এখনও তাহা যেন তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। নাগমহাশয় তাঁহাদের বাড়ীতে দুই দিন ছিলেন। নাগমহাশয় ভক্তের হৃদয়ে থাকিবেনই, যে তাঁহাকে একদিন দেখিয়াছে, সে তাঁহাকে মনে করে। নাগমহাশয় সকলের আপন ছিলেন, কেহ তাঁহাকে পর মনে করে নাই।

নাগমহাশয়ের উপর সারদাপিসীর টান থাকায়, তিনি মাঠাকুরাণীকে ভাল বাসেন। নাগমহাশয় আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গেলে, যে লোক নাগমহাশকে ভক্তি করিতেন,

সারদাপিসী তাহার উপব বড় সুখী হইতেন। স্বামী ভক্তির সহিত শ্রীঠাকুরাণীকে টাকা দেন, তাহাতে তিনি তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট। তিনি লোকের নিকট বলেন, পার্ব্বতী আমার ভাইয়ের পুত্র। সে পুত্রেব কাজ কবিয়াছে। তিনি একবার আমাদিগকে দেখিতে পঞ্চসার আসিলেন। স্বামী কোন কাজ উপলক্ষে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারিদিন পঞ্চসার রহিলেন। শেষদিন তাঁহার ননদিনী তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তিনি যাওযাব সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইলাম না। পার্ব্বতী আমার ভাইয়ের পুত্র। পার্ব্বতীকে দেখিলে, আমার ভাইয়ের কথা মনে হয়। ভাইত বিবাহ করিয়া বধকে কোন সুখ দেন নাই। ভাইয়ের অভাবে বধূ যে একদিন ঘবে বসিয়া খাইবেন, ভাই তাহার যোগার রাখিয়া যান নাই। পার্ব্বতী ভাইয়ের পুত্র ছিল। ভাই তাহাকে বধকে দিয়া গিয়াছেন। সে বধকে মায়ের মত রাখিয়াছে। পার্ব্বতী বাঁচিয়া থাকুক, আমার ভায়ের নাম থাকুক। ভাতৃবধূর উপব ননদিনীর স্নেহ দেখিয়া সকল লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং বলিল, এমন না হইলে কি আর নাগমহাশয়ের সহোদরা হইতে পারেন? ভাতৃবধূর সুখে দুঃখে কোথায় ননদিনী সুখী ও দুঃখী হয়? সংসারের লোকের মত হইলে, তিনি মনে করিতেন, কেহ আমাকে নাগমহাশয়ের ভগ্নী বলিয়া দেখিতে আসে না। তাহারা বধকে কত যত্ন করে, আমার দিকে মুখ তুলিয়াও তাকায় না। আমি কেন উহাদিগকে দেখিতে যাইব? ভাতৃবধূর সুখে মান অপমান সমান বোধ করিয়া, ননদিনী উহাদিগকে দেখিয়া সুখী। ধন্য নাগমহাশয়! ধন্য তাঁহার সহোদরা!!

নাগমহাশয়ের উপর সারদাপিসীর এত টান যে, দেওভোগ গেলেই তিনি নাগমহাশয়ের অভাব অনুভব করেন। তিনি বলেন, দেওভোগ গেলে এখন আমার মন টিকে না; যেখানে বসিয়া ঠাকুর উপদেশ দিতেন, এখন সেই সব স্থান পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল ঠাকুর নাই, ঠাকুরের মিষ্ট কথা নাই। সমস্ত দেখিতে পাই, আর প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। সেই রকম মিষ্ট স্বরই কোথায় শুনিতে পাই না। বউঠাকুরাণী আমার যথেষ্ট যত্ন করেন, আমার মন ঐ বাড়ীতে থাকিতে চায় না। নাগমহাশয়ের ভক্তদের ও সারদাপিসীর মত তাঁহার উপর ভালবাসা দেখিতে পাই না। আমি একরাত্রি তাঁহার সহিত শুইয়া ছিলাম। রাত্রি ভোর হইলে, তিনি শুইয়া থাকিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'মুখেতে বল মন শ্রীদুর্গা নাম'। তাঁহার দুই গণ্ড ভাসাইয়া চক্ষের জল পড়িতে ছিল। অনেকক্ষণ শ্রীদুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই আমাকে দুর্গানাম দিয়া গিয়াছেন। আমার ভাইয়ের এমন নাম, সকলেই প্রাতে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা বলিবে। তাহারা আমার ভাইকে স্মরণ করিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া উঠিতেছে। সংসারের লোক আমার ভাইয়ের নাম নিয়া উঠিবে। ভাই নিজ নাম জগতে রাখিয়া গেলেন।

সারদাপিসী ভোরে উঠিয়া নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া কেবল দুর্গা দুর্গা বলেন। যখন তিনি আমাদের বাড়ীতে চারিদিন ছিলেন, তিনি প্রাতঃকালে কেবল দুর্গা দুর্গা বলিতেন। তাহা শুনিলে নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িত। নাগমহাশয় বলিয়াছেন, প্রাতঃকাল সত্যযুগ, এসময় ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হয়। পিসী গোপনে নাগমহাশয়ের কথা হৃদয়ে রাখিয়া পালন

করিতেছেন। তিনি কখনও কোন কথা বলেন না, কেবল একদিন নাগমহাশয়ের কথা মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, যখন শক্র (নরেন্দ্র) মরিবার সময় ঠাকুর ভাইয়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তখনই আমার মনে হইল, সে ঠাকুর ভাইকে ডাকিতেছে।

নাগমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন পর আমার এক পিসীর দেহত্যাগ হয়। তিনি বয়সে নাগমহাশয়ের ছোট ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল। ৮ দিনের জ্বরে তিনি মারা যান। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হইবে, সেদিন প্রথমে গুগু বলিয়া, থুথু ফেলিয়া নিজ জিহ্বা দংশন করিয়া রুধির বাহির করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার সাক্ষাতে ছিলেন, তাঁহারা কোন মতেই তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারিতেছেন না। বিকারগ্রস্ত রোগীর মুখেও হাত দিতে কাহার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পর কেবল কাদা বলিতে লাগিলেন। তৎপর আগুন বলিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। শত লোকের শত কথা তাঁহার কাণে পৌঁছাইতেছে না। তিনি নিজ মনে যাহা ইচ্ছা হইতে ছিল, তাহা বলিতে লাগিলেন। ভয়ে জড় সড় হইয়া কাঁদিতেছিলেন, হঠাৎ বলিলেন, ঠাকুরভাই, এসেছেন, ঘরে আসুন, বসুন্। কোথা হইতে আসিলেন? নিকটবর্ত্তী লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা চারিদিকে তাকাইয়া 'কোথায় দুর্গা' বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাই দুর্গা যে এখন সাধনার ধন হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। নৌকা করিয়া দেওভোগে গেলে দুর্গাকে দেখিতে পাইতেন, এখন

আর তাহা হওয়ার জো নাই। এখন দুর্গাকে দেখিতে হইলে, প্রাণপাত সাধনা করিতে হয়। তাঁহারা চারিদিকে তাকাইলেন, দুর্গাকে দেখিতে পাইলেন না। যিনি দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি মানসিক নয়ন ভরিয়া তাঁহার মুখ-কমল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কি বলিলেন, কেহ শুনিল না। আমার পিসী একবার হাসিয়া আবার কাঁদিয়া, শিশুছেলের হাসি ও কাঁদার মত করিয়া, দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সকলে বলিতে লাগিল, নারায়ণ আসিয়া উহাকে লইয়া গেলেন। আমার ঐ পিসীর ঘরের লোক নাগমহাশয়কে নারায়ণ বলিতেন। তাঁহার বড় ভগ্নিগণ তাঁহাকে নমস্কার দিতেন না।

মৃত্যুসময় পিসীর মুখ হইতে এত হাসি বাহির হইতে লাগিল, লোক স্তম্ভিত হইল। কোথায় গেল জিহ্বার দংশন, রক্তপাত, কাদা ও আগুন। কেবল হাসি, বনের কুসুম হইতে হাসি চুরি করিয়া, নাগমহাশয়ের চরণে অর্পণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে ইহ-ধাম ত্যাগ করিলেন। কোথায় গেলেন, যিনি অসময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া সকল জ্বালা দূর করিয়াছিলেন, তিনি জানেন। আমার পিতা বলিলেন, মৃত ব্যক্তির মুখে এমন হাসি কখনও দেখি নাই। আমি বলিলাম, উনি আমাকে বলিয়াছেন, তিনি নাগমহাশয়কে এক দিন খাওয়াইয়া ছিলেন। যদি বিদুরের এক মুষ্টি খুদের বিনিময়ে দিব্যভবন পাওয়া যায়, তাহা হইলে নাগমহাশয়কে তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইলে, তাঁহার কৃপায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে ইহা আর বেশী কি?

---

# পূজা।

আমি কয়েক দিন নির্জ্জনে, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশয়ের পূজা করিতাম। নাগমহাশয়ের শরীরের যে অংশ আনা হইয়াছিল, আমি তাহাই পূজা করিতাম। একদিন স্বামী কথায় কথায় আমার মাতাকে বলিলেন, নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ আছে, নমস্কাব করিবেন। তাহা শুনিয়া মা সুখী হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, পরের ছেলে হইলে হইবে কি, জামাতা আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। তিনি নাগমহাশয়ের শরীরের অংশের কথা বলিলেন, তুমি বল নাই। মা আমাকে বুঝাইলেন, আমি তাঁহাকে কোন কথা বলি না। তৎপর পূজা করার সময়, মা ভাত ছাড়া অন্যান্য জিনিষ নাগ-মহাশয়ের উদ্দেশে দিতেন। আমার পূজা শেষ হইলে, মাও তাঁহার পূজা করিতেন। যখন স্বামী চাকরি লইয়া স্বাধীন হইলেন, আমরা ভাত দিয়া তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলাম। যখন যাহা খাওয়া হইত, তাহা পূর্ব্বে নাগমহাশয়কে খাইতে দিয়া, প্রসাদ লইতাম। আমি পূজা আরম্ভ করিয়াই বলিলাম, আমাদের কি সাধ্য তাঁহার পূজা করি। তিনি নিজগুণে বলিয়াছিলেন, আমি রোজ তাঁহার পূজা করিব, রোজ তাঁহার কাজ করিব; একদিন কাজ করিয়া কি বসিয়া থাকিব? নচেৎ আমাদের মত মানুষ কি তাঁহার পূজা করিতে পারে? স্বামী বলিলেন, অপাত্র বলিয়া, আমার উপর তাঁহার কত দয়া ছিল। তিনি আমাদের

অন্য কি না করিলেন? পূজা করিলে ভগবানের উপর যেমন মন যায়, অন্য কোন কাজে সেইরূপ হয় না। তাহার কারণ এই, অন্য কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়। তাঁহার চিন্তা কি ধ্যান করিতে বসিলে, মনটা অন্য দিকে চলিয়া যায়। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলাম সত্য, মন যতটা পারে ফাঁকি দিয়া নেয়। পূজা করার সময় মন ফাঁকি দেয়, কিন্তু ততটা পারে না।

পূজা হইবে, রান্না করিতে গেলে খেয়াল রাখিতে হইবে, কোন জিনিষ যেন পায় না লাগে। যত কাজ করিবে, সমস্ত কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, একবার তাঁহাকে ভাবিবে। রান্না হইয়া গেল, পূজার ভাত নিতে যাইবে, লক্ষ্য করিয়া থালাখানা দেখিবে, মনে হইবে, পূজার ভাত দিব, থালা পরিষ্কার হওয়া চাই। জল দিতে যাইবে, জল ভরিতে গিয়া দেখিবে গ্লাসটী পরিষ্কার কি না। পূজার সমস্ত জিনিষ লইয়া, যখন পূজা করিতে বসিবে, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন ও অন্যান্য পূজোপহার, একটা করিয়া হউক, কিম্বা হাত ভরিয়াই হউক, পূজায় মন না থাকিলেও ভগবানের চরণে দিতে হইবে। ইহা হইতে পারে না যে, পূজা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কাহার মন বাজে কথায় অথবা অন্যায় চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। কোন সময় মন বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গণ মন দিয়া তাঁহার রূপ দেখিবে এবং তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিবে। পূজা হইলে পর, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রত্যেকটী জিনিষ দেখাইয়া বলিতে হইবে, ভগবন্, তোমাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে, প্রভু, তুমি দয়া করিয়া খাও, এই বলিয়া তাঁহার রূপ চিন্তা করিয়া অনুভব করিতে হইবে, তিনি আসিয়া, যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা খাইতেছেন।

এমন ভাবে মন রাখিতে হইবে, যেন তুমি অনুভব করিতেছ, তিনি হাঁতে ধরিয়া মুখে দিতেছেন। পূজা করিতে বসিয়া এই ভাবে তাঁহাকে খাইতে দিবে, মন খুব কম সময় বাজে চিন্তা করিতে পারিবে। আমার মতে, ভগবানকে মনে রাখিতে হইলে, পূজাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূজার সময় যে ভাবে হউক ভগবানে মন রাখিতে হইবে।

সংসারের সকল কাজই করিতে হইবে। না খাইয়া থাকিতে পারিবে না। অন্ততঃ নিজের খাওয়ার জন্য সমস্ত কাজ করিতে হইবে। তবে তাঁহার পূজা থাকিলে, সংসারের কাজ করিতে গিয়াও প্রত্যেকটা কাজে তাঁহার কথা মনে পড়িবে। ভোরে উঠিয়াই পূজার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে, পূজার বাসন ধুইতে হইবে। ঠাকুর শুইয়া রহিলেন, তাঁহাকে উঠাইয়া একছিলুম তামাক দিতে হইবে। তাঁহাকে তামাক দিয়া, ফুল-চন্দন প্রভৃতি একত্র করিয়া পুষ্পপাত্র সাজাইতে হইবে। রান্না করিতে গেলে, মনে হইবে রান্না করিয়া পূজা করিব এবং তাহার পর খাইব। আফিসের তাড়াতেও তাঁহার কথা মনে পড়িবে। রান্না হইলে, পূজার সমস্ত ঠিক করিয়া, পূজা করিবে, তৎপর যাহার যে কাজ তাহা করিতে পারিবে। যাহার বিশ্রাম করিবার অবসর আছে, সে বিশ্রাম করিবে। বিকাল বেলা মনে পড়িবে, ঠাকুর শুইয়া আছেন, তাঁহাকে উঠাইতে হইবে, জল খাবার কিছু দিতে হইবে। তাঁহাকে উঠাইয়া খাবার দিয়া, তাঁহার জন্য আবার রান্না করিতে হইবে। সন্ধ্যা হইলে, অমনি মনে হইবে, তাঁহার সাক্ষাতে ধূপ, বাতি দিতে হইবে। আরত্রিক হইলে, জপ ধ্যান করিতে বসিবে। খাওয়ার সময় হইলে, আবার মনে পড়িবে, অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া

তাঁহার পূজা করিব। এইরূপে সকল দিন পূজার কাজে নিয়োজিত থাকিবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মন কতক সময়ের জন্য সংসারের চিন্তার ভিতরে তাঁহার বিষয় ভাবিবে। তাঁহাকে ভাবিলে সংসারের ভাবনা কমিয়া যাইবে, কারণ যথা রাম, তথা নাহি কাম, যথা কাম, তথা নাহি রাম, দিবস রজনী নাহি এক ঠাম। আবার খাইতে বসিলে, জল কি ভাত পড়িলে মনে হইবে, তাঁহার প্রসাদ যেন পায় না লাগে। খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে মনে রাখিতে পারিবে। ঠাকুরঘরে আসিয়া শোবার সময় একবার তাঁহাকে নমস্কার করিতে হইবে। এইরূপে প্রাতঃকালে উঠা হইতে আবার শোয়া পর্য্যন্ত, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সব কাজেই তাঁহাকে মনে করিতে পারিবে। যদি পূজা না থাকিত, সকল কাজই করিতে হইত, সকলদিন ভূতের বেগার দিতে হইত, সয়তানের পায় মাথা কুটিতে হইত। আমরা কি আর তাঁহাকে স্মরণ করিতাম? সকালে উঠিতাম, ইয়ারকি দিতাম, রান্না হইলে খাইতাম, অফিসে চলিয়া যাইতাম। এই ভাবেই দিন কাটিত।

নিয়ম থাকা ভাল। পূজা করায় সংসারের সকল কাজেই ভগবানকে স্মরণ করিতে পারিবে। জীব কখনও না ঠেকিলে তাঁহাকে স্মরণ করে না। পূজা আছে বলিয়াই, একটা ঠেকা আছে। পূজা না করিয়া খাইতে পারিব না। ক্ষুধায় কাতর হইলে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, খাওয়ার পূর্ব্বে ফুল-বিল্বপত্রাদি পূজোপকরণ লইয়া পূজা করিতে হইবে। পূজা না করিলে উপায় নাই। সুতরাং পূজায় যেমন ভগবানে মন যায়, সংসার-দগ্ধ জীবের মন আর অন্য কোন রকমে সেইরূপ যায় না।

৯-২ নাগমহাশয়ও বলিয়াছেন, নিয়ম থাকা ভাল। এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, এক মুসলমান সন্ধ্যার সময় পীরের ঘরে বাতি দিত। একদা সঙ্গদোষে সে এক বেশ্যাবাড়ী যায়। ইহাই তাহার জীবনে প্রথম পাপপথে যাওয়া। নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া, যখন রমণীর সঙ্গ করিতে যাইবে, সন্ধ্যা হইল। তাহা দেখিয়া পীরের ঘরে বাতি দেওয়ার কথা মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বাতি দিল। পীরের ঘরে বাতি দেওয়ায় তাহার চৈতন্য হইল। সে ভাবিতে লাগিল, সে কি জঘন্য কাজ করিতেছিল। আজ পীর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। নাগমহাশয় বলিলেন, সন্ধ্যার সময় পীরের ঘরে বাতি দেওয়া নিয়ম করিয়াছিল বলিয়া মুসলমানটী পাপ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিল না। সুতরাং নিয়ম রাখা ভাল। যদি কেহ ভগবানের জন্য পাজলে নাবে, ভগবান্ তাহার জন্য গলাজলে নাবেন। প্রতিসন্ধায় পীরের ঘরে একটী বাতি দিয়া, যদি লোক নরকে পড়িয়া উঠিয়া যায়, তবে আমরা এমন ভগবানকে নিয়ম মত পূজা করিয়া, তাঁহার চরণে স্থান পাইব না কেন?

স্বামীর ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, নাগমহাশয় সাধে কি তোমার এত প্রশংসা করিয়াছেন। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বীর পুরুষটী। উহাকে নারায়ণের মত দেখিবে। কোন কথা মনে উঠিলে উহাকে বলিবে। এক সময় আমার মন অকারণে নানা বিষয়ে ঘুরিত; তাঁহাতে মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমি তাঁহাকে এই কথা বলিলাম। নাগমহাশয় বলিলেন, তোমার চিন্তা কি? উহার কাছে বল। আমি তোমার নিকট সকল কথা বলিলাম, তুমি তাঁহাকে তাঁহা

বলিতে বলিলে। তখন আমার জ্ঞান হইল, তিনিই ত আমার মুক্তিদাতা। আমি তাহা ভুলিয়া অনর্থক চিন্তা করিতেছিলাম। তিনি আমাকে নির্ব্বোধ দেখিয়া, তোমাকে সকল কথা বলিতে বলিয়াছিলেন। তিনি সব জানিতেন। তিনি দেখিলেন আমি অতিশয় মূর্খ, পথে পথে বাথার জন্য একজনকে দেখাইয়া যাওয়া দরকার। আমার অভাবে অনেক দিন থাকিতে হইবে, তখন নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিলে, কে দেখিবে? তোমার ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া, তাঁহার সকল কথা স্মরণ পথে আসিতেছে। যিনি নরক হইতে উদ্ধার করেন, তিনি নারায়ণ। যিনি নারায়ণ পাইবার পথ দেখাইয়া দেন, তিনিও নারায়ণ। তোমার ভক্তিপূর্ণ পূজার বিধিতে অনেকের মঙ্গল হইবে। তুমি সত্য বলিয়াছ, জীব কি না ঠেকিলে, ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পূজা করে, কিম্বা তাঁহাকে মনে করে? নাগমহাশয় বলিয়াছেন, পাঁচ ইন্দ্রিয় পাঁচটী সুখের জন্য লালায়িত। চক্ষু রহিয়াছে কোথায় সুন্দর বস্তু দেখিবে, নাসিকা চায় কোথায় সুগন্ধ পাইবে, কর্ণ উৎকর্ণ থাকে কোথায় কে প্রশংসা করে, জিহ্বা সুস্বাদ লইতেই ব্যস্ত, ত্বক্ সুখস্পর্শের জন্য পাগল। জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দৌড়াইতেছে। যখন যেইটী সুবিধা পায় ভোগ করে। তাহার মন মুহূর্ত্তের তরেও ভগবানের জন্য লালায়িত হইতে পারে না। নাগমহাশয় এই সব জানিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, একদিন পূজার কাজ করিয়া কি বসিয়া থাকিব? আমি রোজ তাঁহার পূজা করিব। তিনি ভগবান, তাই এক কথায় আমাকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার মুখ হইতে ভক্তিপূর্ণ পূজার বিধি বাহির করিলেন।

আমাদের উপর তাঁহার অসীম দয়া। তাঁহাকে মনে রাখার জন্য পূজা দিয়া গেলেন। নিয়মের অধীন না থাকিলে, আমি কি তাঁহাকে মনে রাখিতে পারিতাম? স্বামীর পূজার বিধি শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। কাজেও তাহা হইল। প্রাতে উঠা অবধি শোয়া পর্য্যন্ত সকল কাজেই আমার দয়াল দুর্গাচরণের কথা মনে পড়িতে লাগিল। সাংসারের সকল কাজ তাঁহাকে মনে করিয়া দিতে লাগিল।

এই ভাবে পূজা করিতেছি। এক দিন স্বামী নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ খুলিয়া ধূপ দিয়া আবার অতিশয় যত্ন করিয়া কৌটায় ভরিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল। যখন জন্মিয়াছি, এক দিন মরিতে হইবে। যাহার নাশ নাই, তিনি দেহ ধারণ করিয়া দেহ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। জীবের ত কোন স্থিরতাই নাই। আসা যাওয়া স্বাভাবিক। আমাদের অভাবে কে এমন অমূল্য জিনিষ যত্ন করিয়া রাখিবে? স্বামী পূজা করিয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে ইহা বলিলাম। তাহা শুনিয়া, তিনি বলিলেন, তোমার এই ভাব ভাল নয়। আমি দেখিতে পাই, এভাবে সংসারে আরও বন্দিনী হইবে। কি ছিলে, কি হইয়াছ। যাহা হউক, নাগমহাশয় আমাকে সন্তান বলিয়া অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাই আমার প্রতি তোমার মন ঘুড়াইয়া রাখিয়া গেলেন। যত দিন জীবিত থাকিব, তুমি আমাকে তাঁহার কথা শুনাইবে। ইচ্ছা করিলেও আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। উভয় উভয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, বিনা ঝঞ্ঝাটে সংসারে থাকিব। তোমার ভাবানুসারে দেখিতে পাই, ভগবান্ তোমাকে সন্তান দিবেন; সন্তান হইলে আরও

বন্ধনের কারণ হইবে। যখন সংসারের কোন ভাব ছিল না, তাঁহাকে ভালবাসিতে, মনে করিয়া দেখ, কত সুখে ছিলে; কোন চিন্তা ছিল না, ভাবনা হৃদয়ে স্থান পাইত না। কর্ম্মভোগ আছে, আমাকে ভালবাসিয়া, ধীরে ধীরে সংসারের সকল ভাব আসিল। সেই সুখ, সেই স্বাধীনতা আর রহিল না। এমন কি তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া থাকিয়াও আমার অভাব অনুভব করিতে। তিনি মনের ভাব জানিয়া সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইতেন, কলেজ ছুটি হইলেই আসিবে। যখন আমি তোমাকে নাগমহাশয়ের নিকট রাখিয়া ঢাকা যাইতাম, তোমার ভাব দেখিয়া আমার কষ্ট হইত। তুমি তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু জানিতে না, সেই তুমি তাঁহার সামনে বসিয়া আমার অভাবে কষ্ট পাও। তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া আমাকে ভুলিতে পার নাই। পরের মুহূর্ত্তে মনে করিতাম, সকলই তাঁহার ইচ্ছা। আমার সুখের জন্যই তিনি এভাবে তোমার মন ঘুড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দয়ার হেতু নাই। তুমি আমাকে পাইয়া, নাগমহাশয়কে ভুলিয়া সংসারে রহিয়াছ। তোমার পূর্ব্বের ভাব থাকিলে নাগমাশয় চলিয়া গেলে কখনও এই ভাবে থাকিতে পারিতে না। যাহা হউক, সকলই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতেন, কিসে আমাদের সুখ হয়। নাগমহাশয় অনেক সময় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, যাহার একুল আছে, তাহার ওকুলও আছে।

আরও নাগমহাশয়ের দয়া দেখ। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিয়া গিয়াছেন, উহাকে কষ্ট দিবেন না। ইহা শুধু তাঁহার দয়া। আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিতাম না। আমাকে সংসার করিতেই হইত। ভাল মন্দ কর্ম্মের দায়ী হইয়া

বিশেষরূপে বন্দী হইতাম, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া আমার হাত ধরায়, সকলই আমার গৌরবের বিষয় হইল। দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আমি তাঁহার কথায় সংসারে আছি। তাঁহার কৃপায় পাপ কাজ করিতে পারিব না। তিনি আমাকে কুস্থানে রাখিবেন না। তিনি যে স্থানে রাখিয়া গেলেন, সেই স্থান স্বর্গ। যে কয়েক দিন হয় স্বর্গসুখ ভোগ করিব, পরে তাঁহার রাতুল-চরণে স্থান পাইব। যতদিন জীবিত থাকিব, দুইজনে স্বাধীন-ভাবে তাঁহার কথা বলিব, তাঁহার পূজা করিব, সুখে রহিব। সন্তান হইলে, নানামত চিন্তা, নানা রকম কাজ করিতে হইবে, এই স্বাধীনতা থাকিবে না। আমাকে লইয়া বন্দিনী হইয়াছ, তখন ইহা অপেক্ষা অধিক বন্দিনী হইতে হইবে। যাঁহাকে দেবতাগণ খুঁজিয়া যত্ন করিতে পারেন না, জীব তাঁহাকে কি যত্নে রাখিবে? তিনি আমাদের কাছে রহিলেন, ইহা শুধু তাঁহার দয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইবে পারেন। তাঁহার যত্নের অভাব, না থাকার অভাব?

স্বামীর কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, সন্তানের দ্বারা লোক বন্দী হয়, তাহা আমি জানি। সন্তান হইবে মনে করিয়া, আমি এই কথা বলি নাই। জানি না কেন তোমাকে কৌটা খুলিতে দেখিয়া, এই কথা মনে হইল। তোমার কথা শুনিয়া নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তোমাকে তাহা বলিয়াছি, তোমার মনে আছে কিনা জানি না। একদিন দুর্গাপূজার সময়, নাগমহাশয় একটী আগুনের পাতিল হাতে করিয়া আমাকে বলিলেন, আগুন দাও। আমি আগুন আনিতেছি, একজন লোক হরপ্রসন্নবাবুর স্ত্রী মনে করিয়া আমাকে খোকার মা বলিলেন। আমি তাঁহার দিকে

তাকাইয়া বলিলাম, আমি খোকার মা নই। নাগমহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এবুড়ার মা। আমি পাতিলে আগুন দিতেছি। নাগমহাশয়কে সামনে দেখিয়া, আমার মনে হইল, তাঁহার সামনে আগুন দিব না। তিনি একটু সড়িয়া দাড়াইলেন। আমি পাতিলে আগুন রাখিলাম। তিনি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ও খোকার মা না, বুড়ার মা। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মন কেমন হইয়া গেল। তাঁহার বাক্য বেদবাক্য, কখনও মিথ্যা হইবে না। তিনি একবার বলিয়া শেষ করিলেন না। এক কথা দুইবার বলিলেন। তিনি কেন দুইবার বলিলেন? স্বামী কি ভাবিতে লাগিলেন, জানি না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ভগবানের কি ইচ্ছা, জীব তাহা কি করিয়া বুঝিবে? সেই স্নানেই ঋতু বন্ধ হইল। তখন স্বামী বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়াই আমার মনে হইয়াছিল, ভগবান্ সন্তান দিবেন।

কালক্রমে দুইটী পুত্র হইল। স্বামী নাগমহাশয়কে স্মরণ রাখিতে, একটীর নাম রাখিলেন দুর্গদাস, অপরটীর নাম দুর্গাপদ। তাহারা বড় হইয়া নাগমহাশয়ের অনেক মাহাত্ম্য দেখিয়াছে। সংসার করিতে হইলে, সকল সময় সকল জিনিষ ঘরে রাখা যায় না, তাহা সকলেরই জানা আছে। স্বামী অফিস হইতে আসিয়া মিশ্রির সরবৎ পান করিতেন। বিকাল বেলা ঠাকুর তুলিয়া এক গ্লাস সরবৎ দিতাম এবং স্বামীর জন্য রাখিতাম। একদিন এমন হইল, ঘরে একটী পয়সা ছিল না। মিশ্রি আনা হয় নাই। স্বামী অফিসে ছিলেন। ঠাকুর উঠাইবার সময় হইল, কি করি? জল খাওয়ার জিনিষের সাথে এক গ্লাস জল দিয়া ঠাকুর পূজা করিলাম। স্বামী আসিলেন। খাবারের থালা তাঁহার সামনে রাখিয়া

বলিলাম, আজ মিশ্রি আনিতে পারি নাই, সরবৎ হয় নাই। স্বামীকে খাইতে দিয়া, আমি কোন কাজ বশতঃ অন্যত্র চলিয়া গেলাম। তিনি জল পান করিতে করিতে আমাকে ডাকিলেন। হাতের কাজ ফেলিয়া গেলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, একটু জল পান করিয়া দেখ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? স্বামী বলিলেন, আগে পান কর, পরে বলিব। আমি সেই জল সরবতের চেয়ে বেশী মিষ্ট অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন, 'এই কি জল? ইহা এই রকম মিষ্ট হইল কি করিয়া? তুমি কোন মিষ্ট দিয়াছিলে কি? স্বামীর মুখ গম্ভীর হইল। দুইজনে নাগমহাশয়কে স্মরণ করিতে লাগিলাম। গ্লাসের অবশিষ্টজল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। উহার রং জলের মত নয়। মনে হইল কোন জিনিষ জলে পড়িয়াছে। নিকটে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। গ্লাসে যেমন জল দিয়া ছিলাম, তেমনই রহিয়াছে। নাগমহাশয় জল মিষ্ট করিলেন। স্বামী তাঁহার দয়া দেখিয়া ভাবের ঘোরে অবশিষ্ট জলটুকু খাইলেন। দুর্গাপদের বয়স ৪বৎসর ছিল, সে বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিল। তাহা দেখিয়া, আমার মনে কষ্ট হইল। স্বামীকে বলিলাম, উহারা এমন ভগবানকে দেখিতে পাইল না। আমরা এক সময় তাঁহাকে দেখিয়াছি, মহাপ্রসাদ খাইয়াছি। উহাদিগের জন্য এমন প্রসাদ রাখা উচিত ছিল। স্বামীর খেয়াল হইল। তিনি বলিলেন হাঁ, রাখা উচিত ছিল। এখন আর কি করি? যাহা করিয়াছি, তাহা আর না হইবার নয়। আমরা এই কথা বলিতেছি, এমন সময় দুর্গাদাস বেড়াইয়া আসিল। সে বলিল, মা কি হইয়াছে? আমি সমস্ত কথা বলিলাম। তখন তাহারি বয়স

৮ বৎসর, সে বিশেষ কিছু বুঝিল না। কেবল বলিল, আমাকে দিলে না? স্বামী বলিলেন, ভাল ভাবে তাঁহার ছবির চিন্তা কর, তিনি দয়া করিয়া কলের জল সুমিষ্ট করিয়া দিবেন।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে ধূপ বাতি দিয়া সকলেই তাঁহার ধ্যান-জপ করিতে বসিতাম। আমাদের ভাব দেখিয়া, ছেলেরা কি একটা বুঝিল। তাহারাও আমাদের সঙ্গে চক্ষু মুদিয়া বসিত। তাহাদেব বিশ্বাস দৃঢ় করিতে আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, দেখেছ, তাঁহার ইচ্ছায় কলের জল মিষ্ট হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে দেখাও দিতে পারেন। ছেলেরা মনে কি বুঝিল, তাহা জানি না। তাহাব পর হইতে তাহারা রীতিমত আমাদের সঙ্গে ধ্যান-জপ করিতে বসিত, মনোযোগের সহিত তাঁহার পূজা করিত। কতক দিন পর আবার বিশেষ কারণে খাবারের সহিত এক গ্লাস জল দিয়া বিকাল বেলা ঠাকুর তুলিলাম। লোভ পাইয়াছি কিনা? সেই দিন পূজা করিয়া উঠিয়াই জলের প্রতি লক্ষ্য করিলাম। দেখিতে পাইলাম, জল ঈষৎ লাল হইয়াছে। তাহা হইতে সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ঘরে গোলাপ ফুল ছিল না। জল দেখিয়া নাগমহাশয়ের দয়ার কথা মনে পড়িল।। আমি মনে বলিলাম, বাবা, যখন তুমি সংসারে ছিলে, আমাকে স্নেহ করিয়া কত দেখাইতে, তোমার অন্য ভক্ত তাহা ধারণা করিতে পারে না। সংসার ছাড়িয়া গিয়াও পাষাণীকে স্নেহ করিয়া, অসম্ভব সম্ভব করিয়া দেখাইতেছ। বাবা, তাই একদিন তোমার সন্তান আমাকে বলিয়াছিলেন, সকলের শেষ আছে, ভক্তিরও শেষ আছে। ভগবানের দয়ার শেষ নাই। বাবা, তোমার সন্তানের

মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, প্রকারান্তরে তোমারই বাক্য।

স্বামী ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কখন তিনি আসিবেন, কখন তাঁহাকে নাগমহাশয়ের মহিমা বলিয়া সুখী হইব। স্বামী আসিলেন। হাত-মুখ ধোয়া হইলে, জলের গ্লাস তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, আজ জল পান করিয়া দেখ, ইহা কেমন হইয়াছে? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কেন, আজও কি তিনি কলের জল মিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন? স্বামী তাহা পান করিয়া বলিলেন, আজ কলের জল সরবৎ করিয়া শেষ হয় নাই, ইহা হইতে প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার কত দয়া! আমাদের উপর তাঁহার এমন কৃপা!! তুমি ঠিক বলিয়াছিলে, ভগবান্ গুণ দেখিয়া ধরেন না, আবার দোষ দেখিয়া ছাড়িয়া দেন না। নচেৎ আমাদের মত অপাত্রে এখনও তাঁহার এত দয়া কেন? তুমি ইহা পান কর এবং ছেলেদিগকে দাও। সেই দিন সকলেই ইচ্ছামত তাঁহার প্রসাদ নিলাম। নাগমহাশয়ের দয়ায় যে অনেক হইতে পারে, তাহা বিশদভাবে ছেলেদিগকে বলিলাম। তাহা শুনিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নাগমহাশয় ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। দুর্গাদাস মিষ্ট জল খাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা, তিনি কোথায় মিষ্ট পাইলেন? আমি বলিলাম, তাঁহার ইচ্ছায় সকল হইতে পারে। এই জন্যইত তোমাদিগকে বলি, যখন চক্ষু বুজিয়া তাঁহার নাম করিতে বসিবে, ফটোতে যেরূপ দেখিতে পাও, সেই রূপ মনে রাখিও, তাহা হইলে তিনি দেখা দিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষরূপে দেখা দিতে পারেন।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণকুমার যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন নাগমহাশয় শয্যাশায়ী হইলেন। যে দিন সে আতুর ঘর হইতে বাহির হইল, সেই দিন ঠাকুর চলিয়া গেলেন। তজ্জন্য আমি নারায়ণকে ভালভাবে দেখিতে পারিতাম না। এমন কি ছোট সময় তাহাকে কোলে নিতাম না। সময় সময় মা ও ভগ্নি-দিগকে বলিতাম, এ বড় হতভাগা। পিতা তাহা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া মুখ মলিন করিতেন। তাহার বয়স দেড় বৎসর হইল, আধ-আধ কথা বলিতে পারিত। আমরা যখন ঠাকুরের পূজা করিতাম, সে তাকাইয়া সমস্ত দেখিত। আমরা ঘরের বাহিরে আসিলে, সে ঠাকুরঘরে যাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিত। কতটুক সময় ঘরে থাকিয়া বাহিরে যাইয়া, স্বামীকে বলিত, আমি শ্রীদুর্গাচরণের লগে উরা উরি (সঙ্গে হুড়া হুড়ি) করিয়া আসিলাম। শ্রীদুর্গাচরণ আমাকে এ ভাবে ফেলিতে পারে না, ওভাবে ফেলিতে পারে না, আপনি আমাকে ফেলিতে পারেন। তাহা শুনিয়া স্বামীর চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিত। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, ওকি বিস্ময়কর কথা বলে। সে যে ভাবে বলে, মনে হয় যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া, হুড়াহুড়ি করিয়া আসিল। তাঁহাকে না দেখিয়া, দেড় বৎসরের ছেলে বানাইয়া এমন কথা বলিতে পারে না। জীবের উপর তাঁহার অসীম দয়া। কাহাকে কি ভাবে দয়া করিবেন, কে জানে? আমি স্বামীকে বলিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে এই কথা তোমাকে বলিতে গেল কেন? আমাকেও ত বলিতে পারিত, মাতার নিকটও ত বলিতে পারিত। বাড়ীতে ত অনেক লোকই আছে। সে কাহার কাছে কোন কথা বলে না। তিনি বলিলেন, বুদ্ধি

সে আর বড় হইত, মনে করিতাম, আমার মন রক্ষা কবিতে মিথ্যা কথা বলিতেছে। এমন শিশু, ভালমত কথা বলিতে পারে না। সে কি করিয়া এমন মিথ্যা কথা বলিবে? নারায়ণ কুমার ৪।৫ দিন এই কথা বলিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া ছেলেদের বিশ্বাস হইল, নাগমহাশয় ইচ্ছা করিলে দেখা দিতে পারেন, তিনি সকল করিতে পারেন। তিনি ভগবান। লেখা-পড়া করার মত তাঁহার পূজা ও তাঁহার নামজপ দৈনিক কাজ মনে করিত। ভগবানের কৃপায়, আমাদিগকে যেমন তাঁহার ধ্যান ও নাম জপ করিতে দেখিত, ছেলেরা তেমন করিতে আরম্ভ করিল। ছুটির দিনে যদি পূজা করিতে দেরি হইত, তাহারা ১২।১ টা পর্য্যন্ত না খাইয়া থাকিত।

যখন নাগমহাশয় আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহার কাছে বড় সুখে ছিলাম। ছাড়িয়া যাইবার সময় তিনি দয়া করিয়া তাঁহার পূজা দিয়া গেলেন, তাই ছেলেদিগকে সহজে তাঁহার কথা বুঝাইতে পারিলাম। নচেৎ আমরা কোন মতে তাহা-দিগকে এত সহজে তাঁহার বিষয় বুঝাইতে পারিতাম না। তিনি আমাদের কাছে থাকার সময় স্নেহ করিয়া অনন্ত সুখ দিয়াছেন, যখন দেখিলেন আমাদের কর্ম্মদোষে তাঁহাকে হারাইতে চলিয়াছি, পরে আমরা থাকিব, যাহাতে আমাদের কষ্ট আসিতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহার পূজা করিয়া আমরা যে কত সুখে আছি, আমবা বুঝিতেছি। তাঁহার পূজা করিয়া যে কত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতেছি, তাহা আমরা জানি। যাহারা আমাদিগকে জানেন, তাহারাও তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। তাঁহার পূজা করার ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে একবারে

ভুলিয়া থাকিতে পারি না। যে কাজ তাঁহাকে মনে করিয়া দেয়, সেই কাজই কাজ, অন্য কাজ ভূতের বেগার দেওয়া। আমাদের আশা, জগত নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া মানুক, তাঁহার পূজা করুক; যে তাঁহার পূজা করিবে, সে ইহকাল ও পরকালে সুখে থাকিবে। অন্য লোকে তাঁহাব পূজা করিলে আমরা সুখী হই। এ অবস্থায় যদি নিজের সন্তান তাঁহাকে না জানিত, কত অশান্তি পাইতাম। সেই অশান্তি ঘুচাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পূজা দিয়াছেন। তাহাকে বুঝাইবার জন্য কলের জল সরবৎ বানাইয়া দিলেন। এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিয়া, ছেলেরা নাগমহাশয়ের অসীম ক্ষমতা বুঝিল এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইল। পূজা করিয়া আমরা সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আছি। নাগমহাশয় আড়ালে থাকিয়া, দয়া করিয়া, আমাদিগকে যে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি। ভোরের সময় ঠাকুর উঠাইয়া, তাঁহাকে এক ছিলুম তামাক দিয়া, স্বামী এমন আনন্দ অনুভব করেন; তাঁহার মনে হয় যেন নাগমহাশয় তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন ও সেবন করেন। নাগমহাশয় যে ভাবে গায় চাদর রাখিতেন, সেই ভাবে চাদর জড়াইয়া বসিয়া তামাক খাইতে দেখিয়া স্বামী তাঁহার পায় মাথা রাখার মত করিয়া তাঁহার বিছানায় পড়িয়া নমস্কার করেন। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাতে ঠাকুর উঠাইয়া তামাক না দিতে পারেন, সেই দিন স্বামী বড় অশান্তি পান, অকারণ কোন একটা যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ভয়ে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, স্বামী প্রাতে তাঁহাকে উঠান ও তামাক দেন। যদি আমি সকাল বেলা উঠিয়া

তাঁহার ধ্যান ও নাম জপ না করিয়া কোন কাজে হাত দেই, কাজ ত সফল হয় না, দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং যন্ত্রণার হাত এড়াইতে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক অল্প সময়ের জন্য ঠাকুরের নাম করি, তাঁহার উপদেশ মনে করি।

ছেলেরা বড় হইল। দুর্গাদাস সকালে উঠিয়া তাঁহার হুঁকায় জল ভরিয়া দিত। কয়েক দিন কি হইয়াছিল, সেই হুঁকার জল না ভরিয়া, তাঁহার নাম লইয়া পড়িতে বসিত। ৩।৪ দিন এই ভাবে গেল। বৈকালে বেড়াইতে যাইয়া কেবল ব্যথা পাইয়া আসে। চতুর্থদিন এমন হইল, চলন্ত ট্রামে উঠিয়া, লাফাইয়া নামিতে যাইয়া, পড়িয়া গেল, শরীরের অনেক স্থানে ক্ষত হইল। অনেক রক্তপাত হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম, কোন ভয় নাই। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, নচেৎ ট্রামের নীচে পড়িলে, রক্ষা ছিল না। দুর্গাদাসকে সান্ত্বনা করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হইতেছে। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সে নিশ্চয় প্রাণীহত্যা করিয়াছিল, নতুবা এই রকম সাজা পাইবে কেন? উহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে অস্বীকার করিল। তখন আমার মনে পড়িল, সে চারিদিন যাবত ঠাকুরের হুঁকায় জল ভরে না; তাই এমন হইয়াছে। স্বামীকে তাহা বলিলাম। ঠাকুরের দয়া দেখিয়া উভয়ে সুখী হইলাম। আমাদের মনে হইল, ভগবান্ কান ধরিয়া তাঁহার কাজ করাইয়া নিবেন। ইহার পর দুর্গাদাস রোজ তাঁহার হুঁকায় জল ভরিয়া রাখে। দুর্গাপদ বড় হইয়া ঠাকুরের হুঁকায় জল ভরিতে চাহিল। আমি নিয়ম করিলাম, দুর্গাদাস হুঁকায় জল ভরা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কষ্ট পাইয়াছে, সে রোজ তাহা করিবে। দুর্গাপদ সন্ধ্যার

সময় তাঁহাকে ধূপ বাতি দিবে। সেই দিন হইতে সে সন্ধ্যা হইলে বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরকে ধূপ বাতি দেয়। বেড়াইতে যাইয়া, খেলায় মত্ত হইয়া, দুর্গাপদও ২।৩ দিন ধূপ বাতি দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। সে দুর্গাদাসের মত ব্যাথা পাইতে লাগিল। তৃতীয় দিন এমন ভাবে আঘাত লাগিল যে, অল্পের জন্য তাঁহার চক্ষু বাচিল। ডাণ্ডা খেলার গুটি ছুটিয়া আসিয়া, চক্ষের উপর পাতায় পড়িল। কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের ধূপ বাতি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়াছ, সেই পাপে এই কষ্ট পাইলে। নাগমহাশয় কান ধরিয়া সকলকে কাজ করাইয়া নিতেছেন দেখিয়া, আমরা বড় সুখী হইলাম। সেই দিন হইতে, দুর্গাপদ সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের ধূপ বাতি দেয়। পরীক্ষা কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কাজ থাকিলেও সন্ধ্যার সময় কোথায়ও থাকে না।

সন্তান দুইটী সম্পদে বিপদে নাগমহাশয়কে স্মরণ করে। তাহারা নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়া, অনেক কাজে সাফল্য লাভ করিয়াছে। উহারা নাগমহাশয়কে দেখে নাই, উদ্দেশে তাঁহাকে স্মরণ করে। সময় সময় মনে প্রাণে ফটোতে তাঁহার ছবি দেখে। নাগমহাশয়কে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া ভক্তি করে। ইহাতে আমরা উভয়ই অতিশয় সুখী, কারণ আমরা ও নাগমহাশয়কে ভগবান্ বলিয়া মনে করি। তাহারা যে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে, ইহা অপেক্ষা আমাদের সুখের বিষয় সংসারে নাই। নাগমহাশয় সময় সময় বলিতেন, সঙ্গগুণে রংধরে। তাঁহার উপর ছেলেদের ভক্তি দেখিয়া, আমি বলিলাম, নাগমহাশয় সকল প্রাণীকে স্নেহ করিতেন। তোমরা কখনও

প্রাণী হত্যা করিও না। প্রাণীহত্যা করিলে, নাগমহাশকে অবজ্ঞা করা হইবে। তিনি রুষ্ট হইবেন; কারণ কেহ নাগমহাশয়ের আপন কিম্বা পর নাই। সকলই তাঁহার সমান। তিনি সকল দেখিতে পান, সকল শুনিতে পান। এমন কি তিনি পিপিলিকার পায়ের শব্দও শুনিতে পান। অতলজলে ডুবিয়া থাকিলেও নাগমহাশয় দেখিতে পান। তোমরা মনে করিও না, আমার অসাক্ষাতে প্রাণীহত্যা করিলে, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে। আমি দেখিব না সত্য, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইবেন। তোমরা প্রাণীকে যেরূপ কষ্ট দিবে, নাগমহাশয়ের নিয়মানুসারে তোমরা সেইরূপ কষ্ট পাইবে। তিনি যে কাজে বিরক্ত হইতেন, কদাচ সেই কাজ করিও না। মিথ্যা কথা, কুলোকের সঙ্গে মিশা নাগমহাশয় ভালবাসিতেন না। তোমরা যতদূর পার, নাগমহাশকে মনে রাখিবে এবং তাঁহার নিয়মের অধীন থাকিবে। যদি তিনি তোমাদের উপর সদয় থাকেন, তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু যদি অন্যায় করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত কর, তোমাদের সুখ হইবে না। নাগমহাশয়ের কৃপায় ছেলেরা নাগমহাশয়ের উপদেশ গ্রহণ করিল।

যখন নাগমহাশয় আমাদের মধ্য ছিলেন, তাঁহার সকল কাজ অলৌকিক দেখিয়াছি। এখন তাঁহার পূজার ভিন্ন মত মাহাত্ম্য দেখিতেছি। এক হাঁড়িতে ভাত রাঁধা হয়, এক কড়াইয়ে তরকারী রান্না হয়। নাগমহাশয়ের প্রসাদের ভাত ও তরকারির যে রূপ সুস্বাদু হয়, হাঁড়ির অন্য ভাত কিম্বা অবশিষ্ট তরকারির স্বাদ সেই রূপ হয় না। আমরা উহা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যখন কলের জল সুমিষ্ট সরবৎ হয়, সেই- তুলনায়

ইহা নিশ্চয়ই সামান্য। নাগমহাশয়ের আরও মহিমা দেখিয়াছি, যে স্থানে তাঁহার পূজা হয়, কখন কখন সেই স্থানে এমন সুগন্ধ বাহির হয়, অন্য কোন সুগন্ধের সহিত তাহার তুলনা হয় না। নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ যে বাক্সে রাখিয়াছি, গভীর রাত্রিতে তাহার ভিতর গড় গড় শব্দ হইত। আমরা সেই শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত ছেলেরা তাহা শুনে নাই। তাহাদের ভাগ্যে বোধহয় শুনা হইবে না, কারণ তাহারা বড় হইয়াছে পর আর সেই শব্দ শুনিতে পাই না। কদাচিৎ গভীর রাত্রিতে আস্তে আস্তে দুই একটা শব্দ হয়। তিনি ধরা না দিলে, জীব কি তাঁহাকে ধরিতে পারে? নাগমহাশয়ের অপার মহিমা। স্বামী তাঁহার শরীর অংশ যতটুকু আনিয়াছিলেন, এখন উহা ততটুকু নাই, সামান্য বড় হইয়াছে। যখন ছেলেরা ছোট ছিল, তাহা বাড়িয়া ছিল। তাহারা বড় হইয়াছে পর, আর বাড়ে নাই। স্বামী কখন কখন কৌটা খুলিয়া তাহা দেখেন, ধুপ দেন, সকলের কপালে ছোঁয়াইয়া নমস্কার করান, তখন আমরা সকলেই দেখিতে পাই। কয়েক বৎসর যাবৎ দেখিতেছি, তাহা এক ভাবেই আছে। আমরা নাগমহাশয়ের শরীরের অংশ পূজা করি। তাহা আনা হইলে, এক সময় উহা এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়া মনে করিতাম, শীঘ্রই বড় কৌটার দরকার হইবে। একবার আমি হাসিতে হাসিতে বলিয়া ছিলাম, দিন দিন বড় হইলে কোন্ কৌটায় রাখিবে? আবার বলিলাম, যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, নিজগুণে আমাদের কাছে থাকিবেন। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন, তিনি আমাদের নিকট আছেন? আমরা অকৃতজ্ঞ সন্তান, তাই তিনি নিজগুণে কৃপা-

প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের উপর তাঁহার দয়ার কি সীমা আছে? কেমন করিয়া তাঁহার শরীরের অংশ বড় হয়, তাহা দেখি নাই। কৌটাতে রাখিয়াছি, কৌটা খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহা যেমন ছিল, তখন তেমন নাই, ইহা অপেক্ষাকৃত একটু বড় হইয়াছি। এই কথাতে অবিশ্বাসের কিছু দেখিতে পাই না। কারণ, যদি মুনি দুর্ব্বাসার বাক্যে পুরুষের পেটে মুসল হইতে পারে, সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ কৌটায় থাকিয়া বাড়িবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার কাজ অনন্ত, তিনি অনন্তরূপে লীলা করিতেছেন। কে জানে, তিনি কোথায় কোনরূপ লীলা করিবেন? তাঁহার লীলা বুঝা ভার। তিনি নিজগুণে যাহাকে যে ভাবে দেখাদেন, সে সেই ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায়। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

একদিন পূজা করিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় একটা সুগন্ধ বাহির হইল, সেই সৌরভে মন প্রাণ অকর্ষণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে মনে হইল, ইহা নাগমহাশয়ের দেহে যে সুগন্ধ ছিল, তাহার মত। অমনি ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলাম, তোরা শীঘ্র এখানে আয়, নাগমহাশয়ের দেহে যে সুগন্ধ ছিল. তাহা পাবি এখন। শুনামাত্র ছেলেরা চলিয়া আসিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই গন্ধ পাইল না। তাহার আসিলেই তাহা লোপ পাইয়া গেল। ছেলেরা হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল, মা, ঠাকুর ত বড় দুষ্ট। তিনি তোমার নিকট আসিয়া ছিলেন, আমাদিগকে দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম, তোমাদের অদৃষ্টে নাই, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে না। ঠাকুরকে ভক্তি করিয়া নমস্কার কর, একদিন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে,

তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, কেবল গন্ধ পাইয়া ছিলাম। তাহাও কম নয়। যাঁহার বাতাসে জীব পবিত্র হয়, তাঁহার গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারিলে, জীবের হৃদয়-গ্রন্থী আপনিই খুলিয়া যায়। অনেক দিন গত হইয়া গিয়াছে, আমি সেই আঘ্রাণ ভুলিয়া ছিলাম, তাই তিনি দয়া করিয়া পাবণীব হৃদয়ে সেই গন্ধ জাগাইয়া দিলেন। তাহার পর আর একদিন পূজা করার সময় নাগমহাশয়ের শরীরের গন্ধ পাইলাম। পূজা শেষ হইল পরও কতটুকু সময় তাহা ছিল। সেই দিন আর ছেলেদিগকে ডাকিলাম না। নিজেই তাহা অনুভব করিলাম। এক রবিবার স্বামী ও আমি শুইয়া আছি, নাগমহাশয়ের সৌরভে ঘর আমোদিত হইল, ছেলেদিগকে ডাকিলাম, তাহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহা লোপ পাইল। তাহারা দৌড়াইয়া আসিয়া তাহা পাইল না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সেই গন্ধ পাইয়াছেন কি না। স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি পাইয়াছি। তুমি পাগলিনী, তুমি তাঁহার গায়ের গন্ধ পাইয়াছ বলিয়া সকলেই তাহা পাইবে।

আমরা অনেক সময় নাগমহাশয়ের মাহাত্ম্য অনুভব করিতেছি। যে তিথিতে নাগমহাশয় আমাকে দেখিতে পঞ্চসার গিয়াছিলেন, সেই তিথিতে একবার পূজা করিয়া চরণামৃত নিতেছি, এক মধুর স্বাদ পাওয়া গেল। তাহা হইতে তীব্র আতরের গন্ধ বাহির হইতেছে। যে বেলপাতা ও ফুল কৌটার উপর ছিল, তাহাতেও আতরের গন্ধ ছিল। এমন সুন্দর আতরের গন্ধ জীবনে কখনও পাই নাই।

পূজার ফুল ও বেলপাতায় কত মাহাত্ম্য। যখন দুর্গাদাসের বয়স তিন মাস, এক রাত্রিতে সে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল

এবং ঘুমের মধ্যে কেবল শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর সকলে বিপদ গণিতে আরম্ভ করিল। পিতা মলিন মুখে বলিলেন, গভীর রাত্রিতে কি করা যায়? আমি বলিলাম, কি করিবেন? যদি সে ভয় পাইয়া থাকে, আমি নাগমহাশয়ের ফটো উহার চক্ষের উপর ধরি, কোন মতে তাঁহার ছবি একবার দেখিলেই ভাল হইয়া যাইবে। আমি নাগমহাশয়কে নমস্কার করিয়া, তাঁহার ছবি দুর্গাদাসের চক্ষের উপর ধরিলাম। প্রথমতঃ সে তাকাইল না। অনেক সময় পর একবার ছবির দিকে চাহিল। আরও ২।৩ বার তাকাইয়া সহজ অবস্থায় আসিল। শান্ত ভাবে ঘুমাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া পিতা অতিশয় সুখী হইলেন। তাঁহার মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। সেদিন দুর্গাদাস ভাল হইল সত্য, অনেক রাত্রিতে সে চিৎকার করিয়া উঠিত। নাগমহাশয়ের নাম করিলে সে শান্ত হইত। যত দিন কথা বলিতে পারিত না, আমি নাগমহাশয়ের নাম করিতাম। জ্ঞান হইলে আমি তাহাকে ঠাকুরের নাম করিতে বলিতাম। ঠাকুরের নাম বলিয়া ভাল হইয়া থাকিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ বাড়িতে লাগিল। বড় হইলে, সে চিৎকার করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানা হইতে উঠিয়া, ঘরের বাহির হইয়া যাইত। একদিন আমরা ঘুমাইয়াছি, দুর্গাদাস চিৎকার করিয়া সকল ঘর ঘুড়িতেছে। আমি জাগিয়া তাহার কাণে ঠাকুরের নাম বলিতে লাগিলাম। ঠাকুরের নাম বলায়, সে পাগলের মত আমাকে মারিতে আসিল। স্বামী জোর করিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন এবং ঠাকুরের নাম বলিতে লাগিলেন। দুর্গাদাস অনেক সময় পরে শান্ত হইল। ইহার পর এমন হইল, চিৎকার করা মাত্র ঠাকুরের নাম না করিলে,

সে সহজে শান্ত হইত না। তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে অনেক সময় লাগিত।

দুর্গাদাসের এই অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য লোক বলিতে লাগিলেন, ইহা ভাল নয়। ছেলের বার বৎসর বয়স হইয়াছে, তুমি আর কত দিন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিতে পারিবে? তোমাদের অসাক্ষাতে কখন বাহির হইয়া যাইবে, কেহ জানিবেও না। স্বামী এক সিদ্ধাইকে জানিতেন। সেই সিদ্ধাই বলিলেন, অষ্ট ধাতুর একটী তাবিজ শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারে তৈয়ার করিয়া আনিবেন, আমি ঔষধ দিব। তাহা শুনিয়া আমি স্বামীকে বলিলাম, অত গোলমাল কে করিবে? এক কাজ করা যাউক, দুর্গাদাস শুইতে যাওয়ার পূর্ব্বে ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া ঠাকুর পূজার ফুল কিম্বা বেলপাতা দ্বারা বুকে ঠাকুরের নাম লিখিয়া, ফুল কিম্বা বেল পাতা মাথায় রাখিয়া শুইয়া থাকুক। আমার বিশ্বাস ইহাতে সে ভাল হইয়া যাইবে। তদনুসারে সে ঠাকুরের নাম লিখিয়া শুইতে লাগিল। তাহার আর কোন রোগ নাই। সে ভাল হইল, এখন তাহার বয়স ২০বৎসর, সে এক দিনও আব চিৎকার করিয়া উঠে নাই। আমরা নাগমহাশয়ের পূজার মাহাত্ম্য দেখিয়া, তাঁহার দয়া স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম। স্বামী বলিলেন, নাগমহাশয়ের কি দয়া! আমরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পূজা করি না। পূজা না করিলে যন্ত্রণা পাইব, বিপদে পড়িব ভাবিয়া যে তাঁহার পূজা করি, অনিচ্ছায় সহিত যে ফুল বেলপাতা দেওয়া হয়, তাহাও তিনি গ্রহণ করেন। সেই ফুল কিম্বা বেলপাতা দ্বারা দুর্গাদাস ভাল হওয়ায় তাহার প্রমাণ হইল। যদি আমরা ভক্তি ভাবে তাঁহার পূজা করিতাম, তাঁহাকে নিশ্চই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম।

নাগমহাশয়ের শরীরে সুগন্ধ তাঁহার স্নেহ আবার হৃদয়ে জগাইয়া দিল। যখন নাগমহাশয় ছিলেন, তাঁহার স্নেহমাখা অট্টহাসির কথা বলিয়া আনন্দিত মনে হাসিয়াছি। এখন সেই স্নেহ মনে হইলে হা হতোস্মি করি! বাবা দুর্গাচরণ, তোমার এমন স্নেহ পাইয়া, কি করিয়া তোমাকে ২৩ বৎসর ভুলিয়া রহিলাম। তোমার স্নেহে তোমাকে দেখিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারি নাই এখন সেই ফল ভোগ করিতেছি। তোমার দয়ার শেষ নাই, তুমি দয়া করিয়া আরালে থাকিয়া আমাদিগকে স্নেহের সহিত দেখিতেছ। আমাদের এমন কর্ম্ম, তোমার এত দয়া থাকিতেও তোমাকে পূর্ব্বের মত দেখিতেছি না। বাবা দুর্গাচরণ, তুমি আমাদিগকে পাষাণ জনিয়াও দয়া করিয়া পূজা করাইতেছ। পূজা করিতে হইবে বলিয়া, তোমাকে ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় একবার মনে করিতেছি। যখন পূজার কাজ করি, ফুল, চন্দন, তুলসী পাতা পুষ্পপাত্রে রাখি, কোন কোন দিন বিশেষ আকারের তুলসী পাতা দেখিয়া নাগমহাশয়ের বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটী মনে করি।

ছোট বেলায় যখন আমার বয়স ৮।৯ বৎসর ছিল, যখন আমি দেওভোগ যাই নাই, নাগমহাশয়কে দেখি নাই, সে সময় নাগমহাশয়ের কেমন একটী ভাব হৃদয়ে জাগিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, এই কি সেই শ্বেত জবার আভা, যাহা আমার হৃদয়ে গুপ্তভাবে জাগিয়া ছিল? ভয় পাইয়া, নাগমহাশয়ের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া শান্তি পাইয়া তাঁহাকে মনে করিয়া তুলসীতলা বসিয়া থাকিতাম, তখন কখন কখন এমত তুলসীপাতা পাইতাম, যাহার মাথা থেঁত, যেন দুইটী পাতা জোড়া লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া নাগমহাশয়ের বামপদের

কনিষ্ঠ অঙ্গুলির কথা মনে পড়ায় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। কাহাকে কোন কথা বলিতাম না। আমার মনে হইত নাগ-মহাশয়ের পদচিহ্ন তুলসীপাতায় আছে। একদিন রাত্রিতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দুইটী অঙ্গুলি একত্র হওয়ায় জোড়ার মত দেখায় কেন? তিনি বলিলেন, ভগবান্ জীবের উপর দয়া করিয়া সংসারে আসিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে, যদি আমরা তাঁহাকে মনে রাখিতে না পারি, তজ্জন্য তিনি একটী অঙ্গুলি বেশী আনিয়াছেন। সমস্ত ভুলিয়া গেলেও, ঐ জোড়া অঙ্গুলি সহ পা খানা মনে পড়িবে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে বড় সুখ হইল। তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন। অঙ্গুলিটী ভিন্ন মত হইয়াছে বলিয়াইত আমরা আলোচনা করিতেছি। উহা ভিন্ন মত হওয়ায় সকলেই একবার দেখিয়া অঙ্গুলিটী মনে রাখে। স্বামীকে নাগমহাশয়ের পায়ের অঙ্গুলির মত জোড়া তুলসীপাতার কথা কখনও বলি নাই। নাগমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন পর যখন ফুল চন্দন তুলসী পাতা দ্বারা তাঁহার পূজাকরি, একদিন সেইরূপ তুলসীপাতা লইয়া স্বামীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি, এইরূপ কি ছিল? স্বামী আগ্রহের সহিত পাতাটী হাতে নিয়া দেখিয়া বলিলেন, নাগমহাশয়ের বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি এইরূপ ছিল। পাতাটী দেখিলে নাগমহাশয়ের পায়ের কথা মনে হওয়ায় স্বামীর ও আমার মন এক হইয়া গেল। পূজা করিতে বসিয়া, ঐরূপ তুলসী পাতা পাইলে তাঁহার বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কল্পনা করিয়া চন্দন সহ অঞ্জলি দেই। নাগমহাশয়ের এত দয়া, আমরা যে ভাবে অঞ্জলি দেই না কেন;-তিনি নিজগুণে তাহা গ্রহণ করেন।

আমার মাতার শরীরে এমন ঘা হইয়া ছিল, সর্ব্বাঙ্গ গলিতে লাগিয়া ছিল। ডাক্তার ও কবিরাজের ঔষধে উপকার না পাইয়া, তিনি এক সিদ্ধাইয়ের নিকট যান। সেই সিদ্ধাই মাকে বলিল, পাঁচ মাস কোন ঔষধ খাইবে না। ঔষধের পরিবর্ত্তে যেখানে নারায়ণের চরণামৃত পাইবে, তাহা খাইবে এবং ঘায় দিবে। যে অঙ্গে চরণামৃত দিতে পারিবে না, তথায় জল নেকড়া দিবে। পাঁচ মাস ঔষধ খাইতে পারিবেন না শুনিয়া, মা ভয় পাইলেন। অন্য কোন উপায় ছিল না। ডাক্তার ও কবিরাজের ঔষধে কোন ফল হয় নাই। নিরুপায় হইয়া নাগমহাশয়ের পূজা করিয়া, চরণামৃত খাইতে এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। যে স্থানে চরণামৃত দেওয়া অন্যায়, তথায় জল নেকড়া দিলেন। ঘা শুকাইয়া গেল। সকল লোক মাকে ভাল হইতে দেখিয়া, সিদ্ধাইকে বিশেষ ক্ষমতাশালী মনে করিল। স্বামী তাহা শুনিয়া বলিলেন, সিদ্ধাইয়ের ক্ষমতা আছে, ভাল করিয়াছে। কিন্তু তিনি ভাল হইলেন, নারায়ণের চরণামৃত শরীরে মাখিয়া ও খাইয়া। নাগমহাশয়ের চরণামৃত নিতে বলা হয় নাই। যাহার চরণামৃত লইয়া তোমার মা ভাল হইলেন, তিনি নারায়ণ।

নাগমহাশয় এখনও আড়ালে থাকিয়া আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। আমি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকি। এক সময় আমার খুব অসুখ হইয়াছিল। অনেক কাল প্লীহা ও লিবারের জ্বর ভোগ করিয়াছি। অসুখ হেতু সময় সময় ঋতু বন্ধ হইত। একবার নয় মাস হইয়া যাইতেছে, পেট ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিতেছে। বড় বড় ডাক্তার দেখান হইল। কেহ বলিতে পারিল না যে, আমার নয় মাসের গর্ভ। একদিন

আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমার মনে বড় ভয় হইল। মাঠাকুরাণীর শাপের কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। আমি নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রে সামান্য প্রসব ব্যথা বোধ হইল। নাগমহাশয়ের কৃপায় অতিশয় অসুস্থ শরীরে একটী কন্যা প্রসব হইল। প্রসব বেদনা জনিত কষ্ট একবারেই অনুভব করিলাম না। তাহা দেখিয়া পাড়ার রমণীগণ স্তম্ভিত হইলেন। আমি নাগমহাশয়ের দয়া স্মরণ করিয়া, মনের আবেগে বলিলাম, আমাদের যে ঠাকুর আছেন, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রসব যাতনা যে কত কষ্টপ্রদ, তাহা সকল রমণীই জানেন। আমার এই কথাটী তাহাদের প্রাণে লাগিল। যে সকল রমণী আমার নিকট আসিতেন, তাহারা প্রথমই নাগমহাশয়ের ছবি প্রণাম করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, তোমাদের এমন প্রত্যক্ষ ঠাকুর, তোমাদের আবার ভয় কি ?

---

# নাগমহাশয় কি জীব ?

নাগমহাশয় দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া ছিলেন। তাঁহার যাহা ছিল, তাহা লইয়া জীবকে ভালবাসিতেন। ছোট সময় মুখের গ্রাস অপরকে দিয়া, স্থধুমুখে বসিয়া থাকিতেন। কুকুর বিড়াল ডাকিলে, তিনি মনে করিতেন, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। জীবের কষ্ট নিজের কষ্ট বলিয়া অনুভব করিতেন, নিজের অভাব ভুলিয়া যাইতেন। কিশোর বয়সে অন্যান্য লোকের সাথে মাছ ধরিতে যাইতেন, মাছ ধরিয়া আনিয়া নিজের পুকুরে ছাড়িয়া দিতেন। মাছের কষ্ট দূর করিতে নিজে অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করিতেন। যৌবনকালে পক্ষীসকলের চিৎকার, আহত পক্ষীর সজল নয়ন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি কোন কথা না ভাবিয়া, প্রাণঘাতী বন্দুকের সম্মুখীন হইলেন। ধীবর-করগত মৎস্যের উল্লম্ফন তাঁহার হৃদয় অভিভূত করিল। বৃদ্ধ বয়সে যতদিন তিনি দেওভোগে ছিলেন, প্রাণপাত যাতনা স্বীকার করিয়া পুকুর হইতে পুকুরান্তরে মৎস্য ধরিয়া লইয়া যাইতেন; দেহের দিকে না চাহিয়া, অবিরত পরিশ্রম করিয়া, যাহারা তাঁহার বাড়ীতে যাইত, তাহাদের সেবা করিতেন; দুর্দ্দমনীয় শূলের ব্যথায় ধরাশায়ী হইয়াও লোকের সেবা হইবে না ভাবিয়া মলিন হইতেন। যিনি এই সমস্ত করিয়াছেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

নাগমহাশয়ের বয়স ১৮ বৎসর। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর বয়স ১৫ বৎসর। আমরা সকলেই নিজকে জানি। তাঁহার এই স্ত্রী

ননদিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, উঁনি কেমন মানুষ ? নাগমহাশয়ের ঠাকুর মা অসুস্থ হইলে, তিনি নিজ হাতে মল মূত্র ফেলিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া, মাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, তাঁহার সংসারের সকল জ্ঞানই আছে, তবে এমন কেন ? যখন নাগমহাশয় দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর, মাঠাকুরাণী যুবতী। দুইজন একত্র থাকেন, এক বিছানায় এক বালিশে শোন, মনে কোন বিকারের লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। মাঠাকুরাণী বলেন, তিনি অগ্নি বুকে করিয়া রহিয়াছেন, একদিনের তরেও দগ্ধ হন নাই। স্ত্রী স্বামীর নিকট অনেক আশা করে, অনেক রকম কথা বলিতে চায়। নাগমহাশয় প্রত্যেক কথার উত্তরে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের কথা বলিয়াছেন কিম্বা ভাগবত পাঠ করিয়া স্ত্রীকে শুনাইয়াছেন। যুবতী স্ত্রীর তাহা কেন ভাল লাগিবে ? সময়ে সব হয়। সময়ানুসারে তিনি রক্তমাংসের দেহের সুখভোগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। নাগমহাশয় কিছুতেই তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। দেবতা চিরকালই দেবতা। তিনি অক্ষত দেহে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মাঠাকুরাণীর মন অন্তদিকে নিতে চাহিয়া নিজ মস্তক পাষাণে আঘাত করিয়াছেন, রক্তপাত করিয়াছেন, মাঠাকুরাণীর মন ঘোরে নাই। মাঠাকুরাণী প্রাণ-পাত করিতে রাজি হইলেন। প্রাণ দিয়া প্রাণ পাইলেন। তিনি নাগমহাশয়ের আশীর্ব্বাদে নূতন জীবন পাইলেন, তাঁহার যথার্থ সহধর্ম্মিনী হইলেন। তখন নাগমহাশয়ের বয়স ২৮।২৯ বৎসর। যিনি ইহা করিতে পারিয়াছেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

নাগমহাশয় বলিয়াছেন, যে সন্দেশ খায় নাই, সে বলিতে পারে না, সন্দেশের কেমন আস্বাদ। সুতরাং সে খাইতে চায় না। জীব কৌতূহলপরবশ হইয়া কি না করে? যাহা সে জানে না, যাহার কথা কোন দিন শুনে নাই, তাহার অনুসন্ধানেও অগ্রসর হয়। যাহা তাহার সম্মুখে অবস্থিত, যাহার বিষয় লোক এত জানে, তাহা সে ভোগ করিতে চাহিবে না কেন? বিহার জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। দেবতাদেরও সঙ্গমের ইচ্ছা হয়। উদ্বেলিত মনের পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। বসন্ত সখার অব্যর্থ লক্ষ্য কেহ এড়াইতে পারে না, কুসুমপেলব সম্মোহন সকলের হৃদয়তন্ত্রিতে ঝঙ্কার উঠায়, তাহা কাহারও দোষ নয়। রক্তমাংসের শরীরে তাহা সম্ভবে। সুরম্যভবন যাঁহার শ্মশান, হাড়ের মালা যাঁহার অঙ্গে মণিমুক্তা খচিত আভরণের স্থান অধিকার করিয়াছে, চিতাভস্ম যাঁহার অঙ্গরাগ, ধ্যানস্তিমিত-লোচন যাঁহার সৌন্দর্য্য, পরমাত্মাসঙ্গমে যাঁহার আনন্দ, সেই দেবদেব মহাদেব মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অধৈর্য্য। পঞ্চমুখে বেদ পাঠ করিয়াও যাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটে না, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, স্তরে স্তরে মানব, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা তাহা সুসজ্জিত করিয়া যাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, যিনি সয়ম্ভূ, জগৎযোনী, সেই ব্রহ্মা মন্মথশরাঘাতে স্বীয় মানস কন্যার পশ্চাৎ দৌড়াইয়া ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ত স্বয়ং কন্দর্পদেব। অঘটন ঘটিয়ান্ মারকার্ম্মুক যে যাইতে পারে এমন স্থান নাই। তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ। কিন্তু নাগমহাশয় কামপিড়িতা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বুকে লইয়া শুইয়াছেন। মদন তাঁহাকে শিশু ভাবিয়া, বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত হইয়া, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নাগমহাশয় যে শিশু, সেই শিশুই রহিয়াছেন। জীব কি এমন শিশু হইতে পারে? এই নাগ মহাশয় কি জীব?

দেবাসুরের সংগ্রাম ত লাগিয়াই আছে। দেবতা পরাজিত, ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া, যখন বাড়ীঘর ছাড়িয়া পালাইয়া যান, তখন অবতীর্ণ হন। ভগবান অবতীর্ণ হইয়া, অসুর বধ করেন, দেবতাদিগকে স্বপদে স্থাপন করেন। ইহাই হইল দেবাসুর সংগ্রাম। কাম বড় অসুর। কামের মত অসুর আর দেহীর নাই। এ অসুরকে কেহ বশে আনিতে পারে না। বধ করাত সুদুরপরাহত!. নাগমহাশয় এই অসুরকে পরাজয় করিয়া, তাহার অস্তিত্ব শূন্য করিলেন। সে তাঁহার দেহে ত স্থান পাইলই না, সহধর্ম্মিনীর দেহেও তাহাকে বিনাশ করিলেন। যিনি ইহা করিয়াছেন, সেই নাগ মহাশয় কি জীব?

ভগবান্ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, একটী স্থান প্রাচার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। একটী লোক কৌতূহল পরবশ হইয়া যে কোনমতে হউক, প্রাচীরের উপর যাইয়া উঁকি মারিলেন এবং হো হো করিয়া প্রাচীরের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন। তাহাকে সেই ভাবে পড়িতে দেখিয়া, আর একজন লোক প্রাচীরের উপর উঠিলেন, তিনিও সেইরূপ লাফাইয়া পড়িলেন। ক্রমে আরও কয়েকটী লোক প্রাচীরের উপর উঠিলেন এবং অপর পারে পড়িলেন। একটী লোক প্রাচীরের উপর উঠিয়া, বেশ করিয়া তাকাইয়া, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন এবং চারিধারের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোরা কে দেখিবি রে আয়। আনন্দের খনি পাইয়া, কে লুটিয়া নিবি আয়। অনন্ত আনন্দের খনি পাইয়া দয়াপরবশ হইয়া, অসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া, যিনি নামিয়া

আসিলেন এবং সংসারাবদ্ধ জীবদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ইনি দয়ালু ভগবান্। নাগমহাশয় পরমহংসদেবের নিকটে গেলেন এবং আনন্দের খনি পাইলেন। মনের মত আনন্দ লুটিতে লুটিতে আনন্দে বিলীন হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া, জীবের মঙ্গল সাধন করিতে, তাহাদিগকে অমৃতের অধিকারী বানাইতে সংসাররূপ নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন, ইচ্ছা পতিত, বিপথ-গামী মানব ধরিয়া তুলিবেন। যিনি জীবের জন্য ঈদৃশ সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

পরমহংসদেব কাহাকে বলিতেন, কাঠের পুতুলেও স্ত্রীলোকের ছবি দেখিবি না। তোদের যাহা ইচ্ছা, তা কর্, কিন্তু স্ত্রীলোকের ত্রিসীমানায় যাস্ না ; এক হাত পুরু গদিতে বসাইব। অথচ তিনি নাগমহাশয়কে সংসারে থাকিতে বলিলেন। নাগমহাশয়ের যুবতী স্ত্রী ঘরে আছে, তাঁহার কাছে থাকিলে কোন দোষ হইবে না। নাগমহাশয় পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাকিবেন। সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যিনি সংসারে এমন ভাবে নির্লিপ্ত রহিয়াছিলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

পরমহংসদেব আরও বলিয়াছেন, কালীর ঘরে যত সাবধানেই থাক না কেন, গায় কালী লাগিবেই। নাগমহাশয় আজন্ম কালীর ঘরে রহিলেন, সদ্যস্নাত তুষারধবল দেহ লইয়া ঘরের বাহির হইলেন, বিন্দুমাত্র কালী গায় লাগিল না। যিনি এমনভাবে সংসারে রহিলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

পরমহংসদেবের আমলকি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হইল। সেই সময় আমলকি পাওয়া যায় না। তখন তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিলেন, পরমহংসদেব কাহাকেও আমলকি আনিতে

বলিলেন না। নাগমহাশয় তাঁহার নিকট গেলে, আমলকি দ্বারা মুখ ধোয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নাগমহাশয় কোথা হইতে একটী আমলকি আনিয়া দিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার অসাধারণ শক্তি জানিতেন, লোকের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। যাঁহার এমন শক্তি ছিল, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

অনন্তকাল যাবৎ সৃষ্টি হইযাছে। অনন্তকাল যাবৎ দেবপূজা হয় এবং চিরকালই প্রসাদ লওয়া হয। নাগমহাশয় পরমহংস-দেবের প্রসাদ পাইয়া, যাহার উপর প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল, সেই পাতা সমেত প্রসাদ খাইলেন। বিন্দুমাত্র প্রসাদ ফেলিলেন না। যিনি এমনভাবে প্রসাদ লইলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

পরমহংসদেবের নিকট অনেক সিদ্ধাই গিয়াছেন। অনেক সিদ্ধাই তাঁহার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, কেহ পারেন নাই। পরমহংসদেব কাহারও প্রভূত ক্ষমতা স্বীকার করেন নাই। নাগমহাশয়কে তাঁহার ব্যাধি সারাইতে বলিলেন। সদাসত্যবাক্‌শীল তাহা ভাল করিয়া দিতে পারেন বলিয়া নিজ শরীরে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে তাহা করিতে মানা করিলেন। যিনি নিজ শরীরে অপরের রোগ আনিতে পারেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

আমার বয়স বার বৎসর। কি এক ভয় পাইলাম, ফিটের উপর ফিট্ হইতে লাগিল। কখন দম ছাড়িতে পারিতাম, কখন তাহা পারিতাম না। পিতামাতা সাশ্রুনয়নে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন এবং মনে করিতেছেন, এই দমই শেষ হইবে। নাগমহাশয় কোথা হইতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, দেওভোগ হইতে,

কিম্বা কলিকাতা হইতে ? তিনি আমা দ্বারা কি এক মানসিক যজ্ঞ করাইলেন। আমি নবজীবন পাইলাম। আজও পিতামাতা তাহা মনে করিতে পারেন, আমি কি বলিয়াছিলাম এবং কি করিয়াছিলাম। যিনি এইভাবে আমাকে রক্ষা করিলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

নূতন জীবন পাইয়া, তুলসীতলা বসিয়া, যখন নাগমহাশয়ের কথা মনে করিতাম, তিনি দেখা দিতেন, আপনা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিতাম এবং সময় সময় কত কথাই না বলিয়াছি। যিনি ইহা করিতে পারিতেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

কখন হঠাৎ নাগমহাশয়কে দেখিয়া সমিপবর্ত্তী আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জ্যেঠামহাশয় কি এখানে আসিয়াছেন ? তখন আমার বয়স ১২ বৎসর, বিবেচনার শক্তি ছিল না, বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহারা এদিকে ওদিকে তাকাইয়াছে, হতাশমনে আপনার কাজ করিয়াছে। যিনি এইরূপ দেখা দিয়াছেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

একবার স্বামী নাগমহাশয়কে তাহাদের বাড়ীতে দেখিয়া, কয়েক দিনের জন্য বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। সংসারের তাণ্ডব নৃত্য তিনি দেখিতে পান নাই। ভীষণ কলরব তাঁহার কর্ণ কুহরে পশিতে পারে নাই। তিনি আপন মনে পড়িয়া থাকিতেন এবং সর্ব্বদা নাগমহাশয়কে দেখিতেন। যিনি এই ভাবে দেখা দিতে পারেন এবং যাহাকে দেখিলে জীবের হৃদয়-গ্রন্থী ছিড়িয়া যায়, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

বড় হইয়া যখন আমি হৃদয়ে জ্বালা পাইতাম, যখন সংসারের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলাম, নাগমহাশয়ের নিকট তাহা বলিয়া

শান্তি পাইতাম। জ্বালা হৃদয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। এমন কি দূরে থাকিয়াও যদি ত্রিতাপে অভিভূত হইতাম, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহারে উদ্দেশে সকল কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি, বিমলানন্দ পাইয়াছি। তাঁহার সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে কোন অবস্থায় আমাকে জ্বালায় জড়িত করিতে পারে নাই। তাঁহার অসীম দয়ায় আমি কোন ভাবেই অশান্তি ভোগ করি নাই। যাঁহাকে বলিলে অথবা যাঁহাকে মনে করিলে ত্রিতাপের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

নাগমহাশয় বলিতেন, কুলোকের সঙ্গে মিশা, কুলোকের চিন্তা করা দোষ। যদি আমি লোকের সাথে বেশী মিশামিশি করি, কিম্বা অনেক সময় বসিয়া মায়াপুরাণ বলি, আমার মনে ঘোর অশান্তি আসে, শরীর বড়ই অসুস্থ হয়। নাগমহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার রূপ চিন্তা করিলে, এদায় হইতে রক্ষা পাই। তখন আমার মনে হয়, তিনি দয়া করিয়া, আমাকে হুঁষ করিয়া দিতে শাসন করিতেছেন। তাঁহার নিকট নতশিরে ক্ষমা চাই। তাঁহার দয়া দেখিয়া মনে হয়, তিনি আমাকে প্রতিপদে ধরিয়া রহিয়াছেন। যিনি এই প্রকার ধরিয়া থাকেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

নাগমহাশয়কে কোন কথা বলিতে হইত না। কোন কথা মনে উঠা মাত্র, তিনি তাহার জবাব দিতেন। ইহা স্বামী ও আমি সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছি। অন্য লোক কতদূর জানেন, আমি তাহা জানি না, কারণ আমি কাহার সহিত মিশিবার অধিকারিণী নই। আমি প্রতি কথার উত্তর পাইয়াছি। স্বামীও

বলেন, নাগমহাশয় মন জানিয়া তাহার ব্যবস্থা করেন। যে দিন নাগমহাশয় আমাদের কাছে সন্দেশ খাওয়ার ব্যাখ্যা করিলেন, স্বামী মনে করিয়াছিলেন, হইতে পারে, তিনি রমণীর সংসর্গ করেন নাই, তাহা বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার সহবাসের ইচ্ছাও হয় নাই? নাগমহাশয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, যদি হইত তবে বলিতাম। একবার নয়, তিনবার এই কথা বলিলেন। তিনি সেই সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত শেষ কথা মিলিল না। সুতরাং আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। এ রকম অনেক কথা আছে, দ্বিরুক্তি করিয়া লাভ নাই। তিনি মনের কথা জানিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। গিরিশবাবুর মনে হইয়াছিল, কি ভাব নাগমহাশয়কে কই মাছের ডিম খাওয়াইবেন, আমনি নাগমহাশয় হাত পাতিয়া গিরিশবাবুর নিকট ডিম চাহিলেন। যিনি মনের কথা জানিতে পারিতেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

একদিন স্বামী ও আমি ব্রহ্ম বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম। স্বামী বক্তা, আমি শ্রোতা। তিনি ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন, জীবে ও শিবে কোন তফাৎ নাই, কেবল বিকাশের পার্থক্য। আমি বহু প্রশ্ন করায় অবশেষে তিনি বলিলেন, আমাতে ও শিবে কোন পার্থক্য নাই। সেই দিন আমরা দেওভোগ গিয়াছিলাম। তখন দুর্গাপূজা হইতেছিল। পরদিন স্বামী দুর্গাদেবীর চরণে অঞ্জলি দিয়া নাগমহাশয়কে নমস্কার করিতে গিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহার সর্ব্বস্ব। নাগ-মহাশয় একটু সড়িয়া গিয়া বলিলেন, আপনাতে ও আমাতে

তফাৎ কি? স্বামী তাঁহার রাতুল চরণ স্পর্শ করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, নাগমহাশয় তাঁহার কথার শোধ নিলেন। কোথায় দেওভোগ, আর কোথায় পঞ্চসার। পঞ্চসারে এক ঘরের কোণে বসিয়া যে কথা হইয়াছিল, তিনি তাহা শুনিয়া ছিলেন। যিনি এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

স্বামী দেওভোগ যাইবেন। রাস্তা চিনেন না। নাগমহাশয়কে দেখিতে প্রাণ আকুল হইল। কোন বিবেচনা না করিয়া মুন্সিগঞ্জ হইতে রওনা হইলেন। তখন তিনি ওথাকার স্কুলে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় নারায়ণগঞ্জ পৌছিলেন। তিনি পথ জানিতে চেষ্টা করিলেন, চেনা লোকের নিকট গেলেন, কোন ফল হইল না, কেহ সাহায্য করিল না। হতাস হইয়া নাগমহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া রওনা হইলেন। অন্ধকার রাত্র। পাড়াগাঁয়ের পথ, চারিদিকে জঙ্গল। নাগমহাশয় টানিতেছেন প্রেম-ডোর বেধে হৃদি। দেওভোগ গেলেন। নাগমহাশয়কে দেখিলেন। শুনিতে পাইলেন, নাগমহাশয় বলিতেছেন, মনে করিয়াছিলাম, ষ্টেশনে যাইব। যাওয়া হইল না। যিনি সর্ব্বদর্শী, সেই নাগমহাশয় কি জীব?

একদিন স্বামী দেওভোগ গিয়াছেন। একটী গোখরো সাপ নাগমহাশয়ের ঘরে যাইতেছে। মা ঠাকুরাণী ঘরের ভিতর ছিলেন। তিনি ভয়াতুরা হইয়া সাপ তাড়াইতে লাগিলেন এবং সকলকে ডাকিলেন। সাপ কোন বাধা মানিতেছে না, ঘরে ঢুকিবেই। সকলে সাপ মারিতে গেল। তখন নাগমহাশয় কোথায় ছিলেন। বাটীতে আসিয়া, সকলকে উতালা দেখিয়া, তিনি সাপের কাছে গেলেন, বিনয়ের সহিত বলিলেন মা, মনসা দেবী, আপনি আপনার

পথে চলিয়া যান, দরিদ্রের কুটিরে আপনার স্থান হইবে না। সাপ আর ঘরের দিকে গেল না। মস্তক হেঁট করিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল যিনি বিষধর সাপের সহিত এমত ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

একবার আলমবাজারে পরমহংসদেবের উৎসব হইতেছিল। একটী কেউটে সাপের বাচ্চা সেইস্থানে উপস্থিত হইল। হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, মার মার রব উঠিল। নাগমহাশয় তাহার নিকট যাইয়া, পথ দেখাইয়া চলিলেন, নাগশিশু তাঁহার অনুসরণ করিল। যিনি সমগ্র জগতকে ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া দেখিতে পারিতেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

মুনিঋষিগণ ধ্যানে বসিয়া সমস্ত জানিতে পারিতেন, পুরাণে তাহা পড়িতে পাই। ধ্যান করিতে না বসিয়া কিছু জানিতে পারিতেন না। নাগমহাশয়কে দেখিয়াছি, কত লোকের সেবা করিতেছেন, কত লোকের সাথে কথা বলিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বদা লোকের মনের কথার উত্তর দিতেন। কি সাক্ষাতে, কি অসাক্ষাতে সকল অবস্থায় লোকের কথা জানিতে পারিতেন। যিনি মনে বসিয়া মন দেখিতে পারিতেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

আমরা দেখিয়াছি, যখন কীর্ত্তন হইতে থাকিত, নাগমহাশয়ের ভক্তগণ ভাবে অভিভূত হইয়া গান করিতেন, নাগমহাশয়ের চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিত এবং তিনি তামাক লইয়া খুটিনাটি করিতেন। কখন বলিতেন, তামাক খাইব, তামাক খাইব, যেন বাসনার অন্তরায় ভেদ করিয়া সমাধি আসিয়া না পড়ে। তিনি জানিতেন, সমাধি কত সুখকর। যিনি জীবসেবা করিবেন বলিয়া সমাধি-সলিলে ডুবিতে চাহিতেন না, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

নাগমহাশয় বলিয়াছেন, একদিন তিনি মা'র ( রামকৃষ্ণভক্ত জননীর ) নিকট গিয়াছেন। মা তাঁহাকে ৫ বৎসরের শিশুর মত কোলে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে মা'র কোলে বসিয়া শিশুর মত হুটী হুটী কবিয়া খাইলেন। জগৎজননী আদব করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আপনি সন্ন্যাসীদেব সাথে কথা বলেন না কেন ? তিনি বলিলেন, তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। নাগমহাশয় বলিলেন, তাঁহাবা আপনাব সন্তান, তাঁহাদেব সহিত কথা না বলায় তাঁহাবা মনে কষ্ট পায়। জগদম্বা আর কিছু বলিলেন না। যিনি এমন শিশু হইয়া মাতৃকোলে বসিয়া খাইলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

কোন একটী লোককে জানি। তিনি যৌবনকালে বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পঞ্চমকাবে তাঁহার বড়ই রতি ছিল। বিধাতার নিয়মানুসারে তিনি জেলে গেলেন। জেল হইতে বাহিব হইয়া নাগমহাশয়ের আশ্রয় লইলেন। তাঁহাতে মন প্রাণ বিকাইয়া বসিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে তাঁহাব চবণতলে স্থান দিলেন, তাঁহার দিব্যচক্ষু ফুটিয়া গেল। তিনি অপার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। এখন দশ জন তাঁহার আশ্রয় পাইয়া তপ্তজীবন শীতল করিতেছে। যিনি জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারেন, উচ্ছৃঙ্খল জীবকে ত্রাণ কবিতে পারেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

শবৎবাবু নাগমহাশয়ের বিরহে দালানের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণে দিতে গিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিলেন, নাগমহাশয়কে কল্য দেখিতে পাইবে। পরদিন তিনি নাগ-

মহাশয়কে দেখিলেন। যিনি আকাশবাণীর সহিত অবিলম্বে দূরদেশে পৌঁছিতে পারিতেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

এক সময় আমি আত্মহত্যা করিতে চাহিয়া ছিলাম। নাগ-মহাশয় আমাকে তাহা হইতে বিরত করিলেন ; তিনি জানাইলেন প্রাণনাশ করিও না, ভগবানের দেখা পাইবে। যিনি এই রূপ আমাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

তাঁহার পূতলীলা অবসান হইতে বসিল, নাগমহাশয় আনন্দের হাট ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিয়া শরৎবাবুকে পঞ্জিকা দেখিয়া দিন ধার্য্য করিতে বলিলেন। শরৎবাবু ভাল দিন দেখিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, সেইদিন তিনি শরীর ছাড়িবেন। সকলের শিরে বজ্রপাত হইল। পবিত্র দিন দেখিয়া মহাযাত্রা করিলেন। যিনি দিন দেখিয়া শরীর রাখিতে পারেন, সেই নাগমহাশয় কি জীব ?

---

# উপদেশ।

নাগমহাশয় সর্ব্বদা পথভ্রান্ত জীবকে উপদেশ দিতেন। তিনি কথাচ্ছলে যাহা বলিতেন, তাহার কয়েকটী উপদেশ নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

১। যাহা রাম তাহা নাহি কাম,
যাহা কাম তাহা নাহি রাম,
দিবস রজনী নাহি এক ঠাম।

২। মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত
বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।

৩। বিদ্যারূপে দিয়া জ্ঞান
কাকে কর পবিত্রাণ,
আবার অবিদ্যায় আবৃত করে মোহ গর্ত্তে টেনে ফেল।

৪। পদে পদে অপরাধ,
ক্ষমা কর রঘুনাথ।

৫। জানায় মানায় না।

৬। ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।

৭। মেয়ে না মায়া
সব নিল খাইয়া।

৮। ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত, রূপে প্রভেদ, তিন সমান।

৯। পাইলাম থালে দিলাম গালে
পাপ পুণ্য নাই কোন কালে।

১০। ভগবান দয়াবান।

১১। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?
মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

১২। আছে বস্তু নিয়া বিবাদ।

১৩। হাতে দৈ, পাতে দৈ, তব বলে কৈ কৈ?

১৪। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কখনও অমঙ্গল হয়না।

১৫। পিতার নিকট রুটী চাহিলে, তিনি কখন পাথর দেন না।

১৬। ভগবানের নিকট যে যাহা চায, সে তাহা পায়, তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না।

১৭। পথে পথে থাকিলে, এক দিন ভগবানের দয়া আসিয়া পরে।

১৮। এলো মেলো করিলে ধর্ম্ম হয় না।

১৯। ধ্যান কর্‌বে কোণ, বনে ও মনে।

২০। মানুষের কি সাধ্য আছে, সে ভগবান লাভ করে। তিনি দয়া করিয়া দেখা দেন, তাই মানুষ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

২১। সংসারের গুরু মন্ত্র দেন কাণে,
জগৎ গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

২২। কুলোকের সাথে মিশা ও কুলোকের চিন্তা করা দোষ।

২৩। প্রাতঃকাল সত্যযুগ। এসময় ভগবানকে মনে রাখিতে হয়। পশুপক্ষিগণও এসময়ে মনের আনন্দে গান করে।

২৪ । আমরা যে খেয়ে আছি, ইহা ভগবানের অসীম দয়া । কতলোক না খাইয়া মরা যাইতেছে ।

২৫ । সকলের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করিতেছেন ।

২৬ । ভগবানের কৃপার শেষ নাই ।

২৭ । যথা নাই কাম, তথা স্ফুরে রাম ।

২৮ । ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটী গাছের পাতাও পড়ে না ।

২৯ । ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায় ।

৩০ । যিনি ভগবানকে জানেন, শিশু হইলেও তিনি সকলের সম্মানের যোগ্য ।

৩১ । তাঁহাকে ( ভগবানকে ) সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়, মনের সুখ ও দুঃখ তাঁহার কাছেই বলিতে হয় ।

৩২ । ভগবান্ সকলের আপন । তাঁহা হইতে অধিক আপন আর কেহ হইতে পারে না ।

৩৩ । ভগবানের দয়া অহৈতুক । তাঁহার দয়ার কোন কারণ নাই । তাঁহার দয়ার কাম্য কারণ সূত্র পাওয়া যায় না ।

৩৪ । হে ভগবন্ । আমি নিজ কর্ম্মের দায়, নিজে গ্রেপ্তার হইয়াছি, তুমি দয়া করিয়া উদ্ধার না করিলে আমার অব্যাহতি নাই ।

৩৫ । সে ভগবানকে এক মুহূর্ত্তের তরেও দেখিয়াছে, সে কখনও এজীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না ।

৩৬ । জপ তপ কর কিন্তু মরতে পারলে হয় ।

৩৭ । সারা জীবন জপ তপ করা কেবল শেষ সময়ে ভগবানকে মনে করার জন্য ।

৩৮। ভগবান্‌ই সার আর সকল অসার।

৩৯। তোতা পাখী সারা দিন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে, বিড়াল ধরিলে টঁ্যা টঁ্যা করিতে থাকে। জীবও সমস্ত জীবন হরি হরি বলে, শেষ কালে আত্মীয় স্বজন মনে করে।

৪০। সত্যের আঁট থাকা দরকার। সত্যের আঁট থাকিলে কেহ কষ্টে পরে না।

৪১। যখন ভগবান্ যাহাকে যে ভাবে রাখেন, তাহাকে সেই ভাবেই থাকিতে হয়।

৪২। মাত্র দুই দিনের দেখা।
তাকে বলে প্রাণসখা॥

৪৩। মানবের জীবন চক্ষের পলক।

৪৪। ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য, জীব কি তাকে বুঝতে পারে।

৪৫। পিতামাতা এ জগতের দেবতা।

৪৬। দেব, দ্বিজে, গুরুমন্ত্রে বিশ্বাস থাকা উচিত।

৪৭। বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অনায়াসে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

৪৮। ভগবান্ বহু রূপী, তাঁহার রূপের শেষ নাই।

৪৯। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ হয় না।

৫০। মানব জীবনের লক্ষ্য ভগবান্ লাভ। মানব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, অনেক যন্ত্রনা পায়।

৫১। যথা নেত্র পড়ে।
তথা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

৫২। সাপ হয়ে কাঁট তুমি,
ওঝা হয়ে ঝাড়।

হাকিম হয়ে হুকুম দাও,
প্যাদা হয়ে মার॥

৫৩। আল্লা কি কর্‌ছেন?

তিনি বড়কে ছোট করিতেছেন, ছোটকে বড় করিতেছেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা হইতেছে, তিনি স্বাধীন।

৫৪। তাঁকে পাবে কবে?
আমি যাব যবে।

৫৫। পুরাণাদি সকলই সত্য, কিছুই মিথ্যা নয়।

৫৬। সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, ভ্রমে বলে করি আমি।

৫৭। দিন্‌মে মোহিনী, রাত্‌মে বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লৌ চোষে।
দুনিয়া ভর্‌কে ভাউড়া হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥

৫৮। চক্ষু দিতেছিলেন রামচন্দ্র, মাথা দিতেছিলেন পরমহংসদেব। জগদম্বার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

৫৯। তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ।

৬০। হনুমান একসময় বলিয়াছিল, কো রামঃ।

৬১। সে বড় বিষম ঠাঁই।
গুরু শিষ্যে দেখা নাই॥

৬২। কাম ছাড়লে রাম।
রতি ছাড়লে সতী॥

৬৩।* আমল্ কম্‌কে করে ধ্যান,
সংসারী হোকে বাতায় জ্ঞান,
সন্ন্যাসী হোকে ফুটে ভগ,
এহি তিনি কলিকা ঠগ।

৬৪। মহাপ্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ ভাই।
কলির জীবের সুখ কোন কালে নাই॥

৬৫। তাঁহাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি হৃদয়মধ্যে বিরাজ করেন।

৬৬। বনে গেলেই কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? যদি তিনি দয়া করিয়া দেখা দিতে চান, তিনি কি আমার বাড়ী চিনেন না?

৬৭। যদি কেহ হবিষ্যান্ন করিয়া হরিনাম না করে, তাহার সেই খাদ্য গোমাংসের সমান। আবার গোমাংস খাইয়া হরিনাম করিলে, হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

৬৮। মনমে চাঙ্গা, কোঠবামে গঙ্গা।

৬৯। ঈশ্বর সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ।

৭০। আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন কারো ঘরে, যা চাবে, এখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

৭১। জীব যখন শিব হয়, শিব যখন শব হয়, মা সচ্চিদানন্দময়ী তখন হৃদয়-কমলে নাচেন।

৭২। ঘৃণা লজ্জা ভয়।
তিন থাক্‌তে নয়॥

৭৩। আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়।
যত বাড়াও তত হয়॥

৭৪। মানুষ শব্দের অর্থ—মান+হুঁষ।

৭৫। যাহা হইবার হবেই, তবু হুঁষ করিয়া বলা ভাল।

৭৬। মানুষ সমস্ত ঠিক্ ঠিক্ করে, কেবল মাত্র একটী ভুল, সে ভাবে সে কর্ত্তা।

৭৭। যদি কলিকালে মুক্তি চাও, এক বিশ্বাস কর।

৭৮। এখানেও যা, বৈকণ্ঠেও তা। এখানে হিংসা দ্বেষ, কলহ, সেখানেও তাই।

৭৯। অভ্যাসাৎ যায়তে সিদ্ধিঃ।

৮০। অভ্যাসদ্বারা সমস্তই করা যায়।

৮১। এই যে আমগাছ আছে, ইহাকে যদি চালিতা গাছ বলা হয়, কখনই তাহা বিশ্বাস করিবে না, কারণ ইহা আমগাছ, এই অভ্যাস লাগিয়া রহিয়াছে।

৮২। ভগবান্ই কেবল দোষ ক্ষমা করিতে পারেন; দোষ করিলে তাঁহার কাছেই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

৮৩। একবার আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন, রাজকুমার, তুমিত জান না, না জানিয়া ঘুরিয়া আসিলে। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাও প্রাক্তন খণ্ডাইতে পারেন না।

৮৪। আমার কর্ম্মদ্বারা আমি বদ্ধ, আমার কর্ম্মদ্বারা আমি মুক্ত হইব, কে ধরে?

৮৫। ভগবানের নিকট মেয়ে ও পুরুষে কোন প্রভেদ নাই। সকলই তাঁহার সমান!

৮৬। মেয়েও পুরুষ বলিয়া আত্মায় কোন ছাপ দেওয়া নাই।

৭৭। যদি কলিকালে মুক্তি চাও, পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

৮৮। যে ভগবানের নাম করে না, সতত কুকাজে রত, সে

মেয়ে মানুষ। আর যে সর্ব্বদা ভগবানকে মনে করে, সাধু সৎসঙ্গ করে, সে পুরুষ।

৮৯। মেয়েদের কোথায় গিয়াও ধর্ম্ম হয় না। তাহাদের ধর্ম্ম হয় ঘরে বসে।

৯০। আমি সহস্র কোটী পাপ করিয়াছি, আমি ব্রহ্মপদ লইব, ধরিবে কে ?

৯১। যে তাঁকে চায়, সে তাঁকে পায়।

৯২। ঠাকুর ( পরমহংসদেব ) বলিতেন, মেয়ে ভক্ত কেঁদে গড়াগড়ি দিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নেই।

৯৩। পুরুষের পক্ষে রমণী যেমন ধর্ম্মপথে কণ্টক, রমণীর পক্ষে পুরুষও তেমন ধর্ম্মবিরোধী।

৯৪। যাঁহাকে একটী কথা বলিতে হয়, তাঁহার কথা আগে শুনিতে হয়।

৯৫। প্রাক্তন ভোগ কেহ খণ্ডাইতে পারে না।

৯৬। বৃক্ষাদি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ইহারা কর্ম্মের দায় বৃক্ষ হইয়া দাড়াইয়া আছে, সময়ে ইহারাও মানুষ ছিল।

৯৭। আজ যে পুত্র এত আদরের, যদি সে কাল শুকর হইয়া ধোঁ ধোঁ করিয়া আসে, পিতা লাঠি শোঁটা লইয়া তাড়াইতে দৌড়িয়া যান।

৯৮। স্বাস্থ্য রক্ষা পরম ধর্ম্ম। দেহে জ্বালা থাকিলে সমাধি হয় না।

৯৯। জীব তিন রকম, বদ্ধ, মুক্ত ও মুমুক্ষু। বদ্ধজীব নিজেও ভগবানের নাম নেয় না, অপরকেও তাহা নিতে দেয় না। মুক্ত জীব সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণ করে। মুমুক্ষুজীব

ভগবানের দিকে চাহিয়া থাকে এবং তাঁহার দয়া হইলে ধন্য হইয়া যায়।

১০০। বন্যা আসিলে ডোবা পুকুর ডুবিয়া যায়, সমস্ত এক হইয়া যায়। সেইরূপ ভগবান আসিলে সকলেই অসীম সুখ পায়।

১০১। ভগবানকে খুঁজিয়া আনিতে হয় না। তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া আসিয়া দেখা দেন।

১০২। মানুষের বাহিরের আকার এক হইলেও, ভিতরে তাকাইলে দেখা যায়, কেহ বাঘ, কেহ ভল্লুক হইয়া থাপ্ পাতিয়া বসিয়া আছে।

১০৩। মায়ের দশ ছেলে, তিনি কাহাকে চুষি দিয়া ভুলাইয়া রেখেছেন, কাহাকে এটা ওটা দিয়া মত্ত ক'রে রেখেছেন, আর অশান্ত ছেলেটাকে কোলে ক'রে বসে আছেন। কিন্তু যেই কোন অশান্ত ছেলে সমস্ত ত্যাগ করিয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, মা অমনি তাহাকে কোলে স্থান দেন ও শান্ত করেন। সেইরূপ এই সংসারেও যে মানুষ সকল খেলা ছাড়িয়া দিয়া মার জন্য আকুল হয়, চিন্ময়ী মা তাহাকে কোলে তুলিয়া লন।

১০৪। ছোট বাসনা গুলি পূর্ণ করিতে হয়, বড় বড় বাসনা যুক্তি দ্বারা মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে হয়।

১০৫। দেখিয়াছি পরমহংসদেবের জ্বালা নাই। তিনি বলিয়াছেন, আমার জ্বালা নাই। আমার নিকট আর কেহ বলিয়া যাইতে পারিবে না, তাহার জ্বালা নাই।

১০৬। ভগবানের কৃপা হইলে জ্বালার হাত এড়ান যায়; নচেৎ নয়।

১০৭। ভগবান্ যাহাকে দেখা দেন, ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ সকল আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

১০৮। মায়ের কাছে যাহার জ্বালা যায় না, তাহার জ্বালা আর কোথায়ও যইবে না।

১০৯। এই সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই। যাহাকে এত আপন ভাবা যায়, সেও বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভগবানই জীবের একমাত্র আপন। তিনি সকল অবস্থাতেই আপনার মত সঙ্গে থাকেন।

১১০। ভগবান্ মঙ্গলময়।

১১১। রাবন নাগকন্যা, দেবকন্যাও উপভোগ করিল, শেষে ভগবানের চরণেও স্থান পাইল।

১১২। জনক রাজা চতুর ছিলেন, কিছুতে ছিল না ত্রুটি। একুল ওকূল দুকূল রেখে খেয়ে গেলেন দুধের বাটি।

১১৩। প্রতি দেহে ভগবান্ বর্ত্তমান থাকিলেও কুলোকের সাথে মিশিতে হয় না।

১১৪। আজ যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিলাম, আজ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলাম, যদি তিনি ভগবান্ নাও হন, তাহাতে দোষ কি? অনন্তজীবন চলিয়া গিয়াছে, এক জীবনও না হয় চলিয়া গেল।

১১৫। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী,
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে।
তবু সন্ধান নাহি পায়।

১১৬। অনন্যমনে ভগবানের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, সময় হইলে তিনি আপনিই দয়া করেন।

১১৭। ঈশ্বরকে খুঁজিতে হয় না, দয়া করিতে ইচ্ছা হইলে, তিনি নিজে আসিয়া দয়া করেন।

১১৮। একদিন মহম্মদ ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। একজন তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। পরে নিদ্ধারিত হইল, তাঁহাকে জাগরিত করিয়া মারা হইবে। তদনুসারে জাগান হইল। অপর একজন মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? মহম্মদ বুকের কাপড় ফেলিয়া দিয়া, সমস্ত বুক পাতিয়া বলিলেন, আল্লা আমাকে রক্ষা করিবেন। এইকথা বলা মাত্র, তাঁহার শত্রুর হস্তস্থিত বল্লম খসিয়া পড়িল এবং শত্রুগণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

১১৯। যিশু পেরেকবদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্, ইহাদের দোষ গ্রহণ করিও না, কারণ ইহারা জানে না, ইহারা কি করিতেছে।

১২০। ভীষ্মদেবের দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। তিনি ৬ মাস সমর শরশয্যায় রহিয়াছিলেন, তাঁহার বিন্দু মাত্রও কষ্ট হইল না।

১২১। এজগতে কৌলগুরু বিরল। যাহার ভাগ্যে কৌলগুরু জোটে, তাহাব মত ভাগ্যবান্ এই পৃথিবীতে নাই।

১২২। এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। জীব ইহা জানিয়া শুনিয়া ইহাতে ভুলিয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

১২৩। কৃত অভ্যাস আমাদিগকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম।

১২৪। দেখাই দীক্ষা।
শুনাই শিক্ষা॥

১২৫। সখি, যতকাল থাকি, ততকাল শিখি।

১২৬। পুরাণাদি সকলই সত্য, কিছুই ভুল নয়। পরমহংসদেব বলিতেন, তাও বটে, তাও বটে।

১২৭। একজন বলিয়াছিলেন, অত বৎসর পর গঙ্গা মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিবেন। তাহা শুনিয়া নাগমহাশয বলিলেন, আমি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। পতিতপাবনী গঙ্গা এই জগৎ ত্যাগ করিতে পারেন না। যদি কোন মহাপুরুষ, যিনি গঙ্গাকে অনুভব করিয়াছেন, বলেন যে, হাঁ, গঙ্গা সত্যই এ ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, তবে তাঁহার কথা বিশ্বাস যাইব।

১২৮। কামভাব থাকিলে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না। মায়ামুক্ত হইলে রাধাকৃষ্ণপ্রেম বুঝা যায়।

১২৯। মহাপ্রভু বলিতেন,—

রমণীর কোল,
সিংমাছের ঝোল,
বোল হরিবোল।

১৩০। হরি বল, কাপড়ও তোল। ঈদৃশ মতাবলম্বী লোকের কোন দিন ভাল হয় না। তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে, জীবের মুক্তি হয় না।

১৩১। একই ভগবান্ সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিতেছেন।

১৩২। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

১৩৩। সচ্চিদানন্দময়ী মা পথ ছাড়িয়া না দিলে, কেহ মায়ার হাত এড়াইতে পারে না।

১৩৪। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত কাহার দোষ গ্রহণ করেন না, কারণ গুণগ্রাহী জনার্দ্দন।

১৩৫। গলায় পরেছে ঢোল, বাজালেই সিদ্ধি।

১৩৬। ভগবানে প্রীতি থাকায়, পঞ্চকন্যা অসতী হইয়াও সতীর শিরোমণি।

১৩৭। পাশবদ্ধ ভবেৎ জীবঃ।
পাশমুক্ত সদা শিবঃ॥

১৩৮। মায়াকে চিনিলে মায়া আপনিই পালায়।

১৩৯। সিদ্ধি ও সিদ্ধাই প্রশংসার যোগ্য নয়। সিদ্ধি ধর্ম্ম-পথের অন্তঃরায়। লোক সিদ্ধিলাভ করিলে, তাহাতে ভুলিয়া থাকে, ভগবানকে চায় না।

১৪০। যত্র জীব তত্র শিব।
যত্র নারী তত্র গৌরী।

১৪১। হ'তে হ'তে যাহা হয়। এই সংসারে কেহ কিছু করিতে পারে না, সকলই ভগবানের ইচ্ছা।

১৪২। পিতার নিকট সন্দেশ চাহিলে, পিতা পুত্রকে চিট্‌গুড় দেন না।

১৪৩। পরমহংসদেবের উপদেশ আছে, কুলোককে খাওয়াইলে পাপ হয়। সে যেস্থানে ভোজন করে, তিন হাত মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়। নাগমহাশয়ের কোন এক ভক্ত এ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি করিয়া এই সংসারে অতিথিসৎকার করা যায়? তিনি বলিলেন, সংসারে ওসব বিচার করিয়া চলা যায় না। সকলকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিলে পর, তাহা হইতে অমঙ্গল আসিতে পারে না।

১৪৪। মঙ্গলময় হইতে অমঙ্গল আসে না।

১৪৫। আমি রমণী মাত্রেই সচ্চিদানন্দময়ী মাকে দেখিতে পাই।

১৪৬। আমি পশুযোনীকে মাতৃযোনীর মত দেখি।

১৪৭। Similia Similibus Curantur, সদৃশং সদৃশেন শাম্যতে। বিষস্য বিষমৌষধম্।

১৪৮। মনে বলে পাপকর্ম্ম করিব না আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার॥

১৪৯। কুমতি সুমতি
সবই মা ভগবতী॥

১৫০। বনের শাপে খায় না, মনের শাপে খায়।

১৫১। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ।

১৫২। যে হাসিতে শিখে সে হাসে, যে কাঁদিতে শিখে, সে কাঁদে।

১৫৩। এই হাসি এই কান্না।
বলে গেছে রামসন্না॥

১৫৪। দোষ করিলে কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিতে হয়। তিনিই কেবল আমাদের দোষ ক্ষমা করিতে পারেন।

১৫৫। পাপ ও পায়রা কখনও গোপনে থাকে না। সময়ে প্রকাশ পাইবে।

১৫৬। ভ্রমিয়া বার
ঘরে বসিয়া তৈর,
যদি করিতে পার।

১৫৭। ভগবানে মন থাকিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।

১৫৮। কাচ লাগান আলমারির ভিতর জিনিষ সকল যেমন অনায়াসে দেখা যায়, আমি সেইরূপ সকলের হৃদয় দেখিতে পাই।

১৫৯। আয়স্কান্ত পরস্কান্ত মণিমুক্তা আদি,
শ্মশানের ধূলার মত ত্যাগ করিতে পারি,
কিন্তু রম্ভা তিলোত্তমা যদি মোরে ছলে,
কৃষ্ণের কৃপায় আমি তবে যাই তরি।

১৬০। যুবতী কন্যার সহিত পিতাও নির্জ্জনে থাকিবে না।

১৬১। যত দিন পুড়ে শ্মশানে না পড়ে ছাই,
তত দিন সতীত্বের বিশ্বাস নাই।

১৬২। পূজা, ধ্যান, জপ, সকলই শেষমুহূর্ত্তে ভগবৎভাব জাগাইবার জন্য।

১৬৩। একজ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান।

১৬৪। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ, মূলেতে প্রত্যয়।

১৬৫। ভগবানের নিকট যে যাহা চায়, সে তাহা পায়।

১৬৭। জানায় মানায় না।

১৬৮। সংসারীর বেদান্তজ্ঞান সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

১৬৯। ভগবান্‌কে বিশ্বাস করিলে, তাঁহার উপর মন প্রাণ সমর্পণ করিলে, তিনি দয়া করেন।

১৭০। পুরাণ তন্ত্রাদি সকলই সত্য, কিছুই ভুল না। সকল হইতেই মঙ্গল আসিতে পারে।

১৭১। কাহাকেও সুপুমখে যাইতে হইবে না। কাহার আজ, কাহার বা কাল, কাহার দুই দিন পর ডাক পরিবে। সকলেই সচ্চিদানন্দময়ীর প্রকাণ্ড অন্নাগারে স্থান পাইবে।

১৭২। যাদৃশী ভাবনা যস্ত, সিদ্ধির্ভবতি তস্ত তাদৃশী।

১৭৩। তুমিত ঠাকুর ঠাকুর বল; ঠাকুর "তুমি" বলিলেই হইল।

১৭৪। পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

১৭৫। ভগবান্ রুষ্ট হলে, গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে, কেহ রক্ষা কবিতে পারে না।

১৭৬। সংসাবের কথাবার্ত্তা কাক কোন্দল বৎ।

১৭৭। যদ্যপি আমার গুরু শুরি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

১৭৮। বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।

১৭৯। লিঙ্গই সিংহ হইয়া ঘাড় কামড়ায়।

১৮০। যে যারে রাখে, সে তারে রাখে।

১৮১। মনের একাগ্রতার জন্যই যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যা।

১৮২। মরিবার সময় মনে যে ভাব হয়, সেই ভাব লইয়াই পরজন্মগ্রহণ করিতে হয়।

১৮৩। বিপদই সম্পদ।

১৮৪। যাহারা শাস্ত্র দেখিয়া চলে, তাহারাই ধন্য।

১৮৫। ভগবান্ দুই হাত দিয়াছেন, দুই হাত ভরিয়া ভগবানের অঞ্জলি দিতে হয়।

১৮৬। আমি কেন তিন দিন তাঁহাব পূজা করিব? আমি রোজ তাঁহার পূজা করিব।

১৮৭। শ, ষ, স ;-না শ—নাশ। বর্ণমালাতে শ তিনটী। যত পার সহিয়া যাও।

১৮৮। মায়াপুবাণ ত্যাগ করিতে হয়।

১৮৯। কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনা করে, যেমন লাউ কোমরের আগে ফুল, পরে ফল।

১৯০। ভগবানের দয়া হইলে জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্ম্মের শেষ হয়।

১৯১। মায়াকে চিনিলে পর আর মায়া থাকে না।

১৯২। বন্যা হইলে সমস্ত ভাষাইয়া দেয়, খাল, বিল, খানা, ডোবা সকলই ডুবিয়া যায়। ভগবানের অবতার হইলে, সকলেই তাঁহার কৃপায় সুখে থাকে।

১৯৩। ধ্যান করবে কোনে, বনে ও মনে।

১৯৪। চারা গাছে বেড়া। ছোট বেলায় ভগবৎভাব লাভ।

১৯৫। প্রাতঃকালে তোলা মাখন যেমম জলে মিশে না, সেই রূপ ছোট কালে ভগবৎপরায়ণ হইলে আর মায়াতে বদ্ধ হয় না।

১৯৭। কলিকালে বহুলোক কীর্ত্তন করিবে।
নাচিয়া গাইয়া শেষে নরকে যাইবে॥

১৯৮। প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা।

১৯৯। লোকের ভাল ও মন্দ কাককোন্দলবৎ মনে করিবে।

২০০। যে ঘরে লোক জাগিয়া থাকে, তথায় চুরি হয় না।

২০১। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনা জীব ছাড়খারে গেল॥

২০২। মরবে নারী উড়বে ছাই।
তবে নারীর গুণগাই॥

২০৩। যাহার এখানে আছে, তাহার ওখানে আছে।
যাহার এখানে নাই, তাহার ওখানেও নাই

২০৪। প্রদীপের স্বভাব আলো দেওয়া। কেহ আলোতে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছে, কেহ ভাত রাঁধিতেছে, কেহ জাল বুনিতেছে।

২০৫। কাঁচা মাটিতে গড়ন চলে; একবার তাহা পুড়িলে, শত চেষ্টায়ও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।

২০৬। মুলোখেলে মুলোর ঢেকুর উঠে। যাহার হৃদয়ে যে ভাব আছে, তাহা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে।

২০৭। পানকোড়ি জলে থাকে, তাহার গায় জল লাগে না, সেইরূপ মুক্তপুরুষ যে খানেই পড়িয়া থাকুন না কেন, তাঁহার কোন আশক্তি হয় না।

২০৮। চিনিতে বালি মিশাইলে, পিপীলিকা বালি ফেলিয়া রাখিয়া চিনি খায়, সেইরূপ ভগবৎভক্ত সদসতের ভিতর থাকিয়াও সৎভাবে বিভোর থাকে।

২০৯। মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা।
তবে হবে কর্ত্তাভজা॥

২১০। পতঙ্গ আলো ভালবাসে। আলো দেখিলেই তাহাতে পড়ে, কোন বাধা মানে না। সেই রূপ ভক্ত ভগবানের নিকট চলিয়া যায়, সংসারের শত বাধা তাহাকে বাধিয়া রাখিতে পারে না।

২১১। অমৃতকুণ্ডে যে ভাবে হউক পড়িলেই হইল।

২১২। কাক বড় বুদ্ধিমান, আগেই খায় গু।

২১৩। ভগবানে তন, মন ও ধন দিতে হয়।

২১৪। সংসার কেমন? যেমন অমড়া। শস্তের সাথে খোঁজ নাই, হাড়র আর চামড়া, খেলে হয় অম্বলশূল।

২১৫। মানবজীবন লাভ করিয়া যে ভগবান্ লাভের চেষ্টা করে না, তাহার জন্মগ্রহণ কষ্ট মাত্র সার।

২১৬। এক সময় নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্, তোমার লীলা রূপ দেখিতে চাহ না, তোমার নিত্যরূপ অনুভব করিতে চাই।

২১৭। নারদ রামকে বলিয়াছিলেন, তুমি রাবণ বধ করিবে বলিয়া, তাহা আজ করিতে পারিবে না।

২১৮। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়।

২১৯। মানুষ ব্রহ্মকে না জানিলে, সংসার ছাড়িতে পারে না। জলোকা যেমন একটী অবলম্বন গ্রহণ করিয়া, অন্যবস্তু ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ জীব ভগবানের বিমল সুখ পাইলে, সংসারানন্দ ভুলিতে পারে।

২২০। মহাশক্তি মহামায়ার দয়া না হইলে, কেহ মায়ার হাত এড়াইতে পারে না।

২২২। বুঝি তাও বটে, বুঝি তাও বটে।

২২৩। যত মত, তত পথ।

২২৪। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

২২৫। এ সংসারে ধোকার টাটি।

২২৬। অন্নচিন্তা চমৎকারা।
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা॥

২২৭। যে ভগবানকে ধরে, তাহার পা বেতালে পড়ে না।

২২৮ দেহ জানে আর জানি আমি, মন তুমি আনন্দে রহ।

২২৯ কলিকালে নারদীয় ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

অনেক সময় নাগমহাশয় এই কয়েকটা গান বলিতেন। তাঁহাকে কখনও গান করিতে শুনি নাই।

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়॥
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে তবু সন্ধান নাহি পায়॥
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

---

আপনাতে আপনি থাক মন যেয়োনাক কার ঘরে।
যা চাবি এখানে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পবমধন এই পরশমণি অসংখ্য ধন দিতে পারে।
কত মণি পবে আছে চিন্তামনির নাচ দুয়ারে॥

---

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরী।
কাবে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥

---

দে মা আমায় পাগল ক'রে।
কাজ নাই আমার জ্ঞান বিচারে॥ পক্কে

---

কে জানে কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দর্শন ॥
কালী পদ্ম বনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ,
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন,
মহাকাল জেনেছে কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝেনা, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন ॥

---

# পরিশিষ্ট।

এক দিন ৩।৪ জন বৈষ্ণব নবদ্বীপ হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেওভোগ চিনেন না। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া সমাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, দেওভোগ কোথায়? দীনদয়াল নাগ কে? তাঁহার ঘরে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমরা তাঁহাকে কি জান? নাগমহাশয় গোপনে থাকিতেন। কোন কোন লোক তাঁহাকে মহৎব্যক্তি বলিয়া জানিত; কেহই তাহাকে তখন ভগবান্ বলিয়া জানিত না। তাহার উপর, যাহারা তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা নৌকার মাঝি। ভাড়ার জন্য লোক খুঁজিতে নদীর তীরে উঠিয়াছে। তাহারা কি করিয়া নাগমহাশয়কে জানিবে? আমাদের বাড়ীর নিকট একঘর মাঝি বাস করিত। তাহারা আমাদের সূত্রে নাগমহাশয়কে চিনিত। তাহারা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিত, তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সৎলোক বলিয়া জানিত। তাহাদের একজন মাঝি দেওভোগে নাগমহাশয়দের বাড়ী চিনে বলায়, বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত সুখী হইলেন, নিজেদের পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া নাগমহাশয়কে দেখিতে চলিলেন। তাহারা সেই মাঝীকে বলিলেন, তাহাদের মাইজী স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নারায়ণগঞ্জের নিকটে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের ঘরে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই মাইজী দীনদয়[illegible] ছেলেকে দেখার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ মনের আনন্দে দেওভোগ চলিলেন। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেই সময় নাগমহাশয় বাড়ীতেও ছিলেন; কিন্তু কোথায় যে চলিয়া গেলেন, কেহ দেখিল না। যে পর্য্যন্ত তাহারা নাগমহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। ৩।৪ দিন দেওভোগে থাকিয়া, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ অদৃষ্টকে দোষী করিয়া চলিয়া গেলে, নাগমহাশয়কে বাড়ীতে দেখা গেল। সেই অবধি সেই মাঝীর বাড়ীর লোক তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিত, সুখে ও দুঃখে তাঁহার আশ্রয় নিত।